শতকিয়া

সুবোধ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শতক্রিয়া

আর কতদূর ?

আর খুব বেশি দূর নয়। এই বাবুরবাজার থেকে পুরনো সড়ক ধরে তিন
শ দক্ষিণে চলে গেলেই মধুকুপি নামে সেই গাঁ, যে গাঁয়ে দাশু ঘরামির একটি
আছে আর ঘরণীও আছে।

গাঁয়ের পাশে ডরানি নামে সেই ছোট নদীটিও আছে, যে নদীতে বৈশাখ
সও হাঁটুজল থাকে। আর, সেই পাহাড় দুটিও আছে; ছোটকালু ও
কালু, কাদামাখা মোষের গায়ের মতো কালো-কালো আর মেটে-মেটে রঙের
ট বেঁটে আকারের পাহাড়। বোশেখের ভয়ানক শুকনো দুপুরে যখন
ানির স্রোতের কিনারাতে কোন বকও বসে থাকে না, তখন এই দুটি পাহাড়ের
য়ের উপর ছাগল চরে বেড়ায়, কচি বটের পাতা খায়। আর, শ্রাবণের শেষে
হাড়ের গায়ে, এমন কি মাথার উপরেও পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাস
ন ঘন হয়ে গজিয়ে ওঠে, তখন গাঁয়ের রোগা রোগা গরুর দল কাঁকুরে ডাঙার
শ ঘাস ছেড়ে দিয়ে বরং ছোটকালু আর বড়কালুর কোলে বুকে ও মাথায়
ড় তাজা ঘাসের গোছা খেতে ভালবাসে।

মাস সন্ধ্যা হয়েছে। মোটর বাস থেকে নেমে বাবুরবাজারের পথের উপর
ড়িয়ে একটা আরামের হাঁপ ছেড়ে সোজা দক্ষিণের আকাশের দিকে তাকিয়ে
রের আবছায়াময় মধুকুপির সেই জঙ্গলটাকেও চিনতে পারে দাশু ঘরামি।
দলটা আছে, সেই কপালবাবার জঙ্গল, যার কিনারায় বেলগাছের তলায় একটা
ল পাথর আর একটা খুলি পড়ে আছে।

আছে, সবই ঠিক আছে। কপালবাবার আসন যেখানে ছিল আজও নিশ্চয়
ানে আছে। কিছুই বদলায় নি। এই পাঁচ বছরের মধ্যে বদলে যাবারই
ক আছে? আর তিন ক্রোশ পথ হেঁটে পার হয়ে যেতে পারলেই দাশু
মি তার পুরানো মধুকুপিকে, ছোটকালু আর বড়কালুকে, নুড়ি-ছড়ানো
র বালুমাখা সেই ডরানির কলকল জলের স্রোতটাকেও পেয়ে যাবে। হরিপদ
চয় এখনও কপালবাবার জঙ্গলে মৌচাক ভাঙে; আর সুরেন মানঝি রোজ
পুর হতে-না-হতে তার ছোট গো-গাড়ি মরা শালে বোঝাই করে জঙ্গলের
তর থেকে বের হয়ে আসে। আজও নিশ্চয় রোজই পালকি বইতে গোবিন্দ-
রে যায় হরিশ নিধিরাম আর লটবর।

মধুকুপি জনমজুরের গাঁ, যে গাঁয়ের মানুষেরা সবাই মনিষ। পরের মাটি
টে, পরের জমি চষে, পরের গো-গাড়ি হাঁকায়, পরের ঘরের চালা ছায় আর
রের পালকিতে বেহারা খাটে।

জঙ্গলকে একেবারে পর ভাবে না, কিন্তু ক্ষেতের মাটিকে বেশি ভালবাসে;
ড় টাঙ্গি ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু লাঙ্গল কোদাল হাতে তুলে নিয়েছে। কর্মঠ
মিজ জীবনের ছোট্ট একটি উপনিবেশ এই মধুকুপি। জাতের পেশা নামে

ধরাবাঁধা কোন পেশা নেই। ঘরের চালা ছেয়ে দু পয়সা রোজগার করতে বছরের দুটি মাস গোবিন্দপুর যেত দাশু; দাশু তাই দাশু ঘরামি। দ বাবা ছিল কাঠুরিয়া, বাবার বাবা মাটিয়াল।

ত্রিশ মাইলের মধ্যে রেল-লাইন নেই, এহেন মধুকুপির মনে একটা স্ব আছে যে, গাঁয়ের কোন মানুষ আজ পর্যন্ত গোবিন্দপুর হাসপাত ওষুধ মুখে দেয় নি। কপালবাবার সেই বেলগাছের পাতাই যথেষ্ট, মধু সব রোগের ওষুধ, সব ভয়ের কবচ আর সব মানতের আশ্বাস। ... হেই, সেই মধুকুপি!

এখানে সড়কের দু পাশে গোটা দশেক চালাঘর, তারই নাম বাবুরবাজার যাই হোক, বাবুরবাজারের এই দশা কেন? একেবারে স্তব্ধ। সব দোকান বন্ধ। একটাও গো-গাড়ি নেই। এই তো সেই বাবুরবাজার, যেখানে ঠি সন্ধ্যার পর যত ধানের গাড়ি এসে ভিড় করত, আর মানপুরের পাইকারে টাকার থলি হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে দর হাঁকত। কোথায় গেল তারা? বা বাজারের সন্ধ্যার প্রাণটা পালিয়ে গেল কোথায়?

নিতাই মুদির দোকান আছে দেখা যায়। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। কিন্ ভিতরে আলো জ্বলছে। এগিয়ে যায় দাশু ঘরামি। চাপাগলায় ডাক দেয়— নিতাইদাদা আছ হে?

—কে?

—আমি দাশু।

দোকানের ঝাঁপ খুলে নিতাই মুদি বের হয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে তাকি থাকে: এ কি! তুই হঠাৎ এই অসময়ে! ছাড়া পেলি কবে?

দাশু—আজই ছাড়া পেলাম।

নিতাই সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে—কিন্তু তোর মেয়াদের পাঁচ বছর কি শে হয়েছে?

দাশু হাসে: না দাদা।

নিতাই মুদি তার কাঁপা হাতে দোকানের ঝাঁপ ধরে হঠাৎ একটা টান দেয় দরজার অর্ধেকটা বন্ধ করে দিয়ে বলে—জেলখানার পাঁচিল টাঁচিল টপ পালিয়ে এসেছিস মনে হচ্ছে।

—না গো। সাজার চার মাস মকুব হয়েছে।

অনেকক্ষণ দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর চোখ বুজে যে মনের সন্দেহটাকে আস্তে আস্তে সামলাতে চেষ্টা করে নিতাই মুদি। দোকানে ঝাঁপ আবার একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে নিতাই—সাজার চার চারটে মা মকুব করে দিল, এটাও যে আশ্চর্যের কথা বলছিস দাশু!

—হ্যাঁ। একটা ক্ষেপা দাগীর হাত থেকে ছুরি ছিনে নিয়ে জমাদ বাঁচিয়েছিলাম। সে বাবদ দু মাস মকুব হয়েছে। আর জেলের ফু চারটে কবাইত সাপ মেরেছিলাম। সে বাবদ এক মাস।

নিতাই—এ তো মোট তিন মাস হল। হিসাব ভুল করছিস কেন রে?

—তাইদাদা ?

নিতাই মুখ টিপে হাসে : যাচ্ছিস যা। কিন্তু ঠকবি।

ঝট করে হাত চালিয়ে দরজার ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় নিতাই মুদি।

তিন ক্রোশ পথ হন হন করে হেঁটে পার করে দিতে কতক্ষণই বা লাগবে? ভয়? দূরত্বকে নয়, অন্ধকারকে নয়, এবং কানায়ানীর রক্তলোলুপ ভয়ানক কুয়ার উৎপাতকেও নয়, কাউকেই ভয় করতে ইচ্ছা করে না। ভয় করেও না। দাশু ঘরামির বুকের ভিতরটাই যে স্বপ্নলোলুপ একটা পিপাসায় মত্ত হয়ে উঠেছে। বার বার মনে পড়ে, শুধু একটি মুখের ছবি। মুরলীর মুখটা। জমাদার মহেশ রাখালের যে মেয়েকে একান্ন টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল দাশু ঘরামি, সেই মুরলী।

আকাশের তারার দিকে মাঝে মাঝে তাকায় আর পথ হাঁটে দাশু। হাতের পুটলিটা দোলে, যার ভিতর এক শিশি ফুলেল তেল আর এক শিশি আলতাও দোলে। ঠিক যেদিন মুরলীর জন্য ঠিক এই দুটি জিনিস কিনতে গোবিন্দপুরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল দাশু, প্রায় পাঁচ বছর আগের সেই সকালে দাশু ঘরামির জীবনের একটা আক্রোশ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে রইল। তার পরেই গ্রেপ্তার আর চালান। এক মাসের মধ্যেই পুরুলিয়ার দায়রা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাকিমের রায় শুনতে হয়েছিল, সাংঘাতিক অস্ত্র দিয়ে মানুষকে সাংঘাতিকভাবে জখম করার অপরাধে দাশু ঘরামির পাঁচবছরের শক্ত কয়েদ।

যার জন্য এই সাজা তার চেহারাটাও মনে পড়ে। মুরলীর মত জীবন্ত হাসি হাসে না সে, কিন্তু হাসে ঠিকই। সে হল, গুলঞ্চের বেড়া দিয়ে ঘেরা দেড় বিঘের মত জমি।

মাত্র দেড় বিঘে চাকরান জমি, মাটি এঁটেল। কিন্তু চেষ্টা করলে ওই এঁটেলকেই সামান্য গোবরসার দিয়ে তৈরি করে বছরে দুটো ফসল তোলা যায়। শীতের তিন মাসে ভাল সব্জী তোলা যায়; তারপর জিরে বুনে দিলেই হয়। মানপুরের পাইকারেরা জিরের ভাল দর দিতে রাজি আছে।

জিরে বুনব, জিরে বুনব, দশটা টাকা জমাতে পারলেই ওই দেড় বিঘেতে সোনার দানার মত জিরে ফলাব, মুরলীর কাছে কতবার এরকমের আশার কথা বলেছে দাশু।

কিন্তু কোথা থেকে এসে দেখা দিল এক রায়বাবু, ইঁটের ঠিকাদার। দাশু ঘরামির সেই দেড় বিঘে জমি তার চাই, প্রকাণ্ড এক ইঁটখোলা চালু করবে রায়বাবু। পঁচিশ টাকা নাও, আর ঐ দেড় বিঘে জমি ছেড়ে দাও; লোক পাঠিয়ে বার বার দাশুকে একটা রফার প্রস্তাব জানিয়েছিল রায়বাবু। কিন্তু জমি ছাড়তে রাজি হয় নি দাশু।

—পাঁচশো টাকা দিলেও না। বেশ জোর গলায় হাঁক দিয়ে রায়বাবুর

সরকারের দিকে একদিন মারমুখো হয়ে তেড়ে গিয়েছিল দাশু।

—ঈশানবাবুর মত মানুষ তাঁর তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর পর্যন্ত রায়বাবুর ইঁটখোলার জন্য ছেড়ে দিতে পারলেন, আর তুমি তোমার এক টুকরো চাকরান ছেড়ে দিতে পারবে না, কোথাকার লাট হে তুমি ?

রায়বাবুর সরকার মশাইয়ের এই গর্জনের উত্তরে দাশুও গর্জন করেছিল—চুলায় যাক ঈশানবাবুর বেরোমত্তোর। ঈশানবাবু সদরে বসে মোক্তারি করে, আর গাঁয়ে এসে জমি মারে। ওর কত জমি! ডরানির জলে ওর দশ বিঘা জমি গলে গেলেও ওর কোন দুখ নাই ; কিন্তু আমার দুখ হয় গো মশাই।

—শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতেই হবে বাবা।

—কেন ?

—নতুন সেটেলমেণ্টের কাগজে দেখেছি, তাতে তোমার এই দেড় বিঘে চাকরানের কোন দাগ নেই। এখান থেকে শুরু করে ওই সড়ক পর্যন্ত সবই ঈশানবাবুর সাবেক পতিত, রায়বাবু ইজারা নিয়েছেন।

—কাগজে দাগ নাই তো নাই। সারা গাঁয়ের লোক জানে ওটা আমারই তিন পুরুষের ভোগদখলের জমি। লাঙ্গল গরু নাই, বীজ কিনবার পয়সা নাই, তাই চাষ দিতে পারি নাই ; কিন্তু তাই বলে জমি ছেড়ে দিব কেন ?

—জমিটা তোমার কোন কাজে লাগছে না, তবুও ছাড়বে না ?

—না।

—আচ্ছা।

সেই যে শাসিয়ে গেল রায়বাবুর সরকার, তার দশ দিন পরে সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাঠের দিকে লোকের হল্লা শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে দাশু ঘরামি।

গোবর মাখা হাত নিয়ে ছুটে এসে মুরলীও চেঁচিয়ে ওঠে—ইঁটখোলার লোক এসে মাটি কাটতে লেগেছে গো।

দেখতে পায় দাশু, গুলঞ্চের বেড়া উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেড় বিঘে চাকরান, সেই শান্ত শক্ত চৌরস এঁটেলের উপর ঝপাঝপ কোদালের আঘাত পড়ছে। এরই মধ্যে মস্ত বড় দুটো গর্ত হয়ে গিয়েছে। রায়বাবুর সরকার দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি হাতে নিয়ে তিনজন ভাড়াটে লেঠেলও দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার টাঙ্গি কোথা রে মুরলী ? কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। দাশু ঘরামির পঁচিশ বছর বয়সের মজবুত শরীরের হাড়গুলি যেন আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে কটকট করে বাজতে থাকে। চোখ দুটো নেশাড়ে মানুষের চোখের মত ঘোলাটে হয়ে যায়।

গোবরমাখা হাতেই মুরলী দাশুর হাত চেপে ধরে অনুনয় করে—যেও না। ওরা অনেক লোক, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।

এক ধাক্কা দিয়ে মুরলীকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের চালা থেকে টাঙ্গিটা টেনে বের করে নিয়ে ছুটে চলে দাশু। যে টাঙ্গি দিয়ে ফণীমনসার ঝোপের অনেক শজারুকে এক কোপে দু' টুকরো করেছে দাশু সেই টাঙ্গি হাতে তুলে নিয়ে দাশু ঘরামির মনে হয়েছিল, ইঁটখোলার লোকগুলিও যেন উৎপাতের শজারু।

সেই মুহূর্তে…

সেই মুহূর্তে দাশুর টাঙ্গির একটি আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রায়বাবুর সরকার। ঠিক ঘাড়ের কাছে কোপটা পড়েছে। রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে। পাগড়ি-বাঁধা মাথা, সব চেয়ে লম্বা-চওড়া চেহারার লেঠেলটার মাথা লক্ষ্য করে দাশু ঘরামির টাঙ্গি হিংস্র হয়ে লাফিয়ে উঠতেই মাথা নীচু করে মাথা বাঁচায় সেই লম্বা-চওড়া লেঠেল। টাঙ্গিকেও ধরে ফেলে। দাশু ছুটে এসে ঘরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়—আমার কাটারিটা দে তো মুরলী।

কাটারিটা লুকিয়ে ফেলে মুরলী। চিৎকার করে, গাঁয়ের মানুষ কে কোথা আছ গো জলদি এস।

যারা কাছে ছিল, তারা মুরলীর ডাক শুনে ছুটে এসে দাশুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঃ একটু থাম দাশু। মাথা খারাপ করিস না; পাগলপারা কাণ্ড করছিস কেন?

পালিয়ে গেল ইঁটখোলার লোকজন। ভাড়াটে লেঠেলরা সরকারের জখম শরীরটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দূরের সড়কের উপর একটা মোটর গাড়ির দিকে চলে গেল।

তার পর মাত্র একটি দিন মুরলীকে চোখের সামনে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল দাশু। পরের দিন সকালে দাশুকে গ্রেপ্তার করার জন্য যখন পুলিস এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াল, তখন মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল দাশু ঃ আমি তো চললাম, কিন্তু তোর কি করে দিন চলবে মুরলী? ঝালদা চলে যাবি?

মুরলী—না।

দাশু—এই ঘরে থাকবি?

মুরলী—হ্যাঁ।

দাশু—কিন্তু কতদিন থাকতে পারবি?

মুরলী—যতদিন না তুমি ফিরে আস।

দাশু—বেঁচে থাকবি তো?

হাতের তেলো দিয়ে চোখের জল মুছে মুরলী বলে—থাকবো।

মুরলীর সেই মুখটাকে মনে পড়ে। কী সুন্দর একটা প্রতিজ্ঞার জোরে মুরলীর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। বয়সটি সুন্দর, চেহারাটি সুন্দর, আর কথাগুলিও কত সুন্দর। যত দিন না দাশু ফিরে আসে, ততদিন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেই আর এখানেই পড়ে থাকবে মুরলী।

সেই মুরলী আজ এখন ওই মধুকুপির একটা মাটির ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। মধুকুপি বদলায় নি, মুরলীই বা বদলাবে কেন? মুরলীর বয়সটা আঠার থেকে তেইশ হয়েছে, এই মাত্র। কাঁচপোকার টিপ কপালে লাগিয়ে কেমনটি হাসত মুরলী! আজও কাঁচপোকার টিপ পরে তো মুরলী?

ওই তো ওই জমাট অন্ধকার হলো কপালবাবার জঙ্গল। বাতাসটা ঠাণ্ডা। ডরানির স্রোতের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এইবার ডান দিকে একটু ঘুরে

গেলেই মধুকুপির ডাঙা কাছে এসে পড়বে।

দাশু ঘরামির পথ চলার আবেগ হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খায়। একটা নতুন বিস্ময়ের আঘাত। এই সড়ক তো ঠিক সেই সড়ক নয়। লাল কাঁকর আর ধুলোয় ভরে থাকত যে সড়কটা, সেটা এরকম ভরাট আর শক্ত হয়ে গেল কেমন করে? কালো কাতরা ঢেলে সড়কটাকে পাকা করা হয়েছে বলে মনে হয়। ধুলো নেই। লড়াইয়ের সময় এই সড়ক দিয়ে গোরা পল্টন কতবার কাতার দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। ঢেঙা ঢেঙা, হট্টাকাট্টা, সাদা সাদা আদুড় গা; যত আমরিক গোরা।

এই সড়কটাই তো দাশু ঘরামির সেই মাটির ঘরের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। আজও ভুলে যায় নি দাশু, কী ভয়ানক উৎপাতের দিনই না গিয়েছে, কানারানীর উৎপাতের চেয়েও ভয়ানক মানুষখেগো উৎপাত। ঘরের দরজা সব সময় বন্ধ করে রাখতে হত। দরজার কাছে এক মিনিটও নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াবার সুযোগ পেত না মুরলী। পল্টনের দল আসছে আর যাচ্ছে। সাঁজোয়া গাড়ি যায়। ঝনঝন শব্দের হুল্লোড় তুলে লোহার জানোয়ারের মত এক-একটা ট্যাঙ্ক যায়। রামগড়ের দিক থেকে আসে, আর কোথায় যে চলে যায় কে জানে? আবার কোথা থেকে যেন আসে, আর রামগড়ের দিকে চলে যায়। মুরলীর শাড়ির আঁচলটা, মুরলীর খোঁপার ছায়াটাও যদি ভুল করে দরজার কপাটের আড়াল থেকে বের হয়ে পড়ত, তবে সেই মুহূর্তে পল্টনের মুখ থেকে কী ভয়ানক লুব্ধ একটা আহ্লাদের আওয়াজ উথলে উঠত। সেই পুরনো জমকাঠের জীর্ণ দরজার কপাটের উপর কতবার ঝুপঝাপ করে লুটিয়ে পড়েছে গোরা পল্টনের মতলবের যত উপহার—চকোলেটের প্যাকেট, এক গাদা লেবেনচুষ, সিগারেটে ভরা ডিবে, এঁটো মদের বোতল। মুরলী সেই সব জিনিস কোনদিন পা দিয়েও ছোঁয় নি।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। হঠাৎ গা ছমছম করে উঠেছে। মনের ভিতরেও একটা কাঁপুনি যেন সিরসির করে। ছোটকালুর মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে দেখা যায়।

চাঁদের আলোতে অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু চিনতে পারা যাচ্ছে না। কি এগুলি? কোথায় ছিল? কেমন করে এল? কেন এল? মধুকুপির ডাঙার দুরকিনারায় ওসব কিসের ইমারত গড়ে উঠেছে? ডরানির এই স্রোতটার উপর পুল বাঁধা হল কবে? এদিকে ওদিকে এত রাস্তা কেন? কোন্ দিকে কার কাছে ছুটে গিয়েছে কালো সাপের মত কিলবিলিয়ে এইসব রাস্তা? অনেক দূরে ধোঁয়া ছাড়ছে একটা চিমনির মুখ। তবে কি ওখানে কারখানা হয়েছে?

না, ঠিক সে মধুকুপি নয়। ডরানির ভাদুরে জলের ঢলে মধুকুপির ডাঙা বোধহয় আর ভেসে যায় না। বোধহয় বড়কালুর মাথার উপর বাজ পড়ে না; পোড়া ঘাসের বন থেকে গরম ধোঁয়া আর ফুরফুর করে ওড়ে না। জোরে হাঁপ ছাড়তে গিয়ে দাশুর হতাশ নিশ্বাসটা কেঁপে ওঠে।

তা হলে কি মুরলীর মুখের হাসিটাও বদলে গিয়েছে ? কে জানে কেমন করে এই পাঁচটা বছর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে মুরলী। জেলে যাবার আগে মুরলীর হাতে পাঁচটা টাকাও রেখে আসে নি দাশু। দাশুর বুকের উপর মাথা রেখে রোজ ঘুমিয়ে পড়ত যে নরম-সরম মুরলী, সে এই পাঁচটা বছর নিজেকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করে নিয়ে গতর খাটাতে পেরেছে কি ? গরু চরিয়েছে ? কাঠ ভেঙেছে ? জঙ্গলের তেঁতুল কুড়িয়ে হারানগঞ্জের হাটে গিয়ে বেচে এসেছে ? কিংবা গোবিন্দপুরের কোন বাবুর বাড়িতে দাই খেটেছে ? তা না হলে মুরলী বেঁচে থাকবে কি করে ?

ভয়ে ছমছম শরীরটা এইবার ছটফট করে ওঠে ব্যস্তভাবে, প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে দাশু।

ঘুমন্ত মধুকুপির পিপুলের ছায়ার কাছে এসে পড়ে দাশু। দাশুর অনেক চেনা সেই পিপুল, গাঁয়ে ঢুকবার পথে আগভাগে যেটা পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে আছে। পিপুলের কাছে দখিন গুরুজীর বাড়ীটাও আছে। হ্যাঁ, গুরুজীর বাড়ির সামনে সিমেন্ট-বাঁধানো একটা চাতাল দেখা যায়। বাঃ, গুরুজীর সুখ আরও জমাট হয়েছে মনে হয়।

দাশু ঘরামির ঘর। সেই পাঁচ হাত উঁচু মাটির দেয়াল, খাপরার চালা, আর পুরনো জামকাঠের একটা দরজা। পাঁচ বছর আগে সেদিন কোমরে দড়ি বাঁধা দাশু ঘরামি পুলিসের সঙ্গে চলতে চলতে অনেক দূর গিয়েও একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, তখনও এই দরজার কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মুরলী। ওই সেই কপাট, যার গায়ের উপর কতবার নেকড়ের আঁচড় পড়েছে। আর, শব্দ শুনে ভয় পেয়ে দাশুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে মুরলী।

আর সেই দেড় বিঘে জমি ? সেটা কোথায় গেল ? চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু ; দেখতে দেখতে দুই চোখ কাঁপিয়ে একটা জ্বালা ফুটতে থাকে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যেন বুক চিরে হাঁ করে পড়ে আছে সেই দেড় বিঘে জমি। সারি সারি কতগুলি গর্ত। গর্তের মধ্যে ছোট ছোট ঝোপ, বোধহয় শিয়ালকাঁটার ঝোপ। আর ইঁটের পাঁজার যত টুকরো টুকরো হাড়-গোড়, গুঁড়ো গুঁড়ো ঝামা আর ঝুনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বদলে গিয়েছে মধুকুপি। দাশু ঘরামির জেলখাটা শক্ত শরীরের পাঁজরগুলি যেন হাঁ করে তাকিয়ে ধুঁকতে থাকে। তার পরেই চমকে ওঠে দাশু। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে মনে হয়। জেগে আছে মুরলী ? একটা শব্দও শোনা যায়, ঘর্‌ঘর্‌ ঘর্‌ঘর্‌ অদ্ভুত শব্দ। এত রাত্রে কোন্‌ শব্দের সঙ্গে খেলা করছে মুরলী ? কিসের এত আহ্লাদ ?

হাত তুলে দরজার কপাট কাঁপিয়ে একটা ধাক্কা দেয় দাশু : আমি এসেছি মুরলী। দরজা খোল।

খুলে যায় দরজার কপাট। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু। মুরলীর কপালে কাঁচপোকার টিপ নেই, যদিও মুখ টিপে হাসছে মুরলী।

দাশু ঘরামির সাধের মুরলী নয়। পাঁচ বছর ধরে জেলের জীবনে রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে মুরলীর যে চেহারাটা মনে পড়েছে, সে চেহারা নয়। হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির মেয়েদের মত ঢং করে শাড়ি পরেছে মুরলী। গায়ে নতুন রকমের জামা, ঈশানবাবুর মেয়েরা যে-রকমের জামা গায়ে দেয়। মুরলীর পায়ে চটিজুতা। আর, বিছানাটা যেন বাইজী-নাচের বড়বাবুর বসবার আসর; মোটা নরম তোশকের উপর সাদা ধবধবে চাদর আর মোটা মোটা বালিশ। কাঠের দুটো চারপায়াও আছে ঘরের ভিতরে। তার একটার উপর ছোট একটা কল। এই কলটাই বুঝি এতক্ষণ ধরে ঘর্ ঘর্ করছিল!

তাই তো, সবচেয়ে বেশি বদলে গিয়েছে দাশু ঘরামির ঘরণী মুরলী। ডরানির স্রোতের উপর নতুন পুল দেখে আশ্চর্য হয়েছিল দাশু। কিন্তু কী ভয়ানক আশ্চর্যের জিনিস সেই মুরলীর এই চেহারা! দাশু ঘরামির চোখের ফ্যালফেলে বিস্ময় আস্তে আস্তে কটকট করে জ্বলতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—বেঁচে আছিস মুরলী?

মুরলী হাসে: দেখতেই পাচ্ছ।

হাতের পুঁটলিটাকে একটা আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দাশু। ফুলেল তেলের আর আলতার শিশি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তেল আর আলতার ধারা মিশে গিয়ে গাঢ় রক্তের ধারার মত ঘরের মেজের উপর গড়াতে থাকে।

—কি হলো? ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করে মুরলী।

—তোর কি হল, সেটা আগে বল।

—আমার আর কি হবে? যা দেখছো তাই। বেঁচে আছি।

—কিন্তু তুই কি আছিস?

—আছি।

—না, হতে পারে না। তুই গিয়েছিস।

—গালি দিও না।

—গালি তো ভাল। এখনও যে টাঙ্গি হাতে তুলি নাই সেটা তোর বাপ মহেশ রাখালের কপালের জোর।

—কি বললে?

—ঠিক বলেছি।

—তোমার চোখ নাই।

—চোখ আছে, খুব ভাল চোখ আছে, সবই দেখছি।

দাশুর চোখের চেহারা দেখে থরথর করে কেঁপে ওঠে মুরলী। হ্যাঁ, কটকট করে তাকিয়ে মুরলীর শরীরটাকে যেন তন্নতন্ন করে দেখছে দাশু। আর, দাউ দাউ করে জ্বলছে চোখভরা সন্দেহ।

—আমি এখনি এই ঘরে আগুন লাগাবো। তোর ওই সাধের কল আছাড়

মেরে ভাঙ্গবো। কিন্তু তার আগে…।

ক্ষেপা নেকড়ের মত একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে এক হাতে মুরলীর শাড়ির আঁচল শক্ত করে চেপে ধরে দাশু ঃ তার আগে আমি দেখবো।

মুরলী বলে—কি দেখবে ?

দাশু—দেখবো, সব দেখবো। এত ফুলেছিস কেন ? তোর কোমর এত মোটা হলো কেন ? তোর পেটে…।

মুরলী—সাবধান বলছি।

মুরলীর শাড়ির আঁচলটাকে দু হাতের আক্রোশ দিয়ে হিংস্রভাবে ধরে নিয়ে জোরে একটা টান দেয় দাশু। মুরলীও দু হাত দিয়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে মেজের উপর বসে পড়ে।

—তুই নষ্ট হয়েছিস। গর্জন করে দাশু।

—তুমি পাগল হয়েছ! দাশু ঘরামির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে উত্তর দেয় মুরলী।

—আমি পাগল হই নাই, কিন্তু তুই খুব চালাক হয়েছিস।

মুরলীর সেই একজোড়া বেহায়া চোখের দিকে জখমী জানোয়ারের মত হিংস্রভাবে তাকিয়ে আব দাঁত দিয়ে পিষে পিষে কথা বলে দাশু। চোখে পড়ে, মুরলীর খোঁপাটা লাল ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, তার মধ্যে আবার ছোট ছোট বেলকুঁড়ি কাঁটা গাঁথা রয়েছে।

এক হাত ছুঁড়ে দিরে, যেন থাবা দিয়ে মুরলীর খোঁপাটাকে চেপে ধরে দাশু। খোঁপা ভেঙে যায়, বেলকুঁড়ি কাঁটা ঝরে পড়ে। তারপর একটা লাফ দিয়ে সরে এসে ঘরের দেয়ালের খোপে হাত দিয়ে কি-যেন খোঁজে দাশু। আবার সরে গিয়ে চালার গোঁজের ভিতর হাত চালিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। ভাঙা খোঁপাকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আর চোখের চাহনিকেও অদ্ভুত এক দুঃসাহসে শক্ত করে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—টাঙ্গি খুঁজছো ?

দাশু—হ্যাঁ।

মুরলী—কেন ?

দাশু—তোকে বলি দিব।

মুরলী—হোই দেখ, ঝুড়িটার পিছনে তোমার টাঙ্গি।

টাঙ্গি হাতে তুলে নেবার জন্য এগিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ যেন চমকে ওঠে দাশু। থবকে দাঁড়ায়, মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে—এত ডাঁট কেন রে মাগি ?

মুরলী—কেন ডাঁট হবে না ? আমি তোমার পল্টনী দিদি নই।

দাশু ঘরামির হাতের দুঃসাহস যেন আঁতকে ওঠে। মুরলী যেন পাথুরে ঢেলার মত শক্ত একটা ধিক্কার ছুঁড়ে মেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে জব্দ হয়ে গিয়েছে দাশু ঘরামির পাগলাটে সন্দেহ।

পল্টনী দিদি নই ? কি বলতে চায় মুরলী ? সারা মধুকুপির মধ্যে শুধু

এক পল্টনী দিদির ঘরে এইরকম শখের বিছানা আছে। এইরকম নরম তোশক, মোটা মোটা বালিশ, আর নক্‌শাদার চাদর। এখান থেকে আধ ক্রোশও হবে না, মাঠান কুলের ছোট জঙ্গলটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এক বুড়ো পাকুড়ের ছায়ার কাছে পল্টনী দিদির ঘর। ওই ঘর একটা জাতছাড়া ঘর। গ্রেপ্তার হয়ে দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে ভেলকিওয়ালার বাঁদরের মত পুলিসের সঙ্গে পথ হেঁটে চলে যাবার সময়, সেই পাঁচ বছর আগের এক সকালবেলাতে দেখতে পেয়েছিল দাশু, পল্টনী দিদি তার ঘরের দরজার সামনে বসে তালপাতার পাখা বাঁধছে। আর, পল্টনী দিদির গোরা-গোরা চেহারার সেই দোগলা ছেলে দুটো—সেই মোটা আর কটা, ছাগলছানার সঙ্গে খেলা করছে।

তা হলে পল্টনী দিদিও আছে? চলে যায় নি, মরেও যায় নি পল্টনী দিদি।

দশ বছর আগে পাঁকুড়তলার ওই নারীকে কেউ পল্টনী দিদি বলে ডাকত না। ওই ঘরের কাছে আরও তিন-চারটে ঘর ছিল। চার ঘর শিয়ালগীর—ভুতন, লেদু, লকাই আর ভরত; শিয়াল মেরে, শিয়ালের চাম বেচে, আর মাগ-ছেলে সবাই মিলে হাঁড়িয়া খেয়ে দিনরাত নেশা করে বেশ সুখেই ওরা থাকত। রোজই সন্ধ্যা হলে যখন কুলের জঙ্গলের আশেপাশে হুয়া হুয়া শিয়ালের ডাক বেজে উঠত, তখন এই ঘরের ভিতরে বসে হেসে হেসে কত ঢলাঢলি করছে দাশু আর মুরলী। কী সুন্দর শিয়াল ডাকছে ভরত আর ভুতন!

মুরলী হেসে হেসে দাশুর অনুমানের ভুল শুধরে দিত, ভরত আর ভুতন নয় ভরত। আর বাতাসী।

ভরতের বউ সেই বাতাসীর পুরনো নাম মুছে গিয়েছে। সেই বাতাসীই হল আজকের মধুকুপের পল্টনী দিদি।

ঠিক সেই লড়াইয়ের সময়, গাঁয়ের লোকের মনের ভুলে একবার দু মাসের মধ্যেও একটা পুজো পায় নি কপালবাবা। এমন কি, জেঠুয়া অমাবস্যায় কপালবাবার আসনের কাছে যে একটি ডাগর সাদা ছাগ বলি দেবার নিয়ম ছিল, তাও ভুলে গিয়েছিল সবাই। বড় ব্যস্ত ছিল সবাই। লড়াইয়ের মাল চালানের যত ঠিকাদার এসে গাঁয়ের মানুষের হাতে হাতে দাদন ছড়িয়ে দিয়েছিল। এত পয়সা জীবনে দেখে নি মধুকুপি। শুধু ডরানির বালু তুলে গো-গাড়ি বোঝাই কর আর বাবুরবাজারে ঠিকাদারের মোটর ট্রাকের কাছে ফেলে দিয়ে এস। দিনে এস, রাতে এস। কোন অসুবিধা নেই। ঠিকাদারের লোক নগদ নগদ ঢোলাই মিটেয়ে দেয়।

সেই সময় ভয়ানক রাগ করেছিল কপালবাবা। আর, এক মাসের মধ্যে মধুকুপির পঞ্চাশেরও বেশি মানুষের প্রাণ কলেরায় শেষ হয়ে গেল। ছেলে বুড়ো জোয়ান, মাগি আর মরদ, সব লাস ওই ডরানির জলে ফেলে দিতে হয়েছিল। কিছু ভেসে গিয়েছিল, কিছু শেয়ালে খেয়েছিল, খুঁজলে বোধহয় ডরানির বালুর কোন গর্তে আজও দু-একটা খুলি পাওয়া যাবে।

সেই কলেরাতেই শেষ হয়ে গেল ওই চার-ঘর শিয়ালগীরের সংসার। শুধু রইল বাতাসী। ভরতের রাঁড়ি বউ বাতাসী।

কপালবাবার রাগ শান্ত হল তখন, যখন ডরানির ভাদুরে ঢলে ভাঙার সব কোদো ধান ভেসে গেল, আর কুলের জঙ্গলে সব লা-এর ফেকড়ি পচে গেল। আর, শুরু হল লাল কাঁকরের সড়ক দিয়ে গোরা পল্টনের যাওয়া-আসা ; গান গেয়ে, শিস বাজিয়ে, সড়কের ধুলো উড়িয়ে দিনরাত ছুটে যায় আর আসে, আসে আর চলে যায় পল্টনের গাড়ি। একদিন এই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার শুনতে পেয়েছিল দাশু—গোরা পড়েছে, গোরা পড়েছে, বাতাসী দিদির ঘরে ঘরে গোরা পড়েছে।

গাঁয়ের তিন-চারটে গরু-চরানী মেয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলে যেতেই টাঙ্গি হাতে তুলে নিয়েছিল দাশু। দাশু ঘরামি ছাড়া সেসময় মধুকুপির ঘরে ও ক্ষেতে কোন পুরুষও বোধহয় ছিল না। যাই হোক, শেষে কিন্তু টাঙ্গিটাকে অলসভাবে কাঁধের উপর রেখে আর হেঁটমাথা হয়ে দাশুকে আস্তে আস্তে হেঁটে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল।

—কি হলো ? আতঙ্কিত চোখ নিয়ে প্রশ্ন করেছিল মুরলী।

—সলজারের হাত ধরে বাতাসী হাসছে। ডুবেছে, মরেছে, নরকে গিয়েছে বাতাসী। বলতে বলতে টাঙ্গিটাকে উঠানের একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দাশু।

যে বাতাসীকে, যে কলঙ্কিনীকে পল্টনী দিদি নাম দিয়েছে গাঁয়ের লোক, তার ঘরের সুখের চেহারাটা দু-তিন মাসের মধ্যেই কেমনতর পাল্টে গিয়েছিল, তা-ও কারও অজানা নয়। একবার দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, মস্ত বড় একটা ঘাগরা পরে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পল্টনী দিদি। ঘরের দাওয়ায় বসে মাঝে মাঝে গানের একটা কলও বাজাত।

কোন লজ্জা নেই, কোন আক্ষেপ নেই ; পল্টনের গাড়ি সড়কের উপর থামলেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে ফিক করে হেসে উঠত পল্টনী দিদি। তিনটে বছর যেতে না যেতেই দুটো ছেলে হল পল্টনী দিদির। সোনা রঙের চুল, ধবধবে ফরসা, আর কটা চোখ—দুটো ছেলে। পল্টনী দিদির প্রাণটাও যেন আহ্লাদে মুখর হয়ে ছেলে দুটোকে দুটো আদুরে নাম দিয়েছিল—মোটা আর কটা।

গরু-চরানী মেয়েরা পাকুড়তলার কাছ দিয়ে যেতে যেতে কতবার তাকিয়ে দেখেছে, ঘরের দাওয়ার উপর শখের বিছানা পেতে শুয়ে আছে পল্টনী দিদি। আর মোটা ও কটাকে বুকের উপর চড়িয়ে ছড়া গাইছে।

গরু-চরানী মেয়েরা চেঁচিয়ে গালি দিত—মর মর মাগি সলজারভাতারী বিস্কুটখাগী। কপালবাবা তোকে নেয় না কেনে ?

পল্টনী দিদি উঠে বসত, আর গরু-চরানী মেয়েদের মনকে রাগকে আরও জ্বালিয়ে দিয়ে ফিক করে হাসত।

এহেন পল্টনী দিদির নাম করে মুরলী এখন যে ধিক্কার দিয়ে দাশু ঘরামির সন্দেহটাকে চমকে দিয়েছে, সেই ধিক্কারের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে দাশু ঘরামির পাগলাটে চোখ হঠাৎ নরম হয়ে ফ্যালফ্যাল করে।

মুরলীর শাড়িটা কোমর থেকে প্রায় খসে পড়ে গিয়েছে। দেখতে পায় দাশু, শাড়ির আড়ালে একটা সায়াও আছে। মুরলীর সায়াটার দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু; চোখের কোণে একটা সন্দেহের বেদনা আবার ঝিকঝিক করে জ্বলতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—আমি তেতরি ঘাসিন নই।

আবার চমকে ওঠে দাশু, কারণ, মুরলী আবার মধুকুপির একটা কলঙ্কের নাম ক'রে দাশু ঘরামির গেঁয়ো অহংকারের উপর যেন আর-এক ঠাট্টার পাথর ছুঁড়ে মেরেছে।

মিঠুয়া ঘাসীর বউ সেই তেতরি ঘাসিনও বেঁচে আছে তা হলে! মনে পড়ে দাশুর, গ্রেপ্তার হয়ে এই গাঁ থেকে চলে যাবার সময় বাবুরবাজারের দিকে যেতে যেতে হলুদ রঙের ডাকবাংলাটার কাছে এসে পেঁছতেই তেতরি ঘাসিনকে দেখতে পেয়েছিল দাশু। ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তেতরি। ছোট ময়লা একটা ছেঁড়া শাড়ি গায়ে জড়ানো। একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া শাড়ির ফাঁকগুলিকে ঢাকা দিয়েছে তেতরি। তেতরি উল্কিকাটা গলা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ভুলে যায় নি দাশু, সেদিন দাশুর কোমরে দড়ি বাঁধা দেখে চমকে উঠেছিল, আর হাত তুলে চোখের জলও মুছেছিল তেতরি ঘাসিন।

শুধু কপালবাবার জঙ্গল নয়, পাঁচ ক্রোশ দূরে ওই যেখানে ডরানি এসে মস্ত বড় একটা ঝরনা হয়ে দামোদরের বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছে, সেই চিত্রপুরের জঙ্গলেরও বুকের ভিতরের সব খবর রাখত তেতরির স্বামী মিঠুয়া ঘাসী। গোবিন্দপুরের বাবুরা জানত, হারাণগঞ্জের গালাকুঠির সাহেবরা জানত, এদিকের আর ওদিকের সব থানা আর সব ডাকবাংলা জানত, মধুকুপির মিঠুয়া ঘাসীর মত ওস্তাদ খোঁজি এই তল্লাটে আর-কেউ নেই। জঙ্গলের কোথায় কোন্ ঘাসের ভিড়ে সম্বর চরে বেড়ায়, নতুন ভালুক এসে ডেরা নিয়েছে কোন্ মহুয়ার কাছে, কোথায় কোন্ জলার কাছে নোনা মাটি চাটতে আসে ডোরাকাটা বাঘ; কত শিকারীকে খোঁজ দিয়েছে আর ঠিক ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে মাচান বাঁধবার ঠিক জায়গাটি বুঝিয়ে দিয়েছে মিঠুয়া। মিঠুয়া যেন জঙ্গলের বাতাস শুঁকে জানোয়ারের গায়ের গন্ধ বুঝতে পারত; ভালুক না সোনাচিতা? নেকড়ে না বনবিড়াল? ছেঁড়া লতার চেহারা দেখে, চিবানো পাতার চেহারা দেখে বলে দিত মিঠুয়া, এটা বড় হরিণ নয়; ছাগলা হরিণ।

সেই মিঠুয়াকে শেষ দেখতে পেয়েছিল গাঁয়ের লোক, দাশু ঘরামিও দেখেছিল, বড়দিনের সময় রাতের বেলায় পুলিস সাহেবকে কপালবাবার জঙ্গলে শিকার খেলাতে নিয়ে গিয়ে সকালবেলা জঙ্গল থেকে যখন বের হয়ে এল মিঠুয়া। জ্যান্ত মিঠুয়া নয়, মরা মিঠুয়া। চারজন সাঁওতাল কুলি, যারা পুলিস সাহেবের তাঁবু বয়ে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়েছিল, তারাই লতা দিয়ে বাঁধা মিঠুয়ার রক্তমাখা লাস কাঁচা বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে গোবিন্দপুর থানার দিকে চলে গেল। হ্যাঁ, সেই ভালুকটার লাসও ছিল, পুলিস সাহেবের গুলি খেয়ে মরার আগে

মিঠুয়া ঘাসীর মাথার খুলি একটি থাবা দিয়ে চিরে আঁচড়ে একেবারে নামিয়ে দিয়েছিল।

তেতরি ঘাসিনের সেদিনের চেহারাটাও মনে পড়ে। সাঁওতালদের কাঁধের কাঁচা বাঁশে ঝোলানো মিঠুয়ার সেই লাসের পাশে পাশে হেঁটে, গুন গুন ক'রে কাঁদতে কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল তেতরি। গাঁয়ের লোকই শেষে বাধা দিয়ে তেতরিকে থামিয়েছিল ঃ আর মিছা কেন যাচ্ছিস তেতরি ? এবার ঘরে ফিরে যা।

সেদিন ডরানির স্রোতের কাছে গিয়ে হাত দুটোকে পাথরের উপর আছড়ে আছড়ে গালার মোটা মোটা বালা দুটোকে ভেঙে আর স্নান করে ঘরে ফিরেছিল মিঠুয়া ঘাসীর রাঁড়ি বউ তেতরি।

তারপর ওই হলুদ রঙের ডাকবাংলার দাবী মেটাতে গিয়ে নিশির ডাকের মত এক-একটা ডাক শুনতে শুনতে তেতরি ঘাসিন কবে আর কেমন করে বদলে গেল, সে খবরও গাঁয়ের লোকের টের পেতে বেশি দেরি হয় নি। ওই ডাকবাংলাতে কত শখের টুরিস্ট আসে, তদন্তের অফিসার আসে, কলকাতা থেকে শিকারী আসে। ডেকচি-ভরা মুরগির কারি আর বোতল-ভরা মদ সামনে রেখেও ডাকবাংলার রাতের অতিথি উৎকট ক্ষুধায় ছটফট করে। খানসামাকে কাছে ডেকে এনে ফিস ফিস করে ঃ আর একটা জিনিস চাই যে খানসামা। পাওয়া যাবে ?

—চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারে হুজুর।

—ভাল বকশিশ দেব, চেষ্টা কর।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

—দেখো, জিনিসটা যেন ভাল হয়।

—নিশ্চয় হুজুর।

খানসামার সাইকেল ছুটে চলে যায়, আর তেতরি ঘাসিনের ঘরের দরজার কাছে এসে ঘণ্টি বাজিয়ে ডাকবাংলার রাতের বকশিশের আহ্বান শুনিয়ে দিয়ে যায়। দরজার কপাটে শিকল তুলে দিয়ে রওনা হয় তেতরি। গায়ে জ্বর থাকলেও এক ক্রোশ পথ হেঁটে সেই ভয়ানক অভিসারে যেতে হয়। গাঁয়ের কে না জানে, সারা মাসের মধ্যে অন্তত তিন-চারটে দিন এইভাবে রাতের বেলা ঘর থেকে বের হয়ে ডাকবাংলার এক-একটা মাতাল লালসার ছোবল খেয়ে শরীরটাকে বিষিয়ে ঘরে ফেরে তেতরি। দেখেছে গাঁয়ের লোক, ডাকবাংলার বকশিশের আহ্বানে ঘর থেকে চলে যাবার সময় কেমনতর সাজ করে তেতরি ঘাসিন। একটি লাল রঙের সায়া পরে।

দাশু ঘরামির ঘরের ভিতরে রেড়ির তেলের মেটে প্রদীপ মিটমিট করে। লুটিয়ে-পড়া শাড়িটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার গায়ে জড়াতে থাকে মুরলী। মুরলীর লাল সায়াটা দোলে। দাশু ঘরামির চোখের সন্দেহ নতুন বিস্ময়ে দুলতে থাকে ; না না না, সেরকম কিছু নয়। তেতরি ঘাসিনের যে লাল সায়াতে ঘৃণার দাগ লেগে থাকে, যে সায়াকে ছাই-কাচা করেও ঘরের বেড়ার উপর মেলে দিতে লজ্জা পায় তেতরি, মুরলীর এই সায়া সেরকম সায়া নয়।

ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে দাশু। ঝুড়িতে মকাইয়ের দানা আছে, মাটির সেই সরাগুলিও আছে। এই সব পুরনোর মধ্যে একেবারে নতুন ও দুর্লভ একটা নতুন জিনিসও আছে। সরার মধ্যে কয়েকটা আলু।

শাড়িটাকে শক্ত করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মুরলী তেমনই অদ্ভুত এক অহংকারের আবেগে বলে ওঠে—আমি ফুলকি মাসি নই।

আর-এক ধিক্কার। মধুকুপির আর-একটা কলঙ্কের কাহিনীকে খুঁচিয়ে দিয়ে দাশু ঘরামিকে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করেছে মুরলী।

তেজ-মরা সাপের মত মাথাটাকে আস্তে আস্তে দুলিয়ে তারপর কাত করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। সেই ফুলকি মাসিও আছে তা হলে; দাশু ঘরামির সৎভাইয়ের আপন মাসি, সেই ফুলকি। ঈশান মোক্তারের ঘরে বাতি জ্বালতে যায়, যে ফুলকি। ঈশান মোক্তারও নিশ্চয় আজও আদালতের ছুটির দিনে মধুকুপিতে তার সম্পত্তির চেহারা দেখতে আর হিসেব নিতে, বকেয়া খাজনা তসীল করতে, পরবের ভেট নিতে, আর ফসলের ভাগ নিতে আসেন।

ঈশান মোক্তারের একটা কুঠি আছে মধুকুপিতে, সেই কুঠির কাছে পঞ্চাশ জোড়া বলদের একটা খাটাল আছে। এটাও ঈশান মোক্তারের সম্পত্তি। সেই খাটালের চারদিকে সারি সারি খড়ের মাচান, মাচানের ফাঁকে ফাঁকে এদিকে-ওদিকে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকে যেসব গো-গাড়ি, সেগুলিও ঈশান মোক্তারের সম্পত্তি। যেমন ঈশান মোক্তারের জমিতে, তেমনি ঈশান মোক্তারের এই সব গো-গাড়িতে মধুকুপির গাঁয়ের মানুষ মনিষ খাটে। অনেকে আবার আধিয়া খাটে। ঈশান মোক্তারের জমিতে নিজের বীজ লাঙ্গলে ক্ষেত করলে যেমন মকাই কুরথি কোদো আর অড়হরের আধ ভাগ, তাঁর গো-গাড়িতে খাটলে তেমনই ঢোলাই মজুরির আধ ভাগ তাঁকে দিতে হয়। ঈশান মোক্তারের বড় গমস্তা দুখন গুরুজী আর দুজন মুহুরি খাতা হাতে নিয়ে কুঠির দাওয়ার উপর বসে হিসাব লেখে আর চিঠা ছাড়ে।

বছরের যে ক'টা দিন মধুকুপির কুঠিতে এসে ঠাঁই নেন ঈশান মোক্তার, সেই ক'টা দিন ফুলকি মাসির জীবনটাও একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ফুলকির স্বামী, সেই বেকুব খোঁড়াটা, সেই তিনকড়িও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঈশান মোক্তারের কুঠিতে যায়, দণ্ডবৎ করে, তারপর ঈশান মোক্তারের দয়ার উপহার চাল ডাল আলু আর মাটির খুরিতে দু-চার ছিটে নারকেল তেলও নিয়ে, আবার খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ফিরে আসে।

ফুলকির জন্য কুঠির ভাণ্ডার থেকে মাসোয়ারী সিধা বরাদ্দ করা আছে। তা ছাড়া এক বিঘা বেলে জমি ফুলকিকে খয়রাত করেছেন ঈশান মোক্তার। বছরের অন্তত বিশটা দিন, রুক্ষ চুলের বোঝা খুলে মেলে দিয়ে নারকেল তেল মাখে ফুলকি। তারপর রান্না করে, খিচুড়ি আর আলু-হলুদ। সারা মধুকুপির মধ্যে একমাত্র ফুলকি মাসি ছাড়া আর কোন কিষাণ-কিষাণীর জীবনে আলু খাওয়ার সৌভাগ্য এখনও হয় নি। গোবিন্দপুরের গোল আলু অনেকে শুধু চোখে দেখেছে, এই মাত্র।

ঠিক যখন সন্ধ্যা হয়, ওদিকে ঈশান মোক্তার যখন তাঁর কুঠির একটি ঘরের নিরালায় মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়েন, এদিকে ফুলকি মাসি তখন হেসে হেসে তিনকড়ি খোঁড়ার হাতের কাছে খৈনির ডিবা এগিয়ে দিয়ে বলে—যাই, মোক্তারের ঘরে বাতি জেবলে আসি।

গাঁয়ের চোখ অন্ধ নয়; গাঁয়ের বুদ্ধিশুদ্ধিও বেকুব তিনকড়ির মত খোঁড়া হয়ে যায় নি। অনেক রাত করে যখন কুঠি থেকে ঘরে ফেরে ফুলকি, তখন গাঁয়ের কেউ-না কেউ দেখে ফেলে, পা টলছে ফুলকির।

—ভাল বাতি জবালছিস ফুলকি! একদিন ঠাট্টা করেছিল নটবর।

—এ মাগিকে কপালবাবা মরাবে কবে? গালি দিয়েছিল হরিশ।

কিন্তু গাঁয়ের এই সব ভীরু-ভীরু ধমক ঠাট্টা আর ধিক্কারকে একটুও ডরায় নি ফুলকি। দাশু ঘরামির ফুলকি মাসি আজও হলুদ-ছোপানো কাপড় পরে, রিঠার জলে গা মাজে, আর গালার রসে নখ রাঙায়।

—আমি ঝালদার মহেশ রাখালের বেটি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর দু চোখের তারায় অদ্ভুত এক দেমাকের তেজ ধিকধিক করে। কাত মাথা তুলে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

—মহেশ রাখালের আর দুটা বেটি কেন মরেছে, ভুলে গেছ কি? কটকট করে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে মুরলী।

জানে দাশু; মনে পড়তেই দাশু ঘরামির চোখে যেন একটা শ্রদ্ধার ব্যথা টলমল করে ওঠে। মুরলীর আরও দুটা বোন ছিল। একটা মুরলীর বড়, আর একটা মুরলীর ছোট—কুসুম আর কালিন্দী; ওরা দেখতে মুরলীর চেয়েও সুন্দর ছিল। দুজনের বিয়েও হয়েছিল।

কুসুম মরেছে গলায় দড়ি দিয়ে, এই পৃথিবীর একটা কুৎসিত মামলার লজ্জা ও যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে। সেই মামলার আসামী ছিল চিত্রপুর জঙ্গলের চারটে গার্ড। একদিন দুপুরে জঙ্গলের মহুয়া কুড়াতে গিয়ে যেন চারটে অজগরের লোভের সামনে পড়ে গাভিন হরিণীর মত কুসুমের শরীরটাও আতঙ্কে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিকই, সেই সময় কুসুমের পেটের ভিতরেও একটা নতুন প্রাণের পিণ্ড ধুকধুক করেছিল। কিন্তু জঙ্গলের চারটে গার্ড কোন বাধা মানে নি, মিনতি শোনে নি। কুসুমের আতঙ্কিত শরীরটাকে লুঠপাট করে তৃপ্ত হয়েছিল চারটে লোভের অজগর। থানায় এজাহার দিয়েছিল কুসুম, আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় সেই চারটে পাপীকে দেখতেও পেয়েছিল; কিন্তু তাতে কুসুমের গায়ের জবালা বোধহয় মেটে নি। তাই, শেষে গলায় দড়ি দিয়ে…।

কালিন্দীর জীবনের মামলাটা একটু অন্য রকমের; মরে যাবার পর মামলা। কালিন্দী দেখে যেতে পারে নি, কিন্তু ঝালদার মানুষ দেখেছিল; আসামীটা গ্রেপ্তার হ'ল, চালান হ'ল আর চার মাসের মামলার পর ছাড়া পেয়ে চলেও গেল। বেশ টাকাপয়সা ছিল সেই আসামীর, এক ছোকরা কারবারী, ধুরকুণ্ডার ভাঁটিখানার ঠিকা নিয়েছিল যে ছোকরা। একজোড়া সোনার চুড়ি নিয়ে

কালিন্দীর ঘরে ঢুকেছিল সেই ছোকরা। কিন্তু কিছুতেই রাজি হয় নি কালিন্দী, তাই সেই ছোকরার হাতের ছুরিতে খুন হয়েছিল কালিন্দী। লোকে বলে, মহেশ রাখালের বেটিগুলোর তেজ আছে।

—মহেশ রাখালের বেটিরা পরের মরদানির থুতু গিলে না, পরের ছেইলা পেটে নেয় না। চোখ বড় করে কি দেখছো তুমি? কি ভাবছো তুমি?

মুরলীর দেমাক-ভরা কথার শব্দে কুণ্ঠিত হয়ে দাশু ঘরামির চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। হাত তুলে চোখ মোছে দাশু আর দেখতে পায়, কই? মুরলীর সেই পাঁচ বছরের আগের চেহারা তো একটুও ফোলে নি। শাড়ির আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত করে জড়িয়েছে মুরলী, কত সরু কোমরটা। এক হাতে এক পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরা যায়। মিথ্যে নয় মুরলীর অভিযোগ। সত্যিই দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

—মুরলী! আস্তে আস্তে আদরের সুরে ডাক দেয় দাশু আর হাসতে চেষ্টা করে।

মুরলীর শক্ত চেহারাটাও এতক্ষণে একটু বিচলিত হয়। ঘরের কোণ থেকে খেজুর পাতার একটা চাটাই তুলে নিয়ে এসে মেজের উপর পাতে মুরলী; অভিমানের স্বরে গলা কাঁপিয়ে বিড় বিড় করে, পাঁচটা বছর পর ঘরে ফিরে এসে নিজের মাগকে এমন করে গালি দিতে নাই।

খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর বসে এবার নিজেকেই গাল দেয় দাশু—হ্যাঁ, জেলের ভাত খেয়ে মাথাটা যেন পাগলা কুত্তার মাথার মত···।

হেসে ফেলে মুরলী। দাশুও হেসে হেসে এইবার আসল বিস্ময়ের কথাটাকে শান্তভাবে বলে—কিন্তু, বুঝতে পারি না, তুই কেমন করে···।

মুরলী হাসে—কি?

দাশু—তুই বেশ সুখে আছিস মনে হয়।

মুরলী—হ্যাঁ, কেন থাকবো না? সুখের কাজে খাটছি। পনর টাকা, বিশ টাকা কামাচ্ছি।

দাশু ঘরামির চোখের বিস্ময় আবার চমকে ওঠে: কি করে? কেমন করে?

—হোই দেখ। হাত তুলে চার-পায়ার উপর রাখা সেলাইয়ের ছোট কলটাকে দেখিয়ে দেয় মুরলী।

দাশু বোকার মত তাকায়: ওটা তো একটা খেলার কল বটে। পল্টনীর ঘরেও একটা গানের কল আছে।

হেসে হেসে যেন গড়িয়ে পড়তে চায় মুরলী: গানের কল নয়, খেলার কল নয়, এটা একটা কাজের কল গো।

চার-পায়ার কাছে একটা কাপড়ের পুঁটলি পড়ে ছিল। হাত বাড়িয়ে পুঁটলিটাকে কাছে টেনে আনে মুরলী। পুঁটলিটাকে খুলে ফেলতেই দাশুর চোখ দুটো অপলক হয়ে, যেন আরও দুর্বোধ একটা বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে—কাপড়ের উপর নক্সার বাহার, এসব কি রে মুরলী?

—এর নাম লেস।

—কে দিলে ?

—আমি বানিয়েছি।

—তুই ?

—হ্যাঁ।

—কেমন করে ?

—এই কলটা চালায়ে গো।

—কল চালাতে কে ষিখালে ?

—সিস্টার দিদি।

—সে আবার কে বটে ?

—হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির মেম।

—তুই গির্জাবাড়ি যাস ? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—না, সিস্টার দিদি এখানে আসে।

—এখানে আসে ?

—হ্যাঁ গো, এখানে বসে কত শোলোক গেয়েছে সিস্টার দিদি।

—খিরিস্তানী শোলোক ?

—হ্যাঁ।

—তুই কি খিরিস্তান হয়েছিস ? দাশু ঘরামির গলা কাঁপিয়ে একটা আর্তনাদ ঠিকরে বের হয়।

মুরলী হাসে—না।

মুরলীর সুডোল হাতটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দুটো সন্দেহ-ভরা চোখ দিয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে দাশু। তারপরেই যেন ডুকরে ওঠে : হাতে টিকা দেগেছিস ?

—হ্যাঁ।

—কেন ? তোকে তো আর আমার মত জেলে গিয়ে কয়েদী হতে হয় নাই।

—সিস্টার দিদি বললে।

—হাসপাতালের ওষুধও খেয়েছিস ?

মুরলী হাসে : একবার খেয়েছি বটে।

—এই সব শাড়ি-জামা পরতে, আর…।

—সব, সব, সব সিস্টার দিদি শিখালে।

—এই সব নক্সা-টক্সা…।

—সব, সব, সিস্টার দিদির লোক এসে সব কিনে নিয়ে যায়।

—কলটা পেলি কোথা থেকে ?

—সিস্টার দিদি ধারে পাইয়ে দিলে।

—ধারের টাকা শুধবি কেমন করে ?

—শুধে দিয়েছি।

—এক-একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে যেন দাশুর বুকের এক-একটা পাঁজর ফেটে গিয়ে আর্তনাদ করছে। আর, প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে

স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে বুকের নিঃশ্বাস। কী ভয়ানক বদলে গিয়েছে মুরলী!

আস্তে আস্তে গলা কাঁপিয়ে আবার প্রশ্ন করে দাশু।—তোর কি খিরিস্তান হবার সাধ হয়েছে?

মুরলী—হলে ভাল হয়।

আর চেঁচিয়ে উঠতে পারে না দাশু। বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস ভীরু হয়ে গিয়েছে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে দাশু—কপালবাবাকে কি তোর একটুকও ডর লাগে না?

মুরলী হেসে ফেলে: ডরাবো কেন গো? কি পাপ করেছি যে ডরাবো?

মুরলী মনে আবার একটা সন্দেহ চমকে ওঠে: তুই কি লিখাপড়াও শিখেছিস?

মুরলী—না; সিস্টার দিদি বলেছে, এইবার শিখাবে।

যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে দাশুর কলিজার ধুকধুক শব্দ। মুরলীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ভয় করে। একান্ন টাকা পণ দিয়ে কিনে আনা মহেশ রাখালের মেয়ে নয়। ছোট একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে, আদুড় গায়ে, দাশুর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ত যে নারী, সে নারী নয়। মুরলীর প্রাণটাই মেমসাহেব হয়ে গিয়েছে। এই মেটে ঘরের ভিতরে শাড়ি জামা গায়ে দিয়ে একটা শৌখীন অহংকার বসে আছে। গোবর-ঘাঁটা হাত ধুয়ে ফেললেও মুরলীর সে হাতে যে মিষ্টি গন্ধ মাখা হয়ে থাকত, ওই টিকা-দাগা আর কল-চালানো হাতে সে মিষ্টি গন্ধ মরেই গিয়েছে।

ফুলেল তেল আর আলতার ধারা গাঢ় রক্তের ধারার মত ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশ এসে ঘরে ঢুকলে সন্দেহ করবে, একটা খুন হয়েছে বোধহয়। হ্যাঁ, দাশুর পাঁচ বছরের উপোসী একটা আশা খুন হয়ে গিয়েছে। এই মুরলীকে ছুঁতে ইচ্ছা করে না, ছুঁতে ভয় করে। মুরলীর সরু কোমরটাকে দেখেও কোন লোভ হয় না, সাহসও হয় না; ওটা যে একটা বাবুমানুষের বউয়ের কোমর; একটা দেশী মেমসাহেবের কোমর। এখন মনে পড়ে, বুঝতেও পারে দাশু, ঠিকই বলেছিল নিতাই মুদি—ঠকবি। ঠকেছে দাশু; দাশুর বউ মুরলী জাতের বাইরে অনেক দূরে আর অনেক উপরে চলে গিয়েছে। দাশু ঘরামির চাষাড়ে হাতের যে-কোন ইচ্ছাকে এখন অনায়াসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারে মুরলী। লোকের চোখে দাশুকে মুরলীর চাকর বলে বোধ হবে; আর মুরলীও…।

সত্যিই কি তাই ভাবছে মুরলী? দাশুকে ঘরের মরদ বলে মনে করতে পারছে না? দেখতে পায় দাশু, মুরলী চুপ করে, চোখ দুটোকে ভয়ানক উদাস করে দিয়ে কি-যেন ভাবছে। আর, মাঝে মাঝে নতুন গেঞ্জি গায়ে দেওয়া দাশুর রুক্ষ ও শক্ত চেহারাটাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখছে।

দাশু বলে—কি ভাবছিস?

মুরলী—কিছু না। তুমি এবার কিছু খেয়ে নাও আর শুয়ে পড়।

দাশুর ঘাড়ের রগগুলি যেন হঠাৎ আহত হয়ে দপদপ করে: কোন্ ঠাঁই শুব?

—এই তো চাটাই বিছিয়ে দিয়েছি।

—আর তুই বুঝি বিছানায় শুবি?

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ যেন ভাষা হারিয়ে বিড়বিড় করে মুরলী: তা তুমি যদি রাগ কর, তবে নাই বা বিছানায় শুলাম।

—কিন্তু শুবি কোন্ ঠাঁই? মাটিতে?

—সে যেথা পারি এক ঠাঁই শুয়ে নিব আমি।

—আমার ঠাঁই শুবি না?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে আর মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে মুরলী। দাশু বলে—আমাকে ছুঁতে তোর আর সাধ নাই মুরলী, বটে কি না?

আবার ভয়ে ভয়ে বিড়-বিড় করে মুরলী—সাধ কেন হবে না? কিন্তু আজ নয়।

দাশু—আজ নয় কেন?

মুরলী—সিস্টার দিদি বলেছে।

দাশু—কি বলেছে?

মুরলী—তুমি কলে কাজ নিবে, ভাল মানুষ হবে, খিরিস্তান হবে, তারপর।

মধুকুপির কিষাণ দাশুর মাথার উপর যেন একটা চাবুক আছড়ে পড়েছে। জ্বলে যাচ্ছে মাথাটা। মুরলীর কাছে আজ অমানুষ হয়ে গিয়েছে মধুকুপির সবচেয়ে তেজী দেমাকী আর মজবুত কিষাণ এই দাশু ঘরামি। দাশু আজ মুরলীর জীবন ও যৌবনের মরদ নয়; একটা মনিষ মাত্র।

খেজুর-পাতার চাটাই ছেড়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দাশু। চমকে ওঠে মুরলী: কি হলো?

দাশু বলে—তুই থাক্, আমিই যাই।

—কোথায় যাবে? মুরলীও আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়ায়।

—দাশু ঘরামি আর তোর সোয়ামী নয়।

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দরজার কপাটে হাত দেয় দাশু। এক টান দিয়ে কপাটের হুড়কো নামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—মহেশ রাখালের বেটি মুরলীও আর দাশু ঘরামির মাগ নয়।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—যেও না, থাম, কথা শুন।

আহত জানোয়ারের মত ছটফট করে একটা লাফ দিয়ে দরজা পার হয়ে চলে যায় দাশু।

ছুটে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দেয় মুরলী—যেও না, তোমার পায়ে পড়ি, এত রাতে ঘর ছেড়ে যেও না।

মধুকুপির মাটিতে শেষ রাতের চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দাশুর মূর্তিটা যেন এক টুকরো হালকা ছায়া হয়ে বাইরের বাতাসে মিশে যাবার জন্যে ছুটে বের হয়ে যায়।

সেই মুহূর্তে শব্দ করে শিউরে ওঠে সড়কের পাশে বাঁশঝাড়ের শুকনো পাতা। আর, একটা প্রকাণ্ড কালোছায়ার পিণ্ড বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে লাফ

দিয়ে সড়কের ধুলোর উপর এসে দাঁড়ায়। জ্বলজ্বল করে এক জোড়া সবুজ আগুনের চোখ। একটা গোটা চোখ, আর একটা নিভু নিভু চোখ।

—কানারানী! কানারানী! চিৎকার করে দরজার কপাটে মাথা ঠুকতে থাকে মুরলী। দেখতে পেয়েছে মুরলী, দাশুর সেই ছায়ামূর্তির একেবারে সামনে, মাত্র দশ হাত দূরে পথ আটক করে কানারানীর দু চোখের রক্তলোলুপ আশা জ্বলজ্বল করছে।

—এসো, এসো, জলদি ফিরে এসো গো! তোমার সামনে যে যম দাঁড়িয়ে আছে গো। কেঁদে চেঁচিয়ে উতলা হয়ে ডাকতে থাকে মুরলী।

কিন্তু এক পা'ও নড়ে না দাশু। মধুকুপির একটা চাষাড়ে অভিমান যেন ইচ্ছে করে কানারানীর থাবার কাছে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত হবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মুরলীর চোখ দুটোও হঠাৎ যেন এক নতুন আক্রোশে দপ করে জ্বলে ওঠে। ছুটে এগিয়ে যায় মুরলী। মুরলীর শাড়িটা কাঁটার ঝোপে ফেসে গিয়ে ঝোপের গায়ে আটকে যায়। খোঁপা ভেঙে গিয়ে চুলগুলিও এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। দাশুর একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মুরলী।

সবুজ চোখের আগুন দুলিয়ে একটা লাফ দিয়ে পিছনে সরে যায় কানারানী, তারপর অলসভাবে একটা হাই তুলে আবার সেই জ্বলন্ত চাহনি একেবারে সুস্থির করে সোজা তাকিয়ে থাকে।

দাশুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসেই একটা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় মুরলী; হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কপাট বন্ধ করে দিয়ে দাশুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে।

রেড়ির তেলের ছোট বাতিটার বুকেও যেন একটা আতঙ্কের শিহর ছুটে এসে লাগে। গরম রেড়ির তেল ফুট্ করে একটা শব্দ ছাড়ে। নিভে যায় বাতিটা। আতঙ্কিত মুরলীও যেন আর্ত শরীরের সব ঠক্ ঠক্ কাঁপুনি দাশুর বুকের উপর ঢেলে দিয়ে ফিসফিস করে: তোমার হাত দুটো কই গো? আমাকে জড়িয়ে ধরছো না কেন?

দাশু ঘরামির বুকে আতঙ্ক নেই। হাত দুটোও উদাস ও অলস। মুরলীর এই আবেদন একটা চালাক হুকুম মাত্র। সায়া-পরা আর জামা-গায়ে-দেওয়া একটা অচেনা মেয়েমানুষ দাশু ঘরামির চাষাড়ে হাত দুটোকে শুধু একটা দরকারের কাজে খাটিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

বুঝতে পারে না মুরলী, কানারানী এখনও পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে, না, চলে গিয়েছে। কে জানে, হয়তো আরও কাছে এগিয়ে এসেছে কানারানী। রাক্ষুসে ক্ষুধার প্রকাণ্ড একটা হাঁ এই জামকাঠের জীর্ণ কপাটের কাছে থাবা পেতে বসে আছে। কিংবা সেই কর্কশ গোঁপের কাঁটা-কাঁটা রোঁয়া বুলিয়ে কপাটটাকে শুঁকছে। এক জোড়া চোখের একটা চোখ কটকট করে জ্বলে, আর একটা চোখ নিভু-নিভু বাতির মত জ্বলে। উঃ, কী ভয়ানক ধূর্ত কানারানীর রাতের বেলার এই মুখটা!

—আমি যে পড়ে যাব গো! দাশুর কানের কাছে আবার কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে মুরলীর আতঙ্কিত প্রাণের একটা দুঃসহ অভিযোগ। মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দে যেন একটা রাগ ফিসফিস করে।

দাশু আস্তে আস্তে বলে—বসে পড় না কেন?

মুরলীকে বসে পড়তে বলতে পারে; মুরলীকে অনায়াসে বুকের কাছ থেকে নামিয়ে দিতে একটু আপত্তি নেই দাশু ঘরামির? পাঁচ বছর জেল খেটে মাথাটাকে কী ভয়ানক খারাপ করে এসেছে দাশু। মুরলীর আতঙ্কিত শরীরটা এইবার যেন অভিমানের জ্বালায় ছটফট করে আরও জোরে দাশুকে আঁকড়ে ধরে। আর দাশুর কানের কাছে তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে একটা ধিক্কারও দেয়ঃ তুমি এমন কশাই হয়ে গেলে কেন গো?

ধিক্কারটা যেন বাঘিনী কানারানীর ভয়ে ভীরু মুরলীর প্রাণের একটা বাজে অভিযোগের কাতর বিলাপ। কোন অর্থ হয় না। দাশুর হাত দুটো মুরলীকে জড়িয়ে ধরতে পারবে কেন? এমনটা আশা করে কেন মুরলী? এর মধ্যে কশাইপনা কোথায়? কশাই হয়েছিল দাশু, যখন টাঙ্গি হাতে তুলে নেবার জন্য লাফালাফি করেছিল।

কিন্তু চমকে ওঠে দাশু। কাঁধের উপর যেন গরম জলের ছোঁয়া লেগেছে। ভিজে গিয়েছে দাশু ঘরামির গায়ের নতুন গেঞ্জির সুতো।

—এ কি? তুই কাঁদলি কেন? দাশু ঘরামির হাত দুটো যেন হঠাৎ-মায়ায় চমকে ওঠে আর মুরলীর নরম শরীরটাকে বুকের উপর শক্ত করে সাপটে ধরে।

আস্তে আস্তে, এক একটা নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে ছন্দ রেখে মুরলীর ভয়াতুর শরীরের কাঁপুনিও শান্ত হয়ে আসতে থাকে। দাশুর দুই শক্ত হাতের বাঁধনে বাঁধা হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায় মুরলী। দাশু বলে—ডর কেন? কিসের ডর?

সত্যিই ডর নেই। কপাটের ওপারে কানারানী দাঁড়িয়ে থাকলেও মুরলীর মনে আর কোন ডর নেই। মুরলীর শরীরটা যেন নতুন নির্ভয়ের সুখে একেবারে জমাট হয়ে দাশুর বুকের উপর পড়ে থাকতে পারছে। সেই ভয়াতুর ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের শিহরও একেবারে মরে গিয়েছে।

—তোর গা-টা এত গরম কেন? জ্বর হয় নাই তো? হঠাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে দাশু।

মুরলী বলে—হ্যাঁ, জ্বর বটে।

দাশু—কেন জ্বর হলো?

মুরলী—জান না?

দাশু—না।

মুরলী—বোকা বটে তুমি।

মিলনের আগে দাশুর আবদারে মুরলী পুরানো পোষাক পরে নাচ দেখায় —গান শোনায়।

না, বোকা নয় দাশু। পাঁচ বছর ধরে জেলের কয়েদী-জীবনের কম্বলের উপর

রাত কাটিয়েও মুরলীর শরীরের সেই মিষ্টি জ্বরের স্বাদ ভুলে যেতে পারে নি দাশু। ভুলে যাওয়া দূরে থাকুক, মুরলীর গায়ের এই জ্বর-জ্বর উষ্ণতার স্বাদটিকে যে ঘুমের মধ্যেও ভোগ করেছে দাশু। কিন্তু আজ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মুরলীর গায়ের এই জ্বর সেই জ্বর নয়। বাঘিনী কানারানীর ভয়ে ভীতু হয়ে আর ঘাবড়ে গিয়ে দাশুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মুরলী। এই জ্বর শুধু একটা ভয়ের জ্বর।

মুরলীর মাথার এলোমেলো চুলগুলি দাশুর মুখের কাছেই ছড়িয়ে রয়েছে। মুরলীর চুলে নতুন তেলের গন্ধ; অচেনা গন্ধ। এই গন্ধও একটা ঠাট্টা; দাশুর জীবনের ভয়ানক নতুন ব্যথাটাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে; পর হয়ে গিয়েছে মুরলী। মুরলীর মাথার কাছ থেকে মুখটাকে সরিয়ে নিয়ে শুকনো একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে দাশু।

ঘামে ভিজেছে, একটু সেঁতসেঁতে হয়েছে মুরলীর হাত দুটো। পিছল সাপের মত আস্তে আস্তে গা-মোড়া দিয়ে মুরলী হঠাৎ বলে ওঠে—ছাড়।

ছেড়ে দেয় দাশু। আর, নিজের অপমানিত হাত দুটোকে যেন একটা কামড় দিয়ে আরও শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে। মুরলীর চোখের জলকে বিশ্বাস করে মায়া করতে গিয়ে দাশুর প্রাণ আবার একটা ঘৃণার মার খেয়েছে। দরজার দিকে তাকায় দাশু। এখনি, কপাটের হুড়কো একটানে নামিয়ে দিয়ে··· ।

এ কি! চমকে ওঠে দাশু। বুকের উপর এ কোন্ স্পর্শের স্বাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল! এ যে সেই মুরলীর গায়ের নরম-নরম স্বাদ! শাড়িতে জামাতে আর সায়াতে সাজানো নকল মুরলী নয়। গামছা গায়ে জড়ানো লাজুক মুরলীও নয়। যেন পাঁচ বছরের অদেখার সব রাগ একেবারে আদুড় হয়ে দাশু ঘরামির বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

দাশুর বুকের উপর ছোট্ট একটা দাঁত-ফোটানো কামড়ের জ্বালা চিন্ করে শিউরে ওঠে। মুরলীর সেই পুরনো অভ্যাস। দাশুর শরীরের সব রক্তের স্বাদও সেই মুহূর্তে মিষ্টি হয়ে যায়। মুরলীর মাথার উপর মুখটা নামিয়ে দিতেই দাশুর সব উদ্বেগ মিটে যায়। সেই মুরলী, মুরলীর ঘামে-ভেজা কপালে সেই পুরনো গন্ধ। দাশুর নিঃশ্বাসও মুরলীর চুলের সেই বুনো ছড়াছড়ির মধ্যে লুটিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করে ওঠে। মুরলীর চোখ-মুখ-কপাল আর ঘাড় শুঁকে শুঁকে অতীতের একটা আদুরে গন্ধকে খুঁজতে থাকে দাশু।

মুরলী বলে—এসো।

দাশুর হাত ধরে টান দেয় মুরলী। দাশুর হাতের সব কুণ্ঠা সেই মুহূর্তে ঝরে পড়ে যায়। এই মুরলীকে বুঝতে কি-ভয়ানক ভুল করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল একটা বোকা সন্দেহের মন!

এক হাতের এক পাক দিয়ে মুরলীর কোমরটা জড়িয়ে ধরতেই মনে পড়ে যায় দাশুর; পাঁচ-পাঁচটা করম পার হয়ে গিয়েছে, এই কোমরে আঁচল জড়িয়ে কত ঝুমুর নেচেছে মুরলী, কিন্তু মুরলীর এই সরু কোমরের দোলানি চোখে দেখতে পায় নি দাশু। শুধু জেলের বাগানে কাজ করতে করতে জাগা চোখের স্বপ্নে

মুরলীর নাচ দেখেছে।

বিছানাটার কাছে এগিয়ে যেতেও আর কোন কুণ্ঠা নেই। মুরলী যেন পাঁচ বছর ধরে একটা মানত করে দাশুর জন্যই একটা আদরের সিংহাসন তৈরি করে রেখেছে।

রাতটা বড় স্তব্ধ। বাইরের বাঁশের ঝাড়েও কোন পাগলা হাওয়া হুটোপুটি করে না। চালার গায়ে ছোট ছোট ফুটো আর ফাটলগুলি খুশি হয়ে হাসছে মনে হয়; বাইরের ফিকে চাঁদের আলো চালার ফুটো-ফাটল দিয়ে চুঁয়ে পড়তে চেষ্টা করছে। মুরলী বলে—বেশ তো পাগল হয়েছো, তবে আর কেন···।

আর একটা মুহূর্তও দেরি করতে চায় না মুরলী। আর দেরি করলে হয়তো কাক ডেকে উঠবে, ভোর হয়ে যাবে, মুরলীর মানত নষ্ট হয়ে যাবে।

দাশু বলে—তুই বা কি কম পাগল?

মুরলী বলে—চুপ।

অনেকক্ষণ পরে যখন ঘরের চালার ফুটো-ফাটল দিয়ে বাইরের আলোর চোরা হাসির ঝরানি বন্ধ হয়ে যায়, তখন ডাক দেয় দাশু—কথা বল মুরলী।

মুরলী বলে—চুপ।

দাশু হাসে—আবার চুপ হতে বলছিস কেন?

মুরলী—হ্যাঁ আবার।

আপত্তি করে না দাশু। মুরলীর পাগল ইচ্ছার রকম দেখে দাশুর শক্ত চেহারার স্নায়ু ও শোণিতের ভিতরে যেন নতুন করে মত্ততার ঝুমুর বাজতে শুরু করে। বেশ তো! কি ভেবেছে মুরলী? মধুকুপির জোয়ান কিষাণ দাশু ঘরামির উপোসী লোভের জোর পরীক্ষা করে দেখতে চায়? তবে দেখুক মুরলী, বুঝুক মুরলী, এই দাশু সেই পাঁচ বছর আগেরই দাশু। পাঁচ বছর জেল খেটেও দাশু ঘরামির রক্ত একটুও শুকিয়ে যায় নি।

তারপর···মুরলীর দুই চোখের উপর যখন নিবিড় ক্লান্তির সুখ ঘুমভারে অলস হয়ে যায়, ঠিক তখন রাতের মধুকুপির নিরেট স্তব্ধতাকে হঠাৎ আহত করে অনেক দূরে একটা আতঙ্কের শব্দ চাপা হুল্লোড়ের মত বেজে ওঠে। শব্দটা আসছে মানঝিদের পাড়ার দিক থেকে। একসঙ্গে এক শো টিনের উপর ঠেঙার বাড়ি মেরে হৈ-হৈ করছে মানঝিরা।

দাশু বলে—শুনছিস?

মুরলী—কি?

দাশু—কানারানী ভেগেছে।

আনমনার মত আর আধ-ঘুমে জড়ানো স্বরে বিড়বিড় করে মুরলী—কেন?

দাশু হাসে—খুব খুশি কানারানী।

মুরলী—কেন গো? গা-মোড়া দিয়ে দাশুর হাত ধরে আদুরে স্বরে প্রশ্ন করে মুরলী।

দাশু হেসে ওঠে—বুঝলি না।

মুরলী—না।

দাশু—তোর আমার নতুন বিয়া দিতে কানারানী এসেছিল।

আবার একটা আর্তনাদের হুল্লোড়। একসঙ্গে ছটফট করে এক পাল গরু ডাকতে শুরু করেছে। গাঁ-গাঁ করে যেন লাফালাফি করছে, ছুটছে, মুখ থুবড়ে পড়ছে, এক গাদা ভীরু করুণ আর আলুথালু শব্দ।

—শুনছিস মুরলী? দাশু ডাকে।

মুরলী—কি?

দাশু—ঈশান মোক্তারের গরুগুলোর খবর নিচ্ছে কানারানী।

মুরলী শক্ত করে দাশুর একটা হাত আঁকড়ে ধরে।

দাশু—ডর লাগছে কি? মুরলী?

মুরলী—না, চুপ কর।

—কি বললি?

—ঠিক বলছি।

—সত্যি তো?

—হ্যাঁ।

দাশু ঘরামির শক্ত বুকের পাঁজরগুলিকে যেন আবার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে অভ্যর্থনা করেছে মুরলী। বোধহয় মুরলীর প্রাণের একটা দীর্ঘ অপেক্ষার পিপাসা বার বার উতলা হয়ে উঠছে। তাই দাশুকে এক অফুরান উপহারের দেবতা বলে মনে করে বার বার আকুল হয়ে ডাকছে। বেশ তো, দাশুর প্রাণেও কোন অনিচ্ছা নেই, শরীরেও ক্লান্তি নেই।

একটা কাকের ডাক শোনা গেল যখন, তখন দাশুর ঘুম-জড়ানো চোখের ক্লান্তিটা একটা চমক লেগে টলমল করে ওঠে। মধুকুপির আকাশটাই যেন হঠাৎ হাঁক দিয়ে একটা প্রচণ্ড গম্ভীর শব্দের প্রতিধ্বনি গড়িয়ে দিয়েছে। নিশ্চয় বড়কালুর মাথার উপরে উঠে ডাক ছেড়েছে কানারানী। বড়কালুর পাথর কাঁপে, সেই সঙ্গে সারা মধুকুপির বাতাসও কাঁপে। কানারানীর গর্জনের রেশ গড়িয়ে গড়িয়ে কপালবাবার জঙ্গলের বাতাসে মিশে যায়।

দাশু ডাকে—নিঁদ গেলি নাকি?

মুরলী—না। এবার নিঁদ যাব।

দাশু—কানারানীর হাঁক শুনেছিস?

মুরলী—শুনেছি।

দাশু—শুনেছিস তো, বুঝেছিস কিছু?

মুরলী—বুঝেছি; খুব খুশি হয়েছে কানারানী।

দাশু—কেন খুশি হয়েছে?

হেসে ফেলে মুরলী—তোমার মুরলীর পেটে ছেইলা এসে গেল তাই।

দাশুর বুকের ভিতরে যেন একটা রঙীন আশার উল্লাস লাফিয়ে ওঠে। কপালবাবার কাছে অনেকবার অনেক মানত করেও হতাশ হয়ে গিয়েছিল মুরলীর যে সাধ, সে সাধ এতদিনে সফল হবে তবে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—এ কি কথা বললি মুরলী? কেমন করে বুঝলি?

মুরলী—তোমার মুরলীর হাড়মাস এত মিঠা হয়ে আর কোনদিনও গলে নাই। বুঝতে পারবো না কেন গো?

মুরলীর মাথাটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দাশু। মুরলী হাসে: দেখো, যেন আবার টাঙ্গি হাতে নিয়ে তেড়ে এসো না।

দাশু রাগ করে: ছি, কেন আবার ওসব রাগের কথা বলছিস?

মুরলী—আর রাগ করবে না তো?

দাশু—কেন রাগ করবো?

মুরলী—যদি মুরলী সরদারিনের কোমর মোটা হয়?

—হবে তো, একশোবার হবে। মুরলীর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলায় দাশু।

ঘুমিয়ে পড়ে মুরলী। মুরলীর মুখটাকে একবার ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে দাশু, আর, আবছা অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায়, মুখভরা হাসি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী।

জেগে থাকতে চেষ্টা করে দাশু, কারণ মুরলীর মুখটাকে বার বার দেখে নিজেরই জীবনের একটা তৃপ্তির পূর্ণতা বার বার প্রাণের ভিতরে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। মুরলীর ছেইলা হবে; কপালবাবার কাছে সাদা ছাগ বলি দেবে দাশু। একটা দিনও ঘরে বসে না থেকে, গো-গাড়ি হাঁকিয়ে হোক আর মাঠান কুলের জঙ্গলটায় লা-পোকার ডাঁটি ভাঙবার ঠিকা নিয়ে হোক, কিছু টাকা দু'তিন মাসের মধ্যে যোগাড় করতেই হবে।

না হয়, ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে নতুন করে একটা চিঠা নিতে হবে। ডরানির ওপারে বিঘা পাঁচেক, অন্তত বিঘা তিনেক দো-আঁশ যদি ভাগজোত করতে পাওয়া যায়, তবে ছয় মাসের মধ্যে একটা ফসল তুলতে পারা যাবে। কে জানে, আজকাল সরু ধানের কী দর দিচ্ছে মানপুরের পাইকারেরা?

কিন্তু ভাগজোতে পেট ভরুক বা না ভরুক, মনটা যে একটুও ভরে না। ফলন শেষ হয়, ফসল তোলা হয়, বাস্, জমিটা আবার পর হয়ে যায়। আবার ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে নতুন করে চিঠার জন্য হাত পাততে হয়। আবার চিঠা না পেলে ঐ জমিতে হাল ছোঁয়াবার উপায় থাকে না।

কোর্ফা হলে তবু মনটা যেন একটুখানি ভরে। জমিটাকে একটু আপন-আপন মনে হয়। ডরানির এপাশে ঈশান মোক্তারের তিন বিঘা ঢালু গরজি; ওপাশে আছে দো-আঁশের কানালি। ভাল ধান ফলে, ঝাঁর্জাল আর কালিশ। কিন্তু অন্তত পঞ্চাশটা টাকা সেলামি না দিলে ঈশান মোক্তার কি দাশুকে কোর্ফা করে নিতে রাজি হবেন?

কিন্তু সুরেন মাঝির মুখের সেই যন্ত্রণার ছবিটাও মনে পড়ে। পর পর দু বছরের সাঁজা দিতে কামাই করেছিল ঈশান মোক্তারের কোর্ফা রায়ত সুরেন। সালিয়ানাও বাকি পড়েছিল। মুহুরিটা একদিন এসে সুরেনের ঘরের আঙ্গিনায় উঠে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠেছিল—বেটিটা তো বেশ ডাগর হয়েছে, সেটাকে ভাড়া খাটিয়ে টাকা আনিস না কেন, আর সাঁজা উসুল করিস না কেন সুরেন?

টাঙ্গি হাতে নিয়ে মুহুরির দিকে তেড়ে গিয়েছিল সুরেন

তার পরেই নোটিস হল। ক্ষেতি-খামার করবার সাধ এ জন্মের মত ছেড়ে দিয়ে সেই যে মনিষ হয়ে গেল সুরেন, তার পর থেকে সে শুধু কপালবাবার জঙ্গলের মরা শাল কুড়োয়।

না, কোর্ফা হলেও কোন সুখ নেই। তাতেও নোটিশের ভয় আছে! সালিয়ানা জমা দিতে একটু দেরি হলেই জমির আলের উপর গিয়ে দাঁড়াবারও অধিকার থাকবে না, এমন অভিশাপের মধ্যে ক্ষেতি-খামার করতে না যাওয়াই ভাল।

বিঘা দুয়েক জমি কি কিনতে পারা যায় না? দাশুর ক্লান্ত চোখের পাতায় পাতায় যেন একটা পুরনো স্বপ্নের সাধ ঝির ঝির করে। জমি পেতে হবে। দো-আঁশ হোক, বেলে হোক, এঁটেল বা মেটেল হোক, জমি চাই। গুলঞ্চের বেড়া হলে ভাল হয়। জিরে বুনতে পারা যাবে, সোনার দানার মত জিরে। আখ না হোক, সরগুজা হবে। হলদে ফুলে ছেয়ে যাবে পৌষের ক্ষেত। ক্ষেতের বেড়ার কাছে ছুটোছুটি করে চোর খরগোশ ধরে ফেলবে মুরলী, আর খরগোশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হেসে উঠবে।

না, খরগোশ কেন? খরগোশ কোলে নিয়ে হাসবার আর দরকার হবে না মুরলীর। দাশু ধরামির স্বপ্নাতুর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে, খরগোশেরই মত তুলতুলে নরম একটি জিনিসকে, দাশুর ছেইলাকে কোলে নিয়ে হাসছে মুরলী।

আরও কত কী না ভাবতে ইচ্ছা করে। নতুন মাদল কিনতে হবে। করম নাচবে মুরলী। ভাদুরে বৃষ্টি নামবে আর থামবে। ছোটকালুর মাথার উপর আকাশের এপার ওপার জুড়ে রামধনু ফুটবে। দাশুর কাঁধের উপর ছেইলাটা, বুকের কাছে মাদলটা, আর পাশে পাশে মুরলী। সরগুজা-ক্ষেতের বেড়ার কিনারা দিয়ে সরু ঘেসো পথ ধরে আখড়ার দিকে যেতে যেতে দাশুর মাদল বাজবে—ধিতাং ধিতাং

খট্ খট্ খট্! যেন দাশু ঘরামির স্বপ্নের উপরে শক্ত শব্দের আঘাত। খট খট খট—কী কর্কশ শব্দ! ধড়ফড় করে জেগে উঠেই চোখ মোছে আর গভীর ঘুমে অলস মুরলীর শরীরটাকে একটা ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—ওঠ, জলদি ওঠ মুরলী।

চোখ মেলে চমকে ওঠে মুরলী ঃ কি হলো?

—কপাট ঠুকছে কে!

—কে? কে? আতঙ্কিত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসে মুরলী। চালার ফুটো দিয়ে সকালবেলার রোদ ঘরের ভিতরে চুঁইয়ে পড়ছে। নিজের চেহারাটা চোখ পড়তেই পোড়া-সাপের মত ছটফটিয়ে ওঠে মুরলী। ছিঃ, কী বেলাজ বুনো চেহারা! মাদি হরিণের মত একেবারে নিরাবরণ একটা শরীর হয়ে এ কোন্ জঙ্গলের ঘাসের উপর একটা জংলী ইচ্ছার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে মুরলী? এ ভুল কখন্ হল? কেন হল? পাঁচ বছর কয়েদ খেটে ঘরে ফিরে আসা এই মানুষটা কি মুরলীকে ধুতুরা খাইয়ে বেহুঁস করে দিয়েছিল?

মুরলীর একটা হাত ধরতে চেষ্টা করে দাশু, আর কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরটাও ভীরু হয়ে যায় : পুলিস এসেছে।

মুরলী—তোমার কপাল এসেছে।

বলতে বলতে দাশুর হাতটাকে যেন একটা কঠোর তুচ্ছতার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে যায় মুরলী, সায়াটাকে হাতে তুলে নেয়, শাড়ি খুঁজতে থাকে।

মুরলীর চোখ মুখের নিষ্ঠুরতা দেখে হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে দাশু : তুই এত রাগলি কেন মুরলী ? গোবিন্দপুর থানাতে হাজিরা না দিয়ে সোজা ঘরকে চলে এলাম, তাই খবর নিতে পুলিস এসেছে।

সায়া শাড়ি জামা দিয়ে শরীরটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে, চিরুনি হাতে নিয়ে চট্‌পট্‌ করে চুল আঁচড়ে নিয়ে, আর চটি পায়ে দিয়ে, একটা ভয়ানক জাদুখেলার বিস্ময়কেও হার মানিয়ে দিয়ে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে একেবারে বদলে যায় মুরলী। মুরলীর চোখ দুটো যেন রাগ সহ্য করতে গিয়ে জ্বলছে। সারা মুখটাই শক্ত হয়ে গিয়েছে। দাশুর সেই বোকার মত তাকিয়ে থাকা চোখ আর হতভম্ব বুকের পাঁজরগুলির উপরে যেন আরও একটা আঘাত দেবার জন্য চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বিছানা থেকে নেমে বসো।

—কেন ? দাশুর চোখ দুটোও দপ্‌ দপ্‌ করে।

—সিস্টার দিদি এসেছে। বলতে বলতে ছুটে গিয়ে ঘরের দরজার হুড়কো নামিয়ে দিয়ে কপাট খোলে মুরলী।

কিন্তু চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের বাইরে দু পা এগিয়ে যেয়েই হঠাৎ যেন পাল্টা একটা ধাক্কা খেয়ে তিন পা পিছিয়ে এসে আবার ঘরের ভিতরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী।

—কি হলো ? প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর মুখটা হিংস্র হয়ে কেঁপে ওঠে।

যেন শুনতেই পায় নি মুরলী ; মুখ তুলে দরজার বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে।

—দেখি তোর সিস্টার দিদির মুখটা কেমন ? বাঘিনের মত, না ডাইনের মত ? বলতে গিয়ে আস্তে আস্তে দাঁতে দাঁত ঘষে দাশু।

দাশুর কথাগুলি, এত তপ্ত রুক্ষ ও স্পষ্ট একটা ধিক্কার, তাও যেন শুনতে পায় নি মুরলী। ঘরের ভিতরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের একটা বিস্ময়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। নড়ে না, চোখ ফেরায় না মুরলী।

ঘরের ভিতর থেকে রাগী বনশুয়োরের মত একটা ছুটন্ত আক্রোশ হয়ে দরজার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা মুরলীর চেহারাটার পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় দাশু !

চমকে ওঠে, অপ্রস্তুত হয়, দু পা পিছিয়ে দাঁড়ায় দাশু। একটা লোক যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে ভদ্রলোক বলে মনে হয়। গায়ে কামিজ আছে, পরনে ছোট পেন্টালুন আছে ; হাতে একটা বন্দুক আছে, আর কোমরবন্ধে বন্দুকের গুলি সাজানো আছে।

—কে বটেন আপনি ? প্রশ্ন করে দাশু।

লোকটা হেসে ফেলে : তুমি কে বট, সেটা আগে বল।

—আমি এই গাঁয়ের কিষাণ।

—কিন্তু কোন কিষাণ ?

—সরদার কিষাণ।

লোকটা এইবার আরও জোরে হো-হো করে হেসে ওঠে : তাই বল। ভূমিজ বট ?

—হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি ?

—রাগছো কেন সরদার, আমি তোমার জাতের নিন্দা করছি না।

বন্দুকটাকে চালার খুঁটির গায়ে হেলিয়ে দিয়ে পেন্টালুনের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে লোকটা। মুরলীর মুখের দিকে বার বার তাকায়। তারপর দাশুর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। সরদারিনকে বড় লাজুক মনে হয়।

দাশু—এখানে আপনার কি কাজটা আছে বলবেন ?

লোকটা গম্ভীর হয়—হ্যাঁ কাজ আছে, অনেক কাজ।

দাশু—কি কাজ ?

লোকটা—আগে আমার নামটা জেনে নাও।

দাশু—বলেন।

—আমার নাম পলুস হালদার। আমি খিরিস্তান। তোমার সরদারিন যদি এক ঘটি জল খেতে দেয়, তবে আমি এখনি সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিব।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে পলুস হালদার। দাশুর বুকের হাড়েও খট্ করে একটা বিস্ময়ের আঘাত বেজে ওঠে। দেখতে পেয়েছে দাশু মুরলীর গম্ভীর মুখে ঝিক করে একটা মিষ্টি খুশির ছায়া শিউরে উঠেছে।

সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠল মুরলী। সত্যিই ঘরের ভিতর থেকে এক ঘটি জল নিয়ে বাইরে এসে পলুস হালদারের হাতের কাছে তুলে ধরল।

নিশ্চয়ই খুব পিপাসিত হয়েছিল পলুস হালদার। ঘটি হাতে তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে জল খায় পলুস। তারপর একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে শান্ত চোখে দাশুর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে : কিন্তু বুঝতে পারছি না সরদার, তোমরা বাঁচলে কি করে ?

—কি বলছেন আপনি ?

—বাঘিনটা শুধু একটা শাড়ি টেনে নিয়ে চলে গেল, এটা কেমন করে হয় ?

দেখতে পায় দাশু, হ্যাঁ, কাল রাতের মুরলীর গায়ে নীল রঙের শাড়িটা বাঁশঝাড়ের কাছে ময়না কাঁটার গায়ে ফেঁসে গিয়ে আটকে রয়েছে। সকালের আলোতে আর ফুরফুরে বাতাসে শাড়িটা নিশানের মত উড়ছে।

দাশু বলে—আপনার কাজের কথাটা বলবেন ?

পলুস হালদার—তাই তো বলছি। আমার বিশ্বাস, ওই বাঘিন আবার এখানে আসবে।

দাশুর ঘরের দাওয়ার চারদিকের ধুলোর দিকে তাকিয়ে, পথের পাশের

মাটির উপর এক-একটা অদ্ভুত আঁচড়ের দাগের দিকে তাকিয়ে, আর বাঁশঝাড়ের গোড়ার কাছে ছন্নছাড়া হুটোপুটির চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে পলুস হালদার বলে—উঃ, তোমরা খুব বেঁচে গিয়েছ সরদার! কিন্তু কেন বাঁচলে বুঝতে পারছি না।

দাশু বলে—বুঝে কাজ নাই।

পলুস হালদার—আমি বুঝবার কাজে এসেছি সরদার। ভোর হতেই মাচান থেকে নেমে, সেই ডরানির পুল থেকে আরও আধ ক্রোশ দূর থেকে, বাঘিনটার পায়ের দাগ ধরে ধরে ঠিক জায়গাটিতে এসেছি। আজ রাতে আমি এখানে মাচান বাঁধবো।

চমকে ওঠে দাশু। পলুস হালদারের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়—না, এখানে আপনি শিকার খেলবার মজা নিতে সাধ করবেন না।

—কেন?

—কেন আবার কি? ওসব এখানে চলবে না।

—আমি সরকারী হুকুমে বাঘিনটাকে শিকার করতে এসেছি। তুমি বাধা দিবার কে?

—আমি বাধা দিব না তো কে দিবে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

পলুস হালদার তবু শান্তভাবে একটু সমীহ করে বলে—তুমি ভুল করছো সরদার। থানা যদি জানতে পারে যে, তুমি মানুষখাগী বাঘিনটাকে মেরে ফেলতে বাধা দিয়েছ, তবে···কি হবে জান?

দাশু—যা হবার হবে।

পলুস হালদার হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মুরলীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—তুমি কি বল সরদারিন?

মুরলী বলে—আপনি রাগ করবেন না।

মুরলীর মুখের দিকে কটমট করে তাকায় দাশু। শিকারী পলুস হালদারের ওই কামিজ আর পেন্টালুন পরা চেহারার গর্বটাকে যেন মিষ্টি মিষ্টি নরম কথা বলে তোয়াজ করছে মুরলী। কী ভয়ানক বেহায়া হয়ে উঠেছে মুরলীর মুখটা!

শিকারী পলুস হালদারের চেহারাটাও যেন এক মুহূর্তের মধ্যে, মুরলীর ওই সুন্দর মুখের একটি মিষ্টি অনুরোধের মায়াতেই নরম হয়ে যায়। বন্দুকটাকে আবার হাতে তুলে নেয় পলুস হালদার। রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। দাশুর মত একটা কিষাণ মনিষের ধমক-ধামক সবই এক মুহূর্তে মধ্যে ভুলে গিয়ে পলুস হালদারের প্রাণটা যেন হেসে উঠেছে। দাশুর দিকে একটা ভ্রূক্ষেপ করতেও ভুলে যায় পলুস হালদার। মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে, বোধহয় আরও গভীর একটা আশ্বাসের সঙ্কেত আশা করে পলুস হালদার বলে—তাই হবে সরদারিন, আমি রাগ করলাম না।

মুরলী হাসে—যেন থানাতে গিয়ে সরদারের নামে···।

পলুস হালদার—না না না, তুমি কিছু ভেবো না সরদারিন। আমি নালিশ

করবো না। কিন্তু…।

মুরলী—কি ?

পলুস হালদার—তোমাকে দেখে কেমন যেন মনে হয়। তুমি কি ঠিক-ঠিক…।

মুরলীর মুখটা হঠাৎ-ভয়ে শিউরে ওঠে—আমাকে আবার কেন মিছামিছি… কি ঠাহর করছেন ?

পলুস হালদার—তুমি কি এই সরদায়ের ঘরণী ?

মুরলী মাথা হেঁট করে—হ্যাঁ।

পলুস—কিন্তু তোমাকে দেখে যে খিরিস্তানী বলে মনে হয়।

মুরলী—না, আমি খিরিস্তানী নই।

পলুস—তবে তুমি কেমন করে ঠিক গড বাবার মেয়েটির মত এমন সুন্দরটি হয়ে…।

মুরলী—সিস্টার দিদির দয়া।

—হারানগঞ্জের সিস্টার দিদি ? বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পলুস হালদার ; যেন খাকি কামিজের আড়ালে শিকারী পলুস হালদারের বুকের একটা আশা চেঁচিয়ে উঠেছে।

মুরলীরও চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা মায়াময় হাসি নিবিড় হয়ে ওঠে। মুরলী বলে—হ্যাঁ।

—আসি সরদারিন। মুরলীর মুখের দিকে আরও একবার তাকিয়ে, আর, একেবারে শান্ত ও প্রসন্ন একটা মূর্তি নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায় পলুস হালদার।

চালার খুঁটো ধরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। দাশুও আস্তে আস্তে, যেন পা দিয়ে মাটির উপর শক্ত থাবা রেখে রেখে মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে বুকের ভিতরের একটা বন্ধ জ্বালাকে বাইরে আছড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—মুরলী।

—কি ?

—কানারানী নয় ; তোর সিস্টার দিদিই মানুষখাগী বাঘিন বটে।

কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। যেন মধুকুপির একটা মনিষের এই অসার গর্জন তুচ্ছ করে নিজের ভাবনার সঙ্গে কথা বলছে মুরলী।

দাশু বলে—আমিও তোর সিস্টার দিদিকে দেখে নিব।

মুখ তোলে মুরলী। দাশুর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে, একটা কটকটে কঠোর চাহনি ছড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তোমার সাধ্যি নাই।

—কি বললি ? বলতে গিয়ে দাশুর শক্ত হাত দুটো ; মাটি কোপানো, কাঠ কাটা, চালা ছাওয়া আর গো-গাড়ি হাঁকানো জীবনের কঠিন দুটো পেশীময় শক্ত হাত থর থর করে কেঁপে ওঠে। কিন্তু…বাস্, তারপরেই যেন অলস হয়ে নেতিয়ে পড়ে। এই হাতে টাঙ্গি তোলবার আর সাহস নেই। এই মুরলীর

দাশু—একটা বুড়ো কয়েদী কুয়ার ভিতর পড়ে গিয়েছিল, সে বেটাকে আমিই টেনে উঠিয়েছিলাম। সে বাবদ এক মাস মকুব হয়েছে।

নিতাই মুদি দাশুর চেহারাটাকে আর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। প্রশ্ন করে নিতাই—গায়ে নতুন গেঞ্জি, নতুন ধুতিও পরেছিস দেখছি। এসব এরই মধ্যে জোটালি কেমন করে?

দাশু—এগার টাকা দশ আনা বকশিশ জমা হয়েছিল।

নিতাই—বকশিশ?

দাশু—হ্যাঁ, একটি বেলাও অসুখ নিয়ে হাসপাতালে যাই নাই। জেলের বাগানের এক বিঘা মাটি আমি একা ভেঙেছি। দুই হাজার ধুঁদুল আর ঝিঙা ফলিয়েছি। আমি বকশিশ পাব না তো কে পাবে? জেলার বাবু বলেছে, দাশু ঘরামির মত ভাল মেজাজের কয়েদী আর নাই।

নিতাই—এগার টাকা দশ আনার সবই খরচ করে ফেলেছিস?

দাশু—না। আট টাকা ছ আনা খরচ করেছি।

নিতাই—একটা গেঞ্জি আর একটা ধুতি আট টাকা ছ আনা হবে কেন?

দাশু হাসে, লাজুক হাসি; সেই হাসির আভা লেগে চোখ দুটোও জ্বলজ্বল করতে থাকে: এক শিশি ফুলেল তেল, আর এক শিশি আলতাও কিনেছি, দু টাকা দু আনা দাম পড়েছে।

কিছুক্ষণ মাথা চুলকোয় নিতাই, তারপর হাঁপ ছাড়ে: বুঝলাম। বেশ করেছিস, তা হলে হাতে এখন মোট তিন টাকা চার আনা আছে?

দাশু—হ্যাঁ।

নিতাই—ভেতরে এসে বস। কি খাবি বল? মুড়ি আছে, মটর আছে, গুড় আছে।

দাশু—কিছু খাব না।

নিতাই—খাবি না মানে?

দাশু—ঘরে গিয়ে খাব।

নিতাই—এখন ঘরে যাবি কি রে? সন্ধ্যা পার হতে চলল। তার ওপর এই তিন ক্রোশ পথ।

দাশুও হাসে: এ তো আমি এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারি গো।

নিতাই মুদি চোখ বড় করে আতঙ্কিতের মত তাকায়: পারবি না দাশু। এমন সাহস করিস না।

দাশু আশ্চর্য হয়: কিসের ডর?

নিতাই—দেখছিস না বাজারের দশা? সন্ধ্যা হবার আগেই যে-যার ঘরে চলে গিয়েছে। আজ এক মাস ধরে এই কাণ্ড চলছে। কোন কারবারী আর এমুখো হয় না।

—কেন?

—এক মাসের মধ্যে তিনটে গরু, পাঁচটা ছাগল আর দুটো মানুষ গিয়েছে।

—কোথায় গেল?

—আঃ, সোজা কথাটা বুঝতে পারিস না কেন দাশু ? কানারানীর পেটে গিয়েছে।

নিতাই মুদির মুখে এত বড় আতঙ্কের গল্পটা শুনে আতঙ্কিত না হয়ে দাশুর বিস্মিত চোখের তারা দুটো ঝিক করে হেসে ওঠে। তা হলে কানারানীও আছে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে কানারানী মরে যায় নি। জঙ্গলের কাঁটার আঁচড়ে নয়, নিজেরই বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বাঘের থাবার আঘাতে একটা চোখ কানা হয়ে গিয়েছিল যে বাঘিনীর, সেই কানারানী। মধুকুপির আখের ক্ষেতের মধ্যে সারা রাত ধরে বাঘ-বাঘিনীর সেই লড়াই চলেছিল, সে আজ প্রায় আট বছর আগের কথা। ঘরের দরজা বন্ধ করে সারা গাঁয়ের মানুষ সারা রাত জেগে বাঘ-বাঘিনীর সেই ভয়ংকর ঝগড়াটে গর্জন শুনেছিল। ছোটকালু আরবড়কালুর পাথরের উপর আছড়ে পড়ে সেই গর্জনের প্রতিধ্বনি আরও ভয়াল হয়ে উঠেছিল। এবং ভোর হতেই আখের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের লোক দেখতে পেয়েছিল, শুকনো ঘাসের উপর বাঘিনীর দুটো বাচ্চ হুটোপুটি করছে, আর ঘাসের এলিয়ে শুয়ে রয়েছে বাঘিনী, কাদামাখা একটা চোখ থেকে রক্ত ঝরছে।

অদ্ভুত একটা খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—সেই কানারানী!

নিতাই—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। জনার্দনের মা সেই মুটকি বুড়িকে মনে পড়ে তো ? শেষ রাতে উঠে সড়কের উপর গিয়ে গোবর কুড়তো যে বুড়িটা ?

—হ্যাঁ।

—এই তো সাত দিন হল বুড়িকে খেয়ে ফেলেছে কানারানী। গোবিন্দপুর থানা থেকে চারজন শিকারী এসে আজ বিশ দিন হল জঙ্গল তছনছ করছে। মাচান বেঁধে সারা রাত ধরে তাক করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। গুলি করলেও কানারানীর গায়ে লাগে না।

দাশু—কানারানী তো বাঘিন নয় ; বনমাতা বটে।

নাক সিঁটকে খেঁকিয়ে ওঠে নিতাই—হ্যাঁ, খুব দয়াময়ী বনমাতা বটে।

চুপ করে নিতাই মুদির দোকান-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে দাশু। আর, স্তব্ধ বাবুরবাজারও এইবার ঘন অন্ধকারে যেন আরও ভাল করে গুটিশুটি হয়ে লুকিয়ে পড়তে থাকে।

দাশু বলে—আচ্ছা, এবার আমি চলি।

নিতাই—যাবি ?

দাশু—হ্যাঁ।

নিতাই—মাত্র পাঁচটি আনা পয়সা খরচ করে মুড়ি-গুড় খেয়ে এখানে আজকের রাতটার মত থেকে গেলে ভাল করতিস। পাঁচ আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য শেষে কানারানীর পেটে যদি যেতে হয়···।

হেসে ওঠে দাশু ঃ আমাকে কিছু বলবে না কানারানী।

নিতাই বলে—সে না হয় হলো, কিন্তু আমার কথাটা শুনলে ভাল করতিস দাশু। এ রকম অসময়ে হঠাৎ ঘরে গিয়ে ঢুকলে···।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় নিতাই মুদি। দাশু বলে—কি বললে

প্রাণ দাশু ঘরামির টাঙ্গির চেয়েও বেশি ধারালো। এই মুরলী দাশু ঘরামির মুরলী নয়; কেউ নয়। মুরলীকে দেখতে ভয় করে।

সরে যায় দাশু। পথের দিকে উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে থাকে, এখন কোন্ দিকে চলে গেলে ভাল হয়? কোন্ দিকের পথটা ফাঁকা?

গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, অথচ কপালবাবার জঙ্গলের দিকে চলে যেতে পারা যাবে, এমন একটা পথ কি পাওয়া যাবে না? কুলের জঙ্গলটাকে ডাইনে রেখে ঘেসো পথে এগিয়ে গেলে পল্টনী দিদির ঘরটা চোখে পড়বে না। তারপর একটা ঢালু আছে, ডরানির স্রোত পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছে সেই ঢালু। কাঁটানটের জঙ্গলের ছাওয়া সেই ঢালু দিয়ে কেউ পথ হাঁটে না। ওই পথ ধরে একটা ক্রোশ এগিয়ে গেলেই তো কপালবাবার আসনের কাছে পেঁৗছে যাওয়া যায়।

সকালবেলার আলোতে ঝলমল করে মধুকুপির পাঁচ বছর আগের সেই চেহারা। শালবনের সেই সবুজ, কাঁকুরে ডাঙ্গার সেই লাল, বেলে ঢালুর সেই সাদা, পলিমাখা দো-আঁশের সেই ভেজা-ভেজা কালো। বড়কালুর বুকের সেই ঝরনার জলো দাগটাও চিকচিক করে, শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে যায় নি। পাথুরে টিলাগুলিও ঠিক সেই পাঁচ বছর আগের মতই ছড়িয়ে গড়িয়ে, বাবলার আর খেজুরের ঝোপঝাপ গায়ে জড়িয়ে, মধুকুপির পুবের আকাশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সাবাই ঘাসের জঙ্গলটাও বাতাসে দুলছে। এর মধ্যে ক্ষতের মত দগদগ করে শুধু একটা জায়গা, রায়বাবুর ইঁটখোলার শ্মশানটা।

ইঁটখোলার দিকে নয়, দাশু ঘরামির হতাশ ও উদাস চোখ দুটো যেন ক্লান্ত হয়ে মধুকুপির আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে। এই আকাশে হাতিয়া তারা নিশ্চয় ঠিক সময়ে দেখা দেয়, আর ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরিয়ে মধুকুপির মাটির পিপাসা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু চমকে ওঠে দাশু। বুম্ বুম্ বুম্! উত্তর দিকের আকাশটা যেন গম্ভীর আক্রোশের তিনটে শব্দ গড়িয়ে দিয়ে মধুকুপির বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

জানে না দাশু; এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জানবারও কোন উপায় নেই, বড়কালুর পশ্চিমে সেই ঘন শালবনের ভিড়কে প্রকাণ্ড এক-একটা খাবলার জোরে উপড়ে আর সরিয়ে দিয়ে বড় বড় কয়লার খাদ তৈরি হয়ে গিয়েছে। বড় বড় পোখরিয়া খাদ। কালো ধুলোর এক একটা দহ, যার তলায় এক একটা লাইন বেঁধে কিলবিল করে মানুষ। গাঁইতা শাবল হাতে নিয়ে কাজ করে মালকাটার দল। কয়লার নিরেট চাপের গায়ে বিঁধ দিয়ে বারুদ ঠাসছে সর্দার, জ্বলছে ফিউজ, আর, তারপরেই বুম্ করে একটা প্রচণ্ড আওয়াজের বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে এক শো ফাটলে ফাটা হয়ে, নড়ে চিরে আলগা হয়ে যাচ্ছে নিরেট কয়লার স্তূপ।

শুধু পোখরিয়া খাদ নয়, এঙ্গরা ব্রাদার্সের আরও তিনটে কলিয়ারী চালু হয়েছে, আরও ক্রোশখানেক দূরে; একটা পিট আর দুটো ইনক্লাইন। কাল রাতের বেলায় চাঁদের আলোতে অনেক দূরে যে মস্ত উঁচু একটা চিমনির গলা

আবছা ছবির মত দেখতে পেয়েছিল দাশু, এখন সেই চিমনির গলাটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এইবার বুঝতে পারে দাশু, ওটা মেঘ নয়, ওটা চিমনির ধোঁয়া। কিন্তু জানে না দাশু, সুরেন মানঝি আজকাল আর কপালবাবার জঙ্গলে মরা শাল কুড়োয় না। সুরেন মানঝি আজ এজরা ব্রাদার্সের ওই কলিয়ারির মালকাটা।

মধুকুপির পুবের আকাশ কিন্তু শান্ত; যদিও এই সকালবেলার রোদেই একটু বেশি তেতেছে বলে মনে হয়। রাতের বেলা ডরানির স্রোতের নতুন পুলের কাছে দাঁড়িয়ে, ওই পুবের ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে অনেক দূরে কয়েকটা নতুন ইমারতের ছায়া-ছায়া চেহারা দেখেছিল দাশু। এখন স্পষ্ট দেখা যায়। যেন ডাঙ্গা আর আকাশের ছোঁয়াছুঁয়ির মাঝখানে ছবির মত আঁকা একটা নতুন জীবনের বসতি। দাশু ঘরামির চোখে অদ্ভুত একটা আতঙ্ক কাঁপতে থাকে।

পুবের আকাশটাও বেজে ওঠে। বাঁশির শব্দের মত শব্দ, গম্ভীর অথচ মিষ্টি। সে শব্দ এক ক্রোশের বাতাসে পাড়ি দিয়ে মধুকুপির কানের কাছে এসে বাজছে।

জানে না দাশু, এই বাঁশির শব্দ নতুন কাজের মানুষকে কাজ করতে ডাকছে। অনেক দূরের ইমারতগুলি হলো সেন এণ্ড ওয়াল্টারের মাটিচালান কোম্পানির লেবরেটরি, অফিস-বাড়ি, কুলি-ধাওড়া আর বাবু-কোয়ার্টার। এক হাজার বিঘা জমি লীজ নিয়েছে সেন এণ্ড ওয়াল্টার। সকাল ছটা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এক হাজার মজুর খাটে। কোদালের ক্ষান্তি নেই, টবের শ্রান্তি নেই। মোটর ট্রাকে বোঝাই হয়ে দূরের কুমারঢুবির দিকে চলে যায় সিলিকা স্যাণ্ড। ধুরকুণ্ডার দিকে চালান হয় ফেলস্পার, আর কেওলিন চালান হয় কলকাতায়। জানে না দাশু—হরিশ, নটবর ও নিধিরাম আজকাল আর পালকি বইতে গোবিন্দপুরে যায় না। ওরা সেন এণ্ড ওয়াল্টারের খনিতে কাজ করে দিন এক টাকা দু আনা রেটে মজুরি পায়।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় দাশু। তবে আর বাকি রইল কোন্ দিকটা? পশ্চিমটা? ছোটকালু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যেদিকে, সেই দিকটা? কিন্তু ছোটকালুর পাহাড়ে ধড়টাও গুরুগুরু শব্দ করছে মনে হয়।

জানে না দাশু, ছোটকালুর ওই পাহাড়ে ধড়ের ঠিক পিছনে, যেখান থেকে মহুয়ার জঙ্গল আর উইঢিবির ভিড় ক্রোশের পর ক্রোশ আরও এগিয়ে যেয়ে একেবারে বাঘমুণ্ডি রেঞ্জের সঙ্গে মিশেছে, সেখান দিয়ে একটা নতুন রেললাইন এঁকেবেঁকে আরও কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। আরও এগিয়ে যাবে রেললাইন। খেলারির সিমেণ্ট তাড়াতাড়ি রামগড়ে পেঁছে দিতে হলে, লোহার-ডাগার বক্সাইট আরও তাড়াতাড়ি মুরির অ্যালুমিনিয়াম কারখানার কাছে এনে ঢেলে দিতে হলে, এই নতুন রেললাইনকে আরও বিশ মাইল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তাই নতুন রেললাইন তৈরী হচ্ছে। সারাদিন কাজ চলে। পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া ছড়িয়ে গোঁ-গোঁ করে মাটি খোঁড়ে প্রকাণ্ড দুটো ইউক্লিড, মাটি চৌরস করে ক্যাটারপিলারের খাঁজকাটা চাকার দাঁত। ওয়াগন

বোঝাই হয়ে রেল আসে, স্লিপার আসে, ইস্পাতের দড়ির বড় বড় রীল আসে, আর আসে সিগন্যালের খুঁটি। ছোটকালুর ওপারে, ছোটকালুরই ছায়ার কাছে শান্টিং ইয়ার্ড। শান্ট করে ইঞ্জিন, নতুন লাইন গুরু গুরু শব্দ করে করে কাঁপে।

মহুয়ার জঙ্গল ছিঁড়ে-খুঁড়ে দশ বিঘা জায়গা জুড়ে রেলওয়ের স্টোর ছড়িয়ে আছে। ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সরঞ্জামে ভরা সারি সারি ওয়াগন। জানে না দাশু, আজকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়াগনের লোডিং আর আনলোডিং-এ কাজ করে হরিপদ; কপালবাবার জঙ্গলে সে আর মৌচাক ভাঙ্গতে যায় না।

তবে কি শুধু একটি দিকের আকাশ পুরনো মধুকুপির শান্তির ছায়া নিয়ে আজ বেঁচে আছে? ঐ দক্ষিণের দিকটা?

হ্যাঁ দক্ষিণের দিকে তাকালে কপালবাবার জঙ্গলের ছায়াঘন চেহারা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কপালবাবার জঙ্গল, অনেক ঠাঁই জুড়ে অনেক ঝরনার শব্দ বুকের ভিতর লুকিয়ে, অনেক পাহাড়কে চারদিক থেকে পাক দিয়ে দিয়ে বন্দী করে রেখে, ক্রোশের পর ক্রোশ এক-একটা নতুন নাম নিয়ে রাঁচি জেলার সীমানা পর্যন্ত পেঁছে গিয়েছে। থানা বলে, প্রতি বছর শীতকালে বাঘিন কানারানী কপালবাবার এই জঙ্গল থেকে সরে গিয়ে, রাঁচির পাহাড়ী ঘাটগুলিকেও পার হয়ে, একেবারে পালামৌয়ের রিজার্ভ জঙ্গলের গভীরে গিয়ে লুকিয়ে থাকে।

ঘরের দাওয়ার কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে কপালবাবার জঙ্গলের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু। কপালবাবর জঙ্গল আছে ঠিকই, কিন্তু কপালবাবা আছে কি? দাশুর চোখ দুটো কটকট করে, বুকটা হাঁসফাঁস করে। মনের ভিতরটা যেন আর্তনাদ করে—কপালবাবা তুমি আছ, কি আছ নাই? মরেছ কি মর নাই?

যেন একটা শেষদেখার আক্রোশ নিয়ে মুরলীর মুখের দিকে একবার তাকায় দাশু। দাওয়ার খুঁটির কাছে উবু হয়ে বসে আর হাঁটুর উপর মুখটা পেতে দিয়ে চুপ করে বসে আছে মুরলী। মাটির উপর নখ দিয়ে হাবিজাবি আঁকছে আর কি-যেন ভাবছে। মনে হয়, একটা দুরন্ত ভাবনার সুখে নির্লজ্জ হয়ে নতুন সৌভাগ্যের হিসেব করছে মুরলী। ওকি? মুরলীর চোখে জল কেন? কিন্তু দাশু ঘরামির সন্দেহের হিসাবেও আর ভুল হয় না। মুরলীর ওই চোখের জল জলই নয়।

একবার দাশু ঘরামির এই মজবুত শরীরের একটা কষ্ট দেখে কেঁদে ফেলেছিল মুরলী। কাঁকড়া বিছার কামড়ে বিষিয়ে ফুলে গিয়েছিল দাশুর শরীরটা। দাশুর গায়ে হাত বোলাতে গিয়ে জলে ভরে গিয়েছিল মুরলীর চোখ। কিন্তু মুরলীর এই চোখ সেই চোখের মত নয়, আর; দাশুর গায়ে হাত বোলাবার জন্য মুরলীর মনে আজ আর কোন সাধও নেই।

একবার মুরলীর নিজেরই একটা অসুখ হয়েছিল। একমাস ধরে জ্বরে আর বুকের ব্যাথায় কষ্ট পেয়েছিল। দাঁড়াতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে

গিয়েছিল।—আমার মরণ এসেছে গো। বলতে গিয়ে মুরলীর চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

না, সে রকমের দুখিনীর চোখও নয়। সিস্টার দিদির দয়া পেয়েছে যে, পলুস হালদারের পিপাসা মেটাতে গিয়ে হেসে উঠেছে যে, দাশু ঘরামির ঘর করবার সাধ শেষ করে দেবার ইচ্ছে হয়েছে যার, তারই চোখ দুটো নতুন ঢং করে জল ঝরিয়ে হাসছে।

কিন্তু মুরলীর চোখের এত কাছে মাটির উপর আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে দাশু ঘরামির পা দুটো পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। জ্বলতে শুরু করেই দিয়েছে। এখনি ছুটে গিয়ে কপালবাবার আসনের কাছে আছড়ে না পড়া পর্যন্ত এই জ্বালা বোধহয় শান্ত হবে না।

কিন্তু চমকে ওঠে দাশু। দাশু ঘরামির পায়ের জ্বালার উপর এক ঝলক ঠাণ্ডা জল হঠাৎ শব্দ করে ছড়িয়ে পড়েছে।

পলুস হালদারের পিপাসা মিটিয়ে দিয়েছিল যে ঘটিটা, সেই ঘটি হাতে নিয়ে দাশু ঘরামির পায়ের উপর হঠাৎ জল ঢেলে দিয়েছে মুরলী। মনটা বিশ্বাস করতে না চাইলেও দাশুর চোখ দুটো অস্বীকার করতে পারে না, সত্যি মুরলী জল ঢেলেছে। কী আশ্চর্য, অনেকদিন আগের একটি সন্ধ্যার উৎসবের ছবি আবার এই সময়ে দাশু ঘরামির আজকের এই আশাহীন জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ লগ্নে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে কেন? সেদিন ঢোল বেজেছিল, মহেশ রাখাল কেঁদেছিল, ঝালদার এক কুটিরের আঙ্গিনায় হাঁড়ি হাঁড়ি মহুয়া-মদের নেশায় ভাইয়ারি মেতে উঠেছিল। গাঁও-পঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে মুরলীর মাথায় সিঁদুর দিয়েছিল দাশু। সিঁদুরদানের পর এক ঘটি জল দাশুর পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে মুখ টিপে লাজুক হাসি লুকিয়েছিল যে মুরলী, সে মুরলী কি সত্যিই মরে যায় নি?

দাশু বলে—কি হলো?

মুরলী বলে—জানি না।

দাশু—তবে?…

—এসো তবে। ঘরে চল। ডাক দেয় মুরলী। আর দাশুও যেন একটা জাদুর আবেদনে মুগ্ধ হয়ে মুরলীর পিছু হেঁটে ঘরের ভিতর ঢোকে।

—বসো! মুরলীর একটি অনুরোধের শব্দেই মুগ্ধ মানুষের মত অবশ হয়ে ঘরের মেঝেতে খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর বসে পড়ে দাশু।

মুরলী বলে—একটা কথাও বলবে না। বড় বড় চোখ করে তাকাবে না। চুপচাপ খেয়ে নাও।

দাশুর হাতের কাছে বাঁশের ডালা ভরে মকাইয়ের খই, দু ঢেলা গুড়, একটা শসা আর এক ঘটি জল রেখে দিয়ে মুরলী নিজেও মেজের উপর পা ছড়িয়ে বসে।

কয়েদ খেটে পাঁচ বছর পরে ঘরে ফিরে এসে দাশুর পেটের ক্ষুধাটাও যেন এইবার পুরনো স্বাদের মধুরতায় ভরে যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম

খাবারের চেহারা দেখতে পেয়েছে দাশু। পাঁচ বছর পরে এই প্রথম মধুকুপির মকাইয়ের খই মুখে দিল দাশু। জেলের ভাত খাওয়া জীবনের সব বিস্বাদগুলিকে এখন একটা মিথ্যা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। মধুকুপির মাটিতে যে শসা ফলে, সেই শসা; মধুকুপির মাটিতে যে আখ ফলে, সেই আখেরই গুড়। দাশুর পেট ভরছে, সেই সঙ্গে বুকটাও অগাধ তৃপ্তিতে ভরে যাচ্ছে। ঘটি তুলে ঢকঢক করে জল খায় আর ঢেকুর ছাড়ে দাশু।

চোখ তুলে মুরলীর দিকে তাকাতেই হেসে ওঠে দাশুর চোখ: তুই কি আমার খাওয়া দেখছিস, না, আমাকে দেখছিস ?

দাশুর প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে মুরলীর শান্ত দুটি চোখ। ঠিক ধরতে পেরেছে দাশু। পাঁচ বছর কয়েদের খাটুনিতে একটুও কাবু আর একটুও কাহিল হয়ে যায় নি মুরলীর জীবনের মরদ সঙ্গী দাশু ঘরামির ওই শরীর, শরীরের ওই পাথুরে ছাঁদ। দাশুর পিঠের দাঁড়া যেন একটা গভীর খাদের ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে। বুকের পাটা যেন দুটো চাকা চাকা পাথর দিয়ে গড়া। কপালের বাঁ দিকে ছোট্ট একটা রগ কুঁকড়ে আছে। হেসে ফেললেই কোমরটা লিকলিক করে দোলে, সেই সঙ্গে নাভিটাও শিউরে উঠে আরও গভীর হয়ে যায়। ভুলে যাবে কেমন করে মুরলী, মধুকুপির এই মানুষটারই গা ঘেঁষে মুরলীর জীবনের আট বছরের কত কামনা কতবার কত সুখের আবেশে গলে গিয়েছে ?

মুরলী হাসে: তোমাকেই দেখছি, দেখতে মানা আছে কি ?

দাশুও হাসে: তোর মরদকে তুই দেখবি, মানা করবে কে ?

পা ছড়িয়ে অলস হয়ে বসে থাকা মুরলীর সেই খুশি শরীরটা হঠাৎ ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় আর পা গুটিয়ে আবার হাঁটুর উপর মাথা রেখে শরীরটাকে আবার শক্ত করে চেপে রাখতে চায়।

হঠাৎ মনে পড়েছে মুরলীর, সত্যিই যে মানা করেছে একজন। মুরলীকে এই পাঁচ বছরের সব দুঃখের অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে, বরং আরও সুন্দর করে হাসিয়ে সাজিয়ে রেখেছে যে, সেই সিস্টার দিদির মানা আছে। সিস্টার দিদির কাছে যে শপথ করেছে মুরলী। না কখনো ভুল করবো না সিস্টার দিদি। আগে আমার মরদ ভাল মানুষ হবে, কলে কাজ নিবে, খিরিস্তান হবে, তারপর। তার আগে নয়। তার আগে মরদের পা ছোঁব না, কোমরও ধরবো না।

কিন্তু মহেশ রাখালের মেয়ের শক্ত প্রাণটা যে কাল রাতে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল, আর এই শপথটাকেই একটা মাতাল খেলার আনন্দে ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ করে দিল। সিস্টার দিদিকে মিথ্যে কথা বলতে বুকটা যে কেঁপে উঠবে। আর, সত্য কথা বললে যে আর মুখ দেখাবার অধিকার থাকবে না।

দাশু বলে—করম নাচবার সময় আমার কথা তোর মনে পড়ে নাই ?

মুরলী—আমি করম নাচি নাই।

—কেন ?

—সিস্টার দিদি মানা করেছে।

—আবার কেন ওর নাম করছিস ? ওর কথা ছেড়ে দে।

—ছাড়বো কেন ? সিস্টার দিদি দয়া না করলে মুরলী যে মরে যেত।

—মিছা কথা বকিস না মুরলী, কপালবাবার দয়া থাকলে কে তোকে মরাতে পারে ?

চুপ করে মুরলী আবার আনমনার মত তাকিয়ে যেন একটা আনন্দুনিয়ার কথা ভাবতে থাকে। আর, ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে একটা নতুন রকমের লাজুক হাসি মুখের উপর ছড়িয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে দাশু। দেখতে পেয়ে খুশি হয় দাশু, হ্যাঁ, ঘরের এক কোণে বিঁড়ের উপর বসানো সেই ছোট হাঁড়িটা আজও আছে। দাশুর জীবনের অনেক সন্ধ্যার আনন্দের বন্ধু ওই হাঁড়ির ভিতরে মধুকুপির মহুয়ার মাতাল রস আজও টলমল করছে।

দাশু বলে—হাঁড়িটাকে কাছে নিয়ে আয়। জেলের ভিতরে পাঁচ-পাঁচটা বছর এই হাঁড়িটাকে ভেবে ভেবে বুকটা যে কি তরাস ভুগছে, তুই বুঝতে পারবি না।

শুকনো চোখে ছোট একটা তুচ্ছতার ভ্রূকুটি পাকিয়ে নিয়ে মুরলী বলে—ও হাঁড়িতে কিছু নাই। কিছু থাকে না।

—কেন, তুই কি পরবের দিনেও হাঁড়িয়া খাস নাই ?

—না।

—কেন ?

—সিস্টার দিদির মানা আছে।

—তোর সিস্টার দিদি মানা করে কেন ? খিরিস্তানীরা কি বোতলা সরাব খেয়ে নেশা করে না ? লিলে লিলে করে নাচে না ?

—জানি না।

—তা জানিব কেন ? সিস্টার দিদির মিছা কথাও তোর ভাল লাগে ?

বোধহয় দেখতে পায় নি দাশু, মুরলীর চোখের তারা দুটো আবার কেমন করে হঠাৎ ছটফটিয়ে উঠে আবার শান্ত হয়ে গেল। ঘরের আর-এক দিকের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু, আর চোখ দুটোও করুণ হয়ে যায়। দেয়ালের গায়ে মাদলটা ঝুলছে। কিন্তু শুকিয়ে চিমসে হয়ে গিয়েছে। মধুকুপির আকাশের মেঘকে, মধুকুপির ক্ষেতের ধানের শিষকে, মধুকুপির জীবনের কত আনন্দকে নাচিয়ে মাতাল করে দিয়েছে এই মাদলের বোল। মহুয়ার নতুন ফুলের গন্ধকে এই মাদলটাই যে ডেকে ডেকে বরণ করেছে। সে জিনিসটার এমন দশা!

মাদলটাকে নামিয়ে এনে ধুলো ঝাড়তে থাকে দাশু। ফুঁ দেয়, হাত দিয়ে ঘষে, টোকা মারে: ইসু, এটাকে যে একেবারে মেরেই রেখেছিস।

মুরলী রাগ করে: আমাকে বকছো কেন ? আমি কি পুরুষ বটি যে, তোমার মাদল নিয়ে ধিতাং ধিতাং করবো।

দাশু শুকনো মুখে হাসে: তা করতে বলছে কে ? কিন্তু, এটাকে মাঝে মাঝে একটুক মুছমাছ করে আর আগুনে সেঁকে রাখতে পারতিস তো ?

উত্তর দেয় না মুরলী। মনে পড়ে মুরলীর, সিস্টার দিদি যেদিন প্রথম এসে নতুন আশার রঙ ধরিয়ে দিয়ে গেল, সেদিন যে ভয় করেছিল মুরলী, সেই ভয়ই সত্য হয়ে উঠেছে। মানুষটা পাঁচ বছর পর ঘরে ফিরে এসে আবার সেই পুরনো আহ্লাদগুলিকেই খুঁজছে। আদুড়-গা হয়ে কোমরে গামছা বেঁধে হাঁড়িয়া খেয়ে চোখ লাল করে, মাদল পিটে পিটে নাচবার জন্য আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এই মানুষটার জীবনের সাধ।

মুরলীর চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন সব তৃপ্তি হারিয়ে বিস্বাদ হয়ে যায়। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার হেঁট মাথা হয়ে ঘরের মেটে মেঝের উপর নখের দাগ আঁকতে থাকে মুরলী। মুরলীর মন যেন এই ঘরের দরজা থেকে সরে গিয়ে বাইরের একটা নতুন ভাষা, নতুন হাসি আর নতুন আহ্বানের মায়ার কাছে বসে সত্যিই হিসবে করছে।

আসি সরদারিন! খিরিস্তান পলুস হালদার কী সুন্দর নরম সুরে কথা বলে! কী চমৎকার তাকায়! গায়ে কামিজ, পরনে পেণ্টালুন, পায়ে বুটজুতো, হাতে বন্দুক ওই পলুস হালদার হারানগঞ্জের সিস্টার দিদিকে নিশ্চয় খুব ভক্তি করে। নিশ্চয় হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির কাছে, সেই ছোট ছোট বাংলাঘরের একটি ঘরে থাকে পলুস হালদার। নিশ্চয় কলে কাজ করে পলুস হালদার। সাইকেল চড়ে কাজের কারখানায় চলে যায়, আর সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে গির্জাবাড়িতে প্রেয়ার সাধতে যায়। সিস্টার দিদি বলেন, একবার প্রেয়ার সাধলে সব পাপতাপ মুছে যাবে বহিন, তোমার জীবন সুখে ভরে যাবে।

আবার কবে আসবে পলুস হালদার? সত্যিই আসবে কি? মুরলীর নিঝুম চোখের উপর কত স্পষ্ট একটা ছবি ছটফট করে। পকেট থেকে রুমাল বের করেছে পলুস হালদার, আর মুরলীর ভীরুচোখের জল মুছে দেবার জন্য সেই রুমাল হাতে তুলে নিয়ে…।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী: শুনছো?

চমকে ওঠে দাশু: কি?

মুরলী—তুমি কবে কলে কাজ নিবে বল?

দাশু ভ্রূকুটি করে: কলে কাজ নিব কেন? গাঁয়ের জমি কি মরে গেছে?

মুরলী—কি বললে?

দাশু—ঈশান মোক্তারের চিঠা নিব; ভাগজ্যোত করবো।

মুরলী—তাতে পেট ভরবে? কত মকাই আর কত ধান ভাগে পড়বে?

দাশু—পেট ভরবে না জানি। তাই ভেবেছি, কপালবাবার জঙ্গলের মরা শালও ভাঙবো।

মুরলী—ঠিকাদারের দস্তুরি, জঙ্গল পুলিসের জলপানি, আর ঈশান মোক্তারের গো-গাড়ির ভাগ দিয়ে তোমার কাঠবেচা পয়সার কটা পয়সা বাঁচবে?

দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। মুরলীর আতঙ্ক একটুও মিথ্যে আতঙ্ক নয়। কিন্তু…কিন্তু জিউ-জান দিয়ে খাটলে কি কিছু টাকা জমানো যাবে না? আর, বিঘা দুই জমি কি…।

দাশু বলে—ভাবিস না মুরলী, একটুক সবুর কর।

মুরলী—কি করতে চাও ?

দাশু—সব্জী ফলাবো। আমি একলা খেটে জেলখানার দুই বিঘা জমি কুপিয়ে কত সব্জী ফলিয়েছিলাম, তুই জানিস না।

মুরলী—কিন্তু দুই বিঘা জমি তোমাকে দিবে কে ?

আবার সেই ভয়ঙ্কর সত্য, মধুকুপির মনিষজীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মুরলী। জমি দিবে কে ? জমি কিনবার টাকা কই ? টাকা জমবে কেমন করে ? জিউ জান ভিড়িয়ে দিয়ে খাটলেও যে টাকা জমে না।

দাশুর উদাস চোখ দুটো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর এই দুর্ভাবনার প্রশ্নগুলিকে যেন একটি বিশ্বাসের জোরে হাসিয়ে দেবার জন্য হেসে ওঠে দাশু : কপালবাবার দয়া থাকলে পেয়ে যাব, ভাবিস না।

মুরলী ভ্রূকুটি করে তাকায় : তারপর কি হবে ?

দাশু—কপি ফলাবো, আলু ফলাবো। ভাদুই সব্‌জিও ফলাবো। আমি কোপাই করবো, তুই ঢেলা ভাঙ্গবি। আমি ছিটাই করবো, তুই বুনবি ; ক্ষেতটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে…।

দাশুর কথাগুলি যেন দাশুর সেই পুরনো স্বপ্নের আবোল-তাবোল বোল। শুকনো চোখে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মুরলী বলে—না। তুমি কলে কাজ নিবে। একটা-দুটা বছর কাজ শিখবে। সিস্টার দিদি বলেছে, তোমাকে সাহেবের খাদের কলঘরের মিস্তিরি করে দিবে। তিন কুড়ি, চার কুড়ি টাকা মাহিনা পাবে। আর আমি…।

হেসে ফেলে মুখে আঁচল চাপা দেয় মুরলী, যেন মুরলীর বুকের ভিতরে জোর করে চেপে রাখা একটা নতুন স্বপ্ন হঠাৎ এই মুখরতার সুযোগ পেয়ে হেসে উঠেছে।

দাশু—কি বটে ?

মুরলী হাসে।—কি আবার বটে ? আমি সিস্টার দিদির ইস্কুলে পড়তে যাব।

দাশুর পাঁজর টনটন করে : ওসব কথা ছেড়ে দে। কী পাপ করেছিস যে সিস্টার দিদির ইস্কুলে পড়বি ?

কটমট করে তাকায় মুরলী : তবে কি আমি তোমার কামিন হয়ে খেটে খেটে গতর বুড়ো করে দিব ?

—ছি, এমন মিছা কথাটি কেন বলিস মুরলী ? নিজের মরদের সাথে কাজ করলে মেয়েমানুষ কি কামিন হয়ে যায় ?

মুরলীর হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে দাশু। তারপর আদরের সুরে ডাক দেয়—মুরলী ! তুই ভাবিস না। কিছু ভাবিস না। আমি নিতাই মুন্দির ঠিকা জঙ্গলে খয়ের করবো। গাছ ভাঙ্গবো আমি, ছিলবো আমি, তুই জ্বাল দিবি। দিনে খাটবো, রেতে খাটবো। পঞ্চাশ টাকা হবেই রে মুরলী।

তোর হাঁসুলি হবে, আমার নতুন মাদল হবে, আর···।

—না। দাশুর স্বপ্নাতুর মুখরতার বিরুদ্ধে একটা কঠোর আপত্তি হেঁকে বাধা দেয় মুরলী : না, তুমি কলঘরে কাজ করতে যাবে, আমি নতুন ঘরে বসে রাঁধবো। রুপোর হাঁসুলি নয়, তুমি সোনার দানার মালা কিনে দিবে। পরবের দিনে তুমি নতুন শাড়ি এনে দিবে।

—না, না, তুই পাগল হয়েছিস মুরলী। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—নতুন ঘরে নয়, তুই এই ঘরে থাকবি।

—আমি এই ঘরে থাকতে পারবো না।

—তোকে এই ঘরেই থাকতে হবে রে মহেশ রাখালের বেটি।

—না।

—হ্যাঁ। সোনার দানার মালা পরতে যদি সাধ হয়, তবে এই ঘরে থেকেই সাধ কর্ না কেন ?

—না।

—কেন না ? কুলের জঙ্গলে লা পোকার ডাঁটি ভাঙবার ঠিকা নিব আমি। আমি ভাঙবো, তুই কুড়াবি। আমি বোঝা বাঁধবো, তুই বোঝা মাথায় নিবি। ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে পেঁছে দিয়ে আসবি। তুই পয়সা পাবি, আমি পয়সা পাব। সুখ হবে, এই ঘরে থেকেই অনেক সুখ হবে।

তোমার কপাল হবে! গেঁয়ো মধুকুপির একটা অসার দুর্বল আর মূর্খ স্তুতিকে যেন একটা ধিক্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী।

—কি ভেবেছিস তুই ? বলতে বলতে এগিয়ে আসে দাশু।

সরে যায় মুরলী। দাশুর মনিষজীবনের এই অসার অহংকারের ছায়াটাকে আর সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। দাশুর মুখের দিকে ছোট একটা ভ্রূকুটি হেনে আর রঙীন শাড়ির আঁচলটাকে দাঁত দিয়ে চেপে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে দরজার চৌকাঠের উপর পা রেখে সামনের সড়কের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাশু বলে—পথের দিকে মিছা তাকাস কেন ? শিকারীটা নাই ?

চমকে ওঠে মুরলী। আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে দাশু ঘরামির হিংসুটে মুখটার দিকে কটমট করে তাকায়।

দাশু—কি বলছিস বল ? মহেশ রাখালের বেটি যদি এক বাপের বেটি হয়ে থাকে, তবে বলুক, এই ঘরে থাকতে ঘিন্না লাগছে ?

মুরলী—হ্যাঁ।

কেঁপে ওঠে দাশু। দাশু কিষাণের জীবনের সব মরদানির অহংকার, স্বামিপনার সব দুঃসাহস যেন বজ্রপাতে আহত বড়কালুর পাথুরে ঢিবির মত ফেটে খানখান হয়ে যায়। বড়কালুর ভেজা ঘাস বাজের আগুনের জ্বালা লেগে যেমন করে পোড়ে আর ধোঁয়া ছড়ায়, দাশুর জীবনের স্বপ্ন আর আশাগুলিও তেমনি করে পুড়ে যাচ্ছে আর ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

দাশু বলে, বলতে গিয়ে অলস অসহায় ও ভীরু একটা অবসাদের মধ্যে

যেন নেতিয়ে পড়ে দাশুর গলার স্বর—তবে আর দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

মুরলী—চলে যেতে বলছো ?

দাশু—হ্যাঁ।

সেই মুহূর্তে রঙীন শাড়ির আঁচলটাকে আরও শক্ত করে কামড়ে ধরে মুরলী। সড়কটার দিকে একবার তাকায়। পুরনো জামকাঠের জীর্ণ কপাটের ছোঁয়া থেকে শরীরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছটফট করে ছুটে চলে যায়।

চুপ করে বসে, প্রাণহীন অসাড় একটা দেহ নিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু। একটা মাছি উড়ে এসে দাশুর চোখের কাছে ভনভন করতে থাকে। দাশুর এই অসাড় চোখ দুটোকে বোধহয় মরা মানুষের চোখ বলে ভুল করে মাছিটা।

হঠাৎ দাশুর সেই মড়াটে চেহারা যেন নতুন রক্তের ঝলক লেগে তপ্ত হয়ে ওঠে। হাত দুটো কাঁপতে থাকে। কি যেন মনে পড়ে গিয়েছে দাশুর। টাঙ্গি টাঙ্গি টাঙ্গি! দাশুর হাত দুটো যেন এক প্রচণ্ড গর্বের দুঃসাহসে বেপরোয়া হয়ে সেই মুহূর্তে ঘরের চালার গোঁজ থেকে টাঙ্গিটাকে টেনে হাতে তুলে নিয়ে মুরলীর দিকে ছুটে যায়। মহেশ রাখালের বেটি যে দাশুর জীবনের একটা সাধের আশাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

মুরলীর পথ আটক করে দাঁড়ায় দাশু: আমার ছেইলাকে পেটে নিয়ে কোন্ নরকে পালিয়ে যাচ্ছিস রে মাগি ?

—কি বললে ? থরথর করে কাঁপতে থাকে মুরলী।

—আমার ছেইলা! চিৎকার করে দাশু।

বুনো মধুকুপির একটা প্রচণ্ড দাবি গর্জন করে মুরলীর পথ আটক করেছে। কিন্তু মুরলীর শরীরের সব রক্তমাংস যে জানে, মুরলীর কোমরের একটা নিবিড় ব্যথাও যে বিশ্বাস করে, একটুও মিথ্যে নয় এই দাবি। দাশু ঘরামির ছেইলাকে যেন ভয়ানক ধূর্ত আর লোভী চোরের মত পেটের কোটরের ভিতরে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে মুরলী।

মুরলীর চোখ দুটো কেঁপে ওঠে। রঙীন শাড়িতে জড়ানো শরীরটা কুঁকড়ে যায়। মাথাটাও কাঁপতে কাঁপতে হেঁট হয়ে যায়। আস্তে আস্তে হেঁটে আর ফিরে এসে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে মুরলী।

পাঁচ হাত উঁচু মাটির দেয়াল, আর খাপরার চালা। জামকাঠের জীর্ণ দরজার একটা কপাট খোলা, একটা কপাট ভেজানো। বড়কালুর গায়ে যখন বিকালের রোদ গড়িয়ে পড়ে, তখনও মধুকুপির এই ঘরের ভিতরে দুটি মানুষের প্রাণ সাড়া হারিয়ে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়েও দাশুর চোখ দুটো যেন মধুকুপির বিকালের এই চেহারাটাকে চিনতে পারে না। আর, মুরলীও বোধহয় বুঝতে পারে না, কতক্ষণ ধরে ওর মাথাটা হেঁট হয়ে আছে, আর হাতটা শুধু মেঝের মাটির উপর নখের দাগ এঁকেছে।

মধুকুপির আকাশ কাঁপিয়ে আবার শব্দের সেই ভয়ানক খেলা মেতে ঠেছে। বুম্ বুম্ শব্দ করে বাতাস ফাটে, গুর্ গুর্ করে বাতাস কাঁপে, াবার বাঁশি বাজিয়ে শিউরে ওঠে বাতাস।

চমকে ওঠে দাশু, যেন দাশুর জীবনের একটা অবসাদের ঘুম হঠাৎ ভয় পয়ে ভেঙে গিয়েছে। এইবার মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পায় দাশু, না, পালিয়ে ায় নি মুরলী। যদিও দরজা খোলা, দাশুর হাতে টাঙ্গিও নেই। নেশার ুমের চেয়েও বেশি নিরেট একটা অবসাদের ঘোরে দাশুর চোখের পাতাগুলি নতিয়ে পড়েছিল।

মাটির উপর নখের দাগ আঁকছে মুরলী। হিসেব করছে মুরলী। মুরলীর ান্ত চোখের তারা দুটো যেন নিজের আলোর অহংকারে চিকচিক করছে। ুরলীর ওই হেঁট মাথা কি মরদের টাঙ্গির ভয়ে ভীরু হয়ে যাওয়া কোন ারীর মাথা ?

না, ভয় পায় নি মুরলী ; ওর জীবনের স্বপ্ন একটুও ভীরুও হয়ে যায় নি। ই ঘরকে ঘৃণা করে, এই ঘরের ছোঁয়াচ থেকে আলগা হয়ে, গুটিশুটি হয়ে সে আছে মুরলী। নিশ্চয় হিসেব করে দেখেছে, চলে যাবার সুযোগ কি আবার াওয়া যাবে না ?

একবার একটা আমগাছের মাথায় জাল পেতে একটা কোকিল ধরেছিল াশু। ঘরের মধ্যেই কানের কাছে যখন-তখন কোকিলের ডাক শুনতে পাওয়া াবে ; অনেক আশা করে, অনেক হেসে কোকিলটাকে একটা বাঁশের খাঁচায় ন্ধ করে ঘরের ভিতরে রেখেছিল। কিন্তু ডাকেনি কোকিলটা। একবারও া। খাঁচায় বন্ধ হওয়ামাত্র যেন প্রতিজ্ঞা করে ডাক বন্ধ করে দিয়েছিল চতুর াখিটা। শেষে, কোকিলটাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আজও মনে পড়ে দাশুর, ই ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে দেখতে আর শুনতে পেয়েছিল দাশু, খাঁচা থকে বের হয়েই কোকিলটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে পথের ধারে ওই নিমের ালে বসল আর ডেকে উঠল, কু-কু-কু। মনের সুখে যেন পাগল হয়ে ডেকে ডকে আর দাশুকে ঠাট্টা করে তারপর উধাও হয়ে গেল পাখিটা।

মুরলীর প্রাণও ঠিক সেই কোকিলটারই মত চালাক। খাঁচায় বন্ধ হয়েছে ুরলীর প্রাণ। হাসবে না, নাচবে না, গাইবে না মুরলী। দাশু ঘরামির সব াশা আর কল্পনাকে জব্দ করে দেবে। একদিন, যেদিন ছাড়া পাবে মুরলী, ড়ে দিতে বাধ্য হবে দাশু, সেদিন আনন্দেরই ডাক ডেকে হাসতে হাসতে ল যাবে। নেই, এই ঘরের মধ্যে পড়ে থাকলেও মুরলী আর নেই। এভাবে ঙ্গির ভয়ে পড়ে থাকা যে মরে থাকার মতই না-থাকা।

মুরলীর চোখদুটো হাসছে। চমকে ওঠে দাশু। মাথা তুলেছে মুরলী, খ ঘুরিয়ে দাশুর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়েছে। দাশুর টাঙ্গির য়েও বেশি শাণিত আর প্রখর, মুরলীর যেই হিসেব করা ভাবনাগুলি যেন সে উঠেছে।

মুরলী বলে—টাঙ্গি হাতে নিয়ে তেড়ে এলে, কিন্তু মারলে না কেন ?

দাশু বিড়বিড় করে—আর একবার চলে যেতে চেষ্টা করে দেখ না কেন, মারি কি না।

মুরলী—মারলে মরবে কে ?

দাশু—মরবে মহেশ রাখালের বেটি, খিরিস্তানী হবার সাধ হয়েছে যে কিষাণী মাগির।

মুরলী—তোমার ছেইলাটা মরবে না ?

দাশুর বুকের হাড়ের উপর যেন টাঙ্গির কোপ পড়েছে। চোখ দুটো কেঁপে ওঠে।

মুরলীর কটমট করে তাকানো সেই চোখের মধ্যে একটা চতুর ধিক্কারের হাসিও জ্বলতে থাকে! মুরলী বলে—মহেশ রাখালের বেটি যদি একটা শিকড়-বাকড় খেয়ে পেট খালি করে দেয় ; তবে…।

—থাম থাম, কিষাণের মাগ হয়ে ডাইনির মত কথা আর বলিস না বুকফাটা একটা আর্তনাদ কোনমতে চেপে রেখে, আর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় দাশু। এমন ভয় জীবনে কোনদিন পায় নি দাশু। মুরলীর চোখের মধ্যে সত্যিই শাণিত টাঙ্গির ছায়া দেখতে পেয়েছে দাশু। দাশুর জীবনের সবচেয়ে মিষ্টি লোভটা, দাশুর ছেইলার প্রাণটা যে এই মুরলীর দয়ার কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছে।

বলতে বলতে আবার ঘরের মেঝের মাটির উপর অলসভাবে বসে পড়ে দাশু পাথুরে ছাঁদে গড়া এত শক্ত শরীরের সব হাড়ের গিঁটগুলি যেন খুলে ভেঙে ঢিলে হয়ে গিয়েছে। আনমনার মত হাত তুলে কি-যেন খোঁজে দাশু। বোধহয় একটা গামছাকে হাতের কাছে পেতে চায়। তারপর শিথিল হাতটা তুলে আস্তে আস্তে চোখ মোছে।

আস্তে আস্তে দাশুর কাছে এগিয়ে আসে মুরলী। দাশুর মুখের দিকে কটকটে চোখের একটা নতুন অস্থিরতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে, অনেকক্ষণ মুরলীর চোখে যেন হঠাৎ একটা ভয়ানক কাঁটার খোঁচা লেগেছে। জ্বলছে চোখ কিন্তু জ্বালাটা যেন ভীরু হয়ে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে।

দাশুর মাথার উপর হাত রাখে মুরলী : কি হলো ?

উত্তর দেয় না দাশু। দাশুর মাথার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে মুরলীর হাতটাও কাঁপতে থাকে : তুমি কাঁদলে কেন বল ?

কথা বলে না, বোধহয় বলারই শক্তি নেই, কিংবা সাহস নেই দাশুর মহেশ রাখালের মেয়ে মুরলীকে জীবনে কোনদিন এত ভয় করে নি দাশু নইলে মুরলীর হাতের ছোঁয়া মাথার উপর আদর বুলিয়ে দিলেও দাশুর গায়ের পেশীতে একটা শিহরও কি না কেঁপে থাকতে পারে ?

দেখতে পায় না দাশু, মহেশ রাখালের সেই মেয়ে একটা হাত তুলে আস্তে আস্তে নিজেরই কটমটে চোখ দুটোকে কেমন করে মুছছে। মুরলী ডাকে—আমার কথাটা শুনছো কি ?

দাশু—কি ?

মুরলী—কোন কিষাণের ঘরে কি জোয়ান মেয়ে নাই ?

দাশু—থাকবে না কেন ? অনেক আছে।

মুরলী—তবে তোমার ভাবনা কিসের ?

দাশু—কি বলছিস তুই ?

মুরলী—তুমি তো আবার একটা বিয়া করতে পার, ছেইলাও পেতে পার।

দাশু ভ্রূকুটি করে তাকায়। মুরলীও সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—মুরলী মরে যাক না কেন, তোমার ভাবনা কিসের ? কত কিষাণের মেয়ে তোমার হাতের সিঁদুর মাথায় নিবে, খুশি হয়ে তোমাকে ছেইলা দিবে।

দাশু বলে—না।

মুরলী—কেন না ?

দাশু—জানি না। আমি তোর মত হিসাব জানি না।

কিন্তু জানতেই হবে, শুনতেই হবে। মুরলী বলে—বলতেই হবে। আমি আজ জবাব নিয়ে ছাড়বো। যেন দুর্বার একটা জিদ মুরলীর মনের ভিতর কঠোর হয়ে চেপে বসেছে।

হিসাব করতে জানে না যে মাথাটা, দাশু তার সেই মাথা দু হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে। কেন কিসের জন্য কি পেতে চায়, ঠিক বুঝতে পারে না দাশুর যে বুকটা, সেই বুকের উপর একবার হাত বুলোয় দাশু। যা বলতে চায় তা ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারে না দাশুর যে মুখটা, হাত তুলে সেই মুখ একবার মুছে নেয় দাশু। তারপর ঘরের দরজার দাওয়াও উপর বিকালের ছড়ানো আলোর দিকে তাকিয়ে আনমনার মত বিড়বিড় করে : তুই রাগ করলে আমার যে বাঁচতে সাধ হয় না। কথাটা বুঝিস না কেন ?

সরে যায় মুরলী। কিন্তু দাশুরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় মুরলীর হিসেব করে চলা ভাবনার আর বুদ্ধির সব জোর হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

ঘরের ভিতর ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে থাকে মুরলী। কান দুটো যেন দাশুর মাদলের বোল শুনতে পেয়েছে, তাই দু পায়ে নাচের নেশা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বার বার চুমুক দিয়ে হাঁড়িয়ার নেশা বুকের ভিতর ভরে নিতে ইচ্ছে করে। ভিজে গিয়েছে ঠোঁট দুটো। হবে, খুব হবে। এই মানুষটার শুধু কোমর ধরে সারা জীবন এই ঘরের ভিতর পড়ে থাকলেও সুখ হবে, অনেক সুখ।

বিছানাটাকে একটা টান দিয়ে গুটিয়ে পাকিয়ে এক দিকে সরিয়ে দেয় মুরলী। সেলাইয়ের কলটাকে চোখে পড়ে। একটুকরো চট দিয়ে কলটাকে বোঁচকার মত বেঁধে ঘরের এক কোণে রেখে দেয়। তার পর নিজের চেহারাটার দিকেও চোখ পড়ে। সত্যিই, একটা নতুন নেশার সুখে মত্ত হয়ে শাড়ি জামা আর সায়া দিয়ে তৈরী করা এই সাজটাকেও সরিয়ে দিতে চায় মুরলী।

ঘরেরর দরজার কাছে তেমনই নীরব নিরেট অলস আনমনা চেহারা নিয়ে বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে দাশু। যখন বিকালের আলো মরে আসে, আর ঘরের চালার উপর ক্লান্ত পাখির মেলা বসে যায়, তখন দাশু ঘরামির

সুন্দর চোখ দুটি যেন ধোঁয়া লেগে কটকট করে ওঠে।

সত্যিই ধোঁয়া। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। রেড়ির তেলের বাতিটা জ্বলছে। ঘরের কোণে উনানের ভিতরে শুকনো বাঁশপাতার আগুন জ্বলছে। রান্না করছে মুরলী। ভাতের হাঁড়িতে টগবগ করে জল ফুটছে।

আর মুরলীর চেহারাটা একেবারে কিষাণী হয়ে গিয়েছে। খাটো শাড়ি দিয়ে জড়ানো মহেশ রাখালের মেয়ে সরু কোমরের উপর ছোট আঁচলের ঝালর ঢলে পড়েছে। হাত চালিয়ে কাজ করছে মুরলী। মুরলীর আদুড় গায়ের নরম-নরম গড়নগুলি দুলছে কাঁপছে দুমড়ে যাচ্ছে।

একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দাশু। যেন এতক্ষণে পাঁচ বছর আগের একটা আনন্দের জীবন্ত মাদলকে চোখে দেখতে পেয়েছে। মুরলীকে শক্ত করে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর তুলে নেয় দাশু।

—মুরলী, তুই আমার মুরলী। তুই কোথায় যেতে চাস বল্? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

মুরলী মুখ টিপে হাসে—তুমি যেথা নিয়ে যাবে।

দাশু—আজ কোথাও যাব না।

মুরলী—যেও না।

দাশু—কাল যাব।

মুরলী—যেও।

দাশু—কিষাণ আর কিষাণীতে মিলে একসাথে যাব, কেমন?

মুরলী—হ্যাঁ।

দাশু—ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নিব।

মুরলী—নিও।

দাশু—তিন বিঘা জমি নিয়ে ভাগজোত করবো।

মুরলী—করো।

বুকে জড়ানো মুরলীকে আদরের চাপে যেন পিষে দিয়ে দোলাতে থাকে দাশু। ডরানির স্রোতের মত কলকল করে মুরলীর বুকের ভিতর থেকেও একটা উতলা খুশির হাসি উথলে পড়তে থাকে। মধুকুপির কিষাণ ও কিষাণীর জীবনের ঝুমুর এতক্ষণে সব অভিশাপের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে নেচে উঠতে পেরেছে।

মুরলীর দু'হাত ধরে হেসে হেসে আর দুলে দুলে সুর করে ছড়া গেয়ে ওঠে দাশু—তু যাস কুথাকে, হেই কিষাণী।

মুরলী চোখ টিপে হাসে—নাইহর যাব, ডহর জানি।

দাশু—কিসের এত গমর হয়।

মুরলী—উমর কমর বুড়া নয়।

দাশু—কিষাণী তুর চিকণ চুল।

মুরলী—কে দিবেক ঝিঙ্গা ফুল।

দাশু—মোর ঘর যাবি কি?

মুরলী—মন দিব লিবি কি ?
দাশু—ছল মন লিব না।
মুরলী—যৈবন দিব না।
চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—কি বললি ?
দাশুর মুখ একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে মুরলী বলে—চুপ কর।

ভোর হয়েছে। চালার ফুটো-ফাটল দিয়ে মধুকুপির আকাশের চোখ দাশু বরামির ঘরের ভিতর হেসে হেসে উঁকি দেয়। ঘুম ভেঙেছে দাশুর, আর মুরলীর ঘুমন্ত শরীর তখনও ছোট মাদলটার মত দাশুর দু হাতের শক্ত বাঁধনে বাঁধা হয়ে দাশুর বুকের সঙ্গে সেঁটে আছে।

দাশু ডাকে—শুনছিস ।

ভাঙা ভাঙা ঘুমের মধ্যে ফিসফিস করে মুরলী—হ্যাঁ, শুনছি।

দাশু—তবে ওঠ না কেন ?

মুবলী—না।

দাশু—ভুলে যাস কেন ?

মুরলী—কি ?

দাশু—রাতের বেলা কত কথা হলো, মনে নাই ?

রাতের বেলার কথা ? কি কথা ? না, মুরলী মনে করতে পাছে না। শুধু মনে পড়ে হাঁড়িতে মহুয়ার জল ছিল না, তবু দুজনে মিলে, মধুকুপির কিষাণ আর কিষাণী সেজে একসঙ্গে বসে এক থালাতে ফেনভাত খেয়ে আর হেসে হেসে যেন একটা মিথ্যা নেশার আবেশে বিভোর হয়ে মিছিমিছি অনেক গল্প করেছিল।

দাশু বলে—ভুলে গেলি কেন, এখন একবার ঈশান মোক্তারের কুঠিতে যেতে হবে ?

মনে পড়ে মুরলীর। আর মনে পড়া মাত্র ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। ঠিক কথা, রাতের বেলা দাশু কথাটা বলেছিল বটে। অন্তত বিঘা তিনেক জমি ভাগজোত করবার জন্য ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নিতে হবে।

মুরলী বলে—যাও না কেন ?

আশ্চর্য হয় দাশু: আমি তো যাবই ; কিন্তু তুই কি যাবি না ?

মুরলী—না।

দাশু—তুই যে বললি, যাবি।

মুরলী—বলেছিলাম ; কিন্তু আমি যেতে পারবো না।

দাশু—কেন ? তুই আবার কি ভাবলি ?

মুরলী—আমি যাব না।

দাশু—কেন ?

মুরলী—লাজ লাগে।

দাশু—আমার সাথে যাবি, তাতে লাজ কিসের ?

মুরলীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকা দাশুর হাত দুটোকেই হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে চমকে দেয় মুরলী।—ছাড়।

হাতের বাঁধন আলগা করে দিয়ে মুরলীকে ছেড়ে দেয় দাশু। মুরলী আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ঘরের মেঝেয় মাটির উপর চুপ করে বসে থাকে। নিজের চেহারার দিকে শুধু নয়, যেন নিজের জীবনের দিকে আবার চোখ পড়েছে মুরলীর। মুরলীর ঘুম ভাঙা চোখ দুটো এই খাটো শাড়ি ও আদুড় গায়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে।

—কি হলো ? বেশ একটু শক্ত স্বরে, দাঁত চিবিয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

মুরলী বলে—আমি যাব না।

মুরলীর গলার স্বরে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক। ভয় পেয়েছে মুরলী। মধুকুপির মাটির কাঁকর ধুলো আর কাঁটার মধ্যে জীবনটাকে সঁপে দিতে হবে, ভাবতেই যে মুরলীর বুকটা কেঁপে উঠেছে। অসম্ভব। সারা মধুকুপির মানুষ এই পাঁচ বছর ধরে মুরলীর নতুন চেহারা দেখেছে, আর হিংসেয় জ্বলছে। তবে আবার কেন ? মধুকুপির কিষাণ আর কিষাণীগুলির চোখে-মুখে ঠাট্টার সুখ জাগিয়ে দেবার জন্য নিজেকে ছোট করে দিতে পারবে না মুরলী। সিস্টার দিদির এত উপকারের অপমান করতে পারবে না। কেন, কিসের দুঃখ, কার ভয়ে কিষাণী হয়ে যেতে হবে ?

দাশু বলে—তুই যাবি, যেতে হবে।

মুরলী—না, আমি তোমার কামিন নই।

দাশু উঠে দাঁড়ায় ঃ আবার সেই কথা !

মুরলী—আমি কিষাণী হতে পারবো না।

দাশু—কিষাণের মাগ তুই কিষাণী হবি না তো কি হবি ?

উত্তর দেয় না মুরলী। মুরলীর আরও কাছে এগিয়ে এসে চাপা গর্জনের মত স্বরে প্রশ্ন করে দাশু—কার মাগ হতে তোর সাধ হয়েছে রে ?

উত্তর দেয় না মুরলী। একটা হাত এগিয়ে দিয়ে মুরলীর হাত ধরবার চেষ্টা করে দাশু ঃ চল্।

হাত দুটো গুটিয়ে পেটের কাছে লুকিয়ে মুরলীও শক্ত হয়ে একটা কঠোর অবাধ্যতার গর্বে অনড় হয়ে বলে—না।

দাশু—আমি তোর ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যাব।

দাশুর চাষাড়ে আক্রোশ হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে মুরলীর একটা হাত ধরবার জন্য মুরলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু পিছন থেকে জামকাঠের কপাটটা যেন প্রচণ্ড টিটকারি দিয়ে বেজে ওঠে। কপাটের উপর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ভোঁতা ভোঁতা ভারি শব্দ।

দাশু ঘরামির কান চমকে ওঠে। তারপর শরীরটাই স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয় দাশু।

—এই যে, মাল যে ঘরের ভিতরেই আছে দেখছি।

কী কুৎসিত উল্লাসের স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একটা লোক! পিতল বাঁধানো মোটা ও বেঁটে একটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। এই লোককে জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না দাশু। খাকি গরম কোট গায়ে, খাকি পা-জামা পরা। রুমাল দিয়ে মাথাটা এক পাক বাঁধা। লোকটার গরম কোটের বুকের কাছে পকেটের মধ্যে ছোট একটা বই আর পেন্সিল। লোকটার ঠোঁটের উপর মোটা মোটা একজোড়া গোঁফ নেতিয়ে রয়েছে।

এই লোকটারই পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চিনতে পারে দাশু। রামাই দিগোয়ার; নীল উর্দি গায়ে, কোমরে চামড়ার পেটি, হাতে চকচকে টাঙ্গি। এই রামাই দিগোয়ার বাবুরবাজার ফাঁড়ির চৌকিদার।

রামাই দিগোয়ার ডাকে—চলে এসো দাশু।

সঙ্গী রামাই দিগোয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে খাকি উর্দির লোকটা মাথা দোলায় আর বিড়বিড় করে—আমার আর সন্দেহ নাই, রামাই; এ বেটা গুপীর দলের একটা পাপী বটে; না হলে শালার চোখ দুটো এত ডাঁট করে তাকায় কেন?

দাশু—কেন? কোথায় যাব? আমাকে আবার মিছা কেন ডাকছো, রামাই?

রামাই মিচকে হাসি হেসে গোঁপালো লোকটাকে দেখিয়ে দেয়।—চৌধুরীজীকে শুধাও।

লোকটা বলে—আমি গোবিন্দপুর থানার পুলিস মুন্সী।

দাশু ফ্যালফ্যাল করে পুলিস মুন্সী চৌধুরীজীর কঠোর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। চৌধুরীজী তার হাতের পিতল বাঁধানো লাঠির গায়ে হাত ঘষে চেঁচিয়ে ওঠে।—এ শালা খুব শক্ত মাল বটে রামাই। দেখছিস না, শালা একটা সেলামও করছে না।

দাশুর হাত কাঁপে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেও বুঝতে পারে, মুরলী এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। দাশুর হাতের কাঁপুনি যেন হঠাৎ হিংস্র হয়ে আবার টাঙ্গি খুঁজে নিতে না পারে; তাই বোধহয় পিছনে এসে পথ আটক করেছে মুরলী। বেশ তাই হোক্।

রামাই দিগোয়ার বলে—আজ তিনদিন হলো তুমি ছাড়া পেয়েছ। কিন্তু থানাতে হাজিরা দিতে যাও নাই। কোথায় ছিলে তুমি?

দাশু—ঘরে ছিলাম।

রামাই হাসে—বেশ তো, চল এবার; থানাতে গিয়ে এই কথাটি বলে এসো।

গর্জন করে চৌধুরীজী—মিথ্যুক চোট্টা! এই দুই দিন গাঁয়ের একটা লোকও তোমাকে দেখে নাই। সারা গাঁ ঘুরে আমি রিপোর্ট নিয়েছি।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। দাশু ঘরামির এই তপ্ত মাথাটাও স্মরণ করতে পারে, এই দুটি রাত আর একটি দিন, সারাক্ষণ মহেশ রাখালের সুন্দর-মুখ মেয়ের সোহাগ ভিক্ষে করতে করতেই পার হয়ে গিয়েছে। ঘর থেকে বের হয়ে গাঁয়ের কোন মানুষের সঙ্গে সুখদুঃখের একটা কথাও বলে নি দাশু।

—চল। পিতল বাঁধানো লাঠিটাকে দরজার কপাটে ঠুকে হাঁক দেয় পুলিস

মুন্সী চৌধুরীজী।

—চলেন। কথাটা বলেই ছোট্ট আর্তনাদের মত তীক্ষ্ণ ও করুণ একটা শব্দ আছড়ে দিয়ে দরজার চৌকাঠ থেকে একটা লাফ দিয়ে দাওয়ার উপর নেমে পড়ে দাশু।

—যেতে হবে না, যদি দশটা টাকা দাও। লাঠির মাথাটাকে শুঁকে শুঁকে কথা বলে চৌধুরীজী।

—না, দিব না। জবাব দেয় দাশু।

—তবে চল। চেঁচিয়ে হাঁক দেয় চৌধুরীজী।

আগে আগে পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী, মাঝখানে দাশু, পিছনে রামাই দিগোয়ার। মধুকুপির সকালবেলার রোদ গায়ে মেখে ছোট একটা অদৃষ্টের মিছিল সড়কের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যেতেথাকে। রামাই দিগোয়ারের টাঙ্গিতে টাটকা রোদের হাসি চিকচিক করে। আর দাশুর গায়ের নতুন গেঞ্জিতে সিঁদুরের ছোপগুলি ছোট ছোট শুকনো রক্তের ছোপের মত সকালের রোদে পুড়তে পুড়তে চলে যায়।

দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মুরলী। শুকনো খটখটে চোখ। মুরলীর সে চোখে শুধু ধোঁয়া আছে, জল নেই। যেন স্মৃতি হারিয়েছে মুরলী। কে চলে গেল, কেন চলে গেল, যেন বুঝতেই পারছে না মুরলী।

দরজার চৌকাঠ থেকে একটা দৌড় দিয়ে ছুটে গিয়ে সড়কের পাশে নিমের ছায়ার কাছে উঁচু পাথরের টিলার উপর দাঁড়ায় মুরলী। এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তিনটে মানুষের মিছিল হন হন করে হেঁটে ডরানির ছোট পুলের দিকে এগিয়ে চলেছে। দাশুকে দেখবার জন্য গাঁয়ের ছেলেমেয়ে আর মাগি-মরদ ছুটে এসে পথের পাশে ভিড় করেছে।

টিলার উপর দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে মুরলী। না আর দেখা যায় না। পথের বাঁকে ওরা ঘুরে গিয়েছে। ছি ছি, লোকটা যে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালও না। পাঁচ বছর আগে গ্রেপ্তার হয়ে চলে যেতে যেতে ওই লোকটাই তো ছলছল চোখ নিয়ে মুখ ফিরিয়ে মুরলীর দিকে বার বার তাকিয়েছিল।

যাবে আর কোথায়? ছাড়া পেয়েই তো আবার ছুটে আসবে। মহেশ রাখালের বেটি মুরলীকে না জ্বালাতে পারলে মানুষটা যে মরেই যাবে।

ধোঁয়াটে চোখের জ্বালা হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে মুরলী। সামনের ঐ সড়কের আঁকা-বাঁকা চেহারার দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছা করে না। তাকালেই চোখে জ্বালা লাগে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পুব দিকের ফাঁকা পথের ছায়া-ছড়ানো শান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ও কে বটে গো? কে আসছে? চমকে ওঠে মুরলী।

আস্তে আস্তে হেঁটে, বন্দুকটাকে কাঁধের উপর রেখে, দুলতে দুলতে সকালবেলার ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মুখের ফুরফুরে হাসি একেবারে মিশিয়ে দিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে পলুস হালদার।

এদিকেই যদি আসছে তবে ওখানে পথের উপর ওভাবে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো

কেন পলুস হালদার ? চুপ করে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেই বা কি ? হ্যাঁ, জীয়লে ফুল ধরেছে। কিন্তু শিকারীর চোখ কি গাছের ফুলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ? তাই কি দেখতে পেল না যে, মুরলী এখানে দাঁড়িয়ে আছে ?

মুরলীর মনের ভিতরে যেন একটা অভিমান হতাশ হয়ে যায়। ভুল হয়েছে। পলুস হালদারকে একটুও বুঝতে আর চিনতে পারে নি মুরলী। রাত জেগে মাচানে বসে থাকা একটা ক্লান্ত শিকারীর দু চোখের নকল পিপাসাকে একেবারে একটা খাঁটি প্রাণের ডাক বলে মনে করে মুরলী বৃথা নিজের বুকটাকে একটা মিথ্যা গর্বে ভরে দিয়েছিল। শুধু এক ঘটি জল খেয়ে খুশি হবার জন্য এসেছিল পলুস হালদার। তার চেয়ে বেশি কোন আশা পলুস হালদারের চোখে ছিল না।

পাথুরে টিলার উপর একটা পাথুরে ছবির মত শক্ত হয়ে বোধহয় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত মুরলী, যদি মুরলীর স্তব্ধ শরীরটাই হঠাৎ সির-সির করে না উঠত। মুরলীর হাঁটুর কাছে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি সুড়সুড় করে উঠছে। একটা ফড়িং, বেশ সুন্দর দেখতে একটা রঙিন চেহারার ফড়িং মুরলীর হাঁটুর উপর বসে পাখনা কাঁপিয়ে ফর্‌ফর্‌ করছে।

চমকে ওঠে মুরলী। ফড়িংটার দোষ কি ? মুরলীর খাটো শাড়িতে যে মুরলীর হাটুও ঢাকা পড়ে নি। একেবারে খাঁটি একটা পাতা-কুড়ুনি আর আগাছা-বাছুনি কিষাণীর মত মুরলীর চেহারাটা যে আধ-উলঙ্গতায় বেলাজ হয়ে রয়েছে। ছি ছি ছি ! মুরলীর এই চেহারা চোখে পড়লে পলুস হালদারের চোখ ভয় পেয়ে শিউরে উঠবে। পলুস হালদার যে কোন দুঃস্বপ্নে সন্দেহও করতে পারবে না, গড বাবার মেয়েটির মত দেখতে সেই সুন্দর সাজে সাজানো মুরলীর আবার এরকম একটা জংলা চেহারা থাকতে পারে।

ভালই হয়েছে। মুরলীকে চোখে পড়ে নি, কিংবা চোখে পড়লেও মুরলী বলে বুঝতে পারে নি পলুস হালদার। হাতের এক ঝাপটে রঙিন ফড়িংটাকে খেদিয়ে দেয় মুরলী। খাটো শাড়িতে জড়ানো আদুড় শরীরটাকে কুঁকড়ে আরও ছোট করে একেবারে লুকিয়ে ফেলবার জন্য বসে পড়ে। তার পরেই টিলা থেকে নেমে পড়ে। দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পার হয়ে হায়। চুলের উপর চিরুণি চালিয়ে নতুন করে খোঁপা বাঁধে মুরলী। শাড়ি সায়া জামা পরে। চটি জোড়াও পায়ে দিতে ভুলে যায় না। মুরলীর যে-চেহারা দেখে পলুস হালদারের চোখে সেই আশার পিপাসা আবার চমকে উঠবে, সেই চেহারা একেবারে নিখুঁত করে নিয়ে বন্ধ দরজার কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। আসবে পলুস হালদার, এই দিকেই আসবে, এই ঘরের এই দরজার কপাটের কাছে এসে পলুস হালদারের জুতোর শব্দ থমকে যাবে।

কিন্তু কই ? আসছে না কেন পলুস হালদার ? জীয়লের ফুলের দিকে তক্ষণ ধরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার কি দরকার আছে ? এখনও কি মানুষটার তেষ্টা পায় নি ?

পলুস হালদারের উপর সন্দেহ করে আবার একটা অভিমান মুরলীর নিঃশ্বাস কাঁপিয়ে দিত নিশ্চয়, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে মুরলীর, মনে পড়তেই মুরলীর চোখে-মুখে একটা আমুদে হাসির আভা চমকে ওঠে। মনে পড়েছে, অনুমান করতে পারছে মুরলী, শিকারীর চোখ একটা শিকার দেখতে পেয়েছে, তাই জীয়ল গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে আর শক্ত হাতে বন্দুকটাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আসতে দেরি করছে।

ওই জীয়লের মাথার উপরে পাতার ঝোপের আড়ালে দুটো মোটা মোটা ডালের চিপার মধ্যে কাদা দিয়ে লেপা ছোট্ট একটা বাসা আছে। আজ প্রায় দশদিন হল, ডিম মজাবার জন্য বাসার ভিতরে নিজেকে বন্ধ করেছে পাখিটা, একটা ধনেশী। ধনেশটা বাসার বাইরে বাসাটারই প্রায় গা ঘেঁষে বসে থাকে আর পাহারা দেয়। মাঝে মাঝে উড়ে যায় ধনেশটা, আর ঠোঁট ভরে ফড়িং নিয়ে এসে কাদালেপা বাসার ছোট ফুটোর ভেতর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে ধনেশীকে খাওয়ায়। মনে পড়ে মুরলীর, কদিন আগে একটা বেদিয়া এসে ঐ বাসা ভেঙে ধনেশীটাকে ধরবার জন্য গাছে উঠেছিল। কোথা থেকে লাঠি হাতে নিয়ে গালি দিতে দিতে তেড়ে এল পল্টনী দিদি—ভাগ এখান থেকে খালভরা চোরের পুত, ড্যাকরা।

পল্টনী দিদির রাগ দেখে আর বেদিয়াটার ভয় দেখে হেসে ফেলেছিল মুরলী। বেদিয়াটা কাঁচুমাচু হয়ে মুরলীর কাছেই আবেদন করেছিল—তু বল তো দিদি, আমার কসুরটা কি? ধনেশীটাকে তেল করে বাতের ওষুধ বানিয়ে তুদিগেরই কাছে বেচে যাব, তুদিগেরই ভালাই হবে।

পল্টনী দিদি আবার তেড়ে আসে: ভাগবি কিনা রে কসবির বেটা, নয় তো আজ তোকেই আগুনে চড়িয়ে তেল করে নিব।

দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল বেদিয়াটা।

বন্ধ দরজার কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে মুরলীর মুখে এখন সেদিনের হাসিটা নতুন করে যেন আরও আমুদে আবেগে চঞ্চল হয়ে কাঁপতে থাকে। নিজের হাসির শব্দ শোনে মুরলী, তার পরেই অন্য একটা শব্দ শোনে, বন্দুকের গুলির আওয়াজ। নিশ্চয় সেই বেহায়া মাদি-কাতুরে ধনেশটা, যেটা কাদালেপা বাসার গা ঘেঁষে বসে থাকে আর বাসা পাহারা দেয়, সেই ধনেশটাকে মেরেছে পলুস হালদার।

কপাট খুলে, দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়ায় মুরলী। এইবার, এই দিকে না এসে আর কোন্ দিকে যাবে পলুস হালদার?

মুরলীর অনুমান মিথ্যে নয়। ভাবতে ভুল করে নি মুরলী। হ্যাঁ, এদিকেই আসছে, এসে পড়েছে পলুস হালদার। পলুস হালদারের হাতে মরা ধনেশটা ঝুলছে। পাখিটার পা দুটোকে যেন খিমচে ধরে রয়েছে পলুস হালদার। পাখিটার প্রকাণ্ড চওড়া ঠোঁট আর অসাড় মাথাটা প্রায় সড়কেয় ধুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলছে।

—কেমন আছ সরদারিন? বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এসে আর দাওয়ায়

উপরে উঠে মুরলীর প্রায় পায়েরই কাছে রঙীন একটা উপহারের মত রক্তমাখা পাখিটাকে ফেলে দিয়ে হাসতে থাকে পলুস হালদার

—জল খাবেন কি ? না, দরকার নাই ? হাসতে হাসতে মুরলীও প্রশ্ন করে।

—খাব। জবাব দেয় পলুস।

একটি ঘটি জল নিয়ে আসে মুরলী। পলুস হালদার সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে হাঁফ ছাড়েঃ আমি এতটা ভাবি নাই সরদারিন।

—কি ?

—আমি চাই নাই, কিছু বলিও নাই, তবুও তুমি বুঝে ফেলেছো।

—যা বলেন, মুখ খুলে বলেন না কেন ?

—আমার পিয়াস তুমি বুঝতে পার।

—কিন্তু আপনি তো কিছু বুঝেন না।

—কি বুঝি না ?

—আপনার এখানে আসা ভাল নয়, আর আমার হাতের জল খেয়েও আপনার কোন লাভ হবে না।

—তুমি জল দিলে, আমি জল খেলাম। লাভ নেই বলছো কেন মুরলী ?

মুরলীর চোখের তারা চমকে ওঠেঃ আমার নাম জানলেন কিসে ?

পলুস হালদার হাসেঃ জেনেছি।

মুরলী ভ্রুকুটি করেঃ নাম ধরছেন কেন ?

পলুস—ইচ্ছা হলো।

—এমন ইচ্ছা ভাল নয়।

—জানি।

মুরলী চেঁচিয়ে ওঠেঃ জেনেও বুঝি আমাকে জ্বালাবে তুমি ?

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় মুরলী। মুরলীর চোখ যেন একটা তীব্র অভিমান, একটা সন্দেহ, একটা উদ্বেগ। কিন্তু মুরলীর সেই উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে পলুস হালদারের চোখের সব আশার উদ্বেগ একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে। মুরলীর রাগের ভাষাটা যে এরই মধ্যে পলুসকে ডাক দিয়ে আপন করে নিয়েছে।

পলুস ডাকে—মুরলী।

মুরলী বলে—না।

পলুস—কিসের না ?

মুরলী—আমাকে জ্বালাবে কেন তুমি ? কেন পিয়াস ঠাণ্ডা করতে এখানে আসবে তুমি ? তোমাকে জল দিবার মানুষ নাই ?

পলুস—নাই।

—কেন ? ঘরণী গেল কোথায় ?

—বেঁচে আছে, কিন্তু ঘরে নাই।

—কেন ?

—ঘরে এলো না। অনেক ডেকেছিলাম, তবুও না।

—এলো না কেন ?

—আমি খিরিস্তান হলাম, সে খিরিস্তান হলো না। অনেক সেধেছিলাম, তবু সে খিরিস্তান হতে রাজি হলো না।

—সে এখন আছে কোথায় ?

—আমার ঘর ছিল যে গাঁয়ে, সেই কুলডিহাতে আছে।

—কোন্ সুখে আছে ?

—সে খুব ভাল সুখে আছে। বড়পাহাড়ির পূজা করে, আর আমার মরণ মানত করে।

—ছি, ছি। হালদারিন কি পাগল হয়েছে ?

অস্ফুট স্বরে একটা আক্ষেপ করে পলুস হালদারের মুখের দিকে অপলক চোখের একটা সমবেদনাতুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে মুরলী। পলুস হালদারের জীবনে বেদনা আছে; কি আশ্চর্য, সে বেদনা যে হুবহু মুরলীর জীবনেরই বেদনার মত। আর অভিযোগ নয়, উদ্বেগও নয়, মুরলীর দুই চোখে যেন দুর্বার এক সান্ত্বনার আবেগ ঝকঝক করে।

পলুস বলে—ওর কথা আর ভাবি না, ওকে আমি ঘিন্না করি।

মুরলী—হালদারিনের সাথে দেখা হয় কি ?

—এই বছরে আর দেখা হয় নাই।

মুরলী মুখ টিপে হাসে: গত বছরে ?

পলুস—হ্যাঁ।

মুরলী—কেন ? কেমন করে দেখা হলো ? সে এসেছিল, না, তুমি গিয়েছিলে ?

পলুস—আমি গিয়েছিলাম।

মুরলী আবার হাসে: তাই বল। হালদারিনকে ভুলতে পার নাই ?

পলুস অপ্রস্তুত হয়ে বলে—তখনো ভুলি নাই।

মুরলী—তারপর ভুললে কেন ?

পলুস—শুনতে চাও ?

মুরলী সন্দিগ্ধ হয়ে, আর এতক্ষণের ঠাট্টার তরল হাসি একেবারে স্তব্ধ করে দিয়ে বলে—শুনবো।

পলুস—পিয়াস লেগেছিল, এক ঘটি জল চেয়েছিলাম। কিন্তু সে তবু আমাকে জল দেয় নাই।

মুরলীর চোখ দুটো বোধহয় ছলছল করে উঠবে; পলুসের জীবনের পিয়াসের মধ্যে এত বেদনা আছে কল্পনাও করতে পারে নি মুরলী।

পলুস বলে—বুঝলে তো মুরলী; কেন আমার পিয়াস লাগে ?

মুরলী—বুঝেছি।

পলুস—তবে ?

মুরলী—বল, আমি কি করতে পারি ?

পলুস—যখন এতই বুঝেছ, তখন আরও একটু বুঝে নাও।

মুরলীর বুক দুরদুর করে, দুই হাঁটুর জোড় যেন খুলে যাচ্ছে, টলমল করে এখনি দাওয়ার উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে শরীরটা।

পলুস বলে—বল মুরলী।

দরজার কপাট শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। তারপর, যেন জোর করে একটা ঢোঁক গিলে সেই সঙ্গে এই মুহূর্তের সব দুর্বলতা গিলে ফেলতে চেষ্টা করে। না, কখনই না, আর কিছু বুঝতে চেষ্টা না করাই ভাল। পলুস হালদার এই মুহূর্তে চলে গেলেই ভাল। হতাশ হোক, রাগ করুক, মুরলীকে একটা ছলনার ডাইনী বলে মনে করে ভয় পেয়ে চলে যাক পলুস হালদার।

খিল খিল করে হেসে একটা অন্য জগতের হাসাহাসির মধ্যে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে মুরলী। মুরলী বলে—কানারানী তোমাকে বুঝিয়ে দিবে, ওর পিছে আর যেও না।

—কানারানী কে বটে?

—বাঘিনটা গো, যেটাকে মারবার লেগে তুমি জঙ্গল ঢুঁড়ছো।

পলুস হালদার—কে কাকে বুঝিয়ে দিবে, দেখে নিও।

মুরলী—আমি শুধাই, কানারানী তোমার কোন্ কলিজা খেয়েছে যে, ওর উপর তোমার এত রাগ?

পলুস হাসে : তোমাকে খেতে এসেছিল, তাই।

মুরলী—কিন্তু খায় তো নাই।

পলুস—কিন্তু তোমার গন্ধ নিয়ে গেছে। আবার আসবে।

ঘরের দাওয়ার চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে কানারানীর থাবার দাগগুলিকে খুঁজতে থাকে পলুস হালদার : না, কাল রাতে আর এপাকে আসে নাই বাঘিনটা। এই সবই পরশুর দাগ।

মুরলী—কানারানী ভেগেছে কি?

পলুস—না। পোষের জাড়া না এলে বাঘিনটা ভাগবে না। কিন্তু আমি তার আগেই…।

হঠাৎ কথা থামিয়ে পলুস হালদার আবার হাসতে থাকে : কিন্তু বুঝতে পারছি না, বাঘিনটার রাগটা এত মজার রাগ কেন?

—কি বললে?

—বুঝলে না?

—না।

—তোমার শাড়িটা টেনে নিয়ে গিয়ে কাঁটায় ফাঁসিয়ে ছিঁড়েছে, মনে নাই?

মুরলী বিব্রতভাবে বলে—তাই বল।

পলুস—শাড়িটাকে পেল কেমন করে?

মুরলী হাসে—পেয়ে গেল।

পলুস—নিশ্চয় ভুল করে রাতের বেলায় এই দাওয়াতে শাড়িটাকে মেলে রেখেছিলে?

মুরলী হাসে ঃ হবে, মনে নাই।

পলুস হো-হো করে হাসে ঃ বেচারী তেতরি ঘাসিনের একটা লাল সায়াকেও বেড়ার উপর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কানি করে দিয়েছে বাঘিনটা।

চমকে ওঠে মুরলী। কানারানীর ধূর্ত চোখের ওই জ্বলজ্বলে রাগের মধ্যে যেন ভয়ানক একটা শাসন আছে। নইলে...।

পলুস বলে—ফুলকি কিষাণীরও খবর নিয়েছিল বাঘিনটা। ফুলকিকে দিয়ে মা ডাক ডাকিয়ে ছেড়েছে।

—অ্যাঁ! আবার চমকে ওঠে মুরলী।

পলুস—ফুলকির দরজার ফাঁক দিয়ে থাবা ঢুকিয়ে ওর খোঁড়া ভাতারটার পা ধরে টেনেছিল বাঘিনটা। কিন্তু ভাগ্য ভাল ফুলকির; ফুলকি মাগো মা বলে চেঁচিয়ে উঠতেই বাঘিনটা ভেগে গেল।

চুপ করে, আর বুকের ভিতরের একটা ছমছমে ভয়ের শিহর নিয়ে শুনতে থাকে মুরলী। পলুস বলে—ঈশান মোক্তারের একটা বলদকে মেরেছে আর বড়কালুর মাথার উপরে নিয়ে গিয়ে খেয়েছে বাঘিনটা। ডরের মারে রেললাইনের কুলিগুলো কাজ ছেড়ে ভেগে যাচ্ছে। আমি বড়কালুর কাছে স্রোতের ধারে মাচান বেঁধেছি। বাঘিনের ছায়াটি একবার কাছে পেয়েছি কি ওকে আমি সেরেছি।

পলুস হালদার বন্দুকে হাত বুলিয়ে কোমরের পেটিতে সাজানো টোটা গুনতে থাকে। তারপর যেন নিজের গর্বের দুঃসাহসে দুলতে দুলতে বলে—মাত্র একটা গুলি খরচ করবো মুরলী। তুমি দেখে নিও। ও জানোয়ারকে খতম করতে পলুস শিকারীর একটার বেশি গুলির দরকার হয় না।

পলুস হালদারের গর্বের গল্প শুনে হাসতে চেষ্টা করে মুরলী, কিন্তু হাসিটা যেন গলার ভিতর আটকে যায়। একটা চোখ জ্বলজ্বল করে, আর একটা চোখ নিভু নিভু হয়ে জ্বলে, কানারানীর সেই হিংস্র ধূর্ততার দৃষ্টিটা যেন মুরলীর বুকের ভিতর বিঁধছে। আনমনার মত তাকিয়ে ফিসফিস করে মুরলী ঃ কানারানীর প্রাণ মেরে তোমার কি লাভ?

পলুস—থানা দিবে পঁচিশ টাকা, ঈশান মোক্তার দিবে পাঁচ টাকা, আর রেল-কোম্পানির সাহেব বলেছে, বিশ টাকা বকশিশ দিবে। লাভ আছে মুরলী।

মুরলী—তাই বল। তুমি বাঘিনটাকে মারবার ঠিকা নিয়েছ?

পলুস—আরও দুইজন শিকারী ঠিকা নিয়েছে। কিন্তু আমি জানি, বাঘিনটার প্রাণ আমিই নিব। সব বকশিশ আমার, আর সেই বকশিশের টাকা দিয়ে আমি...বল দেখি মুরলী, আমি কি করবো ভেবেছি?

মুরলী—কি আর করবে? সোনা কিনে নিয়ে একটা সুন্দরী খিরিস্তানীকে দিবে।

পলুস—না। তোমাকে দিব।

চমকে ওঠে মুরলী ঃ আমি নিব না।

পলুস—কেন?

দু চোখের ভুরু কাঁপিয়ে কটকট করে তাকায় মুরলী : আমি তোমার রাখনি নই।

—ছিঃ! আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে পলুস : তুমি কি মনে কর যে, আমি মেয়েমানুষ শিকার করে বেড়াই? আমি কি ডাকবাংলার রাতের বেলার বাবু? আমি কি ঈশান মোক্তার?

মুরলীর কঠোর ভাষার ধিক্কারটা পলুস হালদারের মনের গভীরে গিয়ে যেন একটা ক্ষত হয়ে জ্বলছে। খুব দুঃখ পেয়েছে পলুস হালদার। মুরলী লজ্জিত হয়, তবু মুরলীর সন্দেহের অভিমান যেন ভাঙতে চায় না। মুরলী বলে—তবে তুমি কি বট? কি কর তুমি?

পলুস—সিস্টার দিদি আমাকে ভাই বলে। সিস্টার দিদি আমাকে লিখাপড়া শিখালে। সিস্টার দিদি আমাকে কয়লা খাদের কলঘরের চাকরি করে দিলে। আমি চার কুড়ি টাকা তলব পাই, মুরলী। আমি জংলী কিষাণ নই।

পলুস হালদারের কথাগুলিও যেন পাল্টা ধিক্কার; কিষাণী মুরলীর মুখরতার উপর কঠোর আঘাত। পলুস হালদারের চোখ দুটোও যেন নিজের অহঙ্কারের উত্তাপে জ্বলছে। দেখতে পায় মুরলী, পলুস হালদারের সারা মুখের মধ্যে সেই পিয়াসের একটু ছায়াও আর নেই।

পলুস বলে—আমি পরের মাটি চষি না, ভুখা পেট নিয়ে কাঁদি না, আধপেটা খাওয়া খাই না। নিতাই মুদির কাছে গিয়ে ধারের লেগে কাঁদি না, আর কোন বেটা ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নিতে হাত পাতি না।

ক্ষুদ্র কিষাণ জীবনের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলছে পলুস। মাথা হেঁট করে মুরলী। তাই বোধহয় দেখতে পায় না পলুস, মুরলীর চোখ দুটো যেন ফেটে গিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরাচ্ছে।

মুরলী বলে—আর কত গালি দিবে বল?

পলুস হালদার এইবার মুরলীর মুখটাকে দেখতে পায়; বিচলিত হয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরে : আমি তোমাকে না, কাউকেই না, কাউকে গালি দিচ্ছি না মুরলী। আমি গাঁয়ের মানুষের দুখের কথা বলছি। আমিও এই দুখে বড় ভুগেছি।

হাত সরিয়ে নেয় না মুরলী। সরিয়ে নেবার ইচ্ছাটাও যেন মুরলীর পুরনো জীবনের মাটির মধ্যে এই মুহূর্তে একেবারে মিশে গিয়েছে। পলুসের জীবনের গল্পগুলি আরও শুনতে ইচ্ছা করে।

পলুস বলে—গোবিন্দপুরে মাটি কাটতে গিয়েছিলাম; তিনটা দিন কাজ পাই নাই। তিনটা দিন খাই নাই। বেহুঁশ হয়ে গাছতলায় পড়ে ছিলাম।

—কবে? পলুসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছে প্রশ্ন করে মুরলী।

—পাঁচ বছর আগে। বিয়া হলো যেদিন, ঠিক তার এক মাস পর। সকালী বলেছিল…।

—সকালী কে?

—সে, খিরিস্তানী হয় নাই যে, যাকে ভাবতে ঘিন্না লাগে। সে বলেছিল, না যেও না। কিন্তু না যেয়ে পারি নাই।

—কেন ?

—সকালীকে একটা শাড়ি দিবার বড় ইচ্ছা হয়েছিল। ভেবেছিলাম, একটা মাস মাটি কেটে মজুরি জমা করে সকালীর শাড়ি কিনে নিয়ে গাঁয়ে ফিরবো। কিন্তু… ।

—কি ?

—সিস্টার দিদি এসে সেই গাছতলায় দাঁড়ালে, ডাকলে। ঘরে নিয়ে গিয়ে ভাত খেতে দিলে। তারপর · ।

জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার যেন জীবনের এক প্রচণ্ড কৃতার্থতার আনন্দে হো-হো করে হাসতে থাকে পলুস ঃ তারপর তো এই আমি, তুমি যাকে দেখছো, যার উপর এত রাগ করছো।

চোখ তুলে দেখতে থাকে মুরলী। হ্যাঁ, সিস্টার দিদি সত্যিই যে অদ্ভুত দয়ার জাদুকরী। মাটিকাটা হালদারকে একেবারে একটি নতুন মানুষ করে সাজিয়ে যেন মুরলীর জীবনের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে। পলুস হালদারের জীবনটাও পাঁচ বছর ধরে লিখা-পড়া শিখে, খিরিস্তান হয়ে আর কলঘরে চাকরি করে যেন মধুকুপির কিষাণী মুরলীকেই ডাক দিয়ে নতুন ঘরে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে।

—মুরলী! ডাকতে গিয়ে পলুস হালদারের চোখের পিয়াস ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

—কি বলছো ?

—বুঝে দেখ।

—বুঝেছি।

—আমার ঘরে যাবে ?

—যাব!

—খিরিস্তান হবে ?

—হব।

পলুস হালদারের চোখের পিয়াস নতুন আলো নিয়ে জ্বলজ্বল করে। মুরলীর বুকের দিকে তাকায় পলুস হালদার। কাছে এগিয়ে আসে। কোন আপত্তি করে না, এক পাও পিছিয়ে যায় না মুরলী। নিথর হয়ে, পলুস হালদারের সেই ব্যাকুল পিয়াস বরণ করবার জন্য শাড়ি সায়া ও জামাতে সাজানো শরীরটাকে বিহ্বল করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—মুরলী! পলুস ডাকে। কিন্তু পলুস হালদারের আহ্বানের ভাষাকে আর হিসেব করে বুঝতে চায় না মুরলী। হিসেব করা হয়ে গিয়েছে। যা জানবার ছিল, সব জেনেছে। কোন উত্তর দেয় না মুরলী। দু চোখ দিয়ে একেবারে স্পষ্ট করে জীবনের নতুন সুখের ছবিটাকে দেখতে পাচ্ছে মুরলী। পলুসের ঘরের ঘরণী হয়েই গিয়েছে মুরলীর প্রাণ। কয়লাখাদের কলঘর থেকে

কাজ করে ঘরে ফিরেছে পলুস। তাই যেন আদর করে নাম ধরে ডাক দিয়েছে,- এত কাছে এগিয়ে এসেছে, আর চাইছে সেই জিনিস, যা পেলে সুখের স্বাদে পাগল হয়ে যাবে পলুস! না, আপত্তি করবে কেন মুরলী?

মুরলীর কোমরে হাত রাখে পলুস হালদার। সেই মুহূর্তে চমকে ওঠে মুরলী। না বুকটা নয়, কোমরটা। কোমরের একটা ব্যথা।

—সর সর, সরে যাও! চেঁচিয়ে ওঠে, আতঙ্কিতের মত ঘোলাটে চোখ তুলে পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী। আর, পলুসকে শক্ত হাতের একটা ঠেলায় আলগা করে দিয়ে দু পা পিছনে সরে যায়।

জামকাঠের জীর্ণ কপাটের পিছনে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। দাশুর টাঙ্গিটা কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, দেখা যায় না। দেখতেও পায় নি মুরলী। টাঙ্গিটা হিংস্র হয়ে লাফ দিয়ে উঠে এসে মুরলীর চোখের সামনে দাঁড়ায়ও নি। টাঙ্গির ভয়ে নয়, কোমরের এই ব্যথাটারই ভয়ে চমকে উঠেছে মুরলী, যে-ব্যথাকে ভুল করে ছুঁয়ে দিয়েছে পলুস হালদার। ভুলতে পারে না, ভুলে থাকবার সাধ্যি নেই মুরলীর, এই ব্যথা সৃষ্টি করেছে যে মানুষটা, সে এই তো মাত্র এক ঘণ্টা আগে গোবিন্দপুর থানার কাছে জীবনের ভুলের জবাব দিতে চলে গিয়েছে।

পলুস বলে—কি হলো?

মুরলী—তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে কোন্ সাহসে? লাজ নাই তোমার?

পলুস—কি?

মুরলী—আমার মরদ ঘরে নাই জেনে, আমাকে একলা পেয়ে…। চোর বট তুমি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলুস হালদার। পলুসের চোখ আর দপ দপ করে না। শিকারীর চোখ নয়, পিয়াসে ব্যাকুল চোখও নয়। একেবারে শান্ত ও ঠাণ্ডা এক জোড়া চোখ। যেন, মুরলীর মুখের এই গালি আর মুরলীর এই ভীত রুষ্ট ক্ষুব্ধ চেহারার মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মত কিছু দেখতে পেয়েছে পলুস।

পলুস বলে—সরদার গেল কোথায়?

মুরলী—জান না?

পলুস—না।

মুরলী—গোবিন্দপুর থানার লোক এসে সরদারকে ধরে নিয়ে গেল।

পলুস—কেন?

মুরলী—কয়েদ থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে এসে বসেছিল, থানাতে হাজিরা দিতে যায় নাই। থানার লোক বিশ্বাস করে নাই যে মানুষটা ঘরে ছিল।

পলুস—তোমার সরদার কি দাগী?

মুরলী চেঁচিয়ে ওঠে—দাগী বটে, কিন্তু চোর নয়।

—আমি আর কখনও এই গাঁয়ে আসবো না। বন্দুকটাকে হাতে তুলে নেয় পলুস হালদার। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

দাওয়া থেকে নেমে, আঙ্গিনার ঘাস মাড়িয়ে তেমনই দুলতে দুলতে আর

মচমচ জুতোর শব্দ বাজিয়ে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়ায় পলুস হালদার। দেখতে থাকে মুরলী, পলুস হালদার ভুলেও একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল না। যেন এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছে পলুস, ওর পিছনে এই এক ঘণ্টার ইতিহাসে কোন ঘটনা ঘটেছে, মুরলী নামে কোন নারী কোন ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

চলে গেল পলুস হালদার। কিন্তু মুরলীর চোখ দুটো আবার চমকে ওঠে।

সামনের সড়কের এদিকে ওদিকে আর সেদিকে, নিমের ছায়ার কাছে, কাঁটাশিরীষের ঝোপের কাছে আর বাঁশঝাড়ের কাছে ছোট ছোট এক-একটা ভিড়। এক-একটা বোবা ভিড় যেন খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে রয়েছে। মেয়ে-মরদ, বুড়ো-বুড়ি, আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, সবাই। কে জানে কখন্ এসেছে ওরা? দাশু ঘরামির ঘরের কাছে কোন্ রহস্যের খেলা দেখতে পাবে বলে ওরা আশা করে এসেছে?

কী ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে আর ঘেন্না করে তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখগুলি! ওরা যদি এখনি একসঙ্গে হাত চালিয়ে পথের পাথর তুলে মুরলীর গায়ে ছুঁড়ে মারত, তবু মুরলী বোধহয় একটুও কেঁপে উঠত না; একটা আর্তনাদও করত না। কিন্তু ধুলো নয়, ঢেলা নয়, পাথরের টুকরোও নয়, ওরা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে একটা ভয়ানক বিস্ময়ের দৃষ্টি ছুড়ে মারছে; তাই কেঁপে উঠেছে মুরলীর বুকটা। গাঁয়ের ডাইনী ধরা পড়ে গেলে তার মুখের দিকে ঠিক এইরকমের হিংস্র বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে গাঁয়ের মানুষের চোখ।

মনে পড়ে মুরলীর, অনেকদিন আগে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে কুসুমদিদির শ্বশুরবাড়ি সেই ভেলিমুণ্ডিতে একবার পরব করতে যেতে হয়েছিল। হরতকীর জঙ্গলে দিনে বাঘ ডাকে আর ময়ূর নাচে, সেই ভেলিমুণ্ডি। কুসুমদিদির পেটে ছেলে ছিল তখন। কুসুমদিদির শাশুড়ি সেই কোমরভাঙা বুড়ি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সাদা চুলে ভরা মাথাটা দুলিয়ে হাসত; আর হামা দিয়ে সারা আঙিনা ঘুরে বেড়াত।

পর পর চার দিনের মধ্যে সে-গাঁয়ের চারটে বাচ্চার কাঁচা প্রাণ পাখি-ঠোকরানো নটে ফলের মত পটপট করে ফেটে মরে গিয়েছিল। জ্বর হয়েছে, পেট ফুলেছে, তারপর ওই ফোলা পেট হঠাৎ চুপসে গিয়েছে। তিন ছেলের মা মঙ্গলীও ভেবে রেখেছিল, তার নতুন ছেলের নাম হবে পাঁচু। কিন্তু সেই মঙ্গলীর নতুন ছেলে জন্ম নিয়ে একটা শব্দও করে নি। কেঁপে উঠল বাচ্চার পেটটা, আর তখনি মরে গেল। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল মঙ্গলী—কে রে, কোন্ ডাইনী আমার ছেইলার প্রাণ নিলে রে!

মার মার, ডাইনী মার! হাতে নিমের ডাল নিয়ে একশো মানুষের ভিড় তেড়ে এল। কুসুমদিদির শাশুড়ি সেই কোমরভাঙা বুড়িকে চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। ওরা কুলকাঠের আগুনও জ্বালিয়েছিল। কিন্তু বুড়িকে পুড়িয়ে মারতে পারে নি। ভাগ্যিস সড়ক সাহেবের কুলির দল লাঠি-সোটা হাতে নিয়ে তেড়ে এসে বাধা দিয়েছিল।

সবার আগে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়ে ঝালদায় পালিয়ে এসেছিল কুসুমদিদি। কুসুমদিদির হাত ধরে মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে বেরমোবাজার যাবার মোটরগাড়ি ধরবার জন্য সড়কের উপরে এসে উঠেও মুরলীর বুকের দুরুদুরু থামে নি। বার বার মনে পড়ছিল, ডাইনী মারবার জন্য কী ভয়ানক একটা সাধের জ্বালা গাঁয়ের লোকের চোখে জ্বলছে!

মধুকুপির মানুষের চোখগুলিও চুপ করে জ্বলছে। চোখগুলি যেন নতুন রকমের এক ডাইনীকে দেখছে। শাড়ি সায়া ও জামা গায়ে দিয়ে রূপসী সেজেছে, লাগর রেখেছে, দাশু ঘরামির ঘরের মান আর জাতের মান মেরে কেমন ভালমানুষটির মত ঢং করে দাঁড়িয়ে আছে ঝালদার মহেশ রাখালের বেটি।

ভিড়ের ভিতর থেকে সবার আগে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসে হলুদ ছোপানো শাড়ি গায়ে, গালার রসে রাঙানো নখ, ফুলকি মাসী। দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর উঠে, একেবারে মুরলীর চোখের কাছে দাঁড়িয়ে ফুলকি মাসী তার দু চোখের চাহনি যেন একেবারে বিষিয়ে নিয়ে, কিন্তু বেশ একটু চাপা-চাপা স্বরে ধিক্কার দেয়।—ছিঃ, তুই তো আমার মত কপাল করিস নাই, তবে কেন, ছিঃ! যার মরদ খোঁড়া নয়, কানা নয়; সে মেয়ে ঘরের ভিতরে লোক ডাকে কেন? দাশুর কি হাত নাই, পা নাই? সে কি তোকে খাওয়াতে পরাতে পারতো না? ফুলকি মাসীর চোখ দুটো যেন কোনমতে দুঃসহ একটা ঘৃণার জ্বালা লুকিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

আর একটা ছায়া; হেঁটমাথা হয়ে মুরলী দাওয়ার মাটির যেখানে তাকিয়েছিল, ঠিক সেখানেই আর একটা ছায়া আস্তে আস্তে এসে ছড়িয়ে পড়ে। মুখ তুলেই দেখতে পায় মুরলী, কাছে এসে দাঁড়িয়েছে পল্টনী দিদি।

পল্টনী দিদির চোখ দুটো যেন রাগ করে ছটফট করছে।—ছিয়া ছিয়া, দাশু দাদার মত মানুষের বউ হয়ে তুই এ কি করলি মুরলী? তুই তো আমার মত কপাল করিস নাই, তোর মরদকে কপালবাবা কোন রোগ দেয় নাই, মারেও নাই? তোর কিসের দুখটা ছিল, বল্‌?

চলে গেল পল্টনী দিদি। পথের দিক থেকে আর একটা মূর্তি, উল্কিকাটা গলা আর ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে জড়ানো শরীর, তেতরি ঘাসিন এগিয়ে এসে মুরলীর কাছে দাঁড়ায়।—কি লো মুরলী, তুই তো আমার মত কপাল করিস নাই, তোর মরদকে বাঘে ভালুকে মারে নাই, তবে কেন ধরম সরম ভুলে গেলি? কোন্‌ দুখে লো? কিসের সুখে লো? বলতে বলতে ছলছল করে ওঠে তেতরি ঘাসিনের চোখ। ছি ছি, চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় তেতরি ঘাসিন।

পথের উপর ভিড়ের বোবা বিস্ময় এইবার মুখর হয়ে ওঠে। তিনটে গরু-চরানী মেয়ে একসঙ্গে হাতের ঠেঙা দুলিয়ে, যেন বিচিত্র ঠাট্টার রসে চোখ-মুখ মজিয়ে আর হাসিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—মুরলীর কল কলকলাইছে, লাগর লিয়ে ঢলঢলাইছে!

বুড়ো রতনের চাপা গলার স্বর যেন ফোঁসফোঁস করে—এ কি রকমটা হলো? দাশু ঘরে ফিরে এলো, তবু মাগি···মাগি জাতপঞ্চকেও ডর করে না?

জটা রাখাল বলে—আমি বলেছিলাম কিনা, সব ধোঁকা, সব ধোঁকা। বলে কিনা গির্জাবাড়ির দিদির দয়া, বলে কিনা সিলাই কল চালিয়ে চিজ পয়দা করে আর টাকা কামায়! সব ধোঁকা। বলেছিলাম কিনা, মাগি কোন খিরিস্তানের সঙ্গে নষ্ট হয়েছে।

গাঁয়ের মানুষের এই পাঁচ বছরের বিস্ময়টা এতদিনে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে। যে নারীর মরদ পাঁচ বছর ধরে কয়েদ খাটছে, সে নারী কেমন করে আর কিসের জোরে এত সুখে থাকে? এত শাড়ি সায়া আর জামা? এত গরম? করম নাচে না; গাঁয়ের কোন কিষাণীর হাত ধরতেও যেন ওর ঘেন্না করে, মুরলীর এই পাঁচ বছরের অহংকারের রহস্য আজ ধরা পড়ে গিয়েছে। যা সন্দেহ করেছিল গাঁয়ের মানুষ, তাই সত্য হয়েছে।

আসুক ফিরে দাশু। তারপর বিচার হবে। লজ্জায় ফিসফাস করতে করতে, রাগে গজগজ করতে করতে, আর ঠাট্টায় চিড়বিড় করতে করতে পথের উপর সেই ছোট ছোট ধিক্কার আর ভ্রূকুটির ভিড় আস্তে আস্তে চলে যায়।

হেঁটমাথা তুলে আবার যখন সামনের দিকে তাকায় মুরলী, তখন দেখতে পায়, রক্তমাখা মরা ধনেশটাকে কামড়ে ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা শেয়াল।

গোবিন্দপুর থানা একটু বেশি উদ্বিগ্ন, একটু বেশি ব্যস্ত। রাঁচি, হাজারিবাগ আর পালামৌয়ের পুলিশ জানিয়েছে, গুপী লোহার ও তার গ্যাং খুব সম্ভব দামোদর পার হয়ে গোবিন্দপুরের দিকে গিয়েছে।

রামগড় বাজারে ছোটোলাল মহাজনের বাড়িতে যে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, তার রকম সকম দেখে সন্দেহ করতে হয়, এটাও গুপী লোহারের কাজ। পাঁচ বছর আগে গুমলা থানার হাজত থেকে পালিয়ে ফেরার হয়ে গেল যে সেই গুপী লোহার। ঘরের জানালা দেয়াল থেকে একেবারে উপড়ে ফেলা, হেঁসো দিয়ে গলা ফাঁসিয়ে ঘুমন্ত মানুষকে খুন করা আর বাক্স ভেঙে শুধু নগদ টাকা আর সোনা রুপো নিয়ে চলে যাওয়া; সেই ভয়ানক গুপী লোহার ছাড়া ঠিক এই নিয়মে ডাকাতি আর করবেই বা কে? শেষ রাত্রি হওয়া চাই, আর খুব জোরে বৃষ্টি হওয়া চাই, এই রকমের লগ্নে এই পাঁচ বছরের মধ্যে ওই তিন জেলার যেখানে যতগুলি ডাকাতি হয়েছে, সবগুলিই গুপী লোহারের কীর্তি। পুলিশ এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কোন হৈ-চৈ হয় না, অঝোর বৃষ্টি আর আকাশভাঙা বাজের কড়কড় শব্দের মধ্যে ডাকাতির সব শব্দ লুকিয়ে, মহাজনের সিন্দুক একেবারে চেঁছেপুছে খালি করে দিয়ে পালিয়ে যায় গুপী লোহার ও তার দল। পাশের বাড়ির মানুষ জেগে থাকলেও ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পায় না, জেগে তাকিয়ে থাকলেও ওদের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায় না।

গুপী লোহারের দল বলতেও প্রায় অশরীরী একটা সত্তা বোঝায়। সে

দল কোথাও নেই, অথচ সব ঠাঁই যেন আছে। তার মানে, সত্যিই কোন দল সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না গুপী লোহার। পুলিশ-রিপোর্ট বলে, নিয়মটা কতকটা পুরনো কালের সেই ঠগীদের মত। তিন জেলার নানা জায়গায় সারা বছর স্বভাব ঢাকা দিয়ে ভালমানুষটির মত কাজ করে গুপী লোহারের লোক। হঠাৎ হাজির হয় গুপী। তারপর একটা ডাকাতি, এবং তারপরেই শুধু ডাকাতির একটা গল্প পিছনে ফেলে রেখে দিয়ে কোথায় গিয়ে যে গা-ঢাকা দেয় গুপী, তা সে-ই জানে।

পালামৌয়ের এক জংলী ডিহিতে গুপী লোহারের ঘরের চিহ্ন আজও পড়ে আছে। লাল মাটির বড় বড় ঢেলা আর ঢিবি। গাঁয়ের লোক বলে, লালমাটি থেকে কাঁচা লোহা গলিয়ে লাঙ্গলের ফলা তৈরি করে বাজারে বেচতে যেত গুপী। তাতে কিন্তু পুরো পেটের ভাত হতো না। গুপীর বউটা তিনদিন উপোসের পর একদিন ভয় পেয়ে, তিনটে ছেলে নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল, কেউ জানে না। তারপর গুপী যে কোথায় গেল, তা শুধু গুপীই জানে।

পুলিশের রিপোর্টে বলে গুপী লোহারের ট্রাইব আর ফ্যামিলির রক্তের মধ্যেও ডাকাতিপনার বীজ আছে। গুপী লোহারের বাপ রুপি লোহার যাবজ্জীবন কালাপানি খেটে মরে গিয়েছে। গুপী লোহারের বাপের বাপ দীনু লোহারকেও ধরতে পারা গিয়েছিল। ফাঁসির দড়িতে শেষ হয়েছে, প্রায় দশটা খুন আর পঁচিশটা ডাকাতির নায়ক সেই দীনু লোহারের প্রাণ। ট্রেনি পুলিশের পাঠ্যপুস্তকের ডাকাতি চ্যাপ্টারের ফুটনোটে দীনু লোহারের নামের উল্লেখ আছে। পুলিশ ট্রেনিং কলেজের মিউজিয়ামে আজও রাখা আছে, একটা প্রকাণ্ড টাঙ্গি—কাঁচা মেটে লোহার টাঙ্গি, দীনু লোহারের প্রিয় সেই খুনিয়ারা হাতিয়ার। সে টাঙ্গির মরচে লাল ধুলোকে এখনও শুকনো রক্তের ধুলো বলে মনে হয়।

সাবধান হয়েছে গোবিন্দপুর থানা। ভুবনপুরের দিকে জঙ্গলের কাছে একটা নতুন বীট হাউস খোলা হয়েছে। রামগড়ের দিক থেকে গোবিন্দপুরে আসার সড়কের উপর কঠোর পাহারা রাখা হয়েছে। যত দাগী পাপী আর বদমাসের নামে একটা নতুন লিস্টি করা হয়েছে। পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজীও খুব ব্যস্ত। এই গাঁ আর সেই গাঁ চুঁড়ে যত দাগীকে টেনে এনে হাজত-ঘর ভরে ফেলা হয়েছে। গোবিন্দপুর বাজারের দুটো বেশ্যাকেও ধরে আনা হয়েছে। সরাইয়ে তল্লাসী করা হয়েছে, কোন নতুন লোক এসেছে কি না! চিমটেধারী একটা সাধুকে সড়কের উপর চুপ করে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল, তাকেও ধরে এনে হাজতে ভরা হয়েছে।

হাজত ঘরের ভিতরে আলো নেই। দরজার গরাদের বাইরে পাহারাদার সেপাইটার পায়ের কাছে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। হাজতঘরের এক কোণে একটা কম্বলের উপর দাশু ঘরামি চুপ করে বসে আছে। দাশুর সামনে শালপাতার ঠোঙ্গায় দুটো রুটি আর গুড়, মাটির ভাঁড়ে জল।

দাশু ঘরামির কাঁধের দু জায়গায় দুটো ক্ষত। দাশুর কাঁধের অমন

পাথুরে পেশীও দু জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে। পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজীর পিতল-বাঁধানো লাঠি দাশু ঘরামিকে কবুল করবার জন্য এক ঘণ্টা ধরে নানা কায়দায় গুঁতো খোঁচা আর মার চালিয়ে আজকের মত শান্ত হয়েছে। চৌধুরীজী নিজেই শ্রান্ত হয়ে হাঁফ ছেড়েছে : এটা শক্ত দাগী বটে, আরও ভাল করে না বানালে শালা কবুল করবে না।

হেসে হেসে দাশুর গম্ভীর মুখটাকে দেখবার চেষ্টা করে একটা ছোকরা, আর, মাথার চুল হাতড়ে তামাকপাতার একটা টুকরো বের করে হাতের তেলোতে ফেলে ডলতে থাকে। দাশুর হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—খেয়ে নাও গো সরদার। থানা কি তোমার মাগ যে, গোসা করে থাকলে তোমাকে হাতটি ধরে আর চুমাটি খেয়ে খেতে সাধবে ?

গামছা গায়ে জড়িয়ে আর একটা লোক কম্বলের উপর পড়ে নাক ডাকাচ্ছিল। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে লোকটা বলে—কি বলছিস কালু ? কার মাগ কাকে চুমা দিল রে ?

ছোকরা বলে—তোর মাগ আমাকে।

গামছা গায়ে জড়ানো লোকটা ছোকরার পিঠের উপর একটা লাথি ছুঁড়ে দিয়ে বলে—তা বাপের মাগের চুমা লিবি, তাতে দোষ কেন হবে রে চোট্টা ?

ছোকরা বলে—তুই কে রে ?

—আমি মহারাজ বোম শঙ্করের প্রজা রে।

ছোকরা দাশুর গায়ে আর একবার ঠেলা দিয়ে বলে—শুনছো সরদার, এ শালা গাঁজা চাষ করে চারবার কয়েদ খেটেছে।

ঘুমিয়েছিল যারা, তারা এক এক করে উঠে বসে আর আশ্চর্য হয়ে যায় : কি হলো ? সরদার বেচারা খায় নাই কেন ?

ছোকরা বলে—সরদারের উপর বড় জবর মার হয়েছে হে। কাঁধের উপর দুটা জখম হয়েছে।

একটা বুড়ো বলে—তা দাগী হয়েছে যখন, তখন দাগ নিতে হবে। আরও কত নিতে হবে।

এক টিপ খৈনি দাঁতের মাড়ির উপর চেপে ধরে ছোকরাটা হাসতে থাকে : আচ্ছা তোর মত একটা বুড়া বক্‌রাকে ধরে নিয়ে এসেছে কেন ? তোকে চেলা করবে কোন ডাকাত ? তোকে দেখলে গুপী লোহার যে ঘিন্নায় মরে যাবে রে বুড়া ?

বুড়ো—আমি তো তাই জানি হে, কিন্তু থানা কি শুনবে ? মুন্সীটা কি আমাকেও ডলে নাই ভাবছো ?

—তুই তো জমি নিয়ে ফৌজদারি করেছিলি ?

—হ্যাঁ ভাই। সে তো বিশ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন তোর চেয়েও কম।

—আর তুই ? পাশের টাকমাথা লোকটাকে প্রশ্ন করে ছোকরা।

বুড়ো হাসে : ওকে শুধিয়ে লাভ নাই। ও বলবে না।

ছোকরা যেন জেদ করে বলে—কেন গো ওস্তাদ, এত লাজ কেন? কার জরুকে ঘরের বার করেছিলে?

টাকমাথা লোকটা গম্ভীরভাবে বলে—মনে কর না কেন, তোর জরুকে।

ছোকরা বলে—হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে। জরুটা ঘরে ফিরে এসে কত খুশি হয়ে বললে, দাদার ঘরে ছিলাম ভাল, তুমি মিছা রাগ কর কেন?

দাশু ঘরামির মাথাটা ভারি হয়ে দু হাঁটুর উপর ঝুলে পড়ে। হাজতঘরের ওই অদ্ভুত আলো-ছায়ার ভাষা শুনতে শুনতে মাথার ভিতরটা যেন কামড়াতে শুরু করেছে। দাগী দাগী দাগী; দাশু ঘরামি মানুষ নয়, মধুকুপির একটা মনিষও নয়; শুধু একটা দাগী। দাশু ঘরামির পিঠের উপর পুলিসের জুতোপরা পায়ের লাথি পড়েছে, চৌধুরীজীর পিতলবাঁধানো লাঠির মার কাঁধের উপর দাগ করে দিয়েছে। হালের মহিষ গোঁয়ার হয়ে গেলেও কেউ কখনো তাকে এভাবে মেরে ঘায়েল করে না। দাশুর মাথার ভিতরে যেন একটা গরম হাওয়া ফোঁস ফোঁস করে। সন্দেহ হয়, প্রাণটা বোধ হয় একটা পাগলা কুকুরের প্রাণ হয়ে গিয়েছে। নইলে মারে কেন ওরা?

মুরলীর শরীর তুলে গালি দিয়েছে মুন্সী চৌধুরীজী। দাগীর বউকেও বোধহয় একটা কুকুরী বলে মনে করে ওরা। গায়ের ব্যথাগুলি নয়, মধুকুপির কিষাণের সেই পাথুরে অহংকার ক্ষতাক্ত হয়ে জ্বলতে থাকে।

ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে নি, কিন্তু চোখের পাতায় যেন একটা ক্লান্তি নেমে এসেছিল; দাশু ঘরামির চোখের সামনে একটা টাঙ্গির শাণিত হাসি ভাসছে। চমৎকার রক্তমাখা হাসি। ডরানির জলে টাঙ্গিটাকে ধুয়ে ফেলতেই লাল হয়ে গেল ডরানির জল। চমকে ওঠে দাশু, মাথা তোলে আর চোখ মেলে তাকায়। শুনতে পায় দাশু, ছোকরা চোট্টাটা অদ্ভুত একটা আক্ষেপ করছে: গুপী লোহারের নাম শুনলেই থানার পায়জামা ঢিলা হয়ে যায়। আমার সাথে যদি কোনদিন দেখা হতো গুপীর, তবে বলতাম—হে বাপ, তুই কিরপা করে এপাকে আর ডাকা মারতে আসিস না বাপ। থানা তো তোর কড়াপাক মোচের একটা ছাঁটা চুলকেও ধরতে পারে না; মারে শুধু আমাদিগে।

বুড়ো বলে—গুপী লোহারকে ধরবে, গোবিন্দপুর থানার বাপের সাধ্যি নাই।

—কেন? প্রশ্ন করে গামছা গায়ে জড়ানো রোগা লোকটা।

বুড়ো বলে—জাদু জানে রে ভাই। হেই দেখ খাঁড়া হাতে নিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে, হেই দেখ নাই, একেবারে হাওয়া।

টাকমাথা লোকটা বলে—হাওয়া হবে কেন? কাক হয়, বক হয়, চিল হয়ে উড়ে যায়।

ছোকরা বলে—হাঁ হাঁ, সবই হয় গুপী, শুধু তোর মত বুদ্ধু হয় না।

হঠাৎ দাশুর দিকে তাকিয়ে ছোকরাটা বলে ওঠে—এ সরদারের লেগে আমার বড় দুখ হয়।

বুড়ো—কেন হে?

ছোকরা—আমাদিগের সবটিকে কাল ছেড়ে দিবে, শুধু ছাড়া পাবে না সরদার।

—কেন? বুড়ো দুঃখিতভাবে আবার প্রশ্ন করে।

—কে জানে? মুন্সী বললে, সরদারটা ছাড়া পাবে না। কাল আবার ওর মার হবে। সরদারকে চালান না করে ছাড়বে না মুন্সী।

টাকমাথা লোকটা হাই তুলে বলে—মাগি দুটা ছাড়া পাবে তো হে?

ছোকরা হাসে—হাঁ হাঁ, নিশ্চয় ছাড়া পাবে। কিন্তু তাতে তোর লাভ কিসের রে চাঁদিল? ওদের একটা তো মুন্সীটার খোরাক হয়ে গেছে। সে মাগির ঘরের দরজা খোলা পাবি না।

—আর একটা?

—আর একটা যে আমার বাঁধা বটে রে শালা।

দুই হাঁটুর ফাঁকে শুধু মুখটাকে নয়, কান দুটোকেও গুঁজে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে দাশু। ছোকরা চোট্টাটা যেন দাশু ঘরামির জীবনের মামলার রায় শুনিয়ে দিয়েছে। সবাই ছাড়া পেয়ে ঘরে চলে যাবে, শুধু ছাড়া পাবে না দাশু ঘরামি। আবার মার হবে। এবার হয়তো বুকের পাঁজরের উপর দুটো নতুন গুঁতোর দাগ ফুলে উঠবে। শুধু দাগ আর দাগ। দাশুর দাগী জীবনটা আবার এক হাকিমের এজলাসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হয়তো তিন বছরের শক্ত কয়েদের আদেশ বরণ করে নেবে। বেশ হবে। সুখী হবে মুরলী, মুরলীর জীবনের সব দুর্ভাবনার কষ্ট মিটে যাবে।

শান্ত হয়ে গিয়েছে হাজতঘর। কম্বলের উপর পড়ে নাক ডাকিয়ে কী আরামে ঘুম দিচ্ছে হাজতী মানুষগুলো, যত দাগী পাপী আর বদমাস। হিংসে হয় দাশুর, শুধু দাশুর চোখ দুটো কেন জেগে জেগে ছটফট করে? ভোর হতে আর কত দেরি?

দরজার গরাদের ছায়া দাশুর মুখের উপরে লোহার লাঠির মোটা মোটা দাগের মত লেগে রয়েছে। কেরোসিনের বাতির ধোঁয়াটে আলো দাশুর চোখের তারার উপরে ধিকধিক করে। গরাদগুলি কি খুবই শক্ত? দম বন্ধ করে দরজার গরাদের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

না, অসম্ভব, সাধ্যি নেই দাশুর। ওই গরাদের উপর মধুকুপির কিষাণ শুধু তার কপালটাকে ঠুকতে পারে, কিন্তু ওই গরাদ ভাঙতে পারে না। ছুটে গিয়ে মধুকুপির একটা মাটির ঘরের জামকাঠের দরজার কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার আর সুযোগ হবে না। সুখী হবে পলুস হালদার; মুরলীকে কাছে পেয়ে শিকারীর দু চোখের আশার পিয়াস এইবার মিটে যাবে।

হাত দুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে; দাশুর যন্ত্রণাময় তন্দ্রাটা যেন ছটফট করে টাঙ্গিটাকে ধরতে চেষ্টা করছে। ওই যে দাশুর ভাগ্যের দুশমন পলুস হালদার আসছে। শিকারী পলুস হালদারের মাথাটা টাঙ্গির একটি কোপে ধড় থেকে খুলে ধুলোর উপর পড়ে গেল। ভাল করে দেখে নে মুরলী, শিকারীটাকে এবার কত জল খাওয়াবি খাওয়া। মুরলীর চোখ পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে, আর

দাশু হো-হো করে হেসে মাদল বাজাতে বাজাতে কপালবাবার কাছে পুজো দিতে চলে যায়।

কাক ডাকে, ভোর হয়, হাজতঘরের এক কোণে কম্বলের উপর বসে সাধুটা চিমটে বাজিয়ে ভজন গাইতে শুরু করেছে। উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের আভা হাজত-ঘরের ভিতরে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে ভরা অন্ধকারকেও একটু হাসিয়ে দেয়।

ছোকরাটা জেগে উঠেই হাঁক দেয়—উঠ গো মহারাজেরা ; ডাক হবে এখন।

তারপর আর বেশি দেরি হয় না। একটা সেপাই আসে, নাম ধরে এক-একজনকে ডাক দেয়। কম্বল গুটিয়ে এক-একজন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর চলে যায়।

একে একে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে হাজতঘর। চিমটেধারী সাধুটা চলে গেল। বেদিয়া দুটোও চলে গেল। ক্ষৌতি দাঙ্গার যত পুরনো দাগীগুলো ছিল, তারাও চলে গেল। হাজতঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে সকালবেলার রোদ ভিতরে চুঁয়ে পড়ে।

ছোকরাটা এক টিপ খৈনি মাড়ির উপর টিপে ধরে আর একটু ব্যথিত স্বরে বলে—তুমি এখন ঘুমিয়ে থাক না কেন সরদার, তোমার তো ডাক হবে না।

—দাশু ঘরামি নিকল আও। সেই মুহূর্তে গরাদ-আঁটা দরজাটাকে ফাঁক করে ডাক দিল সেপাইটা। চমকে ওঠে দাশু। ছোকরাটাও আশ্চর্য হয়ে ফিস ফিস করে—কুছ পরোয়া নাই সরদার। কোন ডর নাই। কোনটি কথা কবুল করবে না ; সব মার হজম করে নিবে।

হাজতঘরের দরজা পার হয়ে সেপাইয়ের পিছু পিছু চলে যায় দাশু, থানার বারান্দায় প্রকাণ্ড টেবিলের কাছে, উর্দিপরা একটা কঠোর ভিড়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

টেবিলের দু দিকে দুটি চেয়ারের উপর বসে দুটি অফিসারের দু জোড়া চোখ দাশু ঘরামির চেহারাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বড় দারোগা, শরীরটা ছোট, পেটটা প্রকাণ্ড। কোমর নেই বললেই চলে ; তাই বুকের উপর বেল্ট। ছোট দারোগা খুব লম্বা, মুখটা রোগা, বেল্টটা কোমরের নীচে ঢলঢল করে। বড় দারোগার ভুরু কাঁপে, ছোট দারোগা গলার আঁচিল খুঁটতে থাকেন ; তার পরেই দুজনে একসঙ্গে হেসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন।

বড় দারোগা গুপ্তবাবু বলেন—চেহারাটা সাংঘাতিক, কিন্তু মুখটা ফুলিশ। তাই নয় কি চ্যাটার্জি ?

ছোট দারোগা চ্যাটার্জি হাসেন—ফুলিশ মুখটা একটা পোজ নয় তো, ভেবে দেখুন।

গুপ্তবাবু—ইনোসেন্ট বলেই তো মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, পলুস হালদার যখন বলেছে যে, লোকটা এই দুটো দিন ঘরেই ছিল, তখন···।

—কে ? কে বটে ? দাশু ঘরামির বোবা মুখটা যেন হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে।

গুপ্তবাবু ভ্রুকুটি করেন—পলুস হালদার।

চ্যাটার্জি—পলুস হালদার মানে…।

গুপ্তবাবু—আরে মশাই, ওই যে, সেই লোকটা, সিস্টার মাদলিনের চিঠি নিয়ে যে লোকটা এসেছিল।

চ্যাটার্জি—বুঝেছি, ম্যান-ইটার মারবার জন্য যাকে বন্দুক দেওয়া হয়েছে।

গুপ্তবাবু—গুপী লোহারের চেহারার একটা ডেসক্রিপশনও পলুসকে দিয়েছি। জ্যান্ত অথবা মৃত…।

চ্যাটার্জি হাসেন: গুপী লোহারকে আর জ্যান্ত ধরা সম্ভব হবে না।

গুপ্তবাবু—মেরেই নিয়ে আসুক না কেন; পলুসের ভাগ্যে তা হলে… ধরুন তিন জেলার পুলিস প্রত্যেকে দু শো টাকা করে মোট ছ শো টাকা রিওয়ার্ড দেবে। তা ছাড়া…।

চ্যাটার্জি—কিন্তু…আমার আশঙ্কা হচ্ছে…যাই হোক্, আপাতত আমার এক মাসের ছুটির ব্যবস্থা করে দিন।

গুপ্তবাবু—তার চেয়ে বরং আমিই এক মাসের ছুটি নিই। আপনি ইন-চার্জ হয়ে থাকুন। এটাই ভাল নয় কি? অন্তত আপনার প্রসপেক্ট হিসাবে?

টেবিলের দু দিকে দুই চেয়ারে বসে দুই অফিসারের মুখ অদ্ভুত একটা মন কষাকষির উত্তাপে আবার গম্ভীর হয়ে যায়। গুপী লোহারের নামটা এই এলাকার নতুন আতঙ্কের খবর হয়ে দেখা দিতেই দুই অফিসারের মনে ছুটি নেবার তাগিদ দেখা দিয়েছে। তাই রোজই একবার এরকমের একটা তর্ক বাধে আর তর্কের শেষে দুজনেই গম্ভীর হয়ে যান।

—খামোখা এত কথা বলেন কেন আপনারা? পুলিস মুন্সী চৌধুরীজীর গলার স্বরে যেন একটা প্রচ্ছন্ন ধমকের আওয়াজ ঘড়ঘড় করে। দুই দারোগা একটু বিচলিতভাবে চৌধুরীজীর মুখের দিকে তাকান।

চৌধুরীজী বলে—কে ছুটি নিবে, কে ছুটি নিবে না, সে আমি বলে দিব। এখন কাজ করুন।

গুপ্তবাবু—বলুন মুন্সীজী, আর কি করবার আছে?

চৌধুরীজী বলে—দাশু ঘরামির উপর কি অর্ডার হয়, বলেন। একটুক তাড়াতাড়ি করেন। আরও দাগীর ডাক বাকি আছে।

—ও হ্যাঁ। গুপ্তবাবু তাঁর বুকের বেল্টে হাত বুলিয়ে, আর চা-এর কাপে শেষ চুমুক দিয়ে দাশু ঘরামির মুখের দিকে তাকান: হ্যাঁ, দাশু ঘরামি, পলুস হালদার যখন বলছে যে, তুমি ঘরে ছিলে, তখন কথাটা আর অবিশ্বাস করলাম না। যাও…ওয়াক আউট; কিন্তু সাবধান, মাসে অন্তত একদিন এসে হাজিরা দিয়ে যাবে।

আস্তে আস্তে, যেন টলতে টলতে থানার বারান্দা থেকে নেমে, ঘেসো মাঠটা পার হয়ে সড়কের উপর এসে দাঁড়ায় দাশু। এইবার মনে হয়, পা দুটো অনড় হয়ে গিয়েছে। এই মুক্তি বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। এই মুক্তি মুক্তিই নয়।

পলুস হালদার দয়া করেছে। কেন দয়া করে পলুস হালদার? ভয় করে; জীবনে কোন ভয়ে এমন ভীরু হয়ে যায় নি দাশু ঘরামি।

এখন এই খোলা পথটাকেও প্রকাণ্ড একটা হাজতঘর বলে মনে হয়। এগিয়ে যাবার উপায় নেই। কোথায় যাবে দাশু? কার কাছে যাবে? গিয়ে কি কোন লাভ হবে? ঘর বলতে কিছু আছে কি? আপন বলতে কেউ আছে কি?

জমিটা আর মুরলীর মুখটা; দাশুর জীবনের দুটি সাধের ভুল বোধহয়। জমিটাকে ভালবেসে জেলে যেতে হয়, আর মুরলীকে ভালবেসে হাজতে আসতে হয়। দুটি ভুলে দাগা পেল; দাশু কিষাণ দাগী হয়ে গেল। তাই কি? কাকে শুধালে জবাব পাবে দাশু? শুধু মনে পড়ে, কপালবাবার কাছে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, থানাতে হাজিরা দেওয়া হল, কিন্তু কই, কপালবাবার কাছে হাজিরা দেওয়া হয় নাই তো?

জঙ্গলের ছায়া থেকে একটু আলগা হয়ে, একটা একলা বেলগাছের গোড়ায় সেই সিঁদুর-মাখানো নুড়িগুলি আর খুলিটাও আছে। কিন্তু বড় বড় ঘাসের ভিড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে কপালবাবার এই আসন। তার উপর আবার মাকড়সার জাল।

বেলপাতা চিবিয়ে আর ক্লান্ত শরীরটাকে প্রায় গড়িয়ে দিয়ে কপালবাবার আসনের কাছে মাথা ঠুকে জীবনের অনেক আশা আর অনেক ইচ্ছার কথা, অনেক ভয় আর অনেক রাগের কথা জানিয়ে যখন উঠে দাঁড়ায় দাশু, তখন দুপুরের ঘুঘুর ডাক আর জঙ্গলের বাতাসের ছোট ছোট ঝড় আর ঝড়ের শব্দগুলিকেও প্রায় ক্লান্ত করে ফেলেছে।

আর এখানে কোন কাজ নেই। কপালবাবার কাছে যা বলবার ছিল তার সবই প্রায় বলা হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বিঘা জমি চাই, আর জমিটাকে ঘিরে গুলঞ্চের বেড়া চাই। আরও কিছু চাই যে কপালবাবা; কিন্তু সবার আগে মুরলীকে চাই; আর চাই, মুরলীর পেটে ছেইলাটার প্রাণ যেন বেঁচে থাকে।

কপালবাবার আসনের উপর থেকে ঘাসগুলিকে উপড়ে পরিষ্কার করে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। কপালবাবাও যেন এতক্ষণে একটা মুখঢাকা অভিমানের হাজত থেকে মুক্তি পেল। নুড়িগুলি আর খুলিটা রোদ আর আলোর ছোঁয়া পেল।

কিন্তু কপালবাবারও এই দশা কেন হল? আবার কি ভুল করেছে গাঁয়ের লোক? লড়াইয়ের সময় মুঠো মুঠো কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে কপালবাবাকে ভুলে গিয়েছিল গাঁয়ের লোক; সেই রকম ভুল আবার হয়েছে মনে হয়। বোধহয় কপালবাবার জঙ্গলে মরা শাল কুড়োতে ও মৌচাক ভাঙতে কেউ আর আসে না। কপালবাবাকে ভয় করতে ভুলে গিয়েছে সবাই। কপালবাবার কাছে পূজা পড়ে নাই অনেকদিন।

কিন্তু আমি তো তোকে ভুলি নাই কপালবাবা ; তবে আমার উপর তোর এত রাগ কেন ? আমার জমি লুট হলো কেন ? মুরলী আমাকে ঘিন্না করে কেন ? আর থানা আমাকে মারে কেন ?

ছি-ছি, কপালবাবার উপর আবার এসব অভিমান কেন ? ভুল করে দাশুও যে কপালবাবাকে অবিশ্বাস করে ফেলেছে। সন্দেহ করছে দাশু, কপালবাবাও বুঝি মরে গিয়েছে। কপালবাবার কৃপা আর ক্রোধের শক্তি নেই বুঝি ?

—মাপ করবি গো কপালবাবা। আর একবার শরীরটাকে মাটির উপর গড়িয়ে দিয়ে, মনের সব বিশ্বাস ঢেলে দিয়ে, আর মাথা ঠুকে ঠুকে যেন প্রাণের ক্লান্তিটাকে ব্যথা দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে তোলে দাশু।

হ্যাঁ, যেতে হবে। নিজের গাঁ, নিজের ঘর, আর নিজের মাগের কাছে যেতে ভয় কিসের ? কপালবাবা সহায় আছে, কিষাণ দাশুর জীবনের জোর ভেঙে দেবার সাধ্য আছে কার ?

জঙ্গলের ঘুঘুর স্বর ক্লান্ত হয়ে আসে। কপালবাবার আসনের কাছ থেকে সরে গিয়ে, কাঁকুরে ডাঙার ঢালু ধরে অদ্ভুত এক ক্লান্তিহীন সাহসের নেশায় যেন মত্ত হয়ে হাঁটতে থাকে দাশু।

ছোট একটা বাবলার বন। বাবলার শুকনো সাঁটি সরু পথের উপর ফণা-তোলা মরা সাপের মত ছড়িয়ে রয়েছে। এই পথটুকু পার হলেই ডরানির নতুন পুলের কাছে সড়কের উপর এসে পড়বে দাশু। ডরানির স্রোতের কল কল শব্দ শোনা যায়।

হেসে ওঠে দাশুর মুখ। পাঁচ বছর পর এই প্রথম ডরানির স্রোতের ঠাণ্ডা জল খেয়ে পিয়াস মিটাবার সুযোগ পেয়েছে দাশু। জোর পিয়াসও পেয়েছে।

ডরানির গরম বালু মাড়িয়ে সরু স্রোতের কাছে পেঁীছে, ঠাণ্ডা জল খেয়ে আর হাত-মুখ ও মাথা ধুয়ে আবার বাবলার জঙ্গলের ছায়ার দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ায় দাশু। মস্ত বড় একটা ডুমুর গাছের নীচে চকচকে তিনটে মহিষ আর দুটো বাচ্চা মহিষ খুঁটোয় বাঁধা হয়ে আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জাবর কাটছে। গাছতলায় ছোট একটা খাটিয়া, একটা কম্বল, একটা ঢোলক। লম্বা একটা লাঠি খাটিয়ার কাছে পড়ে আছে। আর একটা লোক খাটিয়ার উপর বসে দাশুরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দাশু এগিয়ে যেয়ে প্রশ্ন করে—তুমি এখানে এসে ডেরা নিয়ে কি করছো হে ভঁইসাল ?

লোকটা হাসে : জঙ্গলের ডহর ধরে এসেছি ; একটু জিরিয়ে নিচ্ছি সরদার। ভঁইসগুলাকে আর রোদে হাঁটা করিয়ে কষ্ট দিতে চাই না।

দাশু—জঙ্গলের ডহর ধরলে কেন হে ?

—তাতে ডরটা কিসের হে ?

দাশু—তোমার ভঁইস যে বাঘের পেটে যাবে হে।

—কিন্তু যায় নাই তো।

লোকটা আবার হেসে ফেলে আর দাশুর মনের প্রশ্নটাকে শান্ত করে দেয় :

জঙ্গলের ডহর ধরে আসি কেন বুঝলে না? ভঁইসগুলা পেট ভরে ঘাস আর পাতা খেতে পায়। ঠাণ্ডা ছায়া পায়। গরীব ভঁইসালের অনেক পয়সা বেঁচে যায় হে। তোমাদিগের গাঁয়ের বাজারে ভুসির দর এখন কত?

দাশু—তিন টাকা মণ হবে;

—বুঝ তবে? গরীব ভঁইসাল নিজে ভাত খাবে, না তিন টাকা মণ ভুসি কিনে ভঁইসগুলাকে খাওয়াবে।

দাশু—তুমি আসছো কোথা থেকে?

—তিন জিলার বাজার আর মেলা ধরে, অনেক ঘুরে আর অনেক জঙ্গল চুঁড়ে আসছি হে।

দাশু—যাবে কোথা?

—যাব গোবিন্দপুর।

—গোবিন্দপুর কেন? ভঁইস বেচতে?

—হ্যাঁ, তবে সবগুলাকে বেচতে পারবো না। দুধলি ভঁইসি দুটা থাকবে, শুধু ঐ গাভিনটাকে বেচে দিব। তুমি কিনতে চাও নাকি হে সরদার?

দাশু হাসে: না হে।

—কেন?

—আরে, আমি গরীব কিষাণ বটি, ভঁইসি কিনবার টাকা নাই।

—গরীব হলে কেন?

চমকে ওঠে দাশু। লোকটার প্রশ্ন যেন দাশুর কপালের উপর ভয়ানক একটা টোকা দিয়ে ঠাট্টা করে উঠেছে। দাশু রাগ করে, মুখটাকে শক্ত করে নিয়ে রুক্ষস্বরে জবাব দেয়—ভঁইস বেঁচে তুমি লাট হয়েছ; ভাগজোতের কিষাণ আর মনিষ কিষাণ গরীব হয়ে কেন, তুমি বুঝবে না।

—ভাগজোত কর কেন? মনিষ খাট কেন?

আবার একটা রূঢ় ঠাট্টার প্রশ্ন। ভঁইসাল লোকটার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসছে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু: নিজের জমি না থাকলে কোন্ শালা কিষাণ মনিষ খাটে না আর ভাগজোত করে না?

—নিজের জমি থাকলেই বা তুমি কোন্ লাট হয়ে যাবে?

দাশু হাসে: লাট হব কেন রে ভাই, লাট হতে চাই না। কিষাণ মানুষ, ধান মকাই সরগুজা আর সব্জির ফলান করে বেঁচে থাকতে চাই।

লোকটা হো-হো করে হেসে ওঠে: আগে জমি পাবে, তাতে পাঁচ পহর খাটবে, তাতে যদি ধান ফলে তবে ভাত খাবে। তারপর বাঁচবে। এর চেয়ে যে নরকের খাটুনিও ভাল। এমন বাঁচা বাঁচতে লাজ লাগে না সরদার?

দাশু ভ্রূকুটি করে তাকায়: তুমি কি আমাকে ডরাতে চাও?

লোকটা বলে—না, দুটো ভাল কথা শুনাতে চাই।

দাশু—নেশা করেছ মনে হয়।

লোকটা আবার হো-হো করে হেসে ওঠে। আর খাটিয়ার তলা থেকে একটা হাঁড়ি বের করে: একটুক বসে যাও সরদার।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রোদের মেজাজ বুঝতে চেষ্টা করে দাশু। বিকাল হয়ে এল বোধহয়। দাশু বলে—না হে। সাঁঝ হবার আগেই ঘরে পেঁছতে চাই। এখন আর হাঁড়িয়া নিতে সাধ নাই।

—একটুক নিয়ে যাও ভাই। ভঁইসালের বেরাদারি ঘিন্না কর কেন ?

এগিয়ে আসে দাশু। নিজের হাতে শালপাতা মুড়ে একটা নতুন ঠোঙা তৈরি করে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় ভঁইসাল লোকটা। তারপর হাঁড়ি উপুড় করে যেন মহুয়া-মদের ছোট একটি ফোয়ারাকে দাশুর হাতের ঠোঙার উপর গড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে: ডরানির জলে ছাতির পিয়াস মিটে বটে, কিন্তু কলিজার পিয়াস কি মিটে রে ভাই ?

মিথ্যা বলেনি ভঁইসাল লোকটা। দাশু ঘরামির বুকটা জানে, পাঁচ বছর ধরে জেলের সেই বিরস কয়েদী-জীবনে, বুকের ভিতরে কলিজাটা কি-ভয়ানক শুকনো পিপাসার তরাস সহ্য করেছে।

ঠোঙাটা যেন পাঁচ বছর আগের আনন্দে রসাল হয়ে টলমল করে; পাঁচ বছর আগের জীবনের সুগন্ধ ভুরভুর করে। এক চুমুক ঠোঙার টলটল রসালতা বুকের ভিতরে টেনে নেয় দাশু, আর মুখ মোছে।

ভঁইসাল হাসে: তোমার খুব পিয়াস লেগেছে সরদার। আর একটুক নাও।

আপত্তি করে না দাশু। অচেনা এক ভঁইসালের এই নতুন বেরাদারির মাদকতায় দাশুও ধীরে ধীরে মুগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

ভঁইসাল লোকটাও দাশু কিষাণের সঙ্গে এই হঠাৎ বেরাদারির সৌভাগ্যকে যেন নতুন নেশা দিয়ে মাতিয়ে দিতে থাকে। ওর পিয়াসও থামতে চায় না। হাঁড়িটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে আর উপুড় করে দিয়ে ঢকঢক করে মহুয়ামদের তরল আনন্দ যেন গিলে গিলে খেতে থাকে।

আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে লোকটা বলে—তুমি কোন্ গাঁয়ে থাক হে ?

—মধুকুপি।

—কেন মিছা একটা গাঁয়ের দুখের মধ্যে পড়ে থাক ?

—গাঁয়ে যে আমার ঘর আছে গো।

—ঘরই বা রাখ কেন ?

—ঘরণী আছে যে।

—দূর দূর। ঘরণী তোমাকে কী সুখ আর কত সুখ দিবে ?

—তোমার ঘরণী নাই ?

—নাই।

—কেন নাই ?

—ঘর নাই।

—ঘর করলেই তো পার।

—তুই আমার ভঁইসটার চেয়েও বোকা বটিস সরদার। ঘর করবো কেন ? ঘরে কোন সুখটা আছে ?

দাশু মুখ টিপে হাসে: মরদে যে সুখ চায়, সেই সুখ আছে।

—আরে সরদার, সে সুখ কোথায় না পাওয়া যায় বল ? বাজারে কি সে সুখের ঘর মিলে না ?

—সে ঘরকে কি ঘর বল হে ?

—কেন, মাগির ঘরের চালাতে কি পাখি বসে না ?

দাশু হাসে : কিন্তু মাগির ছেইলা তো তোমাকে বাপ বলবে না ?

—না বলবে তো আমার কোন্ ভঁইসটা মরবে ?

—নাঃ, তোমাকে খুব নেশাতে ধরেছে ভঁইসাল।

লোকটা হাসে : আমি ভক্ত বটি সরদার ; সাধুসন্তদের কথা বিশ্বাস করি।

ঢোলকটাকে কোলে তুলে নিয়ে তড়বড় করে হাত চালিয়ে একটা বোল বাজিয়ে নিয়ে লোকটা গেয়ে ওঠে—একেলাহি চলনা ভালা বাপা, চলনা একেলাহি। কোই কিসিকা নেহি রে বাপা, কোই কিসিকা নেহি।

ঢোলকটাকে আরও কিছুক্ষণ তড়বড় করে পিটিয়ে নিয়ে লোকটা বলে—জমি আর জরু, এই দুই চিজ কখনো আপন হয় না সরদার। আপন ভেবেছিস কি মরেছিস।

ভঁইসালের লাল চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করে ; মুখটাকে একজন ভক্তের মুখ বলেই তো মনে হয়। দাশুর বুকের ভিতর দুরু দুরু করে অদ্ভুত একটা ভয়ের ঢোলক বাজতে থাকে।

হঠাৎ হেসে চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা : ছেইলাও বাপের কেউ নয় সরদার। হোই দেখ।

একটু দূরে, বাবলার জঙ্গলটা যেখানে বেশ ঘন, সেখানে একটা মহুয়া গাছে ফুল আর ফল ধরেছে। মহুয়ার দিকে তাকাতেই চমকে ওঠে দাশু। গাছের মাথার উপরে একটা ডাল থরথর করে কাঁপছে। থাবা দিয়ে একটা ডাল আঁকড়ে ধরে মহুয়া ঝরাচ্ছে একটা · হ্যাঁ, জানে দাশু, ওটা ভালুক হতে পারে না, ওটা একটা ভালুকী।

গাছের তলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় দাশু, যদিও দৃশ্যটা দাশুর চোখের কোন নতুন অভিজ্ঞতা নয়, ভালুকীর দুটো ক্ষুধাতুর বাচ্চা নীচের ঘাসের উপর ঝরে-পড়া মহুয়াকে হুটোপুটি করে শুঁকছে আর খাচ্ছে।

—দেখছো তো। ছেইলা হলো মায়ের ছেইলা, বাপের নয়। বলতে গিয়ে আরও জোরে হাসতে থাকে লোকটা।

চুপ করে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু। সেই অদ্ভুত ভয়ের জ্বালায় চোখ দুটো আরও লাল হয়ে উঠতে থাকে। লোকটা বলে—যে মরদে মাগ আর ছেইলাকে আপন ভাবে, গাঁ আর ঘরকে আপন ভাবে, তারাই নেশা করে বোকা হয়ে আছে।

দাশু—কিন্তু···।

—আবার কিন্তু কেন ? সেদিন আর নাই, জমানা বদলে গিয়েছে সরদার তুমি যা ভাবছো সেটি আর হবে না।

—কি ভেবেছি আমি ?

—তুমি গাঁয়ের কিষাণটি হয়ে ঘর বেঁধে, ভাগজোত করে আর মাগ ছেইলা নিয়ে সুখটি করবে, সেদিন আর নাই।

—কে বললে সেদিন আর নাই ?

—আমি বলছি যে ভাই। মাগ বল আর ছেইলা বল, কেউ তোমাকে মিছামিছি পিয়ার করবে না। আগে হিসাব করে বুঝে নিবে, কেন পিয়ার করবো ; তবে পিয়ার করবে। না হয় তো, ভেগে যাবে।

দাশু বিড়বিড় করে ঃ কেন এমনটি হলো বলতে পার।

—আমি বলতে পারি না সরদার, আমি পরমাত্মা নই।

চুপ করে আর চোখ দুটো উদাস করে বসে থাকে দাশু। ডরানির স্রোতের কলকল শব্দ শুনতেও যেন ভয় করছে।

লোকটা কোলের উপর থেকে ঢোলকটাকে সরিয়ে রেখে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে ঃ তুইও বুঝে চল সরদার : না হলে বড় দুখ পাবি।

—কি বুঝতে বলছো ?

—ওসব গাঁ ঘর মাগ আর ছেইলাকে ডরানির জলে ভেসে যেতে দে না কেন ? তুই কেন ভাবিব ? সাধু-সন্তের কথাটা বিশ্বাস কর, কোই কিসিকা নেহি রে বাপা।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—তবে কি ক্ষেপা হব, না ভিখমাগা সাধু হব ?

বলে—খুব চালাক হবি, একটুও ক্ষেপা হবি না। নগদ সুখের সাধু হয়ে, পেট ভরে আর মন ভরে মজা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি।

—সেটা কিসে হয় ?

—টাকাতে হয় রে ভাই।

—টাকা কোথায় পাব ?

—আমি দিব। দাশুর মুখের দিকে একটা ভয়ানক মোহময় আবেদনের জাদু ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটা।

—তুমি বা দিবে কেমন করে ?

—সেকথা শুধাস কেন ? তুই শুধু বল যে, টাকা চাস।

মাথা হেঁট করে ভাবতে থাকে দাশু। সব ভাবনা, সব ইচ্ছা আর সব আশা যেন নেশার ঘোরে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। মধুকুপির ছোটকালু আর বড়-কালুর চেহারা দুটোও যেন স্পষ্ট করে দেখতে পারা যাচ্ছে না। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সবই। মধুকুপির যেন সব শব্দ হারিয়ে, সব গাছপালার রঙ হারিয়ে একটা শুকনো ডাঙা হয়ে গিয়েছে। জামকাঠের পুরনো কপাটটা পচে গলে ছেঁড়া কাঠের আবর্জনা হয়ে পড়ে আছে। ঘর নেই, মুরলী নেই, কেউ নেই।

মন্দ কি ? দাশু ঘরামির জীবনটাও যেন সব দুশ্চিন্তার বোঝা নামিয়ে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নেবার জন্য হাত পাততে আর হবে না।

লোকটা গলার স্বর এইবার যেন এক নতুন জগতের ঢোলকের বোল হয়ে বাজতে থাকে।—টাকা হাতে নিয়ে ডাক দিলে এক রাতের মধ্যে পাঁচটা মাগি পাওয়া যায় সরদার। তারপর নাও না, কত সুখ করে নিতে চাও ? খাও দাও,

নেশা কর, সরে পড়। ব্যস্, তুমি কার কে তোমার ? সাধুসন্তেরা মিছা কথা বলেন নাই সরদার।

হঠাৎ হাত তুলে চোখের জল মোছে দাশু। লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে, লাল চোখ দুটোও যেন রাগ করে জ্বলে ওঠে : কি হলো হে সরদার ?

দাশু বলে—টাকা দিতে চাও, দাও। নিব আমি। শোধ করেও দিব আমি। কিন্তু···তুমি যা বলছো, সেটি হবে না।

—কি হবে না ? রুষ্ট হয়ে ক্ষেপা মহিষের মত চোখের তারা দুটোকে উল্টে দিয়ে দাশুর দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা।

দাশু—আমি গাঁ, ঘর, মাগ, ছেইলা ছাড়তে পারবো না। আমি ভাগজোত, ক্ষেতি-খামার ছাড়তে পারবো না। কিষাণ মানুষ তোমার মত একটা নষ্ট ভূঁইসাল হবে কেন ?

লোকটার চোখের আক্রোশ আর আবেদনও যেন এইবার আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে আসতে থাকে। ক্লান্ত আক্ষেপের মত স্বরে একটা ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠে— নাঃ, তোকে আমি মরদ মনে করেই ভুল করছি। বুঝি নাই যে, তুই একটা হিজরা। সুখ নিবার জোর নাই তোর।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—বেরাদারি করতে ডেকে নিয়ে খুব গালিটি দিয়ে নিচ্ছ ভূঁইসাল।

—আমার টাকা নিতে চাও যখন, তখন দুটা শক্ত কথা শুনতে হবে সরদার।

দাশু উঠে দাঁড়ায় : তোমার টাকা চাই না। তুমি আমাকে চিন না ভূঁইসাল ; তুমি আমার টাঙ্গি দেখ নাই।

—কে বট তুমি ?

—আমি মধুকুপির দাশু ঘরামি। আমার জমির দুশমনকে টাঙ্গিতে ঘায়েল করে পাঁচ বছর কয়েদ খেটেছি। আমাকে যদি জানতে তবে আমাকে ঐ গালিটা দিতে তোমার বুক থরথর করে··।

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দাশু তার কথার আক্রোশটাকে হঠাৎ থামিয়ে দেয়, একটু আশ্চর্যও হয়। হাসছে লোকটা, আর চোখ দুটোও ছলছল করছে।

এরকমের নতুন চোখ-মুখ দিয়ে নতুন রকমের কথাও বলে লোকটা—বেশ তো, আমার মত নষ্ট না হলে তো না হলে ; আমার টাকা নিতে রাগ কেন ?

—আমি ভিখমাগা নই।

—নিজেকে মিছা গালি দাও কেন সরদার ? আমি কি তাই বলছি ?

—তুমি টাকা দিবে কেন ?

—কে জানে, ইচ্ছা করছে, তোমাকে টাকা দিই। অনেকদিন এমন ইচ্ছা করে নাই।

—তুমি টাকা পাবে কোথা থেকে ?

—যেথা টাকা থাকে সেথা থেকে পাব। তোমাকেও পাইয়ে দিব।

—কি বললে ?

—টাকা কোথায় না আছে রে ভাই! বাবুরবাজারের মহাজনদিগের হাতে কি টাকার থলি নাই? ঈশান মোক্তারের কুঠিতে কি টাকা নাই?

আস্তে আস্তে এক-পা দু-পা করে করে পিছনে সরে, আর, একবার কেঁপে উঠেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। ভঁইসালের সেই ঢুলু ঢুলু চোখ, উগ্র হাসি ও লাল চাহনির দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু, ভঁইসালের মুখের ভয়ানক ভাষার শব্দ শুনতে থাকে।

ভঁইসাল বলে—বল, টাকা নিবে তো?

দাশু প্রায় একটা লাফ দিয়ে আরও পিছনে সরে যায়ঃ না, নিব না।

—কেন? বলতে বলতে এগিয়ে আসে ভঁইসাল।

আরও দূরে সরে গিয়ে দাশু বলে—তোমার টাকা নিতে ঘিন্না করে।

ভঁইসাল—ঘিন্না করে লাভ কি সরদার? টাকা না পেলে জমি করবি, ঘর করবি, মাগ ছেইলা নিয়ে সুখে থাকবি কেমন করে?

দাশু—না, তোমার টাকা নিব না।

আর কোন কথা না বলে, ভঁইসালের মুখের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে হন হন করে হাঁটতে থাকে দাশু।

ভঁইসাল লোকটা চেঁচিয়ে হাসতে থাকেঃ আমার টাকা নিতে হবে সরদার। আমি দিয়ে ছাড়বো।

চেঁচিয়ে উত্তর দেয় দাশু—দিতে এলে আমিও তোমাকে বুঝিয়ে দিব।

ভঁইসাল—আমাকে চিনতে পারলে না সরদার?

দাশু—চিনে দরকার নাই।

ভঁইসাল লোকটা আরও জোরে চেঁচিয়ে হাঁক দেয়—দরকার আছে হে সরদার। থানাতে গিয়ে বলে দাও, গুপী লোহার এখানে বসে আছে।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। চমকে ওঠে। কাঁপতে থাকে।

গুপী লোহার হেসে ওঠেঃ থানা তোমাকে অনেক টাকা বকশিশ দিবে, এখনই দৌড়িয়ে যাও আর থানাকে খবরটা শুনিয়ে দাও।

গুপী লোহারের কালো মুখ, ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি, আর লাল চোখের ঢুলু ঢুলু আবেশ যেন একটা বীভৎস রক্তমাখা জানোয়ারের আহ্লাদের চেহারা। কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরি করে না দাশু। গুপী লোহারের সেই মুখের দিকে দুর্দান্ত লোভীর মত একবার তাকিয়ে নিয়েই সড়কের দিকে ছুটে চলে যায়।

পথে চলতে কোন বাধা নেই। কাঁটা নেই, কাঁকর নেই, এমন কি ধুলোও নেই। একেবারে তকতকে পরিষ্কার একটি পাকা সড়ক।

সড়ক ধরে হন্ হন্ করে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। সড়কের ধারে মাঝে মাঝে গাছের ছায়া দেখতে পেয়েও জিরিয়ে নেবার জন্য থামতে চায় না। ডরানির স্রোতের নতুন পুল অনেক পিছনে ফেলে রেখে অনেক দূর এগিয়ে যায় দাশু।

বিকেলের রোদের এখনও তেজ আছে বেশ। পিঠটা জ্বলছে, আর, সেই

সঙ্গে যেন মনের ভিতরে একটা হিসাবও কটকট করে জ্বলছে। কানের কাছে গোবিন্দপুর থানাটা কথা বলছে। তিন জিলার পুলিস তিন দফা বকশিশ দেবে। দুশো, দুশো, আর দুশো, মোট ছশো টাকা। কত জমি কিনতে চাও সরদার? পাঁচ বিঘা দো-আঁশ, না হয় তো দশ বিঘা এঁটেল কিনে ফেল না কেন? নতুন লাঙ্গল কিনবে, এক জোড়া হেলে গরুও কিনতে পার। দাও না, তোমার সাধের ক্ষেতের জমি ঘিরে কত বেড়া দিতে চাও? গুলঞ্চের বেড়া, লাল ঝিণ্টের বেড়া, বাঘভেরেণ্ডার বেড়া, ফণীমনসার বেড়া। জেলের বাগানে পাঁচ বছর খেটে অনেক কেরামতি শিখেছো; তবে তো ইচ্ছা করলে আনারসের বেড়াও দিতে পার।

লাল চোখ দুটো কটমট করে; আরও জোরে পা চালিয়ে আর ছুটে ছুটে চলতে থাকে দাশু। কোনদিন ভুলেও হিসেব করে জীবনের লাভ-লোকসান বুঝতে পারেনি মধুকুপির যে দেহাতি কিষাণ, সেই দাশু ঘরামির প্রাণটা যেন আজ হঠাৎ হিসাব করে বুঝতে শিখে বিপুল এক লাভের উপহার দু হাতে দিয়ে আঁকড়ে ধরবার জন্য ছুটে চলতে থাকে।

ওই তো, আর বেশি দূরে নয়; বাবুরবাজার পুলিস ফাঁড়ির আলকাতরা-মাখানো থামগুলি দেখা যায়। কিন্তু দাশু ঘরামির ছুটে চলবার খুশি উল্লাস হঠাৎ মাতালের মত টলতে টলতে থেমে যায়। আর এগিয়ে যাবার দরকার নেই, এগিয়ে আসছে পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী আর রামাই দিগোয়ার। চৌধুরীজীর পিঠে একটা বন্দুক। রামাই দিগোয়ারের নীল কোর্তা আর টাঙ্গিটাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। পিছু পিছু একটা পালকিও আসছে।

কিন্তু এ কি হলো? এই দিকে, এই পথে বাবুরবাজার ফাঁড়ির এত কাছে এরকম ছুটতে ছুটতে কেন চলে এসেছে দাশু? কিসের আশায়? কোন্ লোভ? গোবিন্দপুর থানার কাছে বকশিশ নিতে?

দাশু ঘরামির বুকের ভিতরের সব বুদ্ধির হিসাব যেন আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায়। আর, লাল চোখ দুটো যেন দাশু ঘরামির জীবনের ভীরুতার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় ও ঘৃণায় থরথর করতে থাকে: ছিয়া! ছিয়া! মধুকুপির এত তেজ আর এত দেমাকের কিষাণ দাশু ঘরামির প্রাণটা কি ছশো টাকা বকশিশের লোভে সত্যিই হিজরা হয়ে গিয়েছে?

ওই তো, ওই সেই পাপীটা! গোবিন্দপুর থানার কসাইটা! দাঁতাল বনবরাহের মত শুধু তেড়ে এসে মানুষের গায়ে দাঁত বসাতে ভালবাসে। ওর নাম চৌধুরীজী। দাশু ঘরামির কাঁধের পেশীর উপর দু জায়গায় দুটো গুঁতোর ক্ষত হঠাৎ যেন নতুন অপমানের জ্বালা নিয়ে জ্বলে ওঠে। ওই চৌধুরীজীকে আর ওই রামাই দিগোয়ারকে টাঙ্গি দিয়ে টুকরো করে ডরানির জলে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে দাশুর কাঁধের ক্ষত দুটোর জ্বালা আজ আর থাকতো না।

কিন্তু টাঙ্গিটা হাতের কাছে নেই আর বিকালের আলোটাও চারদিকের চোখ জাগিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া, ওদের হাতে বন্দুকও আছে। ওদের চোখের

নাগাল থেকে এই মুহূর্তে সরে যাওয়াই ভাল।

সড়কের উপর থেকে টপ করে একটা লাফ দিয়ে নীচের একটা পাথরের আড়ালে একটা বড় গর্তের মধ্যে চোর নেকড়ের মত চুপ করে লুকিয়ে পড়ে দাশু। মস্ত বড় পাথর, চারদিকে বাবলার ভিড়; দাশু ঘরামির এই চোরা চেহারাকে দেখতে পাবে না হিংস্র বনবরাহ ওই চৌধুরীজীও।

অনেকক্ষণ পার হয়ে যায়। কিন্তু কই? নিকটের সড়কে তো কারও পায়ের শব্দ বেজে উঠল না। কোথায় কোন্ দিকে দাগী খুঁজতে চলে গেল ওরা?

উঠে দাঁড়ায় দাশু। উঁকি দিয়ে তাকায়; সেই মুহূর্তে দাশু ঘরামির দু চোখ থেকে মহুয়ার নেশার সব লাল যেন সাদা হয়ে যায়। বুক কাঁপে দাশুর; বুকের ভিতর যেন একটা কান্নাও গুমরে ওঠে।

এদিকে আসছে না চৌধুরীজী ও রামাই দিগোয়ার। জামুনগড়ার কাঁচা সড়ক ধরে কপালবাবার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। আর বেশি দূরে নয়, আর মাত্র আধ ক্রোশ পথ ওরা এগিয়ে যেয়ে জামুনগড়ার সড়কের উপরে দাঁড়ালেই ডুমুর গাছের ছায়াটা ওদের চোখে পড়বে। এখান থেকে এখনও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, ডরানির খাতের পাশে উঁচু এক টিলার কাছে ডুমুরের গাছটা যেন বিকালের রোদে পুড়ে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে ওই ডুমুরের ছায়ায় বসে নেশার ঘোরে ঢুলছে গুপী লোহার। চৌধুরীজীর বন্দুক আজ গুপী লোহারের প্রাণের খবর নিয়ে ছাড়বে।

ওরা যাচ্ছে কাঁচা সড়ক ধরে, বহেড়ার জঙ্গলটাকে ঘুরে ধীরে ধীরে। কিন্তু দাশু তো এখনি কোন চোরাপথে ছুটে গিয়ে আর ওদের আগেই পেঁছে গিয়ে ভুঁইসাল বেচারাকে জানিয়ে দিতে পারে: যাও ভুঁইসাল, জলদি সরে যাও। গোবিন্দপুর থানার কসাইগুলো আসছে।

চোরাপথ বলতে দাশুর চোখের নিকটে শুধু একটি পথের ছায়া ভাসে। এই যে সড়কের ধারে এই পাথর থেকে বিশ হাত পরেই শুরু হয়েছে সেকেলে গঙ্গানারায়ণী গড়ের যত ভাঙা ভাঙা ইঁটপাথরের ঢিবি। দুখন গুরুজী গল্প করেছে, অনেক দিন আগে গুরুজীর বাপের বাপও যখন বাচ্চা মানুষ ছিল, তখন ইংরাজের তোপ এক হাজার চুয়াড়কে মেরে এই গড়ের সামনের ডাঙায় তাঁদের লাস ছড়িয়ে দিয়েছিল। এক মাস ধরে শিয়াল আর শকুনের ভোজ চলেছিল। আর সাহেবরাও ঐ গড়ের ফটকে বসে বিলাতী সরাব আর কচি বাছুরের মাংস খেয়ে নেচেছিল। তাই আজও এই ভাঙা গড়ের নাম খানাপিনা।

হাজার চুয়াড়ের রক্তমাংস যে ডাঙার উপর পড়ে পচেছিল আর গলেছিল, সেই ডাঙাটা আজ মুলি বাঁশের জঙ্গলে ছেয়ে রয়েছে। খানাপিনার পুরনো ইঁটপাথরের ফাঁকে ফাঁকে রক্তশোষা গিরগিটি আর বজ্রকীট ঘুরে বেড়ায়। বিশাল করাইত ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ো বটের গোড়ার হাঁ-করা ফোকরে হুঁড়ারের বাসা। কোন রাখাল ভুলেও খানাপিনার কাছে গরু চরাতে আসে না।

খানাপিনার এই পুরনো ইঁটপাথর আর মুলি বাঁশের জঙ্গলটার ভিতর দিয়ে এক দমে একটা দৌড় দিলে কেমন হয়? পার হয়ে যেতে কতক্ষণই বা

লাগবে ? তারপরেই তো মরা মাটির উপর একটা পুরনো শালবনের ধড় আর যত উইঢিবি। ও-জায়গাটা তো পাঁচ লাফে পার হতে পারা যায় ; তার পরেই ডরানির স্রোত আর সেই ডুমুর গাছের ছায়া।

দাশুও যেন চতুর ক্ষিপ্র ও হিংস্র একটা নেকড়ে ; খানাপিনার পুরনো ইঁটপাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটতে থাকে। বাঁশের খোঁচায় গায়ের গেঞ্জিটা ফালিফালি হয়ে ছিঁড়ে যায়। গেঞ্জিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড় দিতে দিতে একটা উইঢিবির উপর এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

কিন্তু তাতে কি আসে-যায় ? পুরনো উইঢিবির সাপ নিজেই ভয় পেয়ে কাতরাতে থাকে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলতেও ভুলে যায় দাশু। সোজা ছুটে এসে ডরানির স্রোত পার হয়ে ডুমুরের ছায়ার কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে—ভঁইসাল !

কোথায় ভঁইসাল ? কেউ নেই। দুধলি ভঁইসি দুটো নেই, গাভিন ভঁইসিটাও নেই, আর বাচ্চা দুটোও নেই। ভঁইসালের খাটিয়া, ঢোলক, লাঠি আর কম্বলও নেই। শুধু মহুয়ামদের শূন্য হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে আছে।

দাশু ঘরামির লাল চোখ খুশির পুলকে কাঁপতে থাকে। জাদু জানে ভঁইসাল। হেই দেখ আছে, হেই দেখ নাই। কে জানে, হতেও পারে, হয়তো চিল হয়ে বা কাক হয়ে নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে ভঁইসাল। চারদিকে সাবধানে তাকিয়ে আস্তে আস্তে যেন গোপন মানতের প্রার্থনার মত নরম স্বরে হাঁক দেয় দাশু : জলদি সরে পড় ভঁইসাল, যদি হেথা থাক। গোবিন্দপুর থানার লোক এসে পড়েছে।

সত্যিই একটা কাক ডুমুর গাছের পাতার আড়াল থেকে ডানার শব্দ ছটফটিয়ে হঠাৎ উড়ে চলে গেল। জোরে একটা স্বস্তির হাঁফ ছাড়ে দাশু।

কিন্তু এখানে দাশু ঘরামিরও যে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না। এই ভয়ানক নিরালায় ডুমুরের ছায়াতে মহুয়া মদের একটা শূন্য হাঁড়ির কাছে দাশুকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বনবরাহ চৌধুরীর চোখ যে হিংস্র আহ্লাদে আবার ঘোলাটে হয়ে উঠবে।

কিন্তু কোন্ পথে ফিরে যাওয়া যায় ? ডরানির স্রোতের সেই পুলের দিকে আর যাওয়া যায় না। গোবিন্দপুর থানার এক জোড়া রক্তচোষা মতলব ওই পথ ধরে এদিকে এগিয়ে আসছে।

পশ্চিমের আকাশটার দিকে তাকায় দাশু। বিকেলের রোদের তেজ মরে এসেছে। অনেক দূরে মধুকুপি ; ছোটকালু আর বড়কালুর মাথার পাথরে ঠাণ্ডা রোদের লালচে রঙ ধরেছে। ধানকাটা ক্ষেতের উপর ছোট পাখির দল এখনও উড়ুৎ ফুড়ুৎ করে। আর, তার চেয়েও একটু দূরে ডরানির স্রোতের বাঁকের দু পাশে পলাশবনের উপরে তিতিরের ঝাঁক উড়ে বেড়ায়।

ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে একটা দৌড় দিয়ে পলাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে দাশু। স্রোতটা এখানে বেশ চওড়া ; স্রোতের কিনারা ধরে চলতে চলতে দাশুর এতক্ষণের রোদে-পোড়া আর পরিশ্রান্ত শরীরটার জ্বালাও শান্ত

হয়ে আসতে থাকে। স্রোতের বুকের উপর ছড়ানো বড় বড় পাথরগুলি শেওলায় ঢাকা। পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কোঁচবক ঝিমোয়। কুচো মাছের ঝাঁক পাথরের গায়ে শেওলা ঠুকরে খায় আর জলের উপর দাশুর ছায়া দেখতে পেয়ে ছটফটিয়ে পালিয়ে যায়।

দাশুর দু চোখের তারা থেকে মহুয়ামদের নেশার ঘোরে তখনও ঝরে পড়ে নি। বরং, পলাশবনের ছায়ায় স্রোতের পাশে পাশে হেঁটে সে নেশার সুখ এতক্ষণে সব ভয় জ্বালা আর ঘৃণা হারিয়ে আরও ঢুলু ঢুলু হয়েছে।

যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায় দাশু। মুখটাও হেসে ওঠে। স্রোতের ধারে একটা ছোট ডাঙার শুকনো ধুলোর উপর হুটোপুটি করে পাখা ঘষছে একটা পাখি। একটা পাপিয়া। হ্যাঁ, ওটা একটা ভরত পাপিয়া বটে। এত কাছে এমন সুন্দর একটা কলকলে স্রোতের এত ঠাণ্ডা ও এত পরিষ্কার জল থাকতেও ধুলোতে স্নান করছে পাখিটা। যার যেমন স্বভাব।

টি-হা টি-হা টি-হা! পাখিটাও যেন আশ্চর্য হয়ে, দাশু ঘরামিকে একটা মিষ্টি স্বরের ধমক দিয়ে পাখার একটি ঝাপটের জোরে খাড়া উড়ান উড়ে উপরের আকাশে মিলিয়ে গেল। বুকের ধুলো হাত দিয়ে মুছে দাশুও আবার একটা হাঁফ ছাড়ে। কী ভয়ানক পাগল হয়ে গিয়েছিল মাথাটা, তাই বকশিশের লোভে বাবুরবাজার পুলিশ-ফাঁড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল দাশু। ইস্, মধুকুপির কিষাণের মান খুব বেঁচে গিয়েছে। তোর পাও লাগি কপালবাবা!

এগিয়ে এসে একটা পাথুরে ঢিবির কাছে দাঁড়ায় দাশু। স্রোতের কিনারায় এক জায়গায় এদিকে-ওদিকে গোবর শুকিয়ে রয়েছে। গাঁয়ের গরু বোধহয় অনেকদিন আগে পলাশবনে চরতে এসে এখানে জল খেতে এসেছিল। স্রোতের বালুর উপর ছোট একটু জায়গা জুড়ে একটা গড়্হা। চিকচিক ঝিকঝিক করে না জল। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল একটুও কাঁপে না। আঁজলা ভরে জল খেতে ইচ্ছে করে দাশুর।

পাথুরে ঢিবিটার ওদিকে ঝুপ করে একটা শব্দ বেজে ওঠে। যেন হঠাৎ শব্দ করে কেঁপে উঠেছে আহত জলের ঝলক। একটা কোট্‌রা হরিণ কি ভয় পেয়ে জলের উপর লাফ দিয়ে পড়েছে?

এগিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু। শালপাতার একটা ঠোঙায় পাকা ডুমুর, আর লতা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা নীলকণ্ঠ ময়ূরের পালকের একটা গাদা পাথরটার উপর পড়ে আছে।

পাথরের উপর আরও দুটি জিনিস দেখতে পায় দাশু। ছোট একটি হাঁড়ি, সে হাঁড়ির মুখের কাছে একটা ভোমরা ঘুরে ঘুরে উড়ছে। আর, দু হাত বহর ও পাঁচ হাত লম্বা একটা মেটিয়া শাড়ি পাথরের উপর টান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। শাড়িটাকে যেন শুকোবার জন্য মেলে দেওয়া হয়েছে।

স্রোতের পাশে মাটির উপর যদি এক ফোটা রক্তের চিহ্নও থাকতো, তবে না হয় বুঝতে হতো যে, বাঘিন কানারানী একটা মাতাল গরু-চরানী মেয়েকে এখান থেকে একটি কামড়ে তুলে নিয়ে এখনি পালিয়েছে। চোখের বিস্ময়

সহ্য করতে গিয়ে দাশুর বুকের ভিতরে একটা সন্দেহের ছায়া ছমছম করে। গুপী লোহারের নতুন জাদুর কোন খেলা নয় তো? অনেক জাদু আর অনেক ছল জানে গুপী লোহার। নতুন একটা চেহারা ধরেছে নাকি গুপী লোহার?

শাড়ি আছে যখন, তখন মেয়েমানুষ নিশ্চয়। কিন্তু ডর নেই, লাজ নেই, এখানে এসে পাকা ডুমুর আর হাঁড়িয়া খেয়ে নেশা করে, এমন মেয়েমানুষ কি সত্যিই মেয়েমানুষ? এই বনে যে একা একা কোন গরুও জল খেতে আসে না। সন্ধ্যা হতেও আর বেশি দেরি নেই। এই বনে ভালুক আসে, হুঁড়ার ঘুরে বেড়ায়। আর, আজকাল কানারানীও আসে। সে খবর কি জানে না মাগিটা?

সত্যিই একটা মাগি বটে, না, আর কেউ? না, কোন ক্ষেপী? ধমক দিয়ে আর ভয় দেখিয়ে ওকে এখান হতে না তাড়িয়ে দিলে ওর প্রাণটা যে আজ সন্ধ্যা হতেই জানোয়ারের ক্ষুধার খোরাক হয়ে যাবে।

—কে বট তুমি? পাথরটার উপর উঠে হাঁক দিতেই দাশু ঘরামির গলার স্বর পাল্টা ধমক খেয়ে চমকে ওঠে। কে যেন ধমক দিয়েছে—খবরদার; এদিক পানে আসবে না।

এইবার দেখা যায়, শরীরটার গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দিয়ে গুটিশুটি হয়ে বসে আছে যে, সে সত্যিই মেয়েমানুষ। মুখটাও দেখতে বেশ সুন্দর। নেশার ঘোরে লাল হয়ে টলমল করছে একজোড়া টানাটানা চোখ; ভেজা চুলের গোছা নুয়ে পড়ে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলছে। গল্প শুনেছিল দাশু, ডাইনীরা মাঝে মাঝে রূপসী সেজে বোকা মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, তারপর নেশা করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়; তারপর বোকাটার কলিজা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

দাশু ঘরামি ভয়ে ভয়ে বলে—শুধাচ্ছি, কে বট তুমি?

—চোখ নাই? দেখতে পাচ্ছ না?

—দেখছি তো। তুমি মেয়েমানুষ।

—তবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। দাশুর চোখের বিস্ময়ে বোধ হয় নতুন নেশার ছোঁয়া লেগেছে। কত কাছে, এই তো, দাশুর চোখের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে স্বচ্ছ জলের তরলতার মধ্যে শরীরটাকে ডুবিয়ে, শুধু সুন্দর মুখ আর নেশার চোখ ভাসিয়ে, তাকিয়ে রয়েছে একটা ছলনা।

চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েমানুষটা—তুমি সরবে কি না সরদার? কেমন কিষাণ তুমি? লাজ লাগে না তোমার?

—কেন? লাজ কিসের?

—আমি কি তোমার ঘরের গাই যে, আমার এত কাছে এসে দাঁড়াবে আর তাকাবে?

দাশু—কি যে বলছো, বুঝছি না!

মেয়েমানুষটা বলে—বুঝ না কেন? চোখ নাই কি? দেখছো না আমার শাড়িটা কোথায় পড়ে আছে, আর আমি কোথায় আছি?

দাশু ঘরামির চোখের উদ্‌ভ্রান্তি এতক্ষণে পরিষ্কার হয়। সত্যিই একটা মেয়েমানুষ লজ্জা পেয়ে আর ভয় পেয়ে দাশু ঘরামিকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

চলে যাওয়া উচিত, সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু দাশুর চোখের কৌতুহল তবু যেন একটা মায়ার আবেশে ছটফট করে। দাশু বলে—কিন্তু তুমি কেমন মেয়েমানুষ গো ?

—তোমার ঘরণী যেমন মেয়েমানুষটি, তেমনটি গো।

—তুমি ক্ষেপী বট, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

—তুমি চালাক বট, মতলব নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ।

—তুমি নেশা করেছ।

—তুমও নেশা করেছ।

—তোমার ডর নাই ?

—কিসের ডর ?

—জানোয়ারের ডর ?

—তোমার মত মানুষদিকে ডরাই ; জানোয়ারদিগে ডরাই না।

—আমি তোমার কোন্ মান নাশ করেছি যে গালি দিচ্ছ ?

—সরে যাচ্ছ না কেন ? কি দেখবার মতলব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ ?

—কিছু দেখতে চাই না। একটা কথা বলে দিতে চাই ; যদি শুন তো বলি।

—কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি জলদি সরে যাও।

কোন্ গাঁয়ে ঘর তোমার ?

—তুমি শুধাও কেন ?

—শুধালে দোষটা কি বল ?

—ভালটা কি, তাই বল ?

—আমার ভাল কিছু নাই, তোমার ভাল হতে পারে।

—কেন ? আমার কি ভালটা করবে তুমি ?

—তোমাকে ঘর পেঁছিয়ে দিব।

—আমার ঘর নাই।

—মিছা কথা। যদি মেয়েমানুষ হও তো ঘর নিশ্চয় আছে।

—না গো না। আমার নাইহর নাই, শশুরার নাই, কিছু নাই।

—তুমি খুব নেশা করেছ। কেন করলে ?

—তাতে তোমার কি ?

—আমার কিছু নয়। তুমি মরবে।

—কে মরাবে আমাকে ? কোন্ জানোয়ারে ?

—জানোয়ারে নয়, মানুষে !

—কোন মানুষের সাধ্যি নাই গো সরদার।

হেসে ওঠে দাশু। কিন্তু মেয়েমানুষটার লাল চোখ শিকরে বাজের চোখের

মত কটমট করেঃ হাস কেন গো সরদার? একবার ছুঁতে এসে দেখ না কেন, কি হয় তোমার?

—কি করবে তুমি?

—তোমার মত কত গাঁওয়ার এই কিষাণীর গা ছুঁতে এসে বুঝে নিয়েছে, আমার দাঁতে আর নখে কত বিষ আছে।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি কিষাণী?

—হ্যাঁ গো। তুমি কি মনে করেছ?

—আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা বেইদানী।

মেয়েমানুষটার লাল চোখ হঠাৎ ছলছল করে ওঠেঃ তুমি ভুল বুঝ নাই সরদার। কিষাণী ছিলাম, কিন্তু বেইদানী হয়েছি। আমার কপালটা আমাকে বেইদানী করে দিয়েছে সরদার।···ও কি করছো? ছিঃ!

দাশুর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ধিক্কার দিয়ে ওঠে কিষাণী। আর চটপট হাত চালিয়ে জলের নীচের বালু ঘেঁটে স্বচ্ছ জল ঘোলা করে দেয়।

হ্যাঁ, খুবই স্বচ্ছ জল। সেই জল যেন এই কিষাণীর শরীরের একটা স্বচ্ছ সাজ। কী অদ্ভুত সাজ! সবই দেখা যায়। আবরণ বটে, তবু আবরণ নয়। কিষাণী গুটিসুটি হয়ে গলা পর্যন্ত শরীর ডুবিয়ে বসে থাকলে হবে কি? দাশু যে কিষাণীর ঢলঢল শরীরের সব ছবি দু চোখ ভরে দেখে ফেলেছে।

দাশু বলে—তোমাকে বড় দুখী মনে হয়।

কিষাণী হাসেঃ হয় তো হয়। এখন চুপচাপ চলে যাও, আর ঘরে গিয়ে কিষাণীর দুখের কথা ভেবে ভাত খেও না।

কথা বলে না দাশু। কিষাণীও আনমনা হয়ে ওর লাল চোখের নেশার সুখে কি-যেন ভাবে। বিকালের রোদ এবার সব তেজ হারিয়ে একেবারে সিঁদুরে হয়ে স্রোতের জল পাথর আর বালুর উপর যেন রংঝারি ঢালতে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির ওড়ে। কুরুর কুরুর, বনমোরগের দল শব্দ করে উড়ে এসে স্রোতের ধারে বসে আর তখুনি উড়ে পালিয়ে যায়।

দাশু হাসে—তোমাকে বেশ সুখী মনে হয়।

কিষাণী এইবার যেন গর্ব করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠেঃ কেন সুখী হব না? গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি। মানঝিদের ঠাঁই ময়ুর-পাখা খরিদ করি। চার আনায় এক গোছা পালক পাই, বেপারীর কাছে চার টাকায় বেচে আসি।

দাশু—তোমার বিয়া হয় নাই?

—বিয়াতে লাভটা কি আছে গো সরদার? মরদের দাসী হতে বলছো?

—ঘরণী কি মরদের দাসী হয়?

—দাসীই হয়। কিন্তু মিছা নিজেকে ঘরণী ভেবে গমর করে।

—দাসী বল আর যা-ই বল, মেয়েমানুষ যদি মরদ না পায় তবে···।

খিলখিল করে হেসে আর দু হাত তুলে খোলা চুল গুটিয়ে পাকিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে কিষাণী বলে—ছিয়া ছিয়া!

দাশু—তুমি ক্ষেপী বট।

—আমি ক্ষেপী নই। যে মাগি মরদের গা ছোঁয়, সে মাগি ক্ষেপী।

—ক্ষেপী হয়েও ওরা তোমার চেয়ে সুখী।

—কেন ?

—ওরা ছেইলা পায়।

—ছেইলাওয়ালীর কপালে ঝাড়ু।

—কেন ?

—ছেইলা যে ডাইন বটে গো। মায়ের রক্ত খায়।···ও কি ? আবার ?

দু হাতে বালু ঘেঁটে জল ঘোলা করে দিয়ে আবার দাশুর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে কিষাণী।

দাশু বলে—তুমি উঠে এসো!

কিষাণী—তুমি সরে যাও।

দাশু—আমি তাকাব না। এবার উঠে এসে শাড়িটা ধর।

ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে কিষাণী। নেশায় ভরা লাল চোখে সন্দেহ টলমল করে।

দাশু বলে—বিশ্বাস কর।

কিষাণী—ঠিক তো ?

দাশু—হ্যাঁ।

কিষাণীর সন্দেহে ভুল নেই বোধহয়। দাশুর নিঃশ্বাস হঠাৎ উতলা হয়েছে। সত্যিই পলাশবনের এই নিভৃতের স্রোতের কাছে বিকালশেষের সিঁদুরে আলো যেন মহুয়ারসের চেয়েও বেশি মাদক। সারা পলাশবন নেশা চাইছে। নাইহর নাই, শশুরার নাই; বিয়া করে না, ছেইলা চায় না; তবু মেয়েমানুষ। এ কেমন মেয়েমানুষ ? এমন মেয়েমানুষের শরীরে কোন্ জাদু আছে ? দাশু ঘরামির চোখের পিয়াস দুরন্ত হয়ে উঠেছে।

টি-হা টি-হা টি-হা!—ডেকে উঠেছে পাখিটা। কিষাণীও হেসে ওঠে: পাপিহাটা তোমার মত চালাক বটে। সরে যাও এবার; উঠতে দাও।

সরে যায় দাশু। মাথা হেঁট করে পায়ের কাছে শক্ত পাথরটার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটোকেও যেন পাথরের মত শক্ত করে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উঠেছে কিষাণী। কিষাণীর ছায়াটা দাশুর প্রায় গা ঘেঁষে চলে যায়। বুঝতে পারে দাশু, এইবার কিষাণী ওর শাড়িটাকে তুলে নেবার জন্য হাত নামিয়েছে।

কেঁপে ওঠে দাশুর চোখ। দাশুর লাল চোখের পিপাসার স্বপ্নটা এই মুহূর্তে ঢাকা পড়ে যাবে। ঠকে যাবে দাশু ঘরামির এতক্ষণের তপ্ত নিঃশ্বাসের আশা। মুখ ফিরিয়ে তাকায় দাশু।

কিষাণী রাগ করে আর চিৎকার করে ওঠবার, আর শাড়িটা হাতে তুলে নেবার আগেই দাশু তার বিবশ বুকের সব ধুকপুক শব্দের বেদনা নিয়ে ছুটে এসে কিষাণীকে দু হাতে বুকের উপর জড়িয়ে চেপে ধরে। পৃথিবীর কোন মেয়েমানুষ নয়, এই পলাশবনের মেয়েমানুষ। স্রোতের জলে স্নিগ্ধ করা,

াঁড়িয়ার নেশায় মাতাল করা, আর বিকালের সিঁদুরে আলোতে রঙিন করা একটা রক্তমাংসময় কোমলতা।

দাশু বলে—তোমার দাঁতে নখে বিষ আছে জানি। কিন্তু আমাকে মাপ কর কিষাণী।

—কি? দাঁতে দাঁত ঘষে মুখটাকে কুৎসিত করে নিয়ে প্রশ্ন করে কিষাণী। কিষাণীর নেশার চোখ থরথর করে কাঁপতে থাকে; কিন্তু কেঁপে কেঁপে যেন শান্ত হতেও থাকে।

দাশুর গলার স্বর এইবার যেন বুকের ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে উঠে আবেদন করে: আমাকে ঠকাবে না কিষাণী।

কিষাণী—কেন? তুমি আমার কে?

দাশু—তুমি যা বলবে, তাই।

কিষাণীর লাল চোখের উদ্‌ভ্রান্তি যেন নতুন এক উষ্ণতার আবেশে কোমল হয়ে ছলছল করে। দাঁতের আর নখের হিংস্র অহংকার হঠাৎ জব্দ হয়ে গিয়েছে। ফুঁপিয়ে ওঠে কিষাণী—তা হলে কসম খাও; আমি যা বলবো, তাই মেনে নিবে।

দাশু—নিশ্চয়।

কিষাণী—তবে আমিও নিশ্চয়।

দাশু—এখনই তো?

কিষাণী—না সরদার, এখন না।

দাশু—কবে?

কিষাণী—পরে।

দাশু—না, এখনই।

আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে পলাশবনের মেয়েমানুষ। লাল চোখের নেশাটা যেন গলে পড়তে চাইছে। চোখ বন্ধ করে বলে—তুমি আমাকে মরতে বলছো সরদার! বেশ…কিন্তু কথা দাও যে…।

দাশু—বল।

—তুমি আমার সাথে থাকবে। বিয়া হবে না, তবু থাকবে। আমি তোমাকে ভাত দিব, কাপড় দিব। তোমার নেশার মদ দিব। আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে যাবে। আমি না বললে তুমি আমার গা ছুঁবে না। আমি তোমার গা ছুঁলে তুমি না বলবে না। যেদিন চলে যাব সেদিন আর আমাকে খুঁজবে না।

দাশু—তুমি আমাকে বেইদা হতে বলছো?

কিষাণী—হ্যাঁ। যতদিন ভাল লাগবে দুজনে মাগিমরদ হয়ে এক সাথে থাকবো। ভাল লাগবে না যেদিন, সেদিন ছাড় হয়ে যাবে। ছেড়ে যেতে কারও মনে কোন দুঃখ হবে না।

দাশু—শুধু দুটো দিনের এমন সুখে লাভ কি?

কিষাণী—তবে একটিবারের এমন সুখে লাভ কি? তবে তুমি এখনই পাগল হয়েছ কেন, আর আমাকে এখনই মরতে বলছো কেন?

কিষাণীর মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে দাশু। ফিসফিস করে তপ্ত নিঃশ্বাসের বাতাস দাশুর মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে কিষাণী বলে—ঢের দিন এক ঠাঁই ভাল নয়। ঢের দিন এক মরদ ভাল নয়। ঢের দিন এক মাগ ভাল নয়। ছেইলাও ঢের দিন ভাল নয় সরদার। দুটা দিন কাছে রাখ, তারপর চালান করে দাও। যে নিবে নিয়ে যাক্। ঢের দিন কারও সাথে মজেছ কি মরেছ। সুখ হবে এতটুকু, দুখ হবে এত!

দপ্ করে, যেন একটা উল্লাসের জ্বালায় দাশুর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে; এই তো ভাল। বড় ভাল কথা, খুব ঠিক কথা, বড় ভাল সুখের কথা বলেছে কিষাণী।

—একটুক বুঝে নিয়ে কথা বল সরদার? যদি না বুঝে থাক, তবে…। কিষাণীর শরীরটা যেন অভিমান করে দাশুর বুকের ছোঁয়া থেকে সরে যেতে চায়; তাই কেঁপে ওঠে।

পলাশবনের নিভৃতে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া যে স্বাদুতা দাশুর লুব্ধ বুকের উপর পড়ে আছে, সে স্বাদুতা হারিয়ে ফেলবার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হলে দাশু ঘরামির রক্তের সুখ বুঝি শুকিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে দাশু—বুঝেছি।

কিষাণী—তবে শুন।

দাশু—বল।

—এই হাঁড়ির মদে আমি ধুতরা মিশিয়েছি।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—না। তোমাকে আমি মরতে দিব না। এই হাঁড়িকে আমি লাথি মেরে এখনি সোতের জলে ফেলে দিব।

হেসে ফেলে কিষাণী—আমি আমাকে মরাতে চাই না, সরদার।

—তবে কাকে মরাতে চাও?

—বলছি; তুমি আগে কথা দাও, আমার সাথে যাবে আর সে মাগিকে ধুতুরামারা এই হাঁড়িয়া খাইয়ে দিবে।

—সে মাগিটা কে বটে? ডাইনী বটে কি?

—ডাইনীর চেয়েও খারাপ বটে গো।

—কে?

—মধুকুপির কিষাণী, দাশু ঘরামির মাগ মুরলী।

—দাশুর হাত দুটো হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পলাশবনের মাতাল মেয়েমানুষের নগ্ন শরীরটাকে যেন দু হাতের দশ আঙ্গুলের নখ দিয়ে খিমচে শক্ত করে ধরে রাখে।—কি বললে তুমি?

—হ্যাঁ গো সরদার। ও মাগি একটা খিরিস্তান শিকারীর সাথে নষ্ট হয়েছে। কে জানে, মাগি কোন্ জাদু করে শিকারীটার মন টেনে নিলে। আচ্ছা …হ্যাঁ গো সরদার…একটা কথা বলবে?

—বল?

—ঢং করে একটুক হাসলে, গির্জাবুড়িকে সেধে সেধে দুটা জবর কথা

।শখলে, একটা সিলাই কল নিয়ে ঘরঘর আর ফরফর করলে, একটা বাহারী রেশমী শাড়ি পরলে, গায়ে একটা জামা চড়ালে মেয়েমানুষের গতরের সোয়াদ কি মিঠা হয়ে যায় ?

—এ কথা কেন বলছো ?

—মনের জ্বালায় বলছি গো সরদার। আমার গতরে কী মজা নাই যে, আমাকে পেলে মরদ খুশি হবে না বল ? তবু খুশি না হয়ে ভেগে গেল।

—দাশু ঘরামির মাগের নষ্টামির কথা তুমি কোথা থেকে জানলে ?

—তেতরি ঘাসিনের ঠাঁই শুনলাম।

—তেতরি ঘাসিনের সাথে তোমার দেখা হলো কোথা ?

—বাবুরবাজারে।

—তোমার ঘর বাবুরবাজারে ?

—না গো। আমি হালে এসেছি। বাবুরবাজারের কাছে আমার সহিয়ার ঘর আছে। সহিয়ার মরদ পালকিতে খাটে।

—তুমি সেখানে থাক ?

—এখন আছি। কাজ ফুরালেই চলে যাব।...এ কি, কি হলো সরদার ? সরে যাও কেন ?

হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে, ছোট্ট একটা আর্তনাদের মত করুণ স্বরে প্রশ্ন করে পলাশবনের মেয়েমানুষ। কারণ, ওর তপ্ত নিঃশ্বাসের স্বপ্নটাকে বুকের উপর থেকে হঠাৎ ঠেলে আলগা করে দিয়ে দু'পা পিছনে সরে দাঁড়িয়েছে দাশু।

তাড়াতাড়ি শাড়িটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ায় সেই অদ্ভুত নারী, এইমাত্র সর্বস্ব অঙ্গীকার করে ধুতরাবিষ দিয়ে প্রচণ্ড এক হিংসার জ্বালা শান্ত করবার খেলায় দাশু ঘরামিকে সাথী করতে চেয়েছে যে। কিষাণীর মাতাল চোখ দুটোতে যেন ধুলোলাগা একটা ব্যথা কচকচ করছে। আস্তে আস্তে বলে—তুমিও কি আমাকে ঘিন্না করলে সরদার ? আমি তোমাকে ঠকাতে চাই নাই।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—তুমি চল।...সাঁঝ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি কর কিষাণী ...আমার ডর লাগছে।

দাশুর গলার স্বর যেন দুঃসহ যন্ত্রণায় ফেটে পড়েছে। বুকের ভিতর দাউ দাউ করছে একটা পোড়া বাতাস। এই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে যেতে না পারলে দাশু ঘরামির কলিজাটা ফেটে যাবে ; মধুকুপির মানুষ গল্প করতে গিয়ে হেসে উঠবে, রূপসী ডাইনীর পিছনে ছুটে গিয়েছিল দাশু ; আর ডাইনীটা ওর কলিজা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। ইচ্ছা করে নিজেকে মরিয়েছে বোকাটা !

পলাশবনের মেয়েমানুষের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যখন ডাঙার কাছে পেঁছায় দাশু, তখন ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়ে গিয়েছে। সড়কের উপর উঠতেই দেখতে পাওয়া যায়, দূরে বড়কালুর মাথার উপর বড় একটা তারা ফুটেছে।

দাশু বলে—খিরিস্তান শিকারিটা তোমার কে বটে গো ?

—দুশমন বটে। একদিন আমারই কপালে সিঁদুর দিয়েছিল দুশমনটা।

দাশু—তোমার নামটা কি বটে ?

—সকালী

দাশু বলে—তুমি এখন সিধা বাবুরবাজারে চলে যাও, সকালী। আমি আমার গাঁয়ে চললাম।

চেঁচিয়ে ওঠে সকালী—ছিয়া ছিয়া, তুমি আমাকে ঠকালে সরদার!

বড়কালুর মাথার উপর ফুটে-ওঠা বড় তারাটার দিকে আর-একবার তাকায় দাশু। সকালীর হাত থেকে হাঁড়িটা কেড়ে নিয়ে এক আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দেয়। তারপরেই এক লাফে পিছনে সরে যায়।

—তুমি কে বট সরদার? চেঁচিয়ে ডাক দেয় সকালী।

কোনও উত্তর না দিয়ে ছুটে চলে যায় দাশু। মধুকুপির বাতাসের গন্ধ বুকের ভিতরে না পাওয়া পর্যন্ত দাশুর জীবনের এই বিষাক্ত ভুলের জ্বালা আর লজ্জা বোধহয় কাটবে না।

রাতের মধুকুপির বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, অন্ধকারও বেশ নিবিড়। আর নীরবতাও যেন একটা থমথমে নেশার ঘোর।

দাশুর মাথার জ্বালা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আর, চোখের লালও সাদা হয়ে আসতে থাকে। হাতে পায়ে ক্লান্তি নেই, কিন্তু দু চোখে একটা অবশ ঘুম-ঘুম ক্লান্তির ভার জোর করে টেনে নিয়ে পথ হাঁটতে থাকে দাশু।

তবু, মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে থেকে-থেকে ঝাঁঝরের মত বেজে উঠছে। আর মনটাও কথা বলছে। সকালী সকালী! টি-হা টি-হা টি হা! সকালী আর দাশু!

দূর দূর। সকালী আর দাশু কেন? ওটা তো পলাশবনের একটা ভয়ানক অভিশাপের ছবি। সে ছবি আবার এতক্ষণ পরেও চোখের উপর ছমছম করে কেন? চোখে তো আর নেশাও নেই। দূর দূর। মনে মনে যেন ধমক দিয়ে আর ঘেন্না করে কুৎসিত একটা ভয়ের ছবিকে খেদিয়ে দিয়ে পথ চলতে থাকে দাশু। কপালবাবার দয়া আছে, তাই সকালীর লাল চোখের ছলছল মায়ার কাছে মরতে গিয়েও না মরে পালিয়ে আসতে পেরেছে দাশু।

কিন্তু সকালীর জন্য দুঃখ হয়। হালদারের জন্য যদি প্রাণে এতই পিয়াসের জ্বালা জ্বলে থাকে, তবে যাও না কেন, হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির সিস্টার দিদির কাছে গিয়ে খিরিস্তান হও। শাড়ি পর, জামা পর, ঢং করে হাস আর পলুস হালদারের সাথে ঘর কর।

সকালীর উপর একটা রাগও যেন দাশুর মাথার ভিতরে থেকে থেকে জ্বলে ওঠে। তুই মাগি মুরলীকে মরাবার কে রে? মরাতে হলে হালদারকে মরা না কেন, যে তোকে জংলী মাগি বলে ঘিন্না করে ছেড়ে দিয়েছে, তোকে মাগ বলে মেনে নিতে লাজ পায় যে হালদার?

বড়কালুর কাছের একটা জঙ্গলে হরতকী ভাঙতে গিয়ে কতবার দেখেছে দাশু, নাগিনে নাগিনে লড়াই বেধেছে। গায়ে সোনা রঙের ছোপ, চিকচিক করে

চোখ, এই লম্বা এক একটা নাগিন। লিকলিক করে ঘাসের উপর অলসভাবে ঘুরে বেড়ায়। আর, কোন নাগ-নাগিনকে একসঙ্গে দেখতে পেলেই ফণা তুলে নাগিনটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নাগিনে নাগিনে কি-ভয়ামক হিংসার মারামারি চলে! ছোবল কামড় আর হুটোপুটি। গায়ের সোনা রঙের ছোপ রক্তে আর ধুলোয় ঢাকা পড়ে যায়। নাগটা চুপ করে একদিকে বিঁড়ে পাকিয়ে আর শুধু ফণাটুকু উঁচিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। যে নাগিন মরে, সে নাগিন সেখানেই পড়ে থাকে। যে নাগিন বাঁচে, তারই সঙ্গে আবার জড়াজড়ি করে নাগটা। সকালীও যেন হরতকীর জঙ্গলের একটা নাগিন; নইলে মুরলীকে মরাতে চায় কেন?

তেতরি ঘাসিনটা ভয়ানক মিথ্যুক। মুরলীর নামে মিছা একটা নিন্দার কথা বলে দিয়েছে, আর সকালী নাগিনটাও সে-কথা বিশ্বাস করে ফেলেছে। তেতরি ঘাসিনকে এখন একবার কাছে পেলে ওর টুঁটি টিপে ধরে শুধাতে পারা যেত—কি লো ডাকবাংলার রাতের লুচ্চার দাসী, তুই কি দেখে মুরলীকে সন্দেহ করলি, আর এমন মিথ্যেটা রটালি?

হেসে ফেলে দাশু। সকালীর জন্য মায়া হয়। ভুল করে কাকে জড়িয়ে ধরল সকালী নাগিনটা?

খুব জোরে একটা হোঁচট খায় দাশু, আর ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। মুরলীর মরদ দাশু আজ ভুল করে কাকে জড়িয়ে ধরল? মুরলী যে পাগল হলেও সন্দহ করতে পারবে না, দাশু ঘরামির চওড়া বুকটা দুরদুরে পিপাসায় শতবার ছটফট করে উঠলেও মুরলী ছাড়া আর কোন নারীকে কাছে টেনে নিতে পারে। দাশু ঘরামির বুকটা কি পাপী হয়ে গেল?

রিমঝিম করে মাথাটা, মুরলীর উপর একটুও রাগ হয় না, বরং একটু মায়া হয়। আর, মনটাও ভীরু-ভীরু হয়ে স্বীকার করে, মুরলীর উপর রাগ করবার কোন অধিকার নেই দাশুর; মুরলীর চোখের চাহনিকে সন্দেহ করে টাঙ্গি তুলবার শেষ সাহস দাশুর বুক থেকে ঝরে পড়ে গিয়েছে।

পলুস আর মুরলী! দূর দূর! বেচারা পলুস হালদার! হালদারের কথা মনে পড়লে একটুও হিংসে হয় না, বরং করুণা হয়। পথ চলতে চলতে মধুকুপির ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় নিঃশ্বাসের জোর আবার জমে উঠতেই দাশুর প্রাণে যেন একটা দেনা শোধের হাসি শব্দ করে বাজতে থাকে। পলুসের দয়াকে পাল্টা দয়া দিয়ে শোধ করে দিয়েছে দাশু। সকালীকে বুকের উপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

গাঁয়ের পথে ঢুকতে সেই বড় পিপুলের কাছে পৌঁছবার আগেই চমকে ওঠে দাশু। থমকে দাঁড়াতেও হয়। সোরগোলের মত একটা শব্দ। মনে হয় পিপুলতলার কাছেই হৈ-হৈ করে কারা যেন ঠেঙ্গা দিয়ে টিন পিটছে। তবে কি বাঘিন কানারানী আবার কারও গরুর ঘাড় ভেঙেছে? পিপুলতলার কাছে অনেক আগুন জ্বলছে দেখা যায়। অন্ধকার যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘা-ঘা লাল-লাল হয়ে গিয়েছে।

সোজা ছুটে এসে পিপুলতলার কাছে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে দাশু, মধুকুপির বাতাস তেতে উঠেছে। ঝুরি কাঠের আগুন থেকে তাত উথলে উঠছে; আর দুখন গুরুজীর বাড়ির দাওয়ার উপর জাতপঞ্চের সভা বসেছে।

কানারানীর ভয়ে চারদিকে আগুন জেবলে আর একেবারে টাঙ্গি-বল্লম হাতে নিয়ে সবাই এসে পঞ্চে বসেছে। ছেলেগুলোর হাতে টিন আর ঠেঙ্গা।

গুরুজীর বাড়িটাকে এখান থেকে বেশ স্পষ্ট করে দেখা যায়। এই পাঁচ বছরে গুরুজীর অবস্থা আগের তুলনায় বোধহয় প'চিশ গুন ভাল হয়েছে। নইলে বাড়িটার চেহারা এত ফে'পে উঠবে কেন?

পিপুলের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে জাতপঞ্চের চেহারাটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে দাশু। এ কী চেহারা! জোয়ান বলতে দশ বার জনের বেশি হবে না; আর সবাই বুড়ো। কোথায় গেল নিধি, নটবর, হরিশ আর হরিপদ? দাশুর কাছাকাছি বয়সের আরও তো অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ ছিল। তারাই বা কোথায়?

তাছাড়া জাতপঞ্চের সভা গুরুজীর বাড়ির দাওয়াতেই বা বসে কেন? গাঁয়ের মুখিয়া রতন সরদার কি নাই? মরেই গিয়েছে বুঝি?

না, মরে নাই। ওই তো দাওয়ার উপর হাঁটু মুড়ে বসে আছে বড় বুড়ো রতন। শুকনো রোগা ও ঝিরঝিরে, একটা ভয়ানক দুঃখী চেহারা নিয়ে বসে আছে।

আর গুরুজী বসে আছে একটা চারপায়ার উপর। বাঃ, মধুকুপির জীবনের নিয়মটাও উলটে গেল! গুরুজীর না হয় ভাল টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু জাত-পঞ্চের সভায় গাঁয়ের মুখিয়া রতনের চেয়ে উচু ঠাঁই বসবে গুরুজী এটা কেমন করে হয়? পাঁচ বছর আগে এমনটা তো কোনদিন হতে দেখে নি দাশু।

যার নাম দুখন কাকা, তারই নাম গুরুজী। মধুকুপিতে জাতের মানুষের মধ্যে একমাত্র দুখন কাকা জোয়ান কালে গোবিন্দপুরে গিয়ে পাঠশালাতে কিছুদিন লেখাপড়া করেছিল। মনে পড়ে দাশুর, অনেকদিন আগে, দাশু তখন ছেলেমানুষ, এই দুখন কাকা একদিন জাতপঞ্চের সভায় সবাইকে জানিয়ে দিল—এবার থেকে দুখন দুখন বলবে না কেউ।

—কেন? বড় বুড়ো ওই রতনই প্রশ্ন করেছিল। রতনের চোখে সেদিন কত তেজ ছিল! দুখন কাকার চেয়ে বয়স বেশি হয়েও রতনের চেহারা সেদিন কী মজবুতই না ছিল!

—জিলা বোর্ড আমাকে এই গাঁ-এর গুরু করে দিয়েছে। পাঁচ টাকা মাসোহারা দিবে জিলা বোর্ড। বলেছিল দুখন কাকা।

জাতপঞ্চ একটু ভয় পেয়েছিল। বড় বুড়াও শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল। —তা গুরু হয়েছ যখন, তখন গুরুজী বলতে হবে।

তারপর দুখন কাকা যেদিন ঈশান মোক্তারের কুঠির বড় গমস্তা হল সেদিন থেকে দুখন কাকা বলে ডাকবার সাহসই আর কারও হয় নি। গুরুজী নামটা স্থায়ী হয়ে গেল।

দুখন কাকা এই গাঁয়ের একমাত্র মানুষ, যে মানুষ জাতে কিষাণ হয়েও কোনদিন নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে নি। গারুজী হবার আগেও না, গুরুজী হবার পরেও না। গাঁয়ের কোন লোক দুখন কাকার কাছে লেখাপড়া শেখে নি, দুখন কাকাও ভুলেও কোনদিন কাউকে লেখাপড়া শিখতে ডাকে নি। পাঁচ বছর আগে জেলে যাবার আগের মাসেও দেখেছে দাশু পাঁচ টাকা মাসোহারা আনবার জন্য সদরে চলেছে দুখন গুরুজী।

লড়াইয়ের সময় গুরুজীও, কে জানে কেমন করে, অনেক টাকার মানুষ হয়ে গেল। গুরুজী খুব ঘটা করে তার দশ বছর বয়সের মেয়ের বিয়ে দিল। মধুকুপির জীবনের ইতিহাসে সে এক নতুন ঘটনা। দশ বছর বয়সের মেয়ের বিয়ে; বিয়েতে মন্ত্র পড়ল এক বামুন পূজারী, ভুবনপুরের চক্রবর্তী। সবই অভিনব। গাঁয়ের লাইয়া সনাতন কেঁদে ফেলেছিল: এটা কেমনতর হলো? আমি থাকতে কিষাণের বেটির বিয়েতে একটা বামন এসে কাজ করাবে কেন?

গুরুজীও রাগ করে বলেছিল—রাতুগড়ের জোরদার সহদেব সিংহ আমার কুটুম হয়েছে। আমার বেটা-বেটির বিয়াতে তোমাকে দিয়ে কাজ করালে আমার মান থাকে না হে সনাতন।

জাতের মানুষ হয়েও জাতের দুঃখ থেকে বেশ একটু দূরে সয়ে গিয়েছে যে, আর জাতের মানের চেয়ে নিজের মান উঁচু করে দিয়েছে, সে মানুষ আবার তার ঘরে জাতপঞ্চের সভা ডাকে কেন?

এই পাঁচ বছরে গুরুজীর চেহারাও বেশ বদলে গিয়েছে। গায়ে খাটো জামা আছে, পরনে বেশ বড় ধুতি আছে, পায়ে খড়ম আছে, আর কপালে হলদে রঙের একটা ফোঁটাও আছে। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। দেখতে ঈশান মোক্তারের ছোট ভাইটির মত মনে হয়।

চারপায়ার উপর বসে বড় বুড়া রতনের দিকে হাত তুলে বেশ কড়া মেজাজের সুরে কি-যেন বলছে গুরুজী। এগিয়ে যায় দাশু।

দাশু এসেছে। দাশু এসেছে। সোরগোল পড়ে যায়। যেন হঠাৎ কতগুলি বিস্ময় আতঙ্ক আর বিদ্রূপ একসঙ্গে হৈ-হৈ করে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে জটা রাখাল —দাশু যখন এসে পড়েছে, তখন আগে ওর বিচার হয়ে যাক্।

দাশু হাসে—তোমরাও কি আমাকে দাগী মনে করলে জটা? আমার মাথা মুড়াতে চাও নাকি?

জটা রাখাল—তা পঞ্চ যদি বলে তবে মুড়াতে হবে।

চমকে ওঠে দাশু। জটা রাখালের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—বুঝে কথা বল জটা, কার মাথা মুড়াবার সাহস হয়েছে তোমার? দাশু কিষাণের মাথা?

জটা রাখাল আবার চেঁচিয়ে ওঠে—বাবু দুখন সিংহ এখনি বলে দিবেন, তোমাকে জাতে রাখা উচিত হবে কি হবে না।

—বাবু দুখন সিংহ কে বটে? বলতে বলতে আর দুঃসহ বিস্ময় সহ্য করতে করতে গুরুজীর মুখের দিকে তাকায় দাশু।

—আমি। ভ্রুকুটি করে দাশুর দিকে তাকায় সেই মানুষটি, যাকে এতদিন গুরুজী বলে জেনে এসেছে দাশু।

জটা রাখাল আবার চেঁচিয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করে। বাবু দুখন সিংহ ইসারায় জটা রাখালকে থামিয়ে দিয়ে আর বড় বুড়া রতনের মুখের দিকে ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে বেশ উত্তপ্ত স্বরে আক্ষেপ করে ওঠে: জাতপঞ্চ ডেকেছো, জাতের কথা বল। কেমন করে জাতের সুধার হবে, জাতের মান বড় হবে, সেই কথাটি ভাব। কে তোমাদিগে জমি দিবে কি দিবে না; ঈশান মোক্তার বীজ-লাঙ্গল দিবে কি দিবে না, পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী কেন পরবী নিবে, এসব কথা নিয়ে যদি জাতপঞ্চের সভায় চেঁচাতে চাও তো চেঁচাও, আমি এসবে নাই।

—কেন নাই? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—কি বললে তুমি? আরও জোরে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে দুখন সিংহ।

দাশু—জাতের মানুষ দুখ পায়, সে কথাটি ভেবে জাতপঞ্চ চেঁচাবে না তো কে চেঁচাবে?

দুখন সিংহ—যে যার করমফলে ভুগে। চেঁচালে কি হবে?

দাশু—কি বললে দুখন বাবু?

দুখন সিংহ—করমফল।

দাশু—সেটা কি বটে!

দুখন সিংহ—তোমার দশাটি যা বটে।

রতন বলে—দাশুর কথাতে তুমি রাগ কর কেন দুখন বাবু? ঠিক বলেছে দাশু। তুমি পৈতা নিয়েছো, রাজপুত সিংহ হয়েছো, বামন লাগিয়ে বেটা-বেটির বিয়া দিয়েছো, তুমি বনচণ্ডীর মূর্তি বসিয়েছো, তাতে…।

—তাতে কি? আবার রুষ্ট স্বরে প্রশ্ন করেন দুখন সিংহ—হিংসা করে কথা বল কেন রতন?

রতন বোকার মত হাসে: হিংসা করছি না। তুমি বল, তা হলে কি করলে আমাদিগের দুখটা মরবে?

দুখন সিংহ—আগে জাতের সুধার কর।

রতন—বল, কি করতে হবে?

দুখন সিংহ—ধরম সুধার কর।

রতন—বল কি করতে হবে?

দুখন সিংহ—কুঁকড়া খাওয়া ছেড়ে দাও।

—কেন ছাড়বো? রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করে ওঠে দাশু।

দুখন সিংহ—তা না হলে চক্রবর্তী তোমাদিগের কারও বেটা-বেটির বিয়াতে কাজত করতে রাজি হবে না।

দাশু—না হবে তো না হবে। আমাদিগের বামনে কাজ নাই। আমাদিগের লাইয়া সনাতন কি মরেছে?

সভার ভিড়ের এক কোণ থেকে যেন আর্তনাদ করে ওঠে সনাতন—আমি

বেঁচেই আমি দাশু। কিন্তু দুখনবাবু আমাকে মরাতে চায়। বামন চক্রবর্তীকে পাঁচ বিঘা জমি পাইয়ে দিয়েছে দুখনবাবু, আমাকে এক কাঠাও দিবে না বলেছে।

দাশু—কে তোমাকে মরাবে সনাতন? কপালবাবা কি নাই? জাহির বুরু কি নাই? সিনবোঙা কি দেখছে না?

—তুমি চেঁচাচ্ছ কেন দাশু, তুমি বুঝ কি? চোখ পাকিয়ে দাশুর দিকে তাকিয়ে থাকে বাবু দুখন সিংহ।

দাশু—তুমি বুঝিয়ে দাও দুখন বাবু।

দুখন সিংহ—সিনবোঙা আর জাহির বুরুকে পুজবে, কপালবাবাকে মানবে, রুদরাকে তুষবে, আমি মানা করছি না। কিন্তু চারটি মানা মানতে হবে, না হলে জাতের কপালে সুখ নাই।

দাশু—বল, কি মানা মানতে হবে?

দুখন সিংহ—কুঁকড়া খাবে না, কুঁকড়া বলি দিবে না, করমে ঘরের বেটি বহিন বহুড়ি নাচবে না; আর বেটি বহিনের বিয়ার বয়স বারো বছরের বেশিটি হবে না। আর···।

দাশু—হঁ্যা, বলে যাও দুখন বাবু। শুন পঞ্চ শুন।

দুখন সিংহ—আর বনচণ্ডীর পূজাও করতে হবে।

দাশু—বনচণ্ডীর পুজা করলে কি লাভ হবে, সেটা একটুক বুঝিয়ে বল দুখন বাবু।

দুখন সিংহ—বনচণ্ডী হলেন মহামায়া। তুমি জান না দাশু, তুমি জেলে ছিলে, এরা সকলে জানে, আমি কত ভক্তি করে দেবীকে এই পিপুলতার ঠাঁই বসিয়েছি। জাতের ভাল মানত করে আমি অনেক ভেবেছি, অনেক করেছি দাশু; তুমি কিছু জান না। তাই চেঁচাচ্ছ।

মুখ ঘুরিয়ে পিপুলতলার দিকে তাকায় দাশু। দেখতে পায়; হঁ্যা, ঠিকই তো, ইঁট দিয়ে গাঁথা ছোট একটা ঘর। ঘরের দরজার কপাটে সিঁদুরের ছাপও দেখা যায়। দুটো লাল জবার গাছও দুলছে।

দাখন সিংহ বসে—বনচণ্ডী কৃপা করলে মানুষ কি না পাবে? আর ভক্তকে দেবী কি না দিবে?

দাশু—জমি দিবে?

দুখন সিংহ—জমির কথা ছেড়ে দাও। ওসব ছার কথা। দেবী পুণ্য দিবে, মোক্ষ দিবে, আত্মার গতি করে দিবে, আর জনম নিতে হবে না।

জাতপঞ্চের সভার ভিড় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুখন সিংহ যেন বীরু ওঝার মত সাদা মাথাটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নতুন রকমের ধুলাপড়া পড়ে মধুকুপির বুক নতুন ভয়ে ভরে দিচ্ছে; তাই হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে জাতপঞ্চ। কিছু বুঝতে পারা যায় না, তাই আরও বেশি ভয় করে।

দুখন সিংহ বলে—তোমরা পালা করে চক্রবর্তীর জমি চষে দিয়ে বামনের নমস্কারি দিবে। চক্রবর্তী খুশি হয়ে তোমাদিগের মাথায় পায়ের ধুলা দিবে।

তোমাদের বেটি-বহিনের বিয়াতে কাজ করবে।

ঝুরিকাঠের আগুন চিড়বিড় করে ফুটতে আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আগুনের ছায়া লেগে দপ্ দপ্ করে জাতপঞ্চের ভিড়ের মুখগুলি।

এই স্তব্ধতার ঘোর কেটে যেতে সময়ও লাগে। শুকনো রোগা ও ঝিরঝিরে বড় বুড়া, গাঁয়ের মুখিয়া রতন আরও কিছুক্ষণ উসখুস করে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে বলে—কেমন পূজাটা নিবে বনচণ্ডী?

দুখন সিংহ—সবই নিবে। চাল ফুল আর ফল নিবে। যত ইচ্ছা ছাগবলি দাও, সব নিবে। পয়সাও নিবে। আর, স্নানটি করে ভিজা কাপড়ে মাটির ভাঁড়ে ভরে নিয়ে যে মহুয়ামদ দিবে, তাও নিবে। কিন্তু কুঁকড়া বলি নিবে না।

বড় বুড়া হাঁক দেয়—বল পঞ্চ, বল।

জাতপঞ্চের ভিড়ের মাথাগুলি দুলে ওঠে, কিন্তু চেঁচিয়ে সাড়া দিতে পারে না। দুখন সিংহের কথাগুলি সত্যিই ধুলপড়ার মত পঞ্চের মুখ যেন বেঁধে দিয়েছে।

আবার হাঁক দেয় বড় বুড়া রতন—বল পঞ্চ বল, হঁ্যা কি না?

—না। চিৎকার করে ওঠে দাশু।

সঙ্গে সঙ্গে জাতপঞ্চের সভার বোবা-বোবা আর ভীরু-ভীরু মুখগুলি ঝুরিকাঠের আগুনের মত নতুন বাতাস পেয়ে চিড়বিড় করে ফুটে ওঠে: না, না, না।

দুখন সিংহ ভ্রুকুটি করে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে; গলায় চাদর, কপালে হলদে ফোঁটা, পায়ে খড়ম, নতুন মানের মানুষ দুখন সিংহ। জাতপঞ্চের আপত্তির রব কর্কশ কোলাহলের মত বাজতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে দুখন সিংহ—কিসের না? বনচণ্ডীর পূজা দিবে না?

বড় বুড়া—তা দিব না কেনে? আমরা কি ভুবনপুরের কালীথানে ছাগবলি দিই নাই? গোবিন্দপুরের ঠাকুরবাড়িতে পূজা দিই নাই? বামনের ঠাকুর যদি পূজা নেয়, তবে পূজা দিব না কেন?

—কিন্তু জাহিরথানে কুঁকড়া বলি দিব। হাত তুলে হাঁক দেয় দাশু।

—নিশ্চয় দিব। চেঁচিয়ে সাড়া দেয় জাতপঞ্চ। সোরগোল ওঠে। এক একটা প্রতিবাদের শব্দ আক্রোশের স্বরে ফেটে পড়তে থাকে।

—গাঁয়ের সব মেয়ে করম নাচবে। নিশ্চয় নাচবে।

—বেটা-বেটির বিয়াতে বামনের দরকার নাই।

—কোন দরকার নাই।

—বামন পুষবার পয়সা নাই।

—বেটি-বহিন ডাগর হবে, তবে বিয়া হবে।

—নিশ্চয় হবে। রাঢ়ির বিয়া হবে, সাগাই বিয়া হবে। সব হবে। যেমনটি হয়ে এসেছে, তেমনটি হবে। জাতের সুধার চাই না।

সোরগোল আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসে। জাতপঞ্চের সভাও আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। আর দাশুর দু চোখে একটা জয়ের হাসি ঝিক্ ঝিক্ করে।

আজকের দিনটা দাশু ঘরামির জীবনে যেন সব বাধা জয় করা একটা অভিযানের দিন।

দুখন সিংহ বলে—বাস্‌, আমাকে কোনদিন আর কিছু বলতে এসো না। তোমাদিগকে বাঁচাবার সাধ্যি আমার নাই।

হেসে ফেলে দাশু ঃ তুমি জাতের ঘরে বামন ঢুকাতে এসো না দুখন বাবু; তাতেই জাত বেঁচে যাবে।

এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জটা রাখাল ঃ কিন্তু জাতের ঘরে খিরিস্তান ঢুকলে জাত বাঁচবে কি?

জাতপঞ্চের সভা সেই মুহূর্তে আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। বড়া বুড়া রতন আবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। সভায় ভিড়ের চোখগুলি দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে। এইবার মনে পড়েছে সবারই, দাশুর ঘরের গণ্ডগোল নিয়ে জাতের মান যে সমস্যায় পড়েছে, সেই সমস্যার একটা হেস্ত-নেস্ত করবার জন্য আজ বাঘিন কানারানীর উৎপাতের ভয়ে সন্ত্রস্ত এই রাত্রিতে দুখন সিংহের বাড়িতে জাতপঞ্চের সভা ডাকা হয়েছে। দাশু ঘরামি এই পাঁচ বছর ঘরে ছিল না। দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর গির্জাবাড়ির মেম এসে খিরিস্তানী শোলোকে গান করে গিয়েছে। তবু ঘর থেকে ভেগে গিয়ে খিরিস্তানী হয়নি দাশুর মাগ মুরলী। কিন্তু গাঁয়ের ঘরে থেকেও, আর দাশু ঘরে ফিরে আসবার পরেও এ কেমন কাণ্ড? দাশু কি জেনেছে যে, মুরলীর সাথে খিরিস্তান শিকারীটার চলাচলি হয়েছে?

জটা রাখাল হাঁক দেয়—বল পঞ্চ, বল।

দুখন সিংহ রাগ করে হাঁক দেয়—তুই মিছা হাঁকিস কেন জটা? এরা সব খিরিস্তান হবে আর মরবে। এদের মরতে দে।

—কে খিরিস্তান হবে রে জটা? কে মরবে গো দুখন বাবু? দাশু ওঠে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে আর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

জটা রাখাল আবার হাঁক দেয়—বল পঞ্চ, বল। ঠিক কথাটা বল। দাশুর ঘরের কাণ্ডটা বল। বলতে এত লাজ কেন, ডর কেন?

জাতপঞ্চের মেজাজে আবার যেন ঝুরিকাঠের আগুনের আঁচ এসে লেগেছে দুলে ওঠে মাথাগুলি, আর একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে মুখগুলি।—কিসের লাজ? কে ডরাচ্ছে? কিসের ডর? বল বড় বুড়া, বল।

বড় বুড়া রতন চেঁচিয়ে ওঠে—দাশু ঘরামির ঘরণী মুরলী খিরিস্তান শিকারীটাকে ঘরে ডাকে কেন?

জটা রাখালের গলা আরও বিষাক্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—শিকারীটা মুরলীর গা ছোঁয় কেন?

দাশুর চোখের সাদাও সেই মুহূর্তে যেন বিষের জ্বালায় লাল হয়ে ওঠে। জাতপঞ্চের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কোন্‌ মিথ্যুক বলেছে? কোন্‌ কানায় দেখেছে?

—কে না দেখেছে?

—সবাই দেখেছে।

—চুপ কর দাশু।

—চেঁচিও না দাশু।

—ছিয়া ছিয়া ছিয়া!

জাতপঞ্চের ভিড়ের এক-একটা মুখ থেকে এক-একটা রুষ্ট ধিক্কার উথলে উঠতে থাকে। দুখন সিংহের ঠোঁটের ফাঁকে একটা কুটিল হাসি পাকিয়ে পাকিয়ে সাপের মত কিলবিল করতে থাকে। আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন পুড়তে থাকে দাশু। মধুকুপির রাতের বাতাসটাই আগুন হয়ে গিয়েছে।

বড় বুড়া রতন বলে—জবাব দাও দাশু।

—জবাব নাই। থরথর করে চোখ কাঁপিয়ে উত্তর দেয় দাশু।

—কোন জবাব নাই? বড় বুড়া রতন ও সেই সঙ্গে পঞ্চের সবাই রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।

—মিথ্যা কথা বিশ্বাস করি না।

—কি? জাতপঞ্চের গলা এক সঙ্গে কেঁপে গরগর করে ওঠে।

—মিথ্যা কথা, তোমাদিগের মতলবের কথা, তোমাদিগের হিংসার কথা। বলতে বলতে যেন হঠাৎ পাগল হয়ে জাতপঞ্চের সভার ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ে দাশু, তারপরেই ছুটে পালিয়ে যায়।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। বিশ্বাস করে ফেললে দাশু ঘরামির পাঁজর-গুলি এখনি পট পট করে ভেঙে যাবে; তাই ভয়ানক অভিযোগে মুখর ওই জাতপঞ্চের সভাকে একটা চিৎকার করে ধমক দিয়ে পালিয়ে এসেছে দাশু।

কিন্তু জাতপঞ্চের সভার ঝুরিকাঠের আঁচটা যেন দাশুর গা ঘেঁষে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, দৌড় দিলে এই আঁচটাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায়। ছুটে চলতে আর ইচ্ছা করে না। হাঁটতে গিয়ে পা দুটো বার বার মধুকুপির কাঁকুরে মাটিতে ঘষা খায়; বুকটা হাঁপায়। অবিশ্বাস করবার জোরটাই আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছে, আর, ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে নিঃশ্বাসের সাহসও যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

পলুস হালদারের দয়ার রহস্যটা যেন এই অন্ধকারের মধ্যেই দাশুর চোখ-মুখের ব্যথাটাকে দেখতে পেয়ে মুখ টিপে হাসছে। পলুসের ঠাট্টার হাসি, গর্বের হাসি, জয়ের হাসি। গোবিন্দপুর থানার সন্দেহ থেকে দাশুকে ছাড়া পাইয়ে দেবার জন্য থানার কাছে গিয়ে একটা সত্য কথা বলেছে পলুস, ওটা যে পলুসের জীবনের জয়ের হুংকার। দাশু ঘরামি কয়েদ হয়ে দূরে সরে গেলেই বা কি, আর ছাড়া পেয়ে ঘরে থাকলেই বা কি? দাশুকে একটা বাধা বলে মনে করে না পলুস। মুরলীর মুখের হাসির অঙ্গীকার পলুসের আশার পিপাসাকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে রেখে দিয়েছে। মুরলীর গা ছুঁয়ে সুখী হবার সুযোগ যখন খুশি তখন পেয়ে যায় পলুস; পেয়ে গিয়েছে আর পেতেই থাকবে পলুস।

এই তো ঘর। পথের উপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। ওই তো

পুরনো জামকাঠের কপাট। কপাটের ফাঁকে আলো দেখা যায়। কে জানে, আলোটা এখন ঘরের ভিতরের কোন্ খুশির ছবি দেখছে? শিকারীটার বুকের উপর কি ঢলে পড়ে আছে মুরলী?

না, আর এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে না। পা টিপে টিপে নিজেরই ঘরের দিকে আজ চোরের মত এগিয়ে যেতে হবে, এই শাস্তি সহ্য করবার আর দরকার কি? কিন্তু একটা চরম জানা না জেনে নিয়ে চলে যাওয়াও যে যায় না। মধুকুপির রাতের জানোয়ারের মত আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জামকাঠের কপাটের ফাঁকে চোখ ঘষে দাশু।

কিছু দেখা যায় না। কপাটের উপর কান পাতে দাশু। শিউরে ওঠে দাশু ঘরামির পাথুরে গাঁথুনির শরীর; অভিমান করে ফোঁপাচ্ছে ঘরটা, কথা বলছে ঘরটা।—না আর এখানে থাকবো কেন? থেকে লাভ কি? আমি যাব, নিশ্চয় যাব।

জামকাঠের কপাট দু হাতের দশ আঙুলের নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে দাশু। ঠক ঠক করে মাথাটা কাঁপে। আবার গুন গুন করে কেঁদে এই ঘরটাকে ধিক্কার দিচ্ছে মুরলী—এ ঘরে থাকলে মরণ হবে। এ ঘরে আর থাকবো না। কভি না।

তবে কি পলুস হালদারের বুকের উপর ঢলে পড়ে আবেদন করছে মুরলীর প্রাণ?

না, আর বাধা দেবে না দাশু। টাঙ্গি হাতে তুলে নেবে না। হাতটাকে কপাটের উপর যেন আছড়ে দিয়ে ডাক দেয় দাশু—মুরলী!

খুলে যায় কপাট। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটার দিকে উদাস-ভাবে তাকিয়ে থাকে দাশু। ঘরের ভিতরে কোন নতুন ছায়া নেই। রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা শুধু মিটমিট করে জ্বলে। যেন ঘরের শূন্যতাকে দাশুর ক্লান্ত চোখের উপর তুলে ধরে মিটমিট করে ঠাট্টা করছে বাতিটা।

কেউ নেই? এ কি করে হয়? একটা পাল্টা সন্দেহের চমক লেগে কেঁপে ওঠে দাশু ঘরামির উদাস চোখ। মুরলীর মুখের দিকে তাকায়। একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরে। ভয় পেয়ে, আশ্চর্য হয়ে, আর যেন হঠাৎ হোঁচট-লাগা একটা ব্যথার জ্বালায় ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু: তুই কাঁদছিস কেন মুরলী?

ঘরের মেজের উপর খেজুর পাতার চাটাই ছড়িয়ে পড়ে আছে। দাশুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুরলী আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চাটাইয়ের উপর বসে পড়ে। তার পরেই দু হাত দিয়ে দু হাঁটু জড়িয়ে পেটের উপর চেপে ধরে নিথর হয়ে বসে থাকে।

মুরলীর মাথাটা ভেজা। জলের ঘটিটা কাছেই আছে। ঘরের মেজের অনেকখানি মাটিও জলে ভিজে কাদা কাদা হয়ে উঠেছে।

—তোর কিসের কষ্ট হলো, বল মুরলী। ডাক দেয় দাশু।

দুই হাঁটু আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, যেন ঘোর নেশার বেদনার মত শরীরের একটা বিবশ কষ্টের রহস্যকে ভয় পেয়ে আরও জোরে চেপে ধরে মুরলী।

তারপর কেঁদেই ফেলে : সত্যি যে আমার ছেইলা আসছে গো ?

আশ্চর্য হয় দাশু : কেন, তুই কি তবে আগে বুঝিস নাই ?

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মুরলী : আগে বুঝেছিলাম, তোমার ছেইলা আসছে। আজ বুঝলাম গো, এটা আমার ছেইলা বটে !

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দাশু বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। মুরলীর প্রাণ আজ কেন হঠাৎ কেঁদে কেঁদে আর হিসাব করে এরকম একটা অদ্ভুত নতুন কথা বলছে ? দাশু বলে—কেন বুঝলি, কেমন করে বুঝলি ?

মুরলী—এটা যে আমার গতর জ্বলাতে শুরু করলে গো। শুতে পারি না, ঘুমাতে পারি না, দম উগরে উঠছে। আরও কত জ্বালা জ্বলাবে, কে জানে ?

মুরলীর কাছে সরে আসে দাশু। মুরলীর ভেজা মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলে—তুই ঠিক বুঝেছিস। কিন্তু কাঁদিস কেন ?

মুরলী—আমি যাব। এ ঘরে আমার ছেইলা বাঁচবে না। আমি এখানে থাকবো না।

দাশু ঘরামির সান্ত্বনার হাত যেন হঠাৎ অপমানের আঘাতে ব্যথিত হয়ে কেঁপে ওঠে। দাশুর মনের একটা হেঁয়ালির ঘোরও কেটে যায়। এই কথা! এতক্ষণ ধরে এই খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে বসে মুরলী তা হলে ওর জীবনের একটা আশার সঙ্গে কথা বলছিল। চলে যেতে চায় মুরলী। কিন্তু কোথায় কার কাছে ?

টাঙিটা ঘরের এক কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেদিকে নজর পড়লেও দাশুর হাতে আর সেই আক্রোশের জোর হিংস্র হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই আক্রোশহীন অলস হাতের একটা অভিমানের জ্বালা দাশুর দু চোখের চাহনিতে ফুটে উঠে অলস হিংস্রতার মত মিট মিট করে জ্বলে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—জাতপঞ্চ আজ কি বলেছে শুনবি ?

মুরলী—কি ?

দাশু—তুই খিরিস্তান শিকারীটাকে ঘরে ডেকেছিস। সে-ও তোর গা ছুঁয়েছে।

মুরলী বলে—হঁ্যা।

—হঁ্যা! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। দাশুর পাঁজরের হাড় পট পট করে বেজে ওঠে।

মুরলীর গলার স্বরও যেন হিংস্র হয়ে জবাব দেয়—হঁ্যা। শিকারীটাকে গালি দিয়ে আমি যে খেদিয়ে দিলাম, সে কথাটা জাতপঞ্চ বলে নাই ?

দাশু—না।

মুরলী—তবে যাও, জাতপঞ্চকে বলে দাও, পলুস হালদার আর এ গাঁয়ে আসবে না।

বলতে গিয়ে মুরলীর গলার স্বর আবার ভারি হয়ে, অভিমানে ফুঁপিয়ে, আর অনুতাপে করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে। হাঁটুর উপর মাথা নামিয়ে চোখ ঘষে মুরলী।

দাশু বলে—গোবিন্দপুর থানার হাজত থেকে আমাকে কে ছাড়া করিয়েছে জানিস ?

মুখ তুলে তাকায় মুরলী—কে ?

দাশু—পলুস হালদার।

মুরলীর চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে। তারপর যেন অদ্ভুত বিস্ময়ের আবেশে ঢলঢল করতে থাকে। আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে যেন অনেক দূরের একটা বিরাট ছায়ার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মুরলী। —এটা আবার কেমন কান্ড করলে পলুস ?

দাশু—হালদারের মনে বড় দয়া। আমার মান রেখেছে পলুস।

মুরলী—মান রাখতে জানে পলুস। গাঁওয়ার কিষাণ নয় পলুস।

দাশুর চোখ জ্বলে ওঠে : গাঁওয়ার কিষাণও পলুস হালদারের মান রাখতে জানে।

মুরলীর ঠোঁটের ফাঁকে ছোট একটা হাসির রেখা সির সির করে : তুমি নেশা করেছ।

দাশু—করেছিলাম, কিন্তু এখন আর নেশা নাই। নেশার কথা নয়; পলুসের মাগ সকালী মধুকুপির কিষাণ দাশুর কাছেই মরতে চেয়েছিল, কিন্তু…।

মুরলীর চোখের ভ্রূকুটি আরও তীব্র হয়ে ওঠে : কিন্তু কি ? সকালীকে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—তোকে ধুতরা খাইয়ে মরাতে চায় সকালী।

—কেন ?

—সকালী শুনেছে, পলুস তোর সাথে ঢলেছে।

—সকালী তোমাকে একথা বলতে আসে কেন ?

—আমাকে চিনে নাই। তাই বলে ফেলেছে।

—না চিনুক, কিন্তু বলে কেন ?

—ঘর ছাড়া বেদেনী হয়েছে সকালী।

—হয়েছে তো হয়েছে, কিন্তু তোমাকে মনের কথা বলে কেন ?

—আমাকে ওর মরদ করে নিতে চায়।

—কেন চায় ?

—আমার উপর রাগ করতে পারে নাই।

—কেন পারে নাই ?

—আমি সেধেছিলাম, যেন রাগ না করে।

—কেন তুমি সেধেছিলে ?

—ভুল হয়েছিল মুরলী।

—কি ভুল ?

—সকালীকে ছুঁয়েছিলাম।

—ছুঁতে ইচ্ছা করেছিল?

—হ্যাঁ।

—ছুঁতে ভাল লেগেছিল?

—হ্যাঁ।

—তবে গেলে না কেনে?

—তোকে মরাতে চায় যে মাগি, তার সাথে আমি চলে যাব ··আমি পাগল হই নাই মুরলী।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুরলী: তবে পলুসকে তুমি কি দয়াটা করলে বল? তুমি নিজেকে দয়া করেছ। সকালী তোমার মাগকে মরাতে চায় শুনে ভয় পেয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছ।

দাশু—সেটা কি আমার দোষ হলো?

মুরলী—দোষ নয়, কিন্তু গুণ কিসের?

দাশু—সকালীকে খেদিয়ে দিতে পেরেছি।

মুরলী—গরব করবে না গো কিষাণ? ডরানির জলে ভাসিয়ে দাও তোমার গরব।

—কেন? দাশুর গলার স্বর তপ্ত হয়ে ওঠে।

—সকালী যদি তোমাকে ঐ কথাটা না বলতো?

—কি কথা?

—মুরলীকে ধুতরা খাইয়ে মরাবার কথা।

—কি বললি?

—তোমার কপালবাবার নামে কিরিয়া করে বল তো; তবে কি তুমি সকালীকে খেদিয়ে দিতে পারতে?

যেন বোবা হয়ে আর কাতরভাবে তাকিয়ে থাকে দাশু। এক মুঠো জয়ের ধুলোকে একটা জয়ের পাহাড় মনে করেছিল দাশু! মুরলীর স্বামী হয়েও পলাশবনের একটা নিরালার ইঙ্গিতে দাশু ঘরামির বুকের বাতাস কত সহজে সকালীর লাল চোখের কাছে মরবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। দাশু ঘরামির এই পাথুরে শরীরও ভুল করতে জানে, ভুল করতে পারে, ভুল করবার জন্য হঠাৎ পাগল হয়ে ওঠে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুরলী। হাসিটা যেন দাশু ঘরামির মন প্রাণ আর শরীর, যত মরদানি স্বামিপনা আর টাঙ্গির অহংকার মিথ্যে করে দিয়ে ভয়ানক টিটকারির ঝুমুরের মত বাজছে।

হাসি থামিয়ে আর ভেজা চুলের খোঁপাটাকে একটু গুছিয়ে টান করে বেঁধে নিয়ে মুরলী বলে—সকালী বুড়ি বটে কি?

—না।

—সুন্দরী বটে?

—হ্যাঁ।

—তবে ?

—কি তবে ? বিরক্ত হয়ে রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। কিন্তু মুরলীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই ভয় পেয়ে দাশুর পাথুরে গাঁথুনির বুকটাও দুরুদুরু করে। মুরলীর চোখের চাহনিতে যেন একটা ভয়ানক হিসাব, একটা সংকল্প, একটা ইচ্ছার জ্বালা ফুটে রয়েছে।

মুরলী বলে—তুমি সকালীকে ঘরে নিয়ে এসো।

দাশু—ও কথা বলিস না। বল্, তুই চলে যেতে চাস ?

মুরলী—হ্যাঁ।

—কেন ?

—এ ঘরে সকালী থাকলেই ভাল হবে।

—কেন ?

—তুমি যেমন ঘরটি চাও, তেমন ঘরণীটি হবে সকালী। সকালী যেমনটি চায়, এই ঘর তেমনটি কিষাণের ঘর বটে, আর তুমিও তেমনটি মরদ বট।

—তুই কোথায় যাবি ? ঝালদা ?

—আমার কথা শুধাও কেন ? আমার কপাল যেথা নিয়ে যাবে, সেথা যাব।

দাশু হাসে : কপাল যদি মানিস, তবে আর যাবি কেন ?

মুরলী—তোমার লাজ লাগে না ?

—কিসের লাজ ?

—জাতপঞ্চ তোমার যে মাগকে নষ্ট বলে গালি দিয়ে জাতের বার করতে চায়, তাকে নিয়ে আর ঘর করবার সাধ কর কেন ?

—জাতপঞ্চ কিছু বুঝে নাই, তাই গালি দিয়েছে। সব কথা শুনলে মাপ করে দিবে জাতপঞ্চ।

—যদি মাপ না করে ?

—তবু, তবু তোকে আমি যেতে দিব না।

—আমাকে ঘরে রেখে তোমার লাভ কি ?

—আমার মাগ আমার ঘরে থাকবে। আমার ছেইলা আমার কাছে থাকবে। লাভের কথা বলিস কেন ? ঘর করা কি কারবার বটে ?

—থাকবো তো, কিন্তু বাঁচাতে পারবে কি ?

—কি বললি ? দাশুর গলার স্বর থর থর করে।

—আমার ছেইলাকে বাঁচাতে পারবে ?

হঠাৎ দাশু ঘরামির দু চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে : কেন বাঁচাতে পারবো না ?

—বুঝে দেখ।

—কপালবাবার দয়া আছে। আর কি বুঝতে বলছিস ?

—বেশ। দাশু ঘরামির মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার একেবারে নীরব হয়ে যায় মুরলী। খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর দু হাতে দুই হাঁটু জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিন হাত উঁচু মাটির দেয়াল, ফুটো-ফাটালে ভরা খাপরার চালা, আর জীর্ণ জামকাঠের কপাট। দাশুও ঘরের মেঝের উপর চুপ করে বসে অনেকক্ষণ ধরে কি কেন ভাবে। তার পরেই এগিয়ে যেয়ে মুরলীর হাত ধরে : তুই কি আমাকে ঘিন্না করলি ?

মুরলী—এমন কথা বল কেন ?

—আমি যে সকালীর গতর ছুঁয়ে ফেলেছি।

—বেশ করেছ। শিকারীটাও তো আমাকে…।

দাশু—কিন্তু তুই তো আর সাধ করে ছোঁয়া নিস নাই। আমি যে নিজে সেধে…তুই মাপ কর মুরলী।

মুরলীর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ উতলা হয়ে ওঠে। দাশুর মুখের কথাগুলি যেন একটা শিশু মানুষের বিশ্বাসের প্রলাপ, একটা ভয়ানক মিথ্যা প্রশস্তি। কি-যেন বলতে চায়, হাঁটুর উপর মাথা ঘষে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে মুরলী।

দাশু কি বলবি, বল মুরলী।

আনমনার মত তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী : না, কিছু বলবো না। তুমি মাপটাপ চেয়ে আমাকে হাসাবে না।

শান্ত হয় দাশু। তারপরে ব্যস্ত হয়ে ওঠে : তুই কি আজ কিছু রাঁধিস নাই, কিছু খাস নাই ?

মুরলী : ছেইলার জ্বলায় জ্বলবো, না, রাঁধবো ?

দাশু—আমি রাঁধি। তুই শুয়ে থাক।

ঘরের এদিকে ওদিকে যত হাঁড়ি আর ঝুড়ি নেড়ে-চেড়ে আর হাতড়ে হাতড়ে যখন ক্লান্ত হয় দাশু, তখন মুরলী যেন একটা ভ্রূকুটি লুকোতে গিয়ে মুখ টিপে হেসে ওঠে : হোই দেখ, খাটিয়ার তলে সরাতে মকাইয়ের দানা আছে।

ছোট একটা মাটির সরা, তার মধ্যে আধ সের মত মকাইয়ের দানা। সরাটাকে হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

মুরলী বলে—ওই আছে, আর কিছু নাই। শুখা মরিচ দিয়ে হলুদ জলে সিঝিয়ে নাও।

হ্যাঁ, রাঁধতে হবে; ক্ষিদেটা যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব হাড়মাসের ক্লান্তি জিভ দিয়ে চাটছে। উনানের দিকে তাকায় দাশু।

ভোর হবার আগে মধুকুপির রাতশেষের ফিকে চাঁদের চেহারা যখন কুয়াশায় ভিজে নরম হয়ে প্রায় মুছে এসেছে, আর ভুখা শিয়ালের চেহারা ছোট ছোট চোরা আবছায়ার মত ছটফটিয়ে সড়কের শিশিরভেজা ধুলো শুঁকে শুঁকে পালিয়ে যেতে শুরু করেছে, তখন দাশু ঘরামির ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারে দাশুর সেই পাথুরে বুকটাকে দু হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে আছে মুরলী, যে বুকের সবচেয়ে সাধের আশার প্রতিজ্ঞাকে মুরলীই

একটা ভয়ানক প্রশ্নের আঘাত দিয়ে ব্যথিত করেছে।

কিন্তু সে ভয় আর নেই। সেই ভয়টাকে এখন মিথ্যার তামাশা বলে মনে হয়। সে ভয় রাতের বেলাতেই মরে গিয়েছে। দুজনে মিলে সেই শুখা মরিচ আর হলুদজলে সিঝানো আধ সের মকাইদানার গরম গরম ঘাট্টা একই সঙ্গে একই হাঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে খেয়েছে। খেতে খেতে ঝালের জ্বালা লেগে যখন মুরলীর গলা ধরেছে, আর খাওয়া থামিয়ে চোখ বন্ধ করেছে মুরলী, তখন মুরলীর মুখের কাছে জলের ঘটি তুলে ধরেছে দাশু। জল খেয়ে লাজুক হাসি হেসে ফেলেছে মুরলী। তারপর, মুরলীর মুখের সেই লাজুক হাসি যেন মধুকুপির রাতের বাতাসের মত জংলা ফুলের গন্ধ পেয়ে ধীরে ধীরে নিবিড় হয়ে উঠেছে। দাশুর বুকের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়েছে মুরলী। মুরলীর চোখের চাহনি আরও কালো হয়ে ছটফট করেছে। দাশুর কাছে এগিয়ে এসে, দাশুর গা-ঘেঁসে বসে, দাশুর কাঁধের উপর অলস মাথাটা নামিয়ে দিয়েছে। দাশু বলেছে—কি হলো মুরলী? মুরলী রাগ করে বলেছে —চুপ কর।

সেই মুহূর্তে দাশুর জীবনের সব আতঙ্ক মরে গিয়ে মধুকুপির রাতের বাতাসে মিশে গিয়েছিল। হেসে উঠেছিল দাশুর চোখ। মধুকুপির রাতের বাতাস আর নীরবতার মধ্যে যেন জাদু আছে। মধুকুপির রাতটা যেন একটা দয়ালু ব্যাধি; পাখি আর পাখিনীকে সারাদিনের ছাড়াছাড়ির অভিশাপ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক পিঁজরায় রেখে দেয়।

জেল থেকে ফিরে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত মধুকুপির কোন রাত দাশু ঘরামিকে ঠকায় নি। রোদ আর আলো নিয়ে জেগে থাকা দিনগুলি যেন কঠোর ঠাট্টার হাসি ধমক হতাশা আর সন্দেহের উৎপাত। দাশুর জীবনটাকে ঘরছাড়া আর গাঁছাড়া করবার জন্য টানাটানি করে। কিন্তু রাতগুলি যেন একটু ক্ষমা আর মায়া রাখে। ঘর-ভাঙানো ভয়গুলি যেন হঠাৎ-মায়ায় করুণ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ-চমৎকার একটা আশ্বাস হয়ে দাশু ঘরামির উৎপীড়িত বুকটাকে শক্ত করে দু হাতে আঁকড়ে ধরে; দাশুও সেই স্পর্শের নেশায় যেন দু চোখ ভরে স্বপ্ন দেখে নেয়, সব্বই ঠিক আছে। ঘর আছে আর ঘরণী আছে; ছেইলা আসছে, জমি আসবে। এত ভয় করবার কি আছে?

ডাক দিয়ে মুরলীর ঘুম ভাঙিরে আর জাগা চোখ দুটোকে দু হাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষে নিয়ে দাশু বলে—আমি এখন খাটতে বের হব মুরলী।

জোয়ান কিষাণের নির্ভয় অহঙ্কার ঘুম ভাঙতেই তৈরি হয়েছে; দিনমানের কঠোর ঠাট্টা ধমক আর ভয়গুলিকে জয় করবার একটা প্রতিজ্ঞা পাঁজর ঠেলে উথলে উঠেছে। দুরুদুরু ভয় দূরে থাকুক, হাতপায়ের গাঁটগুলিতে অদ্ভুত এক আমোদ সিরসির করে।

জামকাঠের কপাট খুলে ঘরের দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ায় দাশু। আকাশের দিকে তাকায়। তারপর চেঁচিয়ে হাঁক দেয়—তুই একটুক তাড়াতাড়ি করবি কি মুরলী; উনানে আগুন দিতে পারবি?

মুরলী আশ্চর্য হয়ে বলে—কেন ?

মুরলীর বিস্মিত সন্দেহটাকে বুঝতে না পেরে দাশু আবার হেসে ওঠে : খাটতে বের হব, কে জানে কত ক্রোশ দৌড়াতে হবে, কত টাঙ্গি মারতে হবে। হাত-পা একটুক ঝামাই করে না নিলে খাটতে জোর পাব কেন ?

উনানের মুখে শুকনো বাঁশপাতা ঠেসে দিয়ে আগুন ধরায় মুরলী ; আর দাশুও টাঙ্গি হাতি নিয়ে তিন লাফে ঘরের বাইরে চলে যায়। এক গাদা বাবলার ছাল হাতে নিয়ে ফিরে আসে। উনানের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে বাবলার ছাল জ্বাল দিতে থাকে মুরলী।

কিন্তু ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না দাশু। একটা হাঁড়ি আর কোদালি হাতে নিয়ে বের হয়ে যায়। দাশু ঘরামির হাতে-পায়ে কাজের প্রতিজ্ঞা যেন প্রচণ্ড এক উৎসাহের নেশা মাতিয়ে তুলেছে। দুই বিঘা চাকরানের মাটি যেখানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে, সেখানে ঝামাছড়ানো একটা খাদের মধ্যে জল জমে আছে। হাঁড়ি ভরে জল নিয়ে আসে দাশু। ঝুপঝাপ করে কোদালির মার মেরে বাঁশঝাড়ের কাছ থেকে ভুরভুরে মাটি তুলে নিয়ে আসে। কাদা তৈরি করে দাশু। তারপর ; ঘরের দেওয়ালের ফাটলের উপর তাল তাল কাদা আছড়ে দিয়ে দু হাত চালিয়ে লেপতে থাকে।

দাওয়ার খুঁটো আর চালার দিকে একবার তাকায় দাশু। চালার বাতা কাত হয়ে পড়েছে। চোপের গিঁটগুলি ছিঁড়ে গিয়েছে। টাঙ্গির মাথা দিয়ে খুঁটোটাকে ঠুকে ঠুকে ঘুনের ধুলো ঝরিয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠে দাশু : দু-চার হাত চোপ আছে কি ?

মুরলী বলে—না।

না, হলো না। খুঁটোর মাথাটা নতুন চোপের শক্ত গিঁট দিয়ে বেঁধে দেবার এখন আর কোন উপায় নেই।

—দে তবে, কষজলের হাঁড়িটা দে। বাবলার ছাল সিদ্ধ করা জলের হাঁড়িটা কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত ডোবায় দাশু। বাবলার কষে মজে গিয়ে হাত দুটো আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে যেতে থাকে। পা দুটোকেও কষজলে ডুবিয়ে বসে থাকে দাশু। আস্তে আস্তে ঝামিয়ে ওঠে পা দুটো। ও-পায়ে এখন কাঁটা আর কাঁকর ফুটলেই বা কি ? রক্ত ঝরে পড়লেও টের পাবে না দাশু, আর অনায়াসে ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটে বেড়াতে পারবে। বেদনাবোধহীন পা দুটো তবু ক্লান্ত হবে না।

ধুলো শান দিয়ে চকচকিয়ে নিয়ে টাঙ্গিটাকে কাঁধের উপর তুলে নেয় দাশু। গামছা দিয়ে শক্ত করে কোমরটাকে বেঁধে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে : আমি চললাম মুরলী। ঘরের গোঁজাতে আমার টাকা আছে, নিয়ে আয়।

মুরলী আবার আশ্চর্য হয় : টাকা ?

দাশু হাসে : হ্যাঁ রে, তিন টাকা চার আনা এখনও আছে। আমার জেলের রোজগার।

সত্যিই তিন টাকা চার আনা। ঘরের গোঁজার ভিতর থেকে টাকা আর

পয়সাগুলি তুলে নিয়ে এসে দাশুর হাতে তুলে দিয়েই ভ্রূকুটি করে মুরলী : তুমি খাটতে চললে ?

—হ্যাঁ।

—টাকা আনতে ?

—হ্যাঁ।

—তবে টাকা নিয়ে যাও কেন ?

—এ টাকা এখন আর আমার নয় মুরলী। এখনই খরচ হয়ে যাবে।

—কিসে খরচ হবে।

—মানত করেছি, জাহিরথানে কুঁকড়া বলি দিব ।

—তারপর ? মুরলীর চোখের চাহনি দাশুর জীবনের এই নতুন আহ্লাদের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেবার জন্য কটকট করে ফুটতে থাকে।

—তারপর আর কি ? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—আমি কি করবো ?

—তুই ঘরে থাকবি।

—ঘরে থেকে করবো কি ? সেটা বলে যাও।

—কিষাণের মাগ যা করে, তাই করবি।

—কিষাণের মাগ হাঁড়ি ভরে ভাত রাঁধে।

—তুই হাঁড়ি ভরে ভাত রাঁধবি।

—চাল কোথা পাব যে রাঁধবো ?

—আমি নিয়ে আসছি। তুই এত ডর দেখাস কেন ? বলতে গিয়ে দাশুর চোখেও একটা কঠোর স্পর্ধাময় ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে।

মুরলী বলে—বেশ।

বলেই একটা হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে ঠাণ্ডা উনানের উপর চাপিয়ে দেয় মুরলী। তারপর উনানের কাছে শক্ত হয়ে বসে পড়ে।

দাশু—এ কি করলি ?

মুরলী—বসলাম। তুমি চাল নিয়ে এসো, তারপর ভাত রাঁধবো। তার আগে এখান থেকে উঠবো না।

মধুকুপির দিনের আলো আবার দাশুর প্রাণের আশা আর অহংকারের উপর ঠাট্টার কামড় বসিয়ে দিয়েছে। জ্বলতে থাকে দাশুর নিঃশ্বাস। কিন্তু না, দাশু কিষাণের পাথুরে বুকের ভিতর আর কোন ভয় দুরুদুরু করে না। উনানের উপর ঐ হাঁড়িটা এমন প্রকাণ্ড কোন হাঁড়ি নয়। দু সের চাল এনে ফেলে দিলেই ভাতে ভরে যাবে হাঁড়িটা। কিন্তু কি মনে করেছে মুরলী, দাশু কিষাণ আজ তার ঘরণীকে পেট ভরে ভাত খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জোর হারিয়ে অমানুষ হয়ে গিয়েছে ?

—আমি আসছি। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে দাশু।

মুরলীর সেই গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে, বোধহয় মুরলীর মনের একটা অকারণ সন্দেহের দিকে শান্তভাবে একটা তুচ্ছতার হাসি হেসে চলে

যায় দাশু।

ঈশান মোক্তারের কুঠি। বড় গমস্তা দুখন বাবু তার চোখের একটা হিংস্র ভ্রূকুটি সামলে নিয়ে হেসে ফেলে : পাঁচ বছর কয়েদ খেটে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি দাশু ?

দাশু—কোর্ফা হতে চাই, তাতে আবার মাথা খারাপ মনে কর কেন, দুখন বাবু ?

দুখন বাবু—কত বিঘার কোর্ফা হতে চাও ?

দাশু—পাঁচ বিঘা হলে ভাল হয়।

রশিদার ভোলা হো-হো করে হেসে ওঠে : বুঝলাম। পাঁচ বিঘা কেন দশ বিঘা হলে ভাল হয়। কিন্তু জেল থেকে কত টাকা নিয়ে এলি যে, ভুঁইদার হবার মন করেছিস ?

দাশু—এ কথা কেন বলছো রশিদার বাবু ?

দুখন বাবু বলে—একশো টাকা সেলামি দিতে পারবে ?

রশিদার ভোলা—তারপর আরও চার-পাঁচটা নজরানা আছে।

দুখন বাবু—তারপর বীজ চাই, হাল চাই। তারপর ছটা মাস তোমাদের মা-ভাতারের খোরাক চাই। কত টাকা আছে তোমার যে কোর্ফা হবার সাধ হয়েছে ?

দাশু আতঙ্কিত ভাবে তাকায়—টাকা পয়সা একটাও নাই।

দুখন বাবু—তবে পাগলপনা করছ কেন ?

দাশু—কিন্তু আমার যে জমি চাই।

রশিদার ভোলা খেঁকিয়ে ওঠে : জমি চাই মানে কি রে ? ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খাটতে মানে বাধছে ?

চুপ করে থাকে দাশু। দুখন বাবু মাথা নাড়ে : মধুকুপির মনিষগুলার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে।

রশিদার ভোলা বলে—কয়লার খাদ, নতুন রেল-লাইন আর কারখানাগুলো এদের মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে।

দুখন বাবু—নগদ নগদ দেড়-দুই টাকা মজুরি মারে, মেজাজ খারাপ হবে না কেন ?

ভোলা—জোয়ানগুলো সব খাদের কাজে গিয়ে ভিড়েছে। শুধু আছে বুড়াগুলা। সেগুলাও আবার আধা ভাগে জোত করতে চায় না।

দাশু—আমি খাদে কাজ নিব না দুখন বাবু। তুমি আমাকে জমি বন্দোবস্ত করে দাও।

দুখন বাবু—কি বন্দোবস্ত করবো বল ? আঠার-বাইশ করবে ? সেলামি লাগবে না।

দাশু—সেটা কি বটে ?

দুখন বাবু—ফলনের চাল্লিশের বাইশ তুমি নিবে, আর কুঠি নিবে আঠার। পোয়ালের আধা তোমার, আধা কুঠির।

দাশু—হ্যাঁ, তাই মেনে নিব। আমাকে পাঁচ বিঘা দো-আঁশ বন্দোবস্ত করে দাও দুখন বাবু।

ভোলা—কিন্তু বীজ লাঙ্গল তুই দিবি, কুঠি দিবে না।

দাশু—এটা কেমনতর হলো? বীজ লাঙ্গল পাব কোথায়? টাকা কই?

ভোলা—তবে এত জমি জমি করিস কেন? টাকা নাই তো মনিষ হয়ে থাক।

কুঠির দাওয়ার উপর লম্বা-চওড়া একটা চৌকি। ঈশান মোক্তারের বড় গমস্তা দুখন বাবু আর রশিদার ভোলা আবার খাতাপত্র ঘাঁটতে থাকে। ঈশান মোক্তারের বিরাট খাটালের পিছনে গোবরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে চুপ করে হাঁটু মুড়ে দাওয়ার মেঝের উপর বসে থাকে দাশু। ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারটাও এই পাঁচ বছরে কত বড় হয়ে গিয়েছে। মাচানের পর মাচান, খড় আর মকাইয়ের খোসার এক-একটা পাহাড় মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাণ্ডারের বড় দরজাটাও খোলা। ভিতরে ধানের পাহাড় দেখা যায়।

দুখন বাবু আর ভোলা রশিদারের কথা শুনে দাশু কিষাণের জমির স্বপ্ন খানখান হয়ে ভেঙে গিয়েছে! গুলঞ্চের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা সাধের গায়ে আগুন ধরে গিয়েছে। টাকা চাই, নইলে পরের জমির মনিষ হয়ে থাকতে হবে, নিজের জমির মানুষ হওয়া যাবে না।

ভোলা রশিদারের চোখে একটা করুণার ছায়া যেন ছমছম করে ওঠে: যদি ভাগজোত করতে চাস, তবে দশ বিঘা টাঁড় বন্দোবস্ত করে দিতে পারি দাশু। সেলামি লাগবে না, আর বীজও পাবি।

দাশু আক্ষেপ করে—টাঁড় নিয়ে কি হবে?

ভোলা—কোদো ছিটাই কর। যা হবার হবে; আধা মাল কুঠিকে দিবি।

দাশু—তবে তাই দাও।

দুখন বাবু অপ্রসন্ন হয়ে ভ্রূকুটি করে—বেশ, কাল এসে চিঠা নিয়ে যেও; ভোলাবাবু রশি ধরে জমি দাগিয়ে দিয়ে আসবে।

দাশু—কিন্তু...।

দুখন বাবু—কি?

দাশু—আজ একটা কাজ দাও দুখন বাবু। আজ খাটতে বের হয়েছি যে!

দুখন বাবু—এখন কোন কাজ নেই দাশু।

দাশু—একটা গো-গাড়ি দাও।

দুখন বাবু—কেন?

দাশু—জঙ্গলে যাব।

দুখন বাবু হাসে: সর্বনাশ! অমন কথাটি মুখে এনো না।

দাশু আশ্চর্য হয়: কেন গো?

দুখন বাবু—কেন জঙ্গলে যাবে? শাল ভাঙ্গতে?

দাশু—হ্যাঁ, একগাড়ি কাঁচা শাল বাবুরবাজারে নিয়ে গিয়ে ফেলতে

পারলে…।

দুখন বাবু—হ্যাঁ, তাতে তোমার দেড় টাকা আর কুঠির দেড় টাকা হবে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে দেড় টাকা পেতে গিয়ে যে কুঠির একজোড়া বলদ কানারানীর পেটে চলে যাবে।

দাশু—কানারানী? কোথায় আছে কানারানী?

দুখন বাবু—কোথায় নাই বল? কপালবাবার জঙ্গলে বল, বড়কালুর চটানে বল, ডরানির স্রোতে বল, ডাঙ্গায় বল আর সড়কে বল. বাঘিনটা সবঠাঁই দিনে রেতে যখন-তখন ছুটাছুটি করছে।

ভোলা বলে—গত বছর এই সময়টা এক হাজার টাকার শিশালের আঁশ এই ভাণ্ডারে জমা করেছিলাম। এই বছর এক ছটাকও জমা হয় নাই।

দাশু—কেন গো ভোলা বাবু?

ভোলা—বাঘিনটার ডরে। শিশাল ভাঙতে জঙ্গলে যাবে কে বল্? পচাই পিটাই করবে না, শুধু কাঁচা ছেঁচাই করে এনে দিবে, এমন পাঁচ সের ভিজা আঁশের বদলে এক সের চাল হেঁকেছি, তবু কেউ রাজি হয় নাই।

দাশু উদাসভাবে বলে—কিন্তু আমাকে একটা কাজ দাও। আমার হাত আছে, পা আছে, টাঙ্গি আছে; আমি বুড়া নই।

দুখন বাবু—আমি জানি, তিনটা ভঁইসের মত তাকত আছে তোমার। কিন্তু কাজ না থাকলে দিব কেমন করে? রোপাই হয়ে গেল, এখন তো আর কোন কাজ নাই।

দাশু—আমাকে পাঁচটা টাকা আগাম দাও।

দুখন বাবু মুখ টিপে হাসে—সে কি হে দাশু? আবার বিয়া করবে নাকি?

দাশু—দাও এখন; আমি ধান কাটাইয়ের সময় রোজ খেটে শুধে দিব।

দুখন বাবু—ঈশান মোক্তারের কুঠি সরকারী রিলিফ আফিস নয় দাশু। ওসব বাজে কথা বলো না।

ভোলা রশিদার বলে—এখানে বসে না থেকে বাবুরবাজার যা, না হয় গোবিন্দপুরে চলে যা। মাটি কাট, পাথর বিছাই কর, নয়তো ঘরের চালা মেরামত কর। তুই তো ঘরামির কাজ জানতিস।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় দাশু। আকাশের দিকে তাকায়। বেলা প্রায় দু পহর হল। ছোটকালুর মাথায় শুকনো ঘাস পুড়ে পুড়ে ধোঁয়া ছড়ায়।

ব্যস্তভাবে হনহন করে পথ হাঁটে দাশু। এতক্ষণে একটা ভুল বুঝতে পেরেছে দাশু। আজই ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে জমির জন্য এতটা সময় আইঢাই করা ভুল হয়েছে। আজ এখনই হাতের কাছ পাঁচ বিঘা জমি না হলেও চলবে। গুলঞ্চের বেড়ার স্বপ্ন আর কয়েকটা মাস পরে সত্য হয়ে উঠলেও চলবে। কিন্তু আজ যে এই মুহূর্তে এই টাঙ্গির জোরে, এই শক্ত হাত দুটো খাটিয়ে অন্তত আজকের মত পেট ভরাবার খোরাক পেতে হবে। দাশুর কপালের সুখ, দাশুর বুকের আশা, দাশুর এই হাতদুটোর অহঙ্কার পরীক্ষা করবার জন্য ঠাণ্ডা উনানের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে মুরলী। কোন ভুল নেই,

এতক্ষণে মুরলীর চোখ হতাশ হয়ে উঠেছে, মুরলীর ঠোঁটে ক্ষিদের জ্বালা জ্বলছে। মুরলীর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কোথায় কাজ ? তবে কি গোবিন্দপুরে যেতে হবে ? কিংবা বাবুর বাজারে ?

ডরানির ছোট পুলের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় দাশু। বাবুরবাজারের দিকে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। পুলিস-ফাঁড়ির রামাই দিগোরার যদি মিছা আবার একটা হাঁক দিয়ে আটক করে ধরে, যদি মুন্সীটা এসে পরবী দাবী করে ? দরকার নেই, ওপথে এগিয়ে গেলে দাশুর দাগী-জীবনের ব্যথাটাকে নিয়ে আবার টানাটানির খেলা শুরু করবে রামাই আর পুলিসের চৌধুরীজী। ওদিকে গেলে আজ আর ফিরতেই পারা যাবে না। তা ছাড়া গেলেই কি কাজ পাওয়া যাবে ? সেই ঠিকাদারবাবু আজও বাবুরবাজারে আছে কিনা কে জানে ?

দুরুদুরু করে দাশু ঘরামির বুক। টাঙ্গিটা তেতে গিয়ে পিঠের চাম প্রায় ঝলসে দিচ্ছে, কিন্তু দাশুর বুকের ভিতরে ঠাণ্ডা ভয়ের বাতাস সিরসির করে। মুরলীর মুখটা মনে পড়তেই দাশুর চোখের চাহনি ভীরু হয়ে যায়। অন্তত সের দুয়েক চাল নিয়ে মুরলীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে দাশু ঘরামির ভাগ্য যে আর্তনাদ করে উঠবে; সেই সঙ্গে ধিক্কার দিয়ে হেসে উঠবে মুরলী। কই, মধুকুপির এত তেজ আর দেমাকের মজবুত কিষাণ, মুরলীর মরদ হয়েছে যে, সে মানুষ মুরলীকে উপোষ রেখে মরিয়ে দিচ্ছে কেন ? এমন করলে তোমার ছেইলাটাও কি বাঁচবে ?

ডরানির ছোট পুলের লোহার উপর যেন মরিয়া হয়ে হাত ঘষে দাশু; বাবলার কষজলে ঝামানো ভোঁতা হাতে কোন ফোসকা ফুলে ওঠে না। মুরলীর ওই ভয়ানক চোখের সন্দেহের কাছে যেন হার মানতে না হয়, হে কপালবাবা! মুরলীর ওই শূন্য হাঁড়ি ভরে দিতে ক'সের চাল লাগে ?

আকাশের দিকে তাকায় দাশু। বেলা বেড়েছে, কিন্তু এখনও সময় আছে। কপালবাবার জঙ্গলের উপর মেঘ ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু বৃষ্টি হবে না বোধহয়। হোক না বৃষ্টি। এই তো মাত্র ক্রোশটাক পথ, ডাঙা ধরে দৌড়ে গেলে ছোটকালুর বাঁয়ে শিশালের জঙ্গলটাকে পাওয়া যাবে। এক মণ শিশালের পাতা কাটতে কত বা সময় লাগবে ? আর পাতার বোঝা টেনে নিয়ে ডরানির স্রোতের কাছে এনে ফেলতে এমন কিছু দেরি হবে কি ?

হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দাশু!

ঝুপ ঝুপ—ঝপাট। দাশু ঘরামির টাঙ্গির তিন কোপে এক একটা টুসটুসে শিশালের নরম ধড় কাটাছাঁটা হয়ে মাটির উপর গড়িয়ে পড়তে থাকে। শিশালের প্রকাণ্ড মঞ্জরীর শুঁড় থর থর করে কাঁপে; বীজখোল শব্দ করে ফেটে যায়, আর, বীজখোলের রস রক্তের ধারার মত ছিটিয়ে পড়ে মাটি লাল করে।

ঝুপ ঝুপ—ঝপাট। নীরব ও স্তব্ধ জঙ্গলের বুকের ভিতরে শুধু দাশু ঘরামির টাঙ্গির শব্দ বিচিত্র এক খাটুনির উৎসবে মত্ত হয়ে একঘেয়ে ছন্দে

বাজতে থাকে। বাবলার কষজলে ঝামাই-করা পায়ের পাতায় কত কাঁটা ফুটে আছে, আর রক্তও ঝরছে ; তবু ব্যথা নেই, জ্বালা নেই। দাশু কিষাণের পা দুটো যেন জীবনের একটা প্রতিজ্ঞার উৎসবে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

বনমোরগের ঝাঁক উড়ে পালিয়ে গেল। দুটো খরগোশ গর্তের ভিতরে মুখ লুকোল। দাশুও শিশালের রসে-ভেজা টাঙ্গিটাকে মাটিতে মুছে নিয়ে একবার চুপ করে দাঁড়ায়। না, আর দরকার নেই। একটা কচি শালের গা থেকে বুনো লতা ছাড়িয়ে নিয়ে এসে শিশালের পাতাগুলিকে গাদা করে বাঁধে দাশু। বাস্, এইবার গাদাটাকে টেনে টেনে ডাঙার উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে ডরানির স্রোতের কাছে এনে ফেলতে হবে। তারপর ছেঁচাই পিটাই আর ধোলাই আছে। তারপর, নিশ্চয়, অন্তত সের দশেক আঁশ পেয়ে যাবে দাশু।

পাতার গাদাটাকে টান দিয়ে মাত্র দু-তিন পা এগিয়েছে দাশু, হঠাৎ কচি শালের আড়াল থেকে একটা ঘন কালো ও রোমশ হিংসুটে ছায়া বের হয়ে, বড় বড় নখ ঝোলানো দুটো থাবা তুলে দু পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। রাগে সাদা হয়ে গিয়েছে ভালুকটার ঘোলাটে চোখ। আর দু কষ দিয়ে সাদা ফেনার বুদবুদ ফেটে ঝরে পড়ছে।

এগিয়ে আসছে ভালুকটা। কালো কষের সাদা ফেনা হাসছে। শুধু এক মুহূর্তের জন্য, তার বেশি নয়, দাশুর বুকটা থরথর করে ওঠে। তার পরেই এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে ভালুকটার চোখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দাশু। দাশুর শক্ত মুঠোয় বাঁধা টাঙ্গিটার ফলা রোদ লেগে ঝিকমিকিয়ে হাসতে থাকে।

কিন্তু ভালুকটা একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে দাশুর টাঙ্গির উপর একটা থাবা চালায়। দাশুও টাঙ্গি চালায়। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! দাশুর হাত থেকে পিছলে গিয়ে পাথরের উপর ছিটকে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে টাঙ্গিটা। দাশুর মাথার খুলি আঁকড়ে ধরবার জন্য একটা থাবা তুলে ভালুকটা নাচতে থাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা ছায়া দাশু ঘরামির পিছন থেকে লাফ দিয়ে পাশের একটা ঝোপের আড়ালে ঢুকে পড়ে আর উশখুশ করে। ভালুকটাও হঠাৎ থাবা নামিয়ে নেতিয়ে পড়ে। চার পায়ের উপর বসে শরীরটাকে কুঁকড়ে ঝোপের দিকে একবার তাকায় ভালুকটা। দাশুও দেখতে পায় সেই মুখ, জীবনে কোনদিন যে মুখ এত স্পষ্ট করে দেখনে পায় নি। ঝোপের পাতার ভিতর থেকে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ ভাসিয়ে একটা নিভু-নিভু কানা চোখ, আর একটা কটমটে কটা চোখের সবুজ আভা ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে সেই বাঘিন কানারানী।

একটা লাফ দিয়ে সরে গেল ভালুকটা। কচি শালের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে উইঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। উশখুশ করে ওঠে ঝোপটা। দেখতে পায় দাশু, কানারানীও নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে দাশু, উইঢিবির ভিড়ের ভিতর দুই জানোয়ারের চাপা-চাপা গোমরানো রাগ আর হুটোপুটির শব্দ ছটফট করছে। ধুলোও উড়ছে দেখা যায়। ভালুকটাকে কি তাড়িয়ে নিয়ে

চলে যাচ্ছে কানারানী ?

টাঙ্গিটা হাতে তুলে নিয়ে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় দাশু, তারপরেই শিশালের পাতার গাদা টান দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে ডাঙার দিকে ছুটতে থাকে।

ডরানির স্রোতের কাছে যখন পেঁছয় দাশু, তখন আর একবার আকাশের দিকে তাকায়। না এখনও সময় আছে। মুরলীর ধিক্কার মিথ্যে করে দেবার সুযোগ এখনও আছে। বিকেল হয়েছে, এই মাত্র। শিশালের পাতা ছেঁচাই পিটাই আর ধোলাই করতে আর কতই বা সময় লাগবে ?

টাঙ্গির দু কোপে শালের মোটা ডাল কেটে মুগুর তৈরি করে নেয় দাশু। ডরানির স্রোতের কাছে শিশালের পাতার গাদা টেনে নিয়ে এসে পাথরের উপর ছড়িয়ে দেয়।

ছেঁচা শিশালের কড়া গন্ধে বিকেলের বাতাসে যেন ঝাঁজ ধরে যায়। দাশুর হাতের মুগুর শিশালের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ে। থেঁতলানো শাঁস জলে ধুয়ে নিয়ে আবার পিটাই করে। ধুপ ধুপ! ধুপ ধুপ! শিশালের শাঁস ছিটকে এসে দাশুর চোখমুখ পিছল করে তোলে। থুতু ফেলতে গিয়ে বার বার জল বমি করে দাশু।

আকাশের দিকে তাকায় দাশু। বড়কালুর মাথার কাছের আকাশটা আর লাল নয়। ডরানির জল জঙ্গলের ছায়ায় কালো হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হয়ে এল।

ধুপ ধুপ! ধুপ ধুপ! যেন থেঁতলানো শিশালের বুকজ্বালানো দুর্গন্ধে মাতাল হয়ে দাশু ঘরামির হাতের মুগুর শিশাল পিটতে থাকে। ভুলতে পারে না দাশু, দাশু ঘরামির ভাগ্যটাকে আজ ঠাট্টা করে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্য ঠাণ্ডা উনানের উপর শূন্য হাঁড়ি চাপিয়ে অপেক্ষায় বসে আছে মুরলী।

শিশালের আঁশ ধোলাই করতে আরও এক ঘণ্টা সময় গেল। ডরানির জলের স্রোতও ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। শুধু শব্দ শুনে বোঝা যায়, কলকল করে কোন্ দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে ডরানির জল।

শিশালের আঁশের বোঝা লতা দিয়ে বেঁধে কাঁধের উপর তুলে আর টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে ডরানির কিনারা ধরে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয় দাশু। বোঝাটা দশ সেরের কিছু বেশি হবে বলে মনে হয়। অন্ধকারের মধ্যে দাশুর চোখের খুশিতে একটা প্রতিজ্ঞার জয় ঝিক করে হেসে ওঠে। তার পরেই শিউরে ওঠে দাশুর চোখ।

গাছের আড়াল থেকে দাশু ঘরামির ছায়াময় কালো চেহারার দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করছে একটা সবুজ আগুনের চোখ, তার পাশেই একটা নিভু-নিভু চোখ।

কানারানী! থমকে দাঁড়ায় আর কেঁপে কেঁপে বিড় বিড় করে দাশু। তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি করে না। ডরানির খাতের ঘন অন্ধকারের কাছে বুকের সব কাঁপুনি আর উদ্বেগ উৎসর্গ করে দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে থাকে।

ডাঙার কাছে এসে উঠতেই আর একবার দেখতে পায় দাশু, একটু দূরে

ডাঙার ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে একটা নিভু-নিভু চোখ, আর একটা জ্বলজ্বলে চোখ। যেন পা-ছোঁয়া মাটির গন্ধ শুঁকতে চায় কানারানী।

ছুটে ছুটে চলতে থাকে দাশু। ডরানির ছোট পুলের কাছে এসে পেঁছতেই দেখতে পায়, পুলের তলা থেকে হুট্ করে বের হয় কানারানীর ছায়া সেই খানাপিনার বাঁশবনের দিকে চলে গেল। হাঁপ ছেড়ে ওঠে দাশুর মুখ। কানারানী সত্যিই যে পথ দেখিয়ে পেঁছে দিয়ে গেল। বড় দয়া কানারানীর!

তারপর ঈশান মোক্তারের কুঠি। ওজন করে বারো সের কাঁচা আঁশের বদলে আড়াই সের চাল দিয়ে দিল ভাণ্ডারের সরকার। ভোলা রশিদার আশ্চর্য হয়ে হেসে ফেলে—তুই বাঘের চেয়েও জবর জানোয়ার বটিস দাশু!

তারপর, সেই জীর্ণ জামকাঠের দরজা। দরজার ফাঁকে ভিতরের আলো দেখা যায়। কপাটে হাত ঠুকে আস্তে আস্তে ডাক দেয় দাশু—মুরলী।

কপাট খুলে দেয় মুরলী। ঘরে ঢুকেই উনানের দিকে তাকায় দাশু। হ্যাঁ, ঠিকই, মুরলীর প্রতিজ্ঞা একটুও ক্লান্ত বা বিচলিত হয় নি। ঠাণ্ডা উনানের উপর শূন্য হাঁড়ি, দাশু ঘরামির প্রাণের অহঙ্কারকে ঠাট্টা করে মিথ্যে করে দেবার আশায় একটা প্রতিজ্ঞা চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

গামছায় বাঁধা চালের পোঁটলাটা উনানের কাছে ধপ করে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে দাশু—আড়াই সের চাল আছে।

মুরলী—কোথায় পেলে?

দাশু—জিউ-জান দিয়ে খাটলাম, তাই পেলাম।

নাকে কাপড় দিয়ে মুরলী বলে—শিশাল পিটেছো মনে হয়।

দাশু—হ্যাঁ। ভুল করে একটু দেরি করে ফেললাম। না হলে আরও আগেই আসতাম।

মুরলী—কে তোমাকে দয়া করে খাটতে দিলে?

দাশু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—মানুষ নয়, মানুষ নয়, বাঘিন কানারানী দয়া করেছে।

শিশালের রসে ভিজে পিছল হয়ে রয়েছে দাশু ঘরামির বুক পিঠ আর কাঁধ। ঘরের বাতাসও যেন কড়া দুর্গন্ধের জ্বালায় হাঁসফাঁস করছে। কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত দাশুর পায়ের পাতায় এখনো ভেজা-ভেজা রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। মুরলীর চোখ দুটো শক্ত হয়ে মধুকুপির মনিষের এই প্রচণ্ড মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

—তুই এবার একটু হাস দেখি, মুরলী। একজোড়া ভয়ানক উল্লাসের চোখ কাঁপিয়ে হাসতে থাকে দাশু।

—কেন হাসবো? মুরলী ভ্রূকুটি করে বিড়বিড় করে উঠতেই মধুকুপির আকাশটা পাল্টা ধমক দিয়ে গরগর করে বেজে ওঠে।

হাঁক ছেড়েছে কানারানী। বড়কালুর আর ছোটকালুর চটানে আহত হয়ে কানারানীর হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে বাজতে

থাকে।

কাঁপতে কাঁপতে দাশুকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে মুরলী—আমি হাসতে পারবো না।

মুরলীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে; আর নীরব হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। মধুকুপির আকাশের বুক-কাঁপানো সেই প্রচণ্ড পাশব হুংকারের গরগর শিহর ক্ষীণ হতে হতে বাতাসে মিলিয়ে যায়। শুধু শোনা যায়, সড়কের নিমগুলি স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে ঝুরঝুর আরামের শব্দ করছে; আর হাই তুলে গা ভাঙছে বাঁশের ঝাড়—কট কট, পট পট, কট কট।

শিশালের রসের তীব্র বোট্‌কা গন্ধ মেখে দাশুর যে ভয়ানক উল্লাসের বুক বাঘ-বাঘ গন্ধ ছাড়ছে, সেই বুক শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মুরলীর বুকের থরথর কাঁপুনিও আস্তে আস্তে থিতিয়ে, শেষে একেবারে শান্ত হয়ে যায়। দাশুর মুখে সেই অদ্ভুত হাসিও ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে। একটা হঠাৎ-মায়ার আবেশে দাশুর গলার স্বরও গলে যায়। মুরলীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে আদুরে সুরে ফিসফিস করে দাশু: খুব হাসতে পারবি। আমি থাকতে তোর কিসের এত ভয়?

মুরলীর থরথর ভয়ের বুকটা এইবার যেন হঠাৎ-ঘৃণার জ্বালায় ছট-ফটিয়ে ওঠে। মধুকুপির মনিষের জীবনটা বাঘ বাঘ গর্বের বোটকা নিঃশ্বাস ছাড়ছে। দাশুর বুকটাকে হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে দু-পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় মুরলী।

গামছায় বাঁধা আড়াই সের চাল; পোঁটলাটার দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখ দুটো দপদপ করে। মুরলীর কল্পনার একটা হিসাবের সুখ নষ্ট করে দিয়েছে এই আড়াই সের চালের পোঁটলা। মুরলীর জীবনের যে সাধের জেদ কঠোর গর্বে অনড় হয়ে বসেছিল, সেই জেদ চূর্ণ করে দিয়ে পোঁটলাটা যেন হাসছে আর ঠাট্টা করছে। মিছা এত হিসাব করলি মুরলী, তোর ছাড়া পাওয়ার পথ নাই। এখন চুপটি করে মধুকুপির কিষাণী মাগটি হয়ে, কিষাণ ভাতারের বাঘা খাটুনির ওই উপহার, ওই চাল এখন হাঁড়িতে চড়িয়ে ভাত রাঁধতে লেগে যা।

দাশু বলে—কি হলো?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। হেসে ফেলে দাশু। —কানারানীর ধমক শুনে ভয় পেলি, কিন্তু আমার উপর রাগ করিস কেন?

রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বাঘিনটা আমাকে ধমকাবে কেন? ওটা কি আমার শাশুড়ি বটে?

হো-হো করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দাশু। দাশুর পাথুরে বুকটা যেন একটা অদ্ভুত খুশির উচ্ছ্বাস সহ্য করতে গিয়ে নাচতে থাকে। কী চমৎকার একটা কথা বলে ফেলেছে মুরলী। দাশুর হাসি থামতে চায় না। মুরলীর কালো চোখের তারা দুটো আরও ক্ষুব্ধ হয়ে দাশুর এই বিনা নেশার উল্লাস দেখতে থাকে।

দাশু বলে হ্যাঁ রে, কানারানী তোর শাশুড়ি বটে। তা না হলে…।

ভ্রুকুটি করে তাকায় মুরলী: তা না হলে কি?

দাশু—তা না হলে ওটা আমাকে ওর ছেইলা বলে মানে কেন, এত দয়াই বা করে কেন ?

মুখ টিপে হাসে মুরলী, আর মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোয়। দাশু বলে—তুই হাসছিস, কিন্তু ভুলিস কেন যে…।

মুরলী আশ্চর্য হয়—কি ?

দাশু—মনে করে দেখ, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যে-রাতে ঘরে এলাম, সে-রাতে আমি তোর উপর মিছা রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হাঁটা দিয়েছিলাম। তুই কেঁদেছিলি চেঁচিয়েছিলি ; সে রাতে কে তোকে দয়া করেছিল ? সে-রাতে আমাকে চলে যেতে পথ দেয় নাই কে ? সে-রাতেই যে তোর পেটে ছেইলা এল, মনে নাই কি ?

আবার মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোয় মুরলী। দাশু বলে—কানারানীকে বাঘিন মনে করবি না।

ঠোঁট ফুলিয়ে ঠাট্টা করে মুরলী ঃ বনদেবী বটে।

দাশু—বনমাতা বটে। বরাকরের সেই মাতা বুড়ি, এক রাতের মধ্যেই যে বুড়ির ছেইলা, ছেইলার মাগ আর নাতি মরে গেল। বুড়িও গাঁ ছেড়ে দিয়ে সেই যে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলে, আর বুড়িকে কেউ দেখতে পায় নাই।

মুরলী—মরে গিয়েছে বুড়ি।

দাশু—না, মরে নাই। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, সনাতন লাইয়াকে শুধায়ে দেখিস। তুক মন্তর করে মাতা বুড়িটাই বাঘিন হয়ে গেল। কানারানীর ছেইলা আছে ; ছেইলারও বাঘিন আছে। নটবর বলে, কানারানীর নাতিও আছে। মুরু পাহাড়ের জঙ্গলে ওরা থাকে। বিশ্বাস না হয় বড় বুড়া রতনকে শুধায়ে দেখিস।

গা-ঝাড়া দিয়ে জোরে একটা হাই তুলে হেসে ফেলে দাশু বলে ঃ কে জানে, আমাকেও কেন ওর ছেইলা বলে মনে করে কানারানী! আমার ঘরের উপর কেন ওর এত দয়া ?

মধুকুপির কিষাণের এই অদ্ভুত বিশ্বাসের গল্প শুনতে একটুও ভাল লাগে না মুরলীর। সিস্টার দিদি কতবার এসে কত কথা বলে আর হেসে হেসে ঠিক এইসব জংলী বিশ্বাসের ময়লা ধুয়ে ফেলতে বলেছে। চুপ করে বসে আঙুলের নখ দিয়ে মেজের মাটির উপর দাগ কাটে মুরলী।

দাশু বলে—নে, আর দেরি করিস না। অনেক রাত হয়েছে, এইবার রেঁধে ফেল।

মুরলী—না।

বড়কালুর পাথরের চটান সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ করে গুমরে ওঠে। হাঁক ছেড়েছে কানারানী। হাঁকের পর হাঁক, মধুকুপির অন্ধকার আর বাতাসকে যেন কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভয়ানক ধমকের শিহর ছড়িয়ে দিচ্ছে। গর্জনের রেশ সড়ক ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে পাকুড়তলা দিয়ে এই ঘরের দিকে ছুটে আসছে।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। একটা লাফ দিয়ে সরে এসে দাশুর হাত

শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর কেঁদে ফেলে।

কিন্তু দাশু হেসে ফেলেঃ কেন মিছা রাগ করে না বললি, আবার শাশুড়ির ধমক খেলি?

মুরলীর মাথায় হাত বোলায় দাশু। তারপরেই হাত ধরে মুরলীকে টেনে নিয়ে এসে উনানের কাছে বসেঃ নে, ঝটপট ভাত রেঁধে ফেল। কতক্ষণ না খেয়ে আছিস, তোর কি নিজের জিউ-জানের লেগেও একটুক ডর নাই?

উনানের কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। হাঁড়িতে চাল ছাড়ে মুরলী। আর দাশুও তার জীবনের এক নতুন বিশ্বাসের আহ্লাদকে যেন দাউ দাউ করে হাসিয়ে মুরলীর কানের কাছে বাজাতে থাকেঃ বড় মজা হয়েছে মুরলী। কানারানীর ডরে জঙ্গলের সব গার্ড, সব বেটা ঠিকাদার ভেগেছে। কেউ আর এই তল্লাটে নাই।

মুরলী আশ্চর্য হয়ে তাকায়ঃ তাতে তোমার মজার কি হলো?

দাশু—টিকিট নিতে হবে না, দস্তুরি দিতে হবে না, ভাগ দিতেও হবে না। জঙ্গলের মাল আনবো আর বেচবো। বড় দয়া কানারানীর।

উনানের আগুনের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে মুরলী। মুরলীর মুখটা থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। চোখে হতাশার জ্বালা ছলছল করে। সত্যিই কি কানারানীর দয়ার জোরে মধুকুপির কিষাণের একটা বাঘা-বাঘা গর্ব আর সৌভাগ্য মুরলীর অদৃষ্টকে স্বপ্নছাড়া করে এই ঘরের ভিতরে চিরকাল আটক করে রাখবে?

দাশু বলে—মুখটা ঘুরিয়ে নে মুরলী; মিছা ধোঁয়া লাগিয়ে চোখ দুটোকে জ্বলাস কেন?

মুখ ঘুরিয়ে নেয় মুরলী।

একটা দুটো দিন নয়, পর পর অনেকগুলি দিন, প্রায় একটা মাস ধরে দাশু ঘরামির টাঙ্গি আর পাথুরে শরীরের খাটুনি যেন এক-একটা মত্ততার উৎসবের মত মাতামাতি করে মুরলীর আশা হিসাব আর কল্পনাকে ভয় পাইয়ে চুপ করিয়ে রাখে। কোনদিন চাল, কোনদিন মকাই, কোনদিন মাষকলাই এনে ঘরের শূন্য সরা ডালা আর ঝোড়া ভরে ফেলে দাশু।

মধুকুপির আকাশে কালো কালো শাওন মেঘ ভেসে বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে খুব জোর বৃষ্টি ঝরায়। বড়কালার বুকের মরা ঝরনার দাগটা আবার প্রাণ পেয়ে কলকলিয়ে ওঠে।

বড়কালুর পায়ের কাছে বহেড়ার জঙ্গলে সারা রাত ধরে যে আগুনটা জ্বলেছিল, সেই আগুন শাওনের এক পশলা ঝরানিতে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। তাজা বহেড়ার গাছগুলি কালো কাঠকয়লা হয়ে জঙ্গলের বুকে ছড়িয়ে আছে। এই তো সুযোগ।

ভোর না হতেই বের হয়ে যায় দাশু; আর, এক ক্রোশ বুনো পথ প্রায় এক দৌড়ে পার হয়ে গিয়ে পোড়া জঙ্গলের বুকের ভিতরে গিয়ে ঢোকে। টুকরো করে। কাঠকয়লার প্রকাণ্ড বোঝা শালপাতা দিয়ে জড়িয়ে আর লতা দিয়ে বেঁধে

মাথায় বয়ে নিয়ে আসে। সোজা গিয়ে ঈশান মোক্তারের কুঠিতে কাঠকয়লার বোঝা আছাড় দিয়ে ফেলে। এক বেলার খাটুনির জোরেই সের দুই চাল রোজগার করে ঘরে ফিরে আসে দাশু।

তিন-চারটে দিন কাঠকয়লা টেনে টেনে পার করে দেবার পর আবার ভাবতে হয়। মধুকুপির আকাশের মেঘের দিকে, আর মধুকুপির চারদিকের যত জংলা সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। মধুকুপির ডাঙা আর ক্ষেতগুলির দিকেও তাকায়।

মনে পড়ে, বহেড়া জঙ্গলের কাছে, যেখান থেকে নতুন রেল-লাইনের গুরু-গুরু শব্দ খুব স্পষ্ট করে শোনা যায়, সেখানে শত শত কচি আর বুড়ো খয়ের গাছের একটা জটলা লুকিয়ে আছে। কে জানে, গোবিন্দপুরের কোন্ বাবুর ইজারা হয়ে আছে ওই খয়েরের জটলা?

টাঙ্গিটাকে শানিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় দাশু। পর পর সাত দিন ধরে খয়েরের ডালপালা আর ধড়ের বড় বড় বোঝা ঘাড়ের উপর তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। মুরলী শুধু ঘরের দাওয়ার উপর চুপ করে বসে তাকিয়ে থাকে। দুটো বড় বড় উনান তৈরি করে আর উনানের উপর বড় মাটির হাঁড়া বসিয়ে খয়ের জ্বাল দেয় দাশু। খয়েরের কালো ক্বাথ টগবগিয়ে ফোটে। দাশু একাই কাঠের হাতা চালিয়ে ক্বাথ ঘাঁটে। আর, দুটো দিন পরে দুই হাঁড়া চিটা খয়ের ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে ফেলে। বেশি দরাদরি করে না দাশু। খয়েরের বদলে আধ মণ মকাইয়ের একটা বোঝা কাঁধে বয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

মাঝে মাঝে, টাঙ্গিটাকে অলসভাবে কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে মধুকুপির ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে অলসভাবে ঘুরেও বেড়ায় দাশু। ঘরে চাল আছে, মকাই আছে; ভাবনা করবার কিছু নেই। দাশুর দুই চোখ যেন আবার সেই পুরনো স্বপ্নে বিভোর হয়ে মধুকুপির মাটি আর কাদার রঙ খুঁজে খুঁজে ঘুরতে থাকে। কোথায় কালো কালো দো-আঁশ, কোথায় সাদাটে বেলে, আর লালচে এঁটেল? দাশুর চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে থমকে যায়। ডরানির বাঁকের উত্তর দিকে কী চমৎকার বেলে মাটির গরাঞ্জি এই শাওনেও একেবারে নেড়া হয়ে পড়ে আছে। ছিঃ! কুঠি যদি একটা চিঠা দিত, আর বীজ লাঙল দিত, তবে দাশু যে একা খেটে ওই গরাঞ্জির পাঁচ বিঘা ভরে বোরো ফলাতে পারতো।

অলসভাবে হেঁটে, যেন মধুকুপির মাটির গন্ধে নেশা জমাবার জন্য এক অদ্ভুত পিপাসা নিয়ে ঘুরতে থাকে দাশু। অত দূরে কেন, এই তো কত কাছে পাকা সড়কটার লাগান একটা ঢালুর এঁটেল বৃষ্টির জলে গলে গিয়ে কেমন সুন্দর লালচে কাদা হয়ে পড়ে রয়েছে। এই জমিটার বিঘা পাঁচেক জমা নিলে ভাল হয়। ধুন্দুল, শশা আর করলা ফলবে ভাল। আর, কার্তিকের শিশির পড়তেই দু বার হাল ফিরিয়ে চষে নিয়ে কপি আর মটর করা যেতে পারে। চারদিকে জিরা ছড়িয়ে দিতেও পারা যাবে! কিন্তু তার আগে খণ্ডে বুনে একবার মাটি

জো পাকিয়ে নিতে হবে, আর চাই গুলঞ্চের বেড়া।

আগে জমা চাল ফুরিয়ে যায়, তারপর মকাইয়ের দানা। সেদিন আবার টাঙ্গিকে শান দিতে দিতে মুরলীর মুখের দিকে তাকায় দাশু: তুই কি ভাবছিস?

মুরলী—কিছু না।

দাশু—ভাবছিস, মকাইয়ের দানা ফুরিয়ে গেল, এইবার কিষাণটা জব্দ হবে।

চমকে ওঠে মুরলী। মুরলীর মনের হিসাবও হঠাৎ বোকা হয়ে যায়। মধুকুপির কিষাণের চোখ দুটোকে যত বোকা মনে করেছিল মুরলী, তত বোকা তো নয়। মুরলীর এই থমথমে মুখভার, ভীরু ভ্রূকুটি আর সারাদিনের আনমনা চাহনি দেখে বুঝতে পেরেছে দাশু, মুরলী এখনও যেন দাশুর এই অহংকারের পতন দেখবার জন্য মনে মনে একটা আশা ধরে রেখেছে।

দাশু হাসে: তুই মিছা ভেবে মনটাকে দুখাস কেন মুরলী? আমি জব্দ হব না।

অবিশ্বাস করতে পারে না মুরলী। তাই দাশুর এই নরম ঠাট্টার শক্ত খোঁচা খেয়েও মুরলীর চোখে আর ভ্রূকুটি শিউরে উঠতে পারে না; দাশুর এই প্রচণ্ড খাটুনির মাতলামি দেখে মায়া হলেও চোখে জল আনতে পারে না। কিন্তু দাশুর হাসির সঙ্গে সায় দিয়ে হাসতেও পারে না।

—আমি আসছি। টাঙ্গিটা কাঁধে তুলে ঘর থেকে বের হতে গিয়েই চমকে ওঠে, আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায় দাশু। কড়কড় করে একটা বাজ ফেটেছে। ডাঙার তালগাছের মাথার উপর চিলের ঝাঁক এলোমেলো হয়ে উড়ছে। আর, কালো মেঘের চাপ গলে গিয়ে জটার মত লম্বা হয়ে কপালবাবার জঙ্গলের উপর ঝুলছে। মধুকুপির ক্ষেত মাঠ আর জঙ্গলের সব সবুজ যেন কালিমাখা হয়ে ধুটঘুট করছে। মধুকুপির সকাল বেলা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে সন্ধ্যার চেয়েও বেশি কালো হয়ে গিয়েছে।

ডাঙার তালগাছগুলিকে প্রায় শুইয়ে দিয়ে একটা ঝড় ছুটে এল। শিলা ঝরতে থাকে। কনকনে ঠাণ্ডা বরফের গোলকের মত এক-একটা আধসেরী শিলা। ঈশান মোক্তারের খাটালে গরুর চিৎকার করুণ হয়ে ছটফট করতে থাকে। তার পরেই শাওনের অঝোর বৃষ্টির শব্দে মধুকুপির সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।

জামকাঠের দরজার কাছে চুপ করে এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। আর ঘরের ভিতরে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর গম্ভীর মুরলী।

এই বৃষ্টি কি থামবে? দাশুর ভাবনার এই প্রশ্নটাকে যেন ঠাট্টা করে চমকে দিয়ে মধুকুপির আকাশে একটা বিদ্যুতের চমক লিকলিকিয়ে উঠল। তার পরেই আরও জোর বৃষ্টি। দেখতে থাকে দাশু, পাকা সড়কটা যেন একটা স্রোতের ঢল হয়ে গলে গলে ভেসে যাচ্ছে।

কতক্ষণ চুপ করে জামকাঠের দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দাশু, সেকথা মনে পড়তেই দাশুর ভাবনা দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে। বেশ বেলা হয়েছে, সময় চার-পাঁচ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। দেখতে পায় দাশু, একটা মাকড়সা

এরই মধ্যে দাশুর হাতের স্তব্ধ টাঙ্গি আর দাশুর মাথার চুলের সঙ্গে একটা জাল জুড়ে দিয়ে তরতর করে আসছে যাচ্ছে আর নাচছে। দাশুর ভাগ্যটা কি আবার একটা পরীক্ষার ভ্রূকুটি দেখতে পেয়ে ভয় পেয়েছে আর অনড় হয়ে গিয়েছে; তা না হলে এই মাকড়সাটা কেন···।

মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতরে তাকায় দাশু। চমকে ওঠে। ঠাণ্ডা উনানের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে উনানের কাছে চুপ করে বসে আছে মুরলী। আঙুলের নখ দিয়ে মেঝের মাটিতে দাগ কাটছে। মুরলীর জীবনের হিসাব আবার দাশু ঘরামির অহংকার ভাঙবার আশায় যেন নতুন হাসি হাসছে।

বিদ্যুৎ চমকায়; দেখতে পায় দাশু, হ্যাঁ ঠিকই, মুরলী যেন মাথা হেঁট করে মুখ লুকিয়ে হাসছে। আজ দাশু ঘরামির এই সাধের ঘর উপোস করবে এক দানা চাল আনবার সাধ্যি নেই, উপায় নেই দাশুর। আজ আবার মুখ টিপে হেসে হেসে দাশুকে প্রশ্ন করতে পারবে মুরলী, কি গো মধুকুপির কিষাণ মুরলীকে এইরকমটি না খাইয়ে জ্বালালে তোমার ছেইলাটা বাঁচবে তো?

বৃষ্টির ঝরানির শব্দ ছাপিয়ে আর একটা শব্দ। এই শব্দ যেন বড়কাল আর ছোটকালুর সব পাথর গুঁড়ো করে দিয়ে, মধুকুপির ডাঙার পাঁজর কাঁপিয়ে আর গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটে আসছে।

—হুড়পা বান! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। সেই ভয়ানক শব্দের হুড়মুড়ে গড়ানির মধ্যেই চাপাচাপা দূরের আর্তনাদের মত একটা চাপা-চাপা করুণ কলরোল শোনা যায়।—হুড়পা বান! হুড়পা বান! সারা মধুকুপির আতঙ্কিত মানুষ চিৎকার করছে আর ঠেঙার বাড়ি মেরে টিন পিটিয়ে হুড়পা বানের হুঁশিয়ারি জানান বাজাতে শুরু করেছে।

পাগল হয়েছে ডরানি। জানে দাশু, বছরে অন্তত একটি দিনে ডরানি এই পাগলপারা কাণ্ডটি করে। কম করে দশটি পাহাড়ের গা থেকে জলের ঢল গড়িয়ে পড়ে ডরানির জলকে হঠাৎ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাগল করে দেয়। দশ হাত উঁচু জলের হুড়পা নিয়ে দু পাশের জঙ্গল ভেঙে ভাসিয়ে গড়িয়ে আর ঠেলে ডরানির বান ছুটে এসে ঠিক এই মধুকুপির ক্ষেত আর ডাঙার উপর ছড়িয়ে পড়ে। কিষাণের ঘরের আঙিনার ভিতরেও কলকল করে জলের তোড় ঢুকে আসে। মাঝে মাঝে মাচানের মানুষও মাচানের সঙ্গে টলমল করে জলের উপর পড়ে। কেউ বাঁচে, কেউ বা লাস হয়ে ভেসে চলে যায়। এক হাঁটু জলের তোড়েও রোগা গরু-মহিষ হাঁটু ভেঙে পড়ে যায় আর ভেসে যায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবে দাশু। কি-যেন মনে পড়েছে দাশুর। ঘরের ভিতর থেকে চোপের দড়ির একটা পুঁটলি হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে আসে দাশু। তারপর সেই শাওনে বৃষ্টির অঝোর ধারার ভিতর দিয়ে ছুটে চলে যায়।

ডরানির ছোট পুলের কাছে এসে যখন থমকে দাঁড়ায় দাশু, তখন বৃষ্টি জোর একটু ক্লান্ত হয়ে এসেছে। কপালবাবার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি-যেন বিড়বিড় করে দাশু। তার পরেই সড়ক থেকে নেমে ডরানির জলের কিনারায় এক হাঁটু জলের উপর শক্ত হয়ে, চোপের দড়ির মুখে ঢেলা বেঁধে দি

মেছুয়া শিকারীর মত তাক করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হয় না। দাশুর কল্পনার আশাকে যেন অজস্র দানে ভরে দেবার জন্য বানভাসি ডরানির জলের উপর দিয়ে বাঁশের ছোট ছোট টাল ভেসে আসতে থাকে। দড়ি ছোঁড়ে দাশু। একবার, দুবার, তিনবার। দুবার ব্যর্থ হয়, তিনবারের খেপ ব্যর্থ হয় না। বাঁশের একটা বড় টাল আটক করে ডাঙার উপর টেনে তোলে দাশু।

বাঁশের টাল টেনে নিয়ে গিয়ে ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে জমা দিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। তারপর আড়াই সের চাল নিয়ে মধুকুপির সেই জামকাঠের দরজার কাছে গিয়ে আবার দাঁড়াতে আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগে।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—উনানে আগুন দে মুরলী।

উনানে আগুন দেয়, হাঁড়িতে চাল ছাড়ে মুরলী। তার পরেই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলে।

জাহির থানে মোরগ বলি দিয়ে ঘরে ফিরে আসে দাশু।

মুরলীকে একবার শুধাতে ইচ্ছা করে দাশুর; এটা তোর কি রকমের ঢং বটে?

হ্যাঁ ঢং বটে, কিন্তু ঠিক মুরলীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢং বলে মনে হয় না। যেন কোন্ এক প্রচণ্ড তামাসার আত্মা মুরলীর চোখ আর মুখের উপর খেয়ালের ছায়া ফেলে খেলা করছে। তা না হলে এরকম কাণ্ড করবে কেন মুরলী? মুরলীরই মরদ তার ওই অদ্ভুত রকমের শক্ত-শক্ত হাড়মাসের জাদু দিয়ে তৈরি হাত-পায়ের খাটুনি, পাথরের পাটার মত পোক্ত বুকের সাহস, আর শান দেওয়া একটা নির্ভয় টাঙ্গির জোরে দুর্ভাগ্যের এক-একটা কঠোর মতলব ছিন্নভিন্ন করে এই ঘরের প্রাণকে উপোস করা কষ্টের জ্বালা থেকে বাঁচাবার জন্য চাল আর মকাই নিয়ে আসে, তখন কেন কেঁদে ফেলে মুরলী? আর ঘরের ডালা ও সরা যখন শূন্য হয়ে যায়, যখন চাল আর মকাইয়ের শেষ দানাও ফুরিয়ে যায়, তখন কেন মুরলীর মুখটা হেসে ওঠে?

নিজেকেও একবার শুধাতে ইচ্ছা করে দাশুর, মধুকুপির কিষাণেরও প্রাণের ঢং এমনতর হয়ে গেল কেন? মুরলী যখন কেঁদে ফেলে, তখন দাশুর মুখটা কেন অদ্ভুত এক অহংকারের আরামে হেসে ওঠে? আর মুরলী যখন মুখ টিপে হাসে, তখন ভয় পেয়ে দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে কেন দাশু কিষাণের পাথুরে বুক?

ছোট মধুকুপির গেঁয়ো প্রাণ আর চেহারার উপরেও কদিন ধরে একটা প্রচণ্ড তামাসার আত্মা যেন খেয়ালের ছায়া ফেলে ফেলে খেলা করছে। মধুকুপির আকাশ রোদের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে হাসে, আর মধুকুপির মাটি বানভাসির জলে ডুবে আর ভিজে গিয়ে ছলছল করে। পুব আর দক্ষিণের দিক সবচেয়ে বেশি ভেসেছে। বাবলা বনে এক বুক, আর ঢালুর ক্ষেতগুলির উপর

এক কোমর জল। উঁচু উঁচু ডাঙার পিঠগুলি শুধু ভেসে আছে। তার উপর শকুনের ঝাঁক জিরোয়। কপালবাবার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সব খাত জলে ভরে আছে। সাবাই ঘাসের এত বড় জঙ্গলটা পচেই যাবে বলে মনে হয়। পলাশবনের গা ঘেঁষে ডুবো ডাঙ্গার উপর বড় বড় জয়ঢাকের মত মরা গরুর ফোলা-ফাঁপা লাস ভাসে; আর ডাঙার শকুন উড়ে এসে ডানা ধড়ফড়িয়ে পলাশের পাতা ঝরায়।

শুকনো শুধু পশ্চিমটা আর উত্তরটা। নেড়া নেড়া পাথুরে ঢিবি আর কাঁকুরে ডাঙা ধরে যত খুশি এগিয়ে যেতে পারা যায়. সোজা ভুবনপুর পেঁৗছে যাওয়া যায়, পায়ে এক ছিটে কাদা লাগবে না। কারণ কাদাই নেই; ক'টা দিনের শাওনে ঝরানিতে মাটি গলেছিল ঠিকই, কিন্তু এই ক'দিনের রোদের ঝাঁঝে সেই গলানি এখন শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে।

টাঙ্গিটা কাঁধে নিয়ে মিছে তিনটে দিন এদিক ওদিক ঘুরে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিছে ছুটোছুটি করে ঘরে ফিরে এসেছে দাশু। জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাবার পথগুলি যদি জলে ডুবে না থাকত, তবে অন্তত এই ক'দিনের মধ্যে মণ দুয়েক বুনো লতা উপড়ে নিয়ে এসে, ছেঁচে পিটে আর প্যাকিয়ে এক গাদা দড়ি তৈরি করে, আর গিরিমাটি দিয়ে সুন্দর করে রাঙিয়ে নিয়ে ঈশান মোক্তারের ডাণ্ডারে জমা দিতে পারা যেত। কম করেও পাঁচ সের চাল দিত ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারী। কিন্তু মিছে আশা। টাঙ্গি হাতে নিয়ে ডরানির ছোট পুলের কাছে দাঁড়িয়ে আর জঙ্গলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে দাশু।

চার দিনের পর সেই দিন, শেষ এক পোয়া চাল আধ হাঁড়ি জলে ফুটিয়ে নিয়ে ফেনভাত খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে গিয়েই চমকে ওঠে দাশু; আর, মুরলী যেন ঢেঁকুর চাপা দিতে গিয়ে হেসে ফেলে।

সে রাতের ঘুমটাও বার বার ছিঁড়ে যায়। দাশুর চোখের উপর অদ্ভুত এক ভয়ের জ্বালা বার বার ছটফট করে। মুরলীর কোমরের উপর হাত রাখতে ভয় করে: এক পোয়া চালের ফেনভাতের আধা ভাগ খেয়ে মানুষের ভূখ মরে না। মুরলীরও ভুখ মরে নি, মুরলীর পেটটা যেন ভয়ানক এক অভিমানে চুপসে রয়েছে। ঘুমন্ত মুরলীর পেটের উপর হাত বোলাতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে দাশুর বুক। মুরলীর এই পেটের উপর চুমো খেতে গিয়ে যে ধুকপুক শব্দ শুনে কাল রাত্রিতেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল দাশুর কলিজা, সেই ধুকপুক শব্দও কি চুপসে শান্ত হয়ে গেল? দাশুর ছেইলার প্রাণটাও কি উপোস সহ্য করতে গিয়ে অভিমান করে নিথর হয়ে গিয়েছে?

দাশুর চোখের জ্বালা ভিজে যায়। দু হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ মোছে দাশু।

ভোর হয়ে এল বোধহয়। কাক ডাকতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু আর দেরি না করে এখনি বের হয়ে যাওয়া ভাল। খাটুনি খোঁজবার একটা উপায় বের করবার জন্য বেশি সময় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, ঠাণ্ডা উনানের উপর

হাঁড়ি চড়িয়ে দাশুর মুখের দিকে অদ্ভুত রকমের একটা দৃষ্টি তুলে তাকাবে মুরলী, সে দৃশ্য দেখবার আগেই বের হয়ে যাওয়া ভাল।

—শুনছিস মুরলী?

—কি বলছো?

—আমি বের হলাম।

মুরলীর হঠাৎ-জাগা চেতনার কোন ধিক্কারের শব্দ শোনবার আগেই, মুরলীর মুখে ঝিক করে সেই রহস্যের হাসি ফুটে ওঠবার আগেই টাঙ্গি কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যায় দাশু।

কিন্তু বৃথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মধুকুপির খোলা সড়কের এক ক্রোশের হাওয়া আর আলোর মধ্যে দাশু যেন কয়েদীর মত লোহার বেড়ি দিয়ে বাঁধা একটা শাস্তির ভারে অসহায় হয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায়; ছটফট করে আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। বানভাসির জল সবে মাত্র সরতে শুরু করেছে। ডাঙার গা থেকে ঝরনার মত জলের ধারা নেমে খাতের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। কে জানে আর কতদিন লাগবে, কবে সব জল আবার টেনে নেবে ডরানি, আর জঙ্গলে যাবার পথগুলি শুকিয়ে যাবে?

পলাশবনের কাছে উড়ন্ত শকুনের ছায়া যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাপ্সা হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরে ফিরে আসে দাশু। পুরনো জামকাঠের দরজার উপর হাতের ঠেলা দিয়ে একটা শব্দ করবার সাহসও দাশুর হাতের হাড়মাস থেকে যেন আলগা হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। হাত কাঁপে, বুক কাঁপে দাশুর। পেটের ভিতরে ক্ষুধার জ্বালাটাও যেন ভয় পেয়ে সিরসির করে।

দাশুর জীবনের প্রতিজ্ঞা আজ হেরে গিয়েছে। শূন্য হাতে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে আজ শুধু চুপ করে তাকিয়ে দেখতে হবে, মুরলীর মুখের সেই রহস্যের হাসি কাটারির শান দেওয়া হাসির মত জ্বলছে। আজ একেবারে শূন্য হাঁড়ি আর ঠাণ্ডা উনানের দিকে তাকিয়ে দাশু ঘরামির এই সাধের ঘরের প্রাণ উপোস করবে, আর ঘুমোতে না পেরে ছটফট করবে।

দরজা খুলে দেয় মুরলী। কিন্তু মুরলীর মুখের দিকে তাকায় না দাশু। খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর একটা আহত ও কিষ্ট জীবনের পিণ্ডের মত অনড় হয়ে বসে থাকে।

মুরলীও কোন কথা বলে না। কিন্তু নিঝুম হয়ে মেঝের উপর বসেও থাকে না মুরলী। উঠে যায়; দাওয়ার উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতন করে আর মুখ ধুয়ে নিয়ে, তারপর ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে যেন একটা শান্তির হাঁপ ছাড়ে মুরলী। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকে শুয়ে পড়ে।

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় দাশু; রেড়ির তেলের মেটে বাতিটাকে জ্বালিয়ে নিয়ে ঘরের দেয়ালের ও চালার ফাঁকে হাতড়ে হাতড়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে।

মুরলী বলে—কি খুঁজছো?

দাশু—আমার কাঁড়-বাঁশটা আছে কি নাই?

মুরলী—নাই।

দাশু—কেন ?

মুরলী—পচে গিয়েছিল, ফেলে দিয়েছি।

তবু কি-যেন খুঁজতে থাকে দাশু। ধামন কাঠের ধনুকের সেই বাঁকটা কি নাই ? ধনুকের তাঁতটাও কি পচে গিয়েছে ? এক গোছা তীরও তো ছিল।

—কি খুঁজছো ? আবার মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে মুরলী।

—আমার ধনুকটা আর তীরগুলা কি নাই ?

—আছে।

হ্যাঁ আছে। চালার বাঁশের সঙ্গে গোঁজা ধনুকটা আর তিনটা তীর নামিয়ে নিয়ে ধুলো ঝাড়ে দাশু। ধনুকের ছিলার তাঁত ছিঁড়ে গেলেও পচে যায় নি। আর তীরের ফলাগুলি মরচে পড়ে ময়লা হয়ে গিয়েছে, এই মাত্র।

ছিলার ছেঁড়া তাঁতে নতুন করে গিঁট বাঁধে দাশু। ধামনকাঠের বাঁকের দুই মুখ টেনে নতুন করে ছিলার ফাঁসে ফাঁসিয়ে ধনুকটাকে জীইয়ে তোলে। তীরের ফলার মুখগুলিকে ঘষে ঘষে চকচকে করে।

বাতির কাছে তীরের ফলা এগিয়ে নিয়ে দেখতে থাকে দাশু ; দাশুর চোখের তারা দুটোও তীরের ফলার মত ঝিকঝিক করে জ্বলতে থাকে। যেন জীবনের এক ভয়ানক অভিশাপের কলিজা বিঁধে রক্তের ফোয়ারা ছড়িয়ে দেবার জন্য, আর সেই রক্তের লোনা স্বাদ পেট ভরে খেয়ে নাচবার জন্য দাশু কিষাণের চোখের তারায় একটা প্রচণ্ড বুনো আশা নাচতে শুরু করেছে। পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, বুকের একটা নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন গুঁতো খেয়ে শিউরে ওঠে। কিন্তু উপোসের জ্বালা ভুলে গিয়ে একটা কল্পনার নেশায় খুটখাট করে খেলা করতে থাকে দাশু। অলস জিভটাকে এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁট চাটে !

একটা শব্দ। ঘরের নীরবতার গুমোট যেন মুখ লুকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে। চমকে ওঠে দাশু। মুরলীর দিকে তাকায়।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আর পাশমোড়া দিয়েছে মুরলী। দু হাতে মুখ ঢাকাও দিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারে না দাশু, খিলখিল করে হেসে উঠল, না, খিলখিল করে কেঁদে উঠল মুরলী।

বাতি নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে দাশু। মধুকুপির রাতের প্রহরের সব ক্লান্তি যেন ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে কান্না মিশিয়ে দিয়ে বাজতে থাকে। দাশুও জাগা চোখের একটা আক্রোশ ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে চুপ করে বসে থাকে। ভোর হতে আর বাকি কত ?

ডাঙাটা এদিকে আধ ক্রোশ আর ওদিকে আধ ক্রোশেরও বেশি হবে। মাঝে মাঝে বুড়ো বয়সের এক-একটা বট, তা ছাড়া ডাঙার বাকি সব ঠাঁই জুড়ে ফণী-মনসা, বাঘভেরেণ্ডা আর ময়নাকাঁটার ঝোপ। এই ডাঙাটা জলে ডোবে নি। পাকুড়তলার কাছ থেকে হাঁটা দিলে এই ডাঙায় পেঁছিতে এক ঘণ্টার বেশি সময়ও লাগে না। পেঁছিতেও খুব বেশি অসুবিধা নেই। পাকুড়তলা থেকে ডাঙার

পশ্চিমের গড়ানি পর্যন্ত এক হাঁটুরও কম জল ছপছপ করে।

পাঁচ বছর আগে এই ডাঙার ঝোপের আড়ালে বসে ঢোলক পিটিয়ে একটা ছাগলা হরিণকে ভয় পাইয়ে দিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে বের করেছিল দাশু। কাঁড়-বাঁশ চালাতে হয় নি। একটা পাথর ছুঁড়ে ছাগলা হরিণটাকে ঘায়েল করেছিল। সুরেন মানঝিও ফাঁদ পেতে এই ডাঙার ঝোপঝাপের ভিতরে কত খরগোশ আর ছাগলা হরিণ কতবার ধরেছে।

ডাঙার বাকি তিন দিকে জল; সে জলে ঢালুর আর খাতের সব ঝোপঝাপ ডুবে রয়েছে। শুধু পুব দিকের জলে টান ধরেছে। পাথরের চটানের ধাপে ধাপে প্রপাতের মত জল গড়িয়ে পড়ছে। টানের জোর কম নয়; জলের শব্দেরও বেশ রাগ আছে।

ধনুক আর তিনটে তীর এক হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে ডাঙার ঝোপঝাপের ভিতর দিয়ে পা টিপে টিপে ঘুরতে থাকে দাশু। ভোরের ফিকে অন্ধকার মুছে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সকাল বেলার লালচে রোদ ঝলক দিয়ে ডাঙার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। সেই বুড়ো বটও আছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে দাশু। পাঁচ বছর আগে শত শত পাখিতে ছেয়ে থাকত যে বট, সেই বটের কাছে দাঁড়িয়ে একটা পাখির ডাকও শোনা গেল না।

রোদের তাত বাড়ে। দাশু ঘরামির আদুড় শরীর ঘামে ভিজে গিয়ে চকচক করে। বুড়ো বটের মাথার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় দাশু, একটা হরিয়াল ঘুঘুর ছায়াও কোথাও উশখুশ করে না।

ঝোপঝাপও কত ফাঁকা হয়ে গিয়েছে! এক কণা ধুলোও নেই। শুধু কাঁকর আর কাঁকর, আর ভোঁতা ভোঁতা কালো পাথরের ধড়। মাঝে মাঝে ঘেসো সবুজের ছোট ছোট ছিটা দেখা যায়। শাওনের জলে ধোয়া হয়ে পরিষ্কার কাঁকরগুলি ঝকঝক করে; দাশুর পায়ের চাপে করকর করে বাজে।

ফণী-মনসার চেহারাও কত ফ্যাকাসে; উইঢিবির সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে এক-একটা ঝোপ। বাঘভেরেণ্ডার পাতায় মাকড়সার ছেঁড়া জাল সাদা জটার মত গুটলি পাকিয়ে পড়ে আছে। ময়না কাঁটার শুধু কাঁটা আছে, পাতা প্রায় নেই। এই শাওনের জলেও সবুজ হয়ে ওঠে নি ঝোপগুলি। ছাগলা-হরিণ ধরবার আশা ছেড়ে দেয় দাশু। এখানে ছাগলা-হরিণ থাকতে পারে না।

কিন্তু খরগোশও কি নেই? ঝোপঝাপে এত গর্ত; এই সবই যে খরগোশের গর্ত। কিন্তু কই? এতক্ষণ ধরে তাক করে পাথরের আড়ালে বসে আছে দাশু, তবু গর্তের মুখ থেকে একটাও খরগোশের মুখ উঁকি দিয়ে তাকাল না কেন? সবই কি হুড়পা বানের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে? কিংবা, এই রুক্ষ আর শুকনো ডাঙাটাকে ঘেন্না করে চলে গিয়েছে?

শক্ত করে ধনুকটাকে এক হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে, আর এক হাতে একটা তীর দোলাতে দোলাতে আবার ঝোপঝাপের যত ছায়া আর যত রন্ধ্রের দিকে অপলক চোখের জ্বালাময় পিপাসা ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরতে থাকে দাশু। একটা গর্তের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। এক গাদা শুকনো পাতা জড়ো করে গর্তের

মুখে ফেলে দিয়ে আগুন ধরায়। পোড়া পাতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ; চাপ চাপ ধোঁয়া হেলেদুলে ভাঙে আর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৃথা। গর্তের মুখ থেকে কোন আতঙ্কিত খরগোশের মূর্তি হুট করে বের হয়ে আসে না। ধোঁয়ার জ্বালা লেগে দাশুরই চোখ দুটো জ্বলতে থাকে।

বেলা বাড়ে। দাশুর চোখ দুটো ঠিক দিনের বেলার নেকড়ের মত হিংস্রুটে ক্ষুধার জ্বালায় কুঁচকে শীর্ণ হয়ে চারদিকের যত ঝোপঝাপের ছায়ার দিকে তাকায়। দাশুর ছায়াটাও যেন লোভী জানোয়ারের মত ঝোপঝাপের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘুরতে থাকে। এত বড় ডাঙার মধ্যে কি একটাও মাংসল প্রাণ কোথাও লুকিয়ে নেই ? না থাকলে চলবে কি করে ? দাশুর জীবনের স্বপ্ন যে উপোসের জ্বালায় চুপসে মরে যেতে বসেছে !

ডাঙার এদিকে ওদিকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীরব ঝোপগুলিকে জখম করে ছুটতে থাকে দাশু। তারপর ক্লান্ত হয়ে একটা উইঢিবির কাছে বসে পড়ে ধুকতে থাকে।

কিন্তু বসে থাকতে পারে না। উইঢিবির ধুলো গায়ের ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে কাদা হয়ে যায়। দাশুর চেহারাও একটা আহত জানোয়ারের মত দেখায়। আবার ডাঙার ঝোপঝাপের সব ছায়া আর সব গর্তের দিকে চোখ রেখে এদিক থেকে ওদিকে ছুটতে থাকে দাশু।

হঠাৎ চমকে ওঠে, থমকে দাঁড়ায় দাশু। দাশুর ঘামে-ভেজা মুখের উপর যেন এতক্ষণে সফল স্বপ্নের আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে। সাদা দাঁতের দুই পাটি ঘষা খেয়ে আস্তে একটা শব্দ করে ওঠে, যেন সাদা হাসির উল্লাস ঠিকরে পড়ে।

একটা খরগোশ। বেশ বুড়ো হয়েছে খরগোশটা। মাথার রোঁয়া অনেকখানি ঝরে পড়ে গিয়েছে। একটা পা খোঁড়া। চোখের কোণে পিঁচুটি। বুড়ো খরগোশটা ফণী-মনসার ছায়ার কাছে মরা ঘাসের মূল খুঁড়ে খুঁড়ে বের করছে, আর সামনে দু পায়ের ছোট ছোট দুটি থাবা দিয়ে তুলে ধরে খাচ্ছে। এত বড় ডাঙার ঝোপঝাপের মধ্যে বোধ হয় এই বুড়ো খরগোশটাই একলা পড়ে আছে ; ডরানির বানের শব্দ শুনেও পালিয়ে যেতে পারে নি ;

ধুলোতে হাত ঘষে নিয়ে হাতের ঘাম মুছে, ধামনকাঠের ধনুকে একটা টোকা দিয়ে আর তীর জুড়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দাশু। কিন্তু বৃথা, সেই মুহূর্তে এক লাফ দিয়ে ফণী-মনসার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল খরগোশটা।

কিন্তু যাবে কোথায় ? হেসে ওঠে দাশু। বুড়ো খরগোশের পেটও ক্ষিদেয় জ্বলছে যে, নইলে মরা ঘাসের মূল খাবে কেন ? বের হয়ে আসতেই হবে, আর কতক্ষণই বা কোন্ গর্তে লুকিয়ে থাকতে পারবে ?

ধনুকে তীর জুড়ে আর নিথর হয়ে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। দাশুর চোখের চাহনিটাও যেন লালায় ভরে গিয়ে চকচক করে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটোকে চেটে চেটে ভিজিয়ে তোলে দাশু।

বেলা বাড়ে। দাশুর চোখের আশাও ক্লান্ত হয়ে যেন নেতিয়ে পড়ে।

আবার সরে গিয়ে অন্য দিকে তাকায় দাশু। মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে। হ্যাঁ, সেই বুড়ো খরগোশটাই এতক্ষণ বাঘভেরেণ্ডার ছায়ার কাছে সবুজ ঘাসের একটা ছিটার কাছে বসে ছিল; দাশুর ছায়া দেখতে পেয়েই দৌড় দিয়েছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছে বুড়ো খরগোশ। তীর চালায় দাশু। কিন্তু খরগোশটার খাড়া কান দুটো কী ভয়ানক চতুর! কান দুটো দিয়ে মাথা ঢেকে আর মাথাটাকে চকিতে নামিয়ে দিয়ে একটা ঝোপের ভিতরে লাফ দিয়ে পড়ল খরগোশটা। ডাঙার পাথরের উপর মিছা আছাড় খেয়ে পড়ে তীরটা দু টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

কিন্তু সেই ঝোপের কাছে একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় দাশু। আবার ধনুকে তীর জুড়ে দিয়ে ছটফট করে লাফাতে আর হাঁপাতে থাকে। কিন্তু কই? ঝোপের ভিতরে কোন ভীরু খরগোশ মুখ গুঁজে পড়ে নেই। পালিয়েছে ধূর্ত ঠগটা। দাশু ঘরামির ক্ষুধার লালা আর জ্বালার সঙ্গে যেন ঠাট্টার খেলা খেলে বেড়াচ্ছে খরগোশটা।

আবার সরে যায় দাশু। চলতে চলতে একটা গর্তের কাছে থমকে দাঁড়ায়। গর্তের মুখের কাছে যেন এইমাত্র হালকা ধুলো উড়েছে; তারই রেশ এখনও রয়েছে। দাশুর সারা মুখ জুড়ে আবার একটা আশাময় সন্দেহের হাসি থমথম করে। বাঘভেরেণ্ডার আগডালের কচি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে গর্তের মুখের কাছে ফেলে দিয়ে একটু আড়ালে সরে দাঁড়ায় দাশু। ধনুকে তীর জুড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।

বিকালের আলো লাল হয়ে এসেছে। আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠে দাশুর কাদাটে ঘামে পিছল হয়ে যাওয়া বুকটা। ওই খরগোশটাকে বিঁধে নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে; কিন্তু সময় যে আর বেশি নেই। কখন্ বের হবে খরগোশটা?

আশায় রঙীন হয়ে চমকে ওঠে দাশুর চোখ। গর্তের ভিতর থেকে মুখ বের করে কচি পাতার উপর ছোট থাবা এগিয়ে দিয়েছে খরগোশটা। তীর ছাড়ে দাশু। কিন্তু বৃথা। খরগোশটা মাথা কাত করে একটা লাফ দিয়ে গর্তের মুখ থেকে বের হয়েই দৌড় দেয়। দাশুর তীর গর্তের মুখের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে এক মুঠো ধুলো উড়িয়ে আর তিনখান হয়ে ভেঙ্গে যায়।

বুড়ো খরগোশের তিন পায়েও এত জোর ছিল! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটলেও কত জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দাশুও যেন ওর প্রাণ মন ও শরীর এক উদ্দাম লোভের নেশায় মাতিয়ে নিয়ে খরগোশটার পিছু পিছু ধাওয়া করে ছুটতে থাকে।

একটা পরিষ্কার পাথরের উপর বসেছে খরগোশটা। খোঁড়া পায়ের ধুলো চাটছে। জিরোচ্ছে; হ্যাঁ, জিরোতে থাকুক। দাশুও একটা পাথরের আড়ালে হাঁটু পেতে বসে, আর খরগোশটার দিকে অপলক চোখের নজর রেখে হাঁপধরা বুকের ধড়ফড়ানি একটু জুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। এইবার খুব সামলে, খুব সাবধানে, শেষ তীরের মরণবিঁধ ছুঁড়তে হবে।

খরগোশটা বুড়ো হলেও খুব ডাগর। কিন্তু মুড়োটা ফেলে দিতেই হবে, ঘা আছে মাথায়। পিছনের ঠেংরি দুটো পল্টনী দিদিকে দিলে দু সের হাঁড়িয়া পাওয়া যাবে নিশ্চয়। পল্টনী দিদির ঘরে আগে তো সব সময় হাঁড়িয়া জমা থাকত। এখনও কি নাই? আছে নিশ্চয়।

খরগোশের মাংস তেঁতুল-ঝাল দিয়ে শাকপাতার সঙ্গে রাঁধলে স্বাদ ধরে ভাল। যদি বেলা থাকে, তবে কোনারের কচি পাতা যোগাড় করতে পারা যাবে। একটু দূরে যেতে হবে; ওই ওদিকে, হোই পশ্চিমের টাঁড়ের দিকে, যেখানে অনেকগুলি কোনার গাছ সেদিনও দেখতে পেয়েছে দাশু। এক হাঁড়ি গরম গরম শাকমাংস আর পাঁচ চুমুক হাঁড়িয়া। খুশি হবে না কি মুরলী? হেসে ফেলবে না কি মুরলী?

দু কান খাড়া করে আকাশপানে তাকিয়েছে খরগোশটা। মরা বিকালের ছায়া-ছায়া আলো আর লালচে আভা মেখে টুকটুক করছে খরগোশটার লাল চোখ। দাঁতে দাঁতে চেপে তীর ছাড়ে দাশু।

বিঁধেছে। তীরটা যেন একটা গোঁ ধরে ছুটে গিয়ে খরগোশটার পেটে লেগেছে। তীর-গাঁথা হয়ে বুড়ো খরগোশের ধড় একটা ডিগবাজি খেয়ে পাথরের উপর থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে। ধামনকাঠের বাঁক হাতে তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসে দাশু। পাথরটার উপর উঠে দাঁড়ায়।

সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে পাথরটারই মত প্রাণহীন একটা নিরেট কালো চেহারা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, যেন একটা নির্মম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। নেই, কিছু নেই। পাথরের ওপারের কাদার ওপরে শুধু কয়েক ছিটে রক্তের দাগ। খরগোশের ধড়টা খাতের জলের ভিতর পড়েছে আর স্রোতের টানে উধাও হয়ে গিয়েছে।

বানভাসির জল ফিরতি টানে হুড়মুড় করে খাত ধরে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। দাশু ঘরামির মাগ ছেইলা ঘর জমি আর গুলঞ্চের বেড়া, সব গুঁড়ো হয়ে আর হুড়মুড় করে ভেসে গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। জলের শব্দ যেন একটা হিংস্র ঠাট্টার গান। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে দাশু।

কাঁপতে থাকে দাশু। গায়ের সব ঘাম শুকিয়ে যায়। ঠোঁট দুটো মরা গাছের পাতার মত শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। মধুকুপির আকাশে সন্ধ্যার কালো ছায়াও সিরসির করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ধামনকাঠের বাঁকের উপর ভর দিয়ে চলতে থাকে দাশু। ঘরে ফিরতে গিয়ে দাশুর অন্তরাত্মা যেন আহত জানোয়ারের মত জখম হয়ে টলছে। পাকুড়তলা পার হবার সময় পথের মাটির উপর ধপ করে একবার বসেও পড়ে; অনেকক্ষণ বসেই থাকে দাশু। দাশু ঘরামির হাতের শেষ তীরটা যেন দাশুর ভাগ্যটাকে বিঁধে রক্তাক্ত করে দিয়ে বানভাসির জলের ফিরতি টানে ভাসিয়ে দিয়েছে।

পুরনো জামকাঠের দরজার কাছে এসে ডাকতে গিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে দাশু: জলদি আমাকে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল দে, মুরলী।

দরজা খোলে মুরলী। এক ঘটি জল এনে দাশুর হাতে তুলে দেয়; আর

রেড়ির তেলের মেটে বাতির পলতে উসকে দিয়ে দাশুর মুখের দিকে একবার তাকায়।

মুরলীর মুখের দিকে তাকাতে বুক কাঁপে দাশুর। দু হাঁটুর উপর মাথা পেতে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর নিঝুম হয়ে বসে থাকে।

জানে না দাশু, অনুভব করবারও শক্তি বোধহয় নেই, কত রাত হয়েছে। হঠাৎ মনে হয়, ঘরটাই টলমল করে নড়ে উঠেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারে, দাশুর মাথাটাকে একটা ঠেলা দিয়ে তুলে ধরেছে মুরলী। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় দাশু : কি ?

মুরলী বলে—আমাকে আবার কি শুধাতে চাও ? তুমি বল।

দাশু—কি বলবো বল ?

মুরলী—তুমি কি ভেবেছো ? নিজে মরবে, আমাকে মরাবে আর আমার ছেইলাটাকেও মরাবে ?

—না মুরলী, না। কখনো না। এমন কথা বলিস না। মুরলীর একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দাশু।

হাত ছাড়িয়ে নেয় মুরলী। মুরলীর শুকনো মুখের উপর কি ভয়ানক ঘৃণার জ্বালা ছটফট করছে। কালো চোখের তারা দুটো ধিকধিক করছে। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—আমার ছেইলাকে বাঁচাতে পারবে না যে, সে আমার মরদ কেন হবে ?

চুপ করে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। একটা বোবার মুখ, একটা বধিরের চোখ।

আবার চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—মধুকুপির কিষাণের আর সে জোর নাই।

ও কি ? কিসের শব্দ ? জামকাঠের দরজায় কে যেন হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে শব্দ করছে। আস্তে আস্তে ডাকছে—সরদার ভাই আছ কি হে ?

চমকে ওঠে দাশু। আশ্চর্য হয়ে দরজার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

আবার ডাক ; শান্ত স্নিগ্ধ ও মায়ানিবিড় একটা আহ্বানের স্বর—আছ কি হে সরদার ?

দাশু ঘরামির মুমূর্ষু অস্তিত্ব যেন নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। লাফ দিয়ে উঠে, ঘরের দরজা খুলে বাইরের দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ায় দাশু।

দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে যে আগন্তুক, তার এক হাতে একটা বড় লাঠি, আর এক হাতে একটা হাঁড়ি, আর কাঁধের উপর ছোট একটা কম্বল।

শব্দ না করে গুঁড়ো গুঁড়ো নরম বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। আকাশে আবার শাওনে মেঘ জমেছে। বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে আকাশে। আগন্তুকের মুখটা দেখতে পেয়েছে দাশু।

এগিয়ে এসে আগন্তুকের হাত ধরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—ভুঁইসাল, তুমি কোথা থেকে এলে ভাই ?

ভুঁইসাল হাসে : যেথা থেকেই আসি না কেন, তোমার কাছেই তো এলাম !

দাশু—কেন ?

ভঁইসাল এইবার গলার স্বর নরম করে নামিয়ে নিয়ে ফিসফিস স্বরে যেন আবেদন করে : টাকা নিবে সরদার ?

ভঁইসালের হাত ধরে ছটফট করে দাশু : হঁ্যা ভাই, টাকা চাই। কিন্তু বেশি চাই না।

ভঁইসাল—হাঁ হাঁ, সে তো ঠিক কথা। জমি কিনবে, নতুন ঘর বানাবে, মাগ-ছেইলাকে খাওয়াবে, পূজা-পরব করবে, করম নাচবে, এই তো ?

দাশু—হঁ্যা ভাই।

ভইঁসাল—তবে এসো।

দাশু—কোথায় যেতে বলছো হে ?

ভঁইসাল—আমার সাথে এসো।

দাশু—টাকা ?

ভঁইসাল—টাকা আজই পাইয়ে দিব, এসো।

মেঘে ভরাট আকাশ আর বিজলী হানে না ; শুধু গরগর করে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে বেড়ায়। গুঁড়ো বৃষ্টির ঝরানি বাতাসের এক-একটা আচমকা ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে যায়। জমাট অন্ধকার কিন্তু একটুও কাঁপে না।

আকাশ বাতাস আর মাটি একসঙ্গে তাল পাকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। পথের কাদা যেন পচা-পচা কালো মাংস ; পথের জল ঠাণ্ডাঠাণ্ডা কালো রক্ত। পথ চলতে চলতে দাশুর কানের পাশে ফিসফিস করে হাসে গুপী লোহার : আঃ, বড় মিঠা রাত সরদার !

দাশু বলে—একটুক জিরাতে হয় ভঁইসাল।

—জিরাবে ? আশ্চর্য হয় গুপী।

—হঁ্যা। হাঁপ ছাড়ে দাশু।

—পিয়াস লেগেছে ? প্রশ্ন করে গুপী।

—হঁ্যা। একটা গাছের তলায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু, আর হাঁপাতে থাকে।

দাশুর হাতের কাছে হাঁড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে হেসে ফেলে গুপী : নাও সরদার, দম তক পিয়াস মিটিয়ে নাও।

এক চুমুকে হাঁড়ির প্রায় অর্ধেক খালি করে দিয়ে আবার হাঁপ ছাড়ে আর হেসে ওঠে দাশু : বাঃ, বড় ভাল মাল। আবগারী জল বটে কি ?

গুপী—আবগারী জলে কি এত তেজ আর ফুর্তি থাকে রে ভাই ? এটা ঘরের চোলাই বটে ; আধা মেওয়া আর আধা মহুয়া।

দাশু—মজাদার বাস পেলাম যেন।

গুপী—হঁ্যা রে ভাই ; মৌরির রস দিয়ে মজালে মালের বাস এমনটি মিঠা হয়ে থাকে।

দাশু—কোথা থেকে পেলে ?

গুপী হাসে ঃ জামুনগড়ায় আমার একটা ভক্ত আছে ; সে বেটা দিলে।

দাশুর বুকে আর হাঁপ ধরে না। আর এক মুহূর্তও জিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। গুপীর নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে নিজেরও বুকের উতলা বাতাসের শব্দ মিশিয়ে দিয়ে আর প্রায় ছুটে ছুটে চলতে থাকে।

সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকের ডাঙার উপর নামে গুপী। এইবার গুপী একটা হাঁফ ছাড়ে আর হাঁড়িটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে চুমুক দেয়। তার পরেই হেসে ওঠে ঃ একটা কথা শুধাই সরদার ?

দাশু—কি কথা ?

গুপী—সরদারিন তোমাকে এত ডাঁটে কেন ?

দাশু—কে বললে ?

গুপী হাসে ঃ দরজায় কান পেতে সব শুনেছি।

দাশু—তবে আর শুধাও কেন ?

—কদিন খাও নাই ?

—দুই দিন।

—সরদারিনও কি খায় নাই ?

—না।

—সরদারিনের পেটে ছেইলা আছে কি ?

—হ্যাঁ।

ধমকের সুরে আক্ষেপ করে গুপী—ছি ছি, তুই বড় দুখী বটিস সরদার।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে শুধু শুনতে থাকে দাশু। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে—চল ভাই।

গুপী লোহার যেন দাশুর এই যন্ত্রণাক্ত ব্যস্ততার তাড়া তুচ্ছ করে আর আনমনা হয়ে একটা স্বপ্নালু আরামের আবেশে গা ঢেলে দিয়ে ডাঙার ঘাসের উপর বসে পড়ে আর নিঝুম হয়ে যায়। তারপর হাঁড়িতে চুমুক দিয়ে নিয়ে ঢেঁকুর তোলে।—তোমার ঘরটি বড় ভাল ঘর, সরদার। ফিসফিস করে গুপী।

দাশুও চুপ করে বসে দু' চোখের মিঠা-মিঠা নেশার জ্বালা নিয়ে ডাঙার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গুপী—তোমার ঘরণীও বড় ভাল। চোখ দুটা বড় মিঠা।

আবার যেন নিঝুম হয়ে যায় গুপী। আবার মুখে হাঁড়ি ঠেকিয়ে আর এক চুমুক মাদকতার আরাম টেনে বুক ভরে নিয়ে আবার বিড় বিড় করে—তোমার ছেইলাটাও বড় সুন্দর ছেইলা হবে হে।

দাশু বলে—আর কত জিরোবে ?

গুপী তবু যেন আনমনার মত বিড়বিড় করে একটা নেশালস তন্দ্রার সঙ্গে বলতে থাকে ঃ বড় ভাল হবে। তোমার খুব সুখ হবে। নিজের মাগ, নিজের ছেইলা, নিজের ঘর, নিজের জমি! তুমি বড় চালাক বট সরদার।

বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—উঠ ভাই।

—কেন ?

—আমাকে টাকা পাইয়ে দিবে না ?

হেসে ফেলে গুপী : দিব। হাতির দাঁতও ভাঙে সরদার ; কিন্তু গুপী লোহারের বাত ভাঙ্গে না।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় গুপী লোহার। কম্বলের ভাঁজের ভিতর থেকে দুটো হেঁসো বের করে। —এই নাও, ধর।

দাশুর হাতের কাছে একটা হেঁসো এগিয়ে দেয় গুপী লোহার। আর দাশুও যেন অদ্ভুত এক জ্বালাময় ভক্তির নেশায় লুব্ধ হয়ে গুপী লোহারের সেই হিংস্র দীক্ষার শাণিত হাতিয়ার শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

—চল। হাঁক দেয় গুপী লোহার। গুপী লোহারের সঙ্গে প্রায় ছুটে ছুটে হাঁটতে থাকে দাশু।

এক ক্রোশ শেষ হবার আগেই ডাঙা শেষ হয়। মাটির উপর পা ঘষে আর একটু আশ্চর্য হয়ে দাশু বলে—এটা কেমন ডহর বটে ?

—এটা রেল-লাইন। চল।

আবার চলতে থাকে গুপী লোহার। পিছু পিছু দাশু। দু পাশে সরকারী শালবন, মাঝখান দিয়ে নতুন রেল-লাইন। জঙ্গল ভেদ করে কে জানে কোন দিকে চলে গিয়েছে নতুন রেল লাইন ? এদিক ওদিক তাকিয়ে আকাশের অন্ধকারের দিকে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারে দাশু, বড়কালুর হরতকীর জঙ্গল আর পাথরের চটান খুব কাছেই রয়েছে। বড়কালুর গা বেয়ে বর্ষাজলের হাজার ঝরণা ঝরে পড়ছে, তারও শব্দ শোনা যায়।

চলতে চলতে আবার আশ্চর্য হয় দাশু। একটু দূরে, এই সরকারী শালবনের মাথার উপর যেন একটা আভা থমকে রয়েছে। বৃষ্টিতে ভেজা জঙ্গলটাও কি আগুনে পুড়ছে ?

তারপর আর বেশিক্ষণ নয় ; আর খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতেও হয় না ; দাশু যেন একটা নতুন জাদুর বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গুপী লোহারের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে, আর থমকে দাঁড়ায় : কোথায় এলাম ?

গুপী লোহার বলে—চুপ থাক।

বড় বড় খুঁটির উপর বড় বড় আলো। সারি সারি টিনের শেড। থাক দিয়ে সাজানো বড় বড় কাঠের স্তূপ। এখানে ইঁটের আর ওখানে কাটা পাথরের এক একটা গাদা। হাতির মত এক-একটা বয়লট এখানে ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শত রকমের সরঞ্জাম আর কলকব্জা বড় বড় ঠাঁই জুড়ে পড়ে আছে। তিরপাল ঢাকা দিয়ে গুঁড়ো বৃষ্টির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এক একটা কল এখানে ওখানে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।

আস্তে আস্তে, শালের ছায়ার আড়াল দিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকে গুপী লোহার। পা টেনে টেনে চলতে থাকে দাশু। লাইনের পাশে একটা খাতের অন্ধকারের মধ্যে নামে গুপী লোহার, পিছু পিছু দাশু। উঁকি দিয়ে শুধু চোখ দুটোকে ভাসিয়ে দিয়ে দূরের একটা টিনের একচালার দিকে তাকিয়ে

থাকে গুপী লোহার।

—কি দেখছো ভঁইসাল? দাশু চাপাস্বরে কথা বলে।

গুপী লোহার বলে—আছে।

—কে?

—হোই যে লাল কম্বল।

দেখতে পায় দাশু, টিনের একচালার ভিতরে শান বাঁধানো মেজের উপর ছড়িয়ে রয়েছে শত কত কাঠের বাক্স; কে জানে কোন্ মালে ভরে আছে বাক্সগুলি। সেই সব বাক্সের সারির ফাঁকে ফাঁকে শুয়ে আছে মানুষ; একটা দুটো নয়, অনেক। হাত-পা গুটিয়ে ছোট ছোট মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে আছে ঘুমন্ত মানুষগুলো; কুলি-মজুর বলে মনে হয়। হঁ্যা, লাল কম্বলে ঢাকা হয়ে একটা মানুষও ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

দাশু—লাল কম্বলটা কে বটে?

গুপী—ঠিকাদার বটে। কুলিদিগকে কাল সকালে হপ্তা দিবে শালা। শালার মাথার কাছে টাকার থলি আছে।

—ভঁইসাল ভাই। ডাকতে গিয়ে কেঁপে ওঠে দাশুর গলার স্বর।

—কি বটে? রুক্ষ স্বরে ফিসফিস করে গুপী লোহার।

—টাকা চাই না। ফুঁপিয়ে ওঠে দাশু।

—কি? গলার স্বর চেপে আস্তে একটা ধমক হানে গুপী লোহার।

ধপ করে বসে পড়ে দাশু। গুপী লোহারের পায়ে হাত রেখে আর গলার ...র ঠকঠকিয়ে অসহায়ের মত যেন আবেদন করে—টাকা চাই না।

দাশুর পিঠে হাত বুলিয়ে যেন স্নেহার্দ্র স্বরে কথা বলে গুপী লোহার। —কেন মিছা গোলমাল করছো?

—মাপ কর ভাই।

—আমি নিজেকেই মাপ করি না, তোমাকে মাপ করবো কেমন করে? ...ঠ, যাও, চুপচাপ এগিয়ে যাও; আস্তে কম্বলটা ঠেলে দিবে, মুখটাকে চেপে ...রবে, আর হাঁসুয়া দিয়ে টুঁটির উপর তিনটা ঘষা মেরে, টুঁটির নলীটা ছিঁড়ে ...য়ে...।

—না না, কভি না। কাঁপতে থাকে দাশুর গলার স্বর।

দাশুর মাথায় হাত বুলিয়ে গুপী লোহার বলে—কথা শুন, সরদার; ওর ...থার কাছে হাত চালালেই টাকার থলিটা পেয়ে যাবে। এত বড় থলি সরদার!

—আমাকে আর এসব কথা বলো না।

—কেউ জেগে নাই সরদার। কেউ দেখতে পাবে না। সব শালা চৌকিদারের ...গা ঘুমে বেহুঁশ হয়ে আছে।

—আমি ঘরে ফিরে যাই।

—আমি তোমার নিকট খাড়া থাকবো সরদার। কোন শালা তোমার পানে ...ছে কি আমি ওর খবর নিয়ে ছেড়েছি।

—না।

—কেন ?

—মানুষ মারতে বলো না।

—মানুষ ? মারতে বলছে কে তোমাকে ? ওটা যে ঠিকাদার বটে !

—ওর প্রাণ তো মানুষেরই প্রাণ বটে ?

সাপের প্রাণ বটে। সাপ সাপ ! সাপের যেমন বিষ থাকে, ওর তেমন টাকা আছে।

দাশু করুণভাবে হাসে ঃ তবে আর বিষ ছিনতে বল কেন ?

গুপী লোহারও হাসে ঃ ওর বিষ বটে, কিন্তু তোমার যে ওষুধ বটে গো। সাপের বিষ ছিনে নিয়ে ওষুধ করতে হয়। দেখ নাই ওঝারা কি করে ?

দাশু উঠে দাঁড়ায় ঃ না ভাই।

হাতের হেঁসোর-ছুঁচালো মুখটাকে দাশুর বুকের উপর চেপে ধরে, রুষ্ট নিঃশ্বাসের ঝাঁজ দাশুর মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে গুপী লোহার বলে—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি না পার, আমি টাকা আনছি।

—না, আমি টাকা নিব না।

—নিতে হবে। তুই শালা তোর মাগ-ছেইলাকে মারবি কেন রে ? তুই নিজে ভুখা গরুর মত হেঁপে মরবি কেন রে ?

গুপী লোহারের গলার স্বর কাঁপতে কাঁপতে ফুঁপিয়ে ওঠে। যেন গুপী লোহারের একটা স্বপ্নের আহ্লাদ পুড়ে গিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। উন্মত্তের মত হাত-পা ছুঁড়ে দাশুর পিঠে বুকে ও পেটের উপর ঘুষি চড় আর লাথি ছুঁড়তে থাকে গুপী। খাতের ভেজা মাটির উপর গড়িয়ে পড়ে যায় দাশু।

গুঁড়ো ঝরানি নয়, বেশ জোরে শব্দ করে আর ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। হাঁপাতে থাকে গুপী লোহার।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় দাশু। পাথরের পাটার মত বুক, শক্ত আর দুরন্ত পেশী দিয়ে তৈরী সেই দাশু, সেই মজবুত কিষাণ। দাশু কিষাণের ওই দুই হাত ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে গুপী লোহারের মাথাটাকে থেঁতলে দিয়ে জিভটাকেও একটানে উপড়ে ফেলে দিতে পারে। একটা লাফ দিয়ে গুপীর সামনে এগিয়ে আসে দাশু।

দু' হাত দিয়ে গুপী লোহারের হাত দুটোকে যেন অদ্ভুত এক আদরের আবেগে কাছে টেনে নিয়ে দাশু বলে—তোমার হাতে মার খেতে আমার লাজ নাই। তোমাকে দুখ দিলাম, তুমি মারবে না কেন ? দশবার মারবে।

গুপী লোহারের দু' চোখে একটা হিংস্র বিস্ময় করুণ হয়ে ছলছল করে। দাশুর মুখের কাছে চোখ নিয়ে দেখতে থাকে। তার পরেই হাতের হেঁসোর উপর ফুঁ দিয়ে হেঁসোটাকে শক্ত করে চেপে ধরে দোলাতে দোলাতে ছটফট করে গুপী ঃ কিন্তু টাকা তোমাকে নিতেই হবে সরদার। টাকা দিয়ে ছাড়বো আমি।

—না ; দয়া কর ভাই।

—না, কোন দয়া নাই। তুমি থাক, আমি এখনই আসছি।

ছুটে চলে যায় গুপী লোহার। গুপী লোহারের ছুটন্ত ছায়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চোখ বন্ধ করে দাশু। আর, চোখ মেলতেই দেখতে পায়, টিনের এক্‌চালার মেঝের উপর সেই লাল কম্বলের কাছে পেঁছে গিয়েছে গুপী লোহার।

কেঁপে ওঠে দাশুর বুক। খাতের ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে শালবনের অন্ধকারের দিকে তাকায়। ছটফট করে পা দুটো। এই জল, এই কাদা, আর বৃষ্টির এই ঝরানি যেন একটা গলাকাটা যন্ত্রণার রক্তে লাল হয়ে দাশুর হাড়মাস গুলে ফেলছে। হাঁটু দুটো টলমল করছে। টান হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টলতে থাকে দাশু। পালিয়ে যাবার জন্য দৌড়তে চায় দাশু, কিন্তু দৌড়তে পারছে না।

চমকে ওঠে দাশু। একটা ছায়া ছুটে এসে দাশুর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কাশে: চল সরদার।

—কি করলে ভূঁইসাল? কাঁপতে কাঁপতে যেন কান্না চেপে প্রশ্ন করে দাশু।

টাকার থলিটাকে দাশুর পিঠের উপর আছাড় মেরে একবার বাজিয়ে দিয়ে গুপী লোহার আবার কাশে। গুপী লোহারের গলায় যেন রক্তমাখা একটা হাসির শ্লেষ্মা ঘরঘর করে: সাপের বিষ ছিনে নিয়ে এলাম।

দাশু—সাপটার কি করলে?

গুপী লোহার—বাপের বাড়ি রওনা করিয়ে দিলাম।

—কি বললে? দাশুর নেশার বুক খুব আস্তে আর্তনাদ করে ওঠে।

হেসে ফেলে গুপী লোহার: একদিন তুমিও যাবে আর আমিও যাব সরদার, চিন্তা কর কেন?

রক্তমাখা হেঁসোটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাশুর পিঠে একটা ধাক্কা দেয় গুপী লোহার: চল।

আর নতুন রেল-লাইন ধরে নয়; শালবনের ভিড়ের ভিতর দিয়ে, সরু সরু খাত ধরে, জলকাদা মাড়িয়ে আর বৃষ্টির অঝোর ধারায় যেন একটা ছুটন্ত স্নানের ভয়ানক পুণ্যে গা ভিজিয়ে, হন্‌হন্‌ করে হেঁটে যেতে থাকে গুপী লোহার আর দাশু।

বৃষ্টির ঝরানি থেমে যায়। আবার বৃষ্টির গুঁড়ো উড়তে থাকে। আকাশের দিকে চোখ তুলে গুপী বলে—রাত আর বেশি নাই।

কথা বলে না দাশু। গুপী লোহার বলে—ডহর ভুল করো না সরদার।

না, ডহর ভুল করে না দাশু। হরতকীর জঙ্গলটা যখন ধরতে পারা গিয়েছে, তখন সেই শুকনো ডাঙার কিনারায় গিয়ে পেঁছতে কোন ভুল হবে না। পেঁছতে কতক্ষণই বা লাগবে?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় গুপী লোহার: তোমার হিস্যা তুমি এখনই নিয়ে নাও সরদার।

সেই মুহূর্তে যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা আগুনের আভা গুপী লোহার আর দাশুর মুখের উপর এসে আছড়ে পড়ে। চোখ ধাঁধানো কটকটে আভা।

ক্ষণিকের মত অন্ধ হয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গুপী লোহার আর দাশু।

দাশুর কানের কাছে ছোট্ট একটা চিৎকার আছড়ে দিয়ে ছটফট করে ওঠে গুপী লোহার : পালাও, জলদি পালাও।

সঙ্গে সঙ্গে বুনো অন্ধকারের বুকটা যেন প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ফেটে গেল। বন্দুকের শব্দ। গুলিটা ছুটে এসে ঠিক দাশুর পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধেছে। কেঁপে উঠল মাটি।

চোখ মেলতে চেষ্টা করে দাশু, কিন্তু পারে না। সেই চোখ-ধাঁধানো আলোটা যেন দাশুর চোখের উপর কামড় দিয়ে ঝুলে রয়েছে।

—ভঁইসাল! বিড়বিড় করে ডাকে দাশু। কিন্তু কোন সাড়া শুনতে পায় না। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে মরা গাছের মত পড়ে থাকে। আর, সেই বুনো অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা বন্দুকের নল আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঠিক দাশুর বুকের কাছে থামে।

—অ্যাঁ? দাশু সরদার! বন্দুকের নলের মুখটা যেন চমকে উঠে, আশ্চর্য হয়ে, আর দুলতে দুলতে চেঁচিয়ে উঠেছে।

চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করে দাশু, আর পলুস হালদারও তার হাতের টর্চ কাত করে দাশুর চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যেন একটা হিংস্র জয়ের আমোদে হো-হো করে হেসে ওঠে পলুস হালদার।—তোমাকে দাগী বলেছিলাম বলে সরদারিন বড় রাগ করেছিল।

বাঘিন কানারানীকে এক গুলিতে সাবড়ে দেবার আশায় জঙ্গলের এই একান্তে গেছো মাচানের উপর রাতজাগা চোখ নিয়ে বসেছিল যে শিকারী, তারই আশার কাছে কানারানীর চেয়েও চমৎকার একটা জানোয়ার ধরা পড়েছে। টর্চ ঘুরিয়ে দাশুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর একবার দেখে নিয়ে পলুস হালদার প্রশ্ন করে।—সাথীটা ভেগেছে বুঝি?

দাশু মাথা নাড়ে : হ্যাঁ।

পলুস বলে—সাথীটা কে বটে? গুপী লোহার?

—হ্যাঁ।

—খুনিয়া ডাকাতি করে এলে?

—আমি করি নাই।

—গুপী লোহার করেছে?

—সে তো বললে, করেছে।

—কত টাকা পেলে?

—পাই নাই।

—গুপী লোহার সব নিয়ে ভেগেছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু…।

—কি?

—আমাকেও হিস্যা দিবে বলেছিল।

—তুমি হিস্যা চেয়েছিলে ?

—না।

দাঁতে দাঁত ঘষে হাসতে থাকে পলুস হালদার ঃ মধুকুপির দাশু সরদার বড় সাচ্চা, বড় ভালমানুষ বটে। হিস্যা নেয় না, কিন্তু খুনিয়া ডাকাতি করে। কি বল সরদার ? ঠিক বলি নাই ?

উত্তর দেয় না দাশু। পলুস হালদার বন্দুকটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে, একটু দূরে গাছের মাথার উপর টর্চের আলো ফেলে মাচানটার দিকে একবার তাকায়, তারপরেই আক্ষেপ করে ঃ নাঃ, বড় ঠকে গেলাম সরদার। তোমার লাস নিয়ে থানাতে জমা দিলে পাঁচ টাকাও পাওয়া যাবে না।···যাও, ঘরে যাও।

তবুও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। পলুস হালদার ধমক দিয়ে বলে—যাও ; সরদারিনকে বলবে, পলুস হালদার চোর নয়।

—কি বলছো ? দাশু ঘরামির অসাড় চোখ দুটো যেন হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে উঠে।

পলুস ভ্রূকুটি করে—চোখ বড় করে তাকাও কেন সরদার ? তোমাকে মায়া করে ছেড়ে দিলাম।

দাশু—কেন মায়া করলে ?

পলুস বলে—তোমার সরদারিনকে মায়া করি, তাই।

কাক ডাকে নি, ভোরও হয় নি, তবু বেশ ফিকে হয়ে গিয়েছে অন্ধকার। ডাঙ্গা পার হয়ে সড়কের উপর উঠতেই বুঝতে পারে দাশু, এই সড়কটাই সোজা ভুবনপুরে চলে গিয়েছে।

আকাশে মেঘ নেই, দু-তিনটে মর-মর তারা ছাড়া আর কিছুই নেই। সড়কের জল আর কাদাকে জল আর কাদা বলে মনে হয়। আর, সড়কের এক পাশে একই জায়গায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে যে গাছ দুটো, সে গাছ দুটোকেও চেনা যায়।

দুটো লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে গাছের গায়ে হাত দেয় দাশু। হ্যাঁ, যা ভেবে লাফিয়ে উঠেছে দাশুর ক্ষুধাকাতর প্রাণটা, দাশুর হাতে তারই ছোঁয়া লেগেছে। থোকা ডুমুর যেন থোকা থোকা আঁচিলের মত গাছ দুটোর গা ছেয়ে রয়েছে।

কোমরে জড়ানো গামছাটাকে খুলে নিয়ে মাটির উপর ছড়িয়ে দেয় দাশু। ভোরের ভালুকের মত দু থাবা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ডুমুর ঝরাতে থাকে। ডুমুরের রাশ গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আর কাঁধের উপর তুলে নিয়ে দৌড়ে হাঁটতে থাকে।

কাক যখন ডাকে, তখন মধুকুপির সেই মেটে ঘরের জাম কাঠের দরজার কাছে পেঁছে যায় দাশু। কপাট খুলে দেয় মুরলী। ঘরে ঢুকেই গামছার গিঁট খুলে মেজের উপর ডুমুরের রাশ ছড়িয়ে দিয়ে দাশু একটা হাঁপ ছাড়তেই মুখ

ফিরিয়ে নেয় মুরলী ; আর খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ে।

উনানের মুখে শুকনো বাঁশপাতা ঠেসে দিয়ে আগুন জ্বালে দাশু। জ্বলন্ত আগুনের আভা মুরলীর মুখের উপর ছটফট করে। মুরলীর চোখ দুটো মর-মর তারার মত আস্তে আস্তে কাঁপে। তার সঙ্গে যেন একটা জ্বালাময় শ্লেষও কাঁপছে। আর কিছু নয়, গামছা দিয়ে জড়ানো ডুমুরের একটা বোঝা। রাতের বুকের ভিতর ঢুকে ডাকাতি করে কী অদ্ভুত ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে ঘরে ফিরেছে মধুকুপির দাশু কিষাণ! মুরলীর চোখের চাহনিতে একটা ক্লান্ত অভিশাপ হাসতে থাকে।

কিন্তু দাশুর হাত-পায়ের ব্যস্ততা সত্যিই একটা নেশার জ্বালায় দুরন্ত হয়ে উঠেছে। কাঁচা ডুমুরের রাশ যেন একরাশ প্রাণময় স্বাদুতার সম্ভার। দাশুর চোখের চাহনিতে লালা ঝরছে। হাঁড়ি ভরে ডুমুর সিদ্ধ করে দাশু। ডুমুরের জাউ কাঠি দিয়ে ঘাঁটে, তার আগে চারটে শুকনো লঙ্কা, চার চিমটি নুন আর গুঁড়ো হলুদ ছড়িয়ে দেয়।

মাটির তেলাই ডুমুরের জাউয়ে ভরে নিয়ে মুরলীর হাতের কাছে যখন এগিয়ে দেয় দাশু, তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর উঠে বসে মুরলী। মধুকুপির কিষাণের অদ্ভুত রোজগারের উপহার সেই গরম জাউ স্পর্শ করতে গিয়ে হেসে ফেলে মুরলী ঃ সারা রাত ধরে ভিখ মেগে শেষে এই চিজ নিয়ে এলে ?

দাশু বলে—মধুকুপির কিষাণ ভিখ মাগে না।

মুরলী আবার হাসে ঃ তবে কি করে ? চুরি ?

—না।

—তবে ডাকাতি ?

—না। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—তবে ?

উত্তর দেয় না ; উত্তর দিতে পারে না দাশু। মহেশ রাখালের মেয়ের কালো চোখের ওই অদ্ভুত চাহনি, কুঞ্চিত ঠোঁটের কুটিল হাসি আর এই কঠোর প্রশ্নের আঘাতে অভিভূত হয়ে শুধু বোবার মত তাকিয়ে থাকে। তারপর সরে যায়। জাউয়ের হাঁড়িটাকে হাতে নিয়ে বাইরের দাওয়ার উপর গিয়ে বসে।

দূরের পাকুড়বনের মাথার উপর দিয়ে ভোরের আলো গড়িয়ে এসে দাশুর মুখের উপর পড়ে। হাঁড়ির জাউ চেটেপুটে খেয়ে ঢেঁকুর তোলে দাশু। হাত চাটে আর ঘটি তুলে ঢক ঢক করে জল খায়। মধুকুপির কিষাণের উপোষ করা আত্মাটা এতক্ষণে জ্বালা ভুলতে পেরেছে আর শান্ত হয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আর দাওয়ার কিনারায় বসে মুখ ধোয় মুরলী। দাশুও মুখ ধোয়, জল ঢেলে হাত-পায়ের কাদা মুছতে থাকে। চড়ুয়ের ঝাঁক ঘরের চালার উপর বসে কিচিরমিচির করে। সকাল বেলার হাওয়ায় বাঁশঝাড়ের জটিল চেহারা দুলতে থাকে।

দাওয়ার উপর আবার স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দাশু। আর উঠে দাঁড়াতে

ইচ্ছা করে না। ব্যস্ত হয়ে উঠবার সাধ ক্লান্ত হয়ে এসেছে। দাশু কিষাণের হাতে-পায়ে এমন অবসাদ কোনদিন দেখা দেয় নি। ঘরের ভিতরের দিকে তাকাতেও আর কোন ব্যাকুলতা নেই।

পলুস হালদারের দয়া! এই দয়াতেও কী অদ্ভুত হিসাব! মুরলীকে মায়া করে বলে দাশুর বুকের কাছে বন্দুকের নলটাকে এগিয়ে নিয়ে এসেও গুলি মারে নি পলুস। শিকারী পলুসের স্বপ্নটা একটুও ভীরু নয়। দাশু কিষাণকে একটা দুর্বল কাঠবিড়ালীর চেয়েও দুর্বল বলে মনে করে পলুস। তাইতো অনায়াসে দাশুকে ছেড়ে দিতে পেরেছে।

—তুই মিছা কেন পলুসকে চোর বলেছিস মুরলী, ছি!—হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কেঁপে ওঠে মুরলী: কি বললে?

দাশু—পলুস হালদারের বড় দয়া। তোর উপর কত মায়া! তাই আমাকেও মায়া করে।

দাশুর কাছে এগিয়ে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় মুরলী: কে বললে? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

দাশু হাসে—পলুসের সাথে দেখা হলো, পলুসই বললে।

মরুলীর নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। মুরলীর কালো চোখের তারা দুটোর মধ্যে শুধু একটা দুরন্ত পিপাসার ছটফটানি দেখতে থাকে দাশু।

দাশু বলে—পলুসের সাথে যদি আবার দেখা হয়, তবে ওকে একটা কথা বলে দিব।

—কি কথা বলবে?

—বলবো, তোমাকে চোর বলে গালি দিয়ে মুরলীর বড় দুখ হয়েছে: ভুল করেছে মুরলী। তোমার কাছে মাপ চেয়েছে মুরলী।

—হ্যাঁ বলে দিও। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

দাশু আশ্চর্য হয়ে বলে—কেন মুরলী? বেচারা পলুসের উপর তোর এত রাগ কেন?

কথা বলে না মুরলী, দাওয়ার মাটির উপর বসে পড়ে, দু হাঁটুর উপর মাথাটা নামিয়ে দিয়ে চুপ হয়ে থাকে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দাশু। মুরলী মুখ তুলে তাকায়: কি হলো? হাসছো কেন?

দাশু—আজ আর খাটতে বের হব না।

মুরলী—কেন? তা হলে খাবে কি?

দাশু—খেতে ইচ্ছা নাই।

মুরলী—আমার তো ইচ্ছা আছে।

দাশু—সে তুই ভেবে দেখ।

মুরলী—আমাকে চলে যেতে বলছো?

দাশু—না।

মুরলী—তবে ?

দাশু—এখানে থাকবি। আমি যেদিন খাব সেদিন খাবি। আমি যেদিন খাব না, সেদিন তুইও খাবি না।

মুরলী—কেন ?

দাশু—কিষাণের মাগ হলে এমনটি হবে ; উপায় নাই।

মুরলী—তুমি মরবে, আর আমাকেও মরাবে, কেমন ?

দাশু—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমার ছেইলাটা ? সেটা মরবে কেন ? চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর চোখে সকালবেলার আলোর ছায়া আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে।

—না না না। ছেইলাটা মরবে না। বলতে বলতে মাথা হেঁট করে আর ছটফট করতে থাকে দাশু। মুরলীর একটি প্রশ্নের আঘাতে দাশু কিষাণের সব কথার কৌশল আহ্লাদ আর উল্লাস ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

কে জানে কেন, মুরলীর চোখে সকালবেলার আলোর ছায়া আগুন হয়ে জ্বলতে জ্বলতেই হঠাৎ যেন ছাই হয়ে যায়, আর সেই ছাই ভিজেও যায়। ঝাপসা চোখ দুটো মুছে নিয়ে, দাশুর মাথায় হাত রেখে ডাক দেয় মুরলী—শুনছো ?

—কথা বলিস না ; তোর কথা শুনলে আমার কলিজাতে তরাস লাগে। মাথা সরিয়ে নেয় দাশু।

মুরলীর গলার স্বর আরও কোমল হয়ে যায় : কেন ? আমাকে ডর লাগে কি ?

—হ্যাঁ।

—কেন গো ? আমি কি তোমার দুশমন ?

দাশু কিষাণের জীবনের সব আতঙ্কের জ্বালার উপর যেন বড়কালুর ঝরনার ঠাণ্ডা জলের ধারা ঝরে পড়েছে। একটা নতুন বিস্ময়ের আবেগে টলমল করে ওঠে দাশু কিষাণের বুক। মুখ তুলে, অদ্ভুত রকমের চোখ করে মুরলীর মুখের দিকে তাকায়।

মুরলী বলে—আমার কথা শুনবে ?

দাশু—বল।

মুরলী—তুমি একবার হারাণগঞ্জে যাও।

দাশু—কেন ?

মুরলী—সিস্টার দিদির সাথে ভেট কর।

চমকে ওঠে দাশু—কেন ?

মুরলী—তোমাকে ভাল কাজ পাইয়ে দিবে সিস্টার দিদি।

দাশু—ভাল কাজ ?

মুরলী—হ্যাঁ, কলের কাজ। হারাণগঞ্জে, গোবিন্দপুরে, ভুবনপুরে কত নতুন কল হয়েছে, সে খবর তুমি জান না। কত কিষাণ কত ভাল কাজ নিয়ে সুখ

করছে, সে-কথা তুমি শুন নাই।

দাশু—সিস্টার দিদি আমাকে কেন কাজ দিবে? ওটা আমাকে কাজ দিবার কে?

মুরলী—আমি বলছি, দিবে। কিন্তু…।

দাশু—কি?

মুরলী—তুমি খিরিস্তান হবে।

—না। খবরদার, এমন কথা বলবি না। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। দাশুর নিঃশ্বাস রাগী সাপের মত হিসহিস করে শব্দ ছাড়ে।

মুরলী বলে—তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা শুন। আমার মাথার কিরা, তুমি একটু বুঝে দেখ।

—কি বুঝতে বলছিস?

—সেদিন আর নাই। গাঁয়ের মাটিতে সুখ নাই। খেটে মরবে, কিন্তু বাঁচতে পারবে না।

—আমাকে কলের কুলি হতে বলছিস?

—পরের জমির মনিষ হয়ে তোমার কি মানটা থাকছে, বল?

—কপালবাবা দয়া করলে নিজের জমি হবে না কেন? মনিষ হয়ে থাকবো কেন? নিজের জমির কিষাণ হব। একটু সবুর কর মুরলী। আমাকে একটু দম নিতে দে।

—হবে না। যত ইচ্ছে দম নাও, তবু কিছু হবে না। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেন? দাশুর চোখের তারা তীরের ফলার মত চিকচিক করে।

—তোমার কপালবাবা মরেছে।

—খবরদার! খিরিস্তানীর মত কথা বলবি কি আমি তোর…।

—টাঙ্গি মারবে? হেসে ফেলে মুরলী।

চুপ করে, হঠাৎ মেজাজের উত্তাপ সামলে নিয়ে আবার মাথা হেঁট করে দাশু। মুরলী বলে—তবে আমাকে যেতে দাও।

দাশু গম্ভীরস্বরে বলে—না।

মুরলী—তবে খেতে দাও।

দাশু—দিব।

মুরলী—কি খেতে দিবে? জঙ্গলের ডুমুর?

দাশু কিষাণের পাথরের পাঁটার মত বুকটা হঠাৎ যেন চুপসে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বল, কি খেতে দিবে? কথা বল? কথা বলতে মধুকুপির কিষাণের এত ডর কিসের?

গেঁয়ো মধুকুপির একটা মূক ও বধির আত্মার উপর যেন তীর মেরে খেলা করছে মুরলী। হাত-পা গুটিয়ে একেবারে অনড় হয়ে বসে থাকে দাশু। কিন্তু একটু পরেই চমকে উঠতে হয়। নিকটেই সড়কটা গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। তারপরে, একেবারে নতুন একটা উল্লাসের সাড়া যেন ধোঁয়া ছড়িয়ে ছুটতে ছুটতে দাশু

কিষাণের ঘরের কাছে এসে থেমে যায়।

একটা মালবহা মোটর গাড়ি। সে গাড়ির চালা নেই। ঝুপঝাপ করে গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে এক-একটা মূর্তি। হাতে গাঁইতা; কালো কপনি পরা আর কালো ধুলোয় ভরা মাথা, এক-একটা চেহারা।

—দাশু দাদা কবে ফিরে এলে হে! চেঁচিয়ে ওঠে সুরেন মানঝি।

এগিয়ে আসে সুরেন। মালকাটা মানঝির দল সড়কের উপর বসে জিরোতে থাকে; বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছাড়ে আর গল্প করে।

সুরেন মানঝির চেহারার দিকে তাকাতে গিয়ে দাশু কিষাণের চোখের বিস্ময়টাও করুণ হয়ে যায়। এ কি চেহারা! কালো ধুলো মেখে গাঁইতা কাঁধে নিয়ে সুরেন মানঝি যেন শখের ডাকাত সেজেছে।

—কেমন আছ দাশু দাদা? সুরেন মানঝি এসে একগাল হাসিহেসে দাশুর চোখের সামনে দাঁড়ায়।

—তুমি কেমন আছ বল।

—সুখে আছি গো দাদা। কয়লা খাদে খাটি। ঈশান মোক্তারের জমিতে থুক ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছি; মালকাটার কাজ নিয়েছি।

—কেন? জঙ্গলের শাল ভেঙে···।

—হুরুরু, সেদিন আর নাই দাশু দাদা। টাঙ্গির দিন নাই।

—তবে কিসের দিনটা বটে? বলতে গিয়ে দাশুর গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুরেন: গাঁইতার দিন বটে। গাঁইতা মেরে এক টব কয়লা উঠাও, মজুরি এক টাকা দুই আনা। দুই টব উঠাও, কত হয় হিসাব করে বুঝে নাও।

অনেকক্ষণ ধরে দুই চোখ অপলক করে সুরেন মানঝির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। যেন সব নিঃশ্বাসের জোর দিয়ে একটা সন্দেহ জয় করবার চেষ্টা করছে। এ কি বলছে সুরেন? সত্যিই কি কয়লাখাদের কাজে এত সুখ আছে?

কয়লার ধুলোতে পুরু আর কালো হয়ে গিয়েছে সুরেন মানঝির ধুতি। সেই ধুতিকে আবার একটা কালো গামছা দিয়ে শক্ত করে কোমরবাঁধা করেছে। গামছার পাকের ভিতর থেকে ছোট একটা ডিবে বের করে সুরেন, আর ডিবের ভিতর থেকে একটা সিগারেট বের করে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়: ধর দাশু দাদা। তুমি আগে পাঁচ ফুঁক দিয়ে নাও।

দাশু কিষাণের বুকের ক্লান্ত হাড়ের উপর একটা নতুন বিস্ময়ের চমক ঠোকাঠুকি করে বাজতে থাকে। প্রাণপণে হিসেব করতে চেষ্টা করে দাশু; তাই তো! দুই টব মাল উঠালে দুই টাকা চার আনা মজুরি পাওনা হয়। সুরেন মানঝির কথাগুলিও যে ভয়ানক এক মায়াময় প্রতিশ্রুতির ডাকাত হয়ে দাশুর জীবনের অবসাদের উপর নতুন নেশার জ্বালা ছুঁড়ে মারছে। দিন দু টাকা চার আনা রোজগার হলে যে দাশু কিষাণের এই ঘরের প্রাণটা দু বেলা ভরপেট খাওয়ার আনন্দে আবার ঝুমুর গেয়ে উঠবে।

সুরেন মানঝির উপহার, সেই সিগারেটে দুটো লম্বা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দাশু আনমনার মত বিড়বিড় করে কথা বলে—কিন্তু, দিন দুই টব মাল উঠাতে পারা যাবে কি সুরেন ? তোমরা কি পার ?

হেসে উঠে সুরেন : তেমন তেমন দিন হলে তিন টব মাল উঠাতে পারি।

দাশু—কিন্তু, এখনই গেলে কি ওরা কাজ দিবে আমাকে ?

চেঁচিয়ে ওঠে সুরেন—এখনই দিবে। রোজ নতুন মালকাটা ভর্তি করছে কোম্পানি। তুমি ভাবছো কেন ?

দাশু—আগাম কিছু দিবে কি কোম্পানি ?

সুরেন—না, আগাম নিবার দরকারও হয় না দাশু দাদা। হপ্তা পুরা হয়েছে কি পুরা সাতটি দিনের মজুরি হিসাব করে হাতে হাতে নগদ নগদ দিয়ে দিবে খাজাঞ্চি।

দাশু—কিন্তু আমার যে সাতটা দিনেরও খোরাক নাই সুরেন। আমি যাব কেমন করে, বল ?

সুরেন মানঝির চোখ দুটো হঠাৎ একটু বিষণ্ণ আর একটু বিস্মিতও হয় : এমন দশাটা তোমার কেন হলো দাশু দাদা ?

দাশু—কপালবাবা জানে।

সুরেন চুপ করে কি-যেন ভাবে, তারপর নিজের মনের আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে—হুরুরু, ওসব ভাবনা এখন রাখ।···সরদারিনের হাতে কত টাকা তুমি দিয়ে যেতে চাও ?

নিজের কোমরের গামছায় হাত দেয় সুরেন। তারপর এগিয়ে যেয়ে সব মানঝির কাছ থেকে একটা-দুটো করে সিকি আধুলি বা টাকা তসীল করে। তখনি ফিরে এসে দাশুর হাতের কাছে এক মুঠো টাকা-সিকি-আধুলি তুলে দিয়ে সুরেন বলে—এই নাও দশ টাকা। হপ্তা পেলে শুধে দিও।

টাকা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। কেউ যেন হঠাৎ এসে দাশু কিষাণের প্রাণটাকে এই মধুকুপির মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড কালো কবরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। দাশু কিষাণের আত্মার অহঙ্কার এতদিনে মাথা নিচু করে আর হাত পেতে যেন ঘুস নিচ্ছে। কিষাণের জীবন কয়লা-খাদের মালকাটা হয়ে গাঁইতা হাতে তুলে নেবে। দাশুর বুকের ভিতরে যে সত্যিই একটা যন্ত্রণার কান্না ছটফট করে উঠতে চাইছে। চোখের কোণের জল মোছে দাশু।

সুরেন মানঝি চেঁচিয়ে ওঠে : হেই দেখ! এটা আবার কি শুরু করলে ? কাঁদ কেন ?

জামকাঠের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে সব কথাই শুনছিল যে মুরলী, সেই মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেন মানঝি এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে : হেই দেখ, সরদারিন হাসে আর সরদার কাঁদে ; এমনটি তো কভি দেখি নাই।

ঠিক কথা, মুরলীর মুখের উপর ছোট একটা হাসির ছায়া এতক্ষণ ধরে

কে-জানে কিসের জন্য সিরসির করে কাঁপছিল। মধুকুপির কিষাণ এতদিন মাটির লোভ ছেড়ে দিয়ে খাদের কাজে নেমে যেতে বাধ্য হল। হার মেনেছে দাশু। তাই বোধহয় হেসে উঠেছে মুরলী। সুরেন মানঝির কথায় চমকে ওঠে দরজার আড়ালে সরে যায় মুরলী। এগিয়ে আসে দাশু।

মুরলীর হাতের কাছে টাকা রেখে দিয়ে দাশু বলে—চললাম।

মুরলী গম্ভীর হয়—কেন চললে ?

দাশু—তোর লেগে। আর ছেইলাটার লেগে।

মুরলী—কি বলছো তুমি ?

দাশু—তুই ঘরে থাক্। হপ্তা পরে ঘর ফিরবো।

মুরলী—হপ্তা পরে আবার চলে যাবে তো ?

দাশু—হ্যাঁ।

মুরলী—এমন দশাকে কি ঘর করা বলে ? মাগে-মরদে এমন ঘর করে ?

দাশু—আগে তুই বেঁচে থাকবি, তবে তো তোর সাথে ঘর করবো।

মুরলী—ছিঃ!

দাশু—কি ?

মুরলী—মানুষে এমন করে গাইও পুষে না ; কিন্তু মধুকুপির কিষাণ শুধু খোরাক দিয়ে মাগ পুষতে চায়।

দাশু—তুই বিশ্বাস কর মুরলী।

মুরলী—আবার কি বিশ্বাস করতে বলছো ?

দাশু—আমি মালকাটা হয়ে মরবো না, আমি মধুকুপির মাটি ছেড়ে দিব না, কভি না।

মুরলী ভ্রূকুটি করে : পাগলপারা কথা বল কেন ?

দাশু—না। আমি টাকার লেগে যাচ্ছি। টাকা জমাবো। ফিরে আসবো। জমি কিনবো। তুই বিশ্বাস কর। আউশ আমন ফলাবো ; রবি করবো। পাঁচ বিঘা কেন, দশ বিঘা জমি নিয়ে ছিটাই রোপাই করবো। তুই দেখে নিবি।

—বেশ, দেখে নিব। খুব জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে মুরলী, আর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই কেঁদে ফেলে। কী কঠোর দাশু কিষাণেরই এই জেদ! এখনও মুরলীর মুক্তির আশা বিনাশ করবার আশায় মাতাল হয়ে রয়েছে কিষাণের প্রাণ।

সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নীরব ট্রাকটা জোরে হর্ন বাজায়। সুরেন মানঝি ডাক দেয়—চলে এসো দাশু দাদা।

ট্রাকের উপর মালকাটা মানঝিদের গাঁইতাগুলি বড় বড় লোহার নখের মত হেলে দুলে চিকচিক করছে। ঘর ছেড়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ট্রাকের দিকে চলে যায় দাশু।

শুনতে পায় দাশু ঘরের ভিতরে গুনগুন করে কাঁদছে মুরলী। শব্দটা গুনগুন করে গাওয়া গানের শব্দের মত। যেন মুরলীর অদৃষ্টেরই আক্ষেপের গুঞ্জন। পাঁচ বছর আগে, দড়িবাঁধা কোমর নিয়ে পুলিসের পিছু পিছু চলে

যাবার সময়েও দাশু কিষাণের পায়ের জোর এত অলস ও এত নরম হয়ে যায় নি।

এজরা ব্রাদার্সের কলিয়ারি। মধুকুপির এত কাছে এই পাঁচ বছরের মধ্যে এরকম একটা কালিমাময় রাজ্য গড়ে উঠেছে, কল্পনা করতে পারে নি দাশু। দু ক্রোশ দূরে থেকে যে খাদের চিমনির ধোঁয়াকে কালো মেঘের গুঁড়ো বলে মনে হয়, আজ একেবারে সেই চিমনির কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু, কী ভয়ানক কালো হল্কার মত ধোঁয়া উগরে চলেছে চিমনিটা। চারদিকে কী অদ্ভুত ব্যস্ততা! কত রকমের শব্দ আর কত ঘরবাড়ি! একদিকে সারি সারি কয়লার পাহাড় দেখা যায়। সুরেন মাঝি বলে—ওটা ডিপো বটে।

কয়লা খাদে কাজ চলছে দিনরাত। লোয়ার মধুকুপি সীম, সত্তর ফুট পুরু কয়লার স্তর, হাই গ্রেড কয়লার এক বিরাট ভাণ্ডার হাতের কাছে পেয়েছে এজরা ব্রাদার্স। যেমন ব্যাঙ্কার্স অর্ডার, তেমনই লোকো অর্ডার; কোম্পানির অফিসের খাতাপত্রও প্রচুর প্রফিটের আশা ও উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে রয়েছে। নতুন নতুন ম্যাপ নিয়ে ম্যানেজার সর্বক্ষণ ব্যস্ত। কম্পাস বাবুও ব্যস্ত। ওভারম্যান আর সর্দার দিনের শিফ্‌ট্ সেরে আবার রাতের শিফ্‌টে যাবার জন্য তৈরি হয়।

নিকটেই লোডিং স্টেশন। ওয়ে ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি চল্লিশ-টনী জাহাজী ওয়াগন। দিনরাত ওয়াগনে কয়লা লোড করছে রেজিং ঠিকাদারের কুলির দল। তাড়া দেয় ওয়াগনের পাইলট, আর এক ঘণ্টাও ওয়াগন আটক করে রাখা সম্ভব নয়। লোডিং বাবু, রেজিং ঠিকাদার আর পাইলটের সঙ্গে তর্কাতর্কি চলে। তারপর কে জানে কেমন করে হঠাৎ একটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

এজরা ব্রাদার্সের কয়লা খাদ; একটা পিট আর দুটো ইনক্লাইন। ধাওড়ার দিকে যেতে যেতে সুরেন মাঝি বলে—হোই দেখ দাশু দাদা, ওটা ডুলি খাদ বটে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু; খাদের মুখের ভিতর থেকে তারবাঁধা লোহার ডুলি উঠছে আর নামছে। নামছে মানুষ, উঠছে কয়লা। কি-রকম অদ্ভুত ফোঁস-ফোঁস আর ধক্‌পক্ শব্দ ছাড়ছে ডুলি খাদের মুখের কাছে একটা কলঘর। নীল রঙের পায়জামা পরা আর মাথায় কালো কাপড়ের ফেটি বাঁধা এক-একটা লোক কলঘরের কাছে ঘুরে বেড়ায়। সুরেন মাঝি বলে—ওরা খালাসী বটে; কেউ পঞ্চাশ, কেউ ষাট, কেউ আশি টাকা মাইনা পায়। ওরাও একদিন তোমার আমার মত দেহাতী মনিষ ছিল।

আর একটুও দূরে, পর পর দুটো খাদের মুখের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসছে কয়লার সারি সারি চলন্ত স্তূপ। সুরেন মাঝি বলে—ঐ দুটো সিঁড়ি খাদ বটে। মাল নিয়ে টবগাড়ি কেমন উঠছে দেখ।

ডিপোর কাছে গুঁড়ো কয়লার বিরাট আকারের এক-একটা ঢিবির কোলের উপর কালো কালো খরগোশের মত হুটোপুটি করছে কারা ?

সুরেন মাঝি হাসে—পাথর বাছাই করছে ছোঁড়ারা। এক মণ বাছলে একটা ছোঁড়া দশ আনা মজুরি মারে। ভাবছো কেন ?

দাউ দাউ করে পুড়ছে ছোট ছোট কয়লার পাহাড়। দাশুর চোখের বিমূঢ়তাও যেন সেই জ্বালার হল্কা লেগে দপ্ দপ্ করতে থাকে।

সুরেন মাঝি বলে—রাঙী কয়লা জ্বলছে দেখ, দাশু দাদা।

—কেন জ্বলছে সুরেন ?

সুরেন—জলের দাগে দাগী রাঙী কয়লা জ্বলায়ে নরম কোক তৈয়ার হচ্ছে।

দু পাশে কয়লার ধুলো বড় বড় ঢিবি করে সাজানো। চলতে চলতে দাশুর মাথার চুল আর ভুরুর উপর কয়লার ধুলোর প্রলেপ কখন্ কখন্ পুরু হয়ে জমে গিয়েছে তাও বুঝতে পারে নি দাশু।

হঠাৎ, একটা ঢিবি যেন খিল খিল করে হেসে ওঠে ঃ হেই মাঝি, ভাল মানুষটিকে কোথা থেকে নিয়ে এলে ?

সুরেন মাঝি হেসে হেসে ধমক দেয়—তাতে তোদিগের চোখ ফাটে কেন ?

আবার এক ঝলক হাসি খিল খিল করে ঃ মানুষটি বড় উদাস বটে। দেহাতী বটে কি ?

সুরেন বলে—হ্যাঁ।

চোখ মুছে নিয়ে দেখতে থাকে দাশু, একদল মেয়ে ঝুড়ি হাতে নিয়ে কয়লার ধুলোর উপর পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। যেন গুঁড়ো কয়লা দিয়ে তৈরী এক একটা চটুল মেয়ে-চেহারা সব লজ্জা এলোমেলো করে দিয়ে ঢলাঢলি করছে আর হাসছে।

—এরা কে বটে সুরেন ?

—এরা ময়লা কামিন বটে। টালিতে কয়লাগুঁড়া বোঝাই করে। এরাও রোজ মজুরি পায় বারো আনা। ভাবছো কেন ?

এটা খুব লম্বা ও টানা একচালার কাছে এসে থামে সুরেন মাঝি। দেখতে পায় দাশু, এক এক জায়গায় কালো কালো পিণ্ডের মত মানুষের থড় জড়ো হয়ে রয়েছে। ঘুমোচ্ছে মালকাটার দল।

সুরেন বলে—এটা আমাদিগের ধাওড়া বটে। কাঁচা ধাওড়া। কোম্পানি বলেছে, পাকা ধাওড়া জলদি বানিয়ে দিবে। তখন মাঝিন আর ছেইলাগুলোকে আর গাঁয়ে রাখবো না।

চমকে ওঠে দাশু ঃ কেন সুরেন ? এই কালা কয়লার নরকের মধ্যে ঘরের মানুষগুলোকে আনবে কেন ?

সুরেন হাসে ঃ নরক বলো না দাশু দাদা। যেখানে দানাপানি সেখানে ঘর।…হাঁ চল, তোমাকে এখনি ভর্তি করিয়ে দিয়ে গাঁইতা পাইয়ে দিব।

সুরেন মাঝির পিছু পিছু হেঁটে ঠিকাদারের অফিসঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় দাশু। দাঁড়িয়ে আছে আরও প্রায় বিশ জন দেহাতী। দুটো ভীত চোখের

করুণ দৃষ্টির সব বেদনা নিয়ে দেখতে থাকে, আর বুঝতেও পারে দাশু, এতগুলি মানুষ বোধহয় তারই মত দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণায় গাঁয়ের ঠাণ্ডা মাটি, গাছের ছায়া, কাদার গন্ধ আর সবুজ ঘাসের ছোঁয়া থেকে তাড়িত হয়ে এই কয়লার কালো গহ্বরের কাছে আত্মদান করতে এসেছে।

অফিস-ঘরের সামনে মুড়ি আর গুড় ঝুড়িতে সাজিয়ে নিয়ে দোকান করেছে একটা লোক। দুই ঠোঙা মুড়ি আর দুই ঢেলা গুড় কিনে হাঁক দেয় সুরেন—চটপট খেয়ে নাও, দাশু দাদা।

তারপর আর বেশি দেরি হয় না। এক ঘটি জল খেয়েই তৈরি হয় সুরেন, সুরেনের সঙ্গে অফিস-ঘরের ভিতরে ঢুকে নাম লেখায় দাশু। মধুকুপির দাশু কিষাণ যেন এক নিমেষের অদৃষ্টের নতুন লিখনের কৌতুকে এজরা ব্রাদার্সের মালকাটা হয়ে যায়। একটা ঢিবরি, এক ছটাক কেরোসিন তেল আর গাঁইতা হাতে তুলে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকায় দাশু।

ওভারম্যান হাঁক দেয়—ব্যস্, আর দেরি কেন?

সরদার ডাক দেয়—সব হাজির হ্যায়?

হ্যাঁ, সবাই হাজির আছে। সরদারের পিছু পিছু মালকাটা দলের সঙ্গে নতুন মালকাটা দাশু কিষাণের মূর্তিও চলতে থাকে।

সুরেন বলে—হ্যাঁ, বেশ ফুর্তি নিয়ে কাজে লেগে যাও, দাশু দাদা।

দাশু—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রে ভাই?

সুরেন—ভুলি খাদে নয়, সিঁড়ি খাদে। তড়বড় করে নেমে যাও, ঝপাঝপ গাঁইতা মার, টব ভর্তি কর। ব্যস্, ভাবছো কেন?

কেরোসিনের ঢিবরি হাতে ঝুলিয়ে আর গাঁইতা কাঁধে নিয়ে মালকাটা দলের হল্লা হাসির সঙ্গে একটা নীরব গম্ভীরতার মত হেঁটে হেঁটে যখন সিঁড়ি খাদের মুখের কাছে এসে থামে দাশু, তখন কেঁপে ওঠে বুকটা। গাঁইতা ঢিবরি ফেলে দিয়ে সেই মুহূর্তে পালিয়ে যাবার জন্য পা দুটো ছটফট করে ওঠে। যেন হাঁ করে রয়েছে একটা ঘুটঘুটে কালো আর অন্ধ দানোর প্রকাণ্ড মুখ। কে জানে, কত নীচে কোন্ ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে এই মরণের সুড়ঙ্গ! যে মাটির উপরটা এত সুন্দর, সে মাটির ভিতরটা এত কুৎসিত, কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি দাশু। কিন্তু কি আশ্চর্য, সুরেন মাঝি বলেছে, এই কুৎসিত সুড়ঙ্গের ভিতরে নাকি পয়সা ছড়ানো আছে।

ঢিবরি জ্বালে মালকাটার দল। দাশুও কাঁপা হাতে ঢিবরি জ্বালে। তারপর, আবার চলতে শুরু করে। ডাইনে বাঁয়ে আর মাথার উপর কালো-কালো কাটাছাঁটা নিরেট পাথর; তার উপর নিজেরই প্রকাণ্ড কালো ছায়ার বিরাট পা দুটোর দিকে তাকালে ভয় পায় দাশু; একটা দানব যেন দাশুর পাশে পাশে হেঁটে চলেছে।

মোটা তারের কাছি, যেটা সুড়ঙ্গের ভিতরে গড়িয়ে গিয়েছে, তারই উপর ঝন্‌ঝন্ একটা শব্দ যেন নেচে নেচে বাজতে শুরু করে। আর, অনেক দূরের প্রতিধ্বনির মত একটা ঘণ্টার শব্দও শোনা যায়। সরদার হাঁক দেয়—খবরদার!

অতল থেকে কয়লা বোঝাই টবগাড়ি উঠছে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে ঘড়াং ঘড়াং প্রবল শব্দের এক-একটা জন্তু। হাবিস শুরু করেছে নীচের টালোয়ান। মালকাটার দলের সঙ্গে দাশুও সুড়ঙ্গের পাশ ঘেঁষে চলতে থাকে, নীচের দিকে, আরও কালো এক ভয়ানক রহস্যের দিকে।

—ডাইনে ঘরে। হাঁক দেয় সরদার।

একটা ছোট সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে মাথা হেঁট করে কুঁজো হয়ে মালকাটার দলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। পায়ের তলায় পচ্‌পচ্‌ করে কাদা। সরদার বলে—ভয় নাই, আর গ্যাস নাই ; ধুর কয়লার উপর জল মেরে পাথরের গুঁড়া বিছাই করা হয়েছে।

—আবার ডাইনে ঘুরে, পেঁছা সুঁদ।

ডাইনে ঘুরে আরও কুঁজো হয়ে হাঁটতে থাকে মালকাটার দল আর দাশু।

—ব্যস। সরদারের হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে সবাই থমকে দাঁড়ায়।

কয়লা আর কয়লা, স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে কয়লার নিরেট কালো শরীর। কয়লার খাঁজের গায়ে ঢিবরি ঝুলিয়ে দিয়ে জিরোতে থাকে মালকাটার দল। একটু দূরে শাবল মেরে কয়লার গায়ে বিঁধ দিয়ে বারুদ ঠাসছে চারজন মালকাটা। বেঁটে লাঠি আর সেফ্‌টি ল্যাম্প হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওভারম্যান, পরনে খাঁকি হাফপ্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জি আর মাথার প্রকাণ্ড টাকে কালো ধুলোর আবরণ।

—আওয়াজ হবে। তৈয়ার হও। হাঁক দেয় সরদার।

শিথিলভাবে গাঁইতার গায়ে হাত ঠেকিয়ে দিয়ে তৈরি হয় পুরনো মালকাটার দল। আর, নতুন মালকাটা দাশু যেন একটা বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে ভয়ে আক্রোশে হিংস্র হয়ে গাঁইতাটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

বারুদ ফাটে। নিরেট কয়লার বুকটা প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে ফাটা-ফাটা হয়ে যায়।

—কাজ শুরু করো গাঁতি। হাঁক দেয় সরদার।

গাঁইতা হাতে তুলে ফাটল-ধরা কয়লার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে দাশু।

ডরানির বানের জল নেমে গিয়েছে। আবার শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে মধুকুপির ডাঙা। বানভাসি পলি দশ দিনের রোদেই শুকিয়ে ধুলো হয়ে গিয়েছে ; ছোট ছোট ঝড়ো হাওয়ার ফুৎকারে সেই ধুলোও সারা দুপুর ধরে ডাঙার বুকের উপর ছোট ছোট ঘুরনি ছুটিয়ে নেচে বেড়ায়।

ডরানির স্রোতের হাঁটুজল আবার ছলছল করে, আর সেই স্রোত পার হয়ে ঈশান মোক্তারের খাটালের গরু আবার ঘাসের গন্ধ খুঁজতে খুঁজতে পলাশবনের ছায়ার দিকে চরতে চলে যায়। কারণ, আর একটা আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মধুকুপির প্রাণ। বাঘিন কানারানী আর এই তল্লাটে নেই।

বাবুরবাজার ফাঁড়ির পুলিস এ-গাঁয়ে আর ও-গাঁয়ে ঘুরে আবার জানান দিয়ে চলে গিয়েছে, এইবার একটু হেঁটে ছুটে, একটু ঘরের বার আর গাঁয়ের বার হয়ে কাজ করতে থাক সবাই। আর ডর নাই।

সড়কের উপর দিয়ে গো-গাড়ির যাওয়া-আসার সাড়াও শোনা যায়। এমন কি, সন্ধ্যা পার হয়ে যাবার পরেও। জামুনগড়ার কাঠুরিয়ারা জানতে পেরেছে, এই পথে বাঘের ডর আর নেই। থানা বলেছে, বাঘটা এ বছর একটু আগেভাগে, শীত দেখা দেবার অনেক আগেই চলে গেল। গোবিন্দপুর থানার সব ভাড়াটে শিকারী মাচান তুলে দিয়ে আবার যে-যার ঘরে ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু আর-একটা ভয়, যে-ভয়ের জন্য ঈশান মোক্তারের কুঠি রাতের বেলায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে না। বাবুরবাজারের ধানের পাইকার আর ইঁটের ঠিকাদারও সন্ধ্যার পর থেকে আতঙ্কিত বুক আর ঘুমহারা চোখ নিয়ে রাত কাটায়। গোবিন্দপুর থানার বড়বাবু আর ছোটবাবুর তর্কাতর্কিও যখন-তখন আরও তীব্র ও আরও মুখর হয়ে উঠতে থাকে।

এই আতঙ্কের নাম গুপী লোহার। কোন সন্দেহ নেই, বড়কালু ওয়েস্ট নামে নতুন রেলহেডের স্টোর ইয়ার্ডের ভিতর যে খুনের কাণ্ড ঘুমন্ত ঠিকাদারের লাল কম্বলটাকে রক্তে চুবিয়ে দিল আর টাকার থলি নিয়ে সরে পড়ল, সেই খুন গুপী লোহারেরই হাতের একটা ভয়ানক হিংসার শাণিত হিংসার কাজ। বাবুরবাজারে প্রতিদিন দু-চারটা ধানের গাড়ি এসে জমা হলেও কোন পাইকার আসে না।

মধুকুপির আতঙ্ক বলতে শুধু এই কুঠির আতঙ্ক। কারণ, গুপী লোহার যে মধুকুপির কোন মনিষের মেটে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেও আসতে পারে না, এই সহজ ও সরল সত্য কে না বুঝতে পারে? সিন্দুক নামে একটা বস্তু, ও তার ভিতরে নগদ টাকা নামে আর-একটি বস্তু শুধু এই কুঠি ছাড়া মধুকুপির আর কারও ঘরে নেই, থাকতেও পারে না। আজকাল বড় গুমস্তা দুখন বাবুর টাকার বাক্সটাও ঈশান মোক্তারের এই কুঠির সিন্দুকটার ভিতরে থাকে।

তাই আতঙ্কিত কুঠি শেষ পর্যন্ত তারই অনুগ্রহের শরণ নিয়েছে, যার ইচ্ছায় আর ইঙ্গিতে গোবিন্দপুর থানার বড়বাবু আর ছোটবাবুর বিচার-বিবেচনা, এমন কি ছুটি নেবার চেষ্টাও ওঠা-বসা করে। পুলিস মুন্সী চৌধুরীজীর আশ্বাস পেয়েছে ঈশান মোক্তারের কুঠি। কুছ ডর নেই; আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, কুঠিতে ডাকা মারবার কোনও মওকা পাবে না খুনেরা পাপী গুপী লোহার।

বাবু দুখন সিংয়ের বাড়ির সামনে পিপুলতলার ছায়ার ছোট একটি টাট্টু-ঘোড়া আজ সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার একটা পা একটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা দড়ির প্রান্ত দিয়ে বাঁধা। ঘোড়ার সামনে ঘাসের স্তূপ। লেজের ঝালর দুলিয়ে গায়ের মাছি তাড়ায় আর ঘাস খায় চৌধুরীর ঘোড়া। আর, বনচণ্ডীর ছোট দেউলের পাশে রক্তজবার গা ঘেঁষে একটা খাটিয়া পাতা হয়েছে। তার উপর বসে আছে চৌধুরী। রামাই দিগোয়ার মাটির উপর উবু হয়ে বসে

চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঈশান মোক্তারের কুঠি আজ চৌধুরীকে খুশি করার ব্রত পালন করেছে। কুঠি পাঠিয়েছে, মস্ত বড় কাঠের থালার উপর সাজানো পরোটার দুটি স্তূপ আর এক হাঁড়ি অড়হরের ডাল। পিতলের একটি ডেকচি, তার ভিতরে কালো পাঁঠার মাংস, বিনা পেঁয়াজে রাঁধা। একটি নতুন গামছা ; গামছার এক কোণে দশ টাকার নোট গেরো দিয়ে বাঁধা।

জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতনকে ডেকে এনে চৌধুরীর সামনে হাজির করেছে রামাই দিগোয়ার।

চৌধুরী বলেছে—কুঠি পাহারার জন্য বিশজন বেগার চাই। যেখান থেকে পার, যেমন করে পার সন্ধ্যা হবার আগেই লোক নিয়ে এসে জমায়েত করে ফেল। তা না হলে আমি সবার আগে তোমাকে চালান দিব বুড়া।

রতন—বেগার খাটতে বলছেন কেন বাবু ? কিছু পয়সা দিবার আজ্ঞা করেন।

—চুপ। একটা পয়সাও না। সরকারী কাজে বেগার খাটতে হবেই। পিতল বাঁধানো লাঠিটাকে মাটিতে ঠুকে চৌধুরী গর্জন করে উঠতেই বড় বুড়া রতন চুপ করে চলে গিয়েছে।

সারা দুপুর আর বিকাল পিপুলের ছায়ায় খাটিয়ার উপর ঘুমিয়ে পার করে দেবার পর সন্ধ্যা দেখা দিতেই আবার ব্যস্ত হয়ে হাঁকডাক করে চৌধুরী লোক নিয়ে আসে বড় বুড়া রতন। কুঠির জন্য বিশজন মানুষ পাহারায় লাগিয়ে দিয়েই চৌধুরী একটা হাঁপ ছাড়ে ঃ এইবার গলাটা একটু ভিজাতে চাই রামাই বন্দোবস্ত কর দেখি।

আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল বাবু দুখন সিং। দুখন সিংয়ের চাক দুটি মহুয়া সরাবের বোতল আর সরা ভর্তি ছোলাভাজা নিয়ে এসে চৌধুরী হাতের কাছে রাখে।

টিম টিম করে আলো জ্বলে। চৌধুরীর গলা ভিজে যাবার পর এতক্ষণে গম্ভীর মুখটাও নতুন রকমের মেজাজে প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

—নে রামাই। এটাতে পোয়াভর আর এটাতে ছটাকভর আছে। বোতল দুটোকে রামাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে চৌধুরী বলে—তাড়াতাড়ি পিয়ে রামাই ; তারপর চল, একটা রাউণ্ড দিয়ে আসি।

বলতে বলতে অদ্ভুতভাবে হাসির ঢেঁকুর তুলতে থাকে চৌধুরী। চুমুকে বোতল খালি করে আর গলা ভিজিয়ে রামাই বলে—হুজুর আ ফাঁড়িতে ফিরবেন কি ?

চৌধুরী হাসে ঃ তুই জানিস। যদি জায়গা করে দিস তবে আর ফিরবে কেন ?

হেসে ওঠে রামাই ঃ তবে চলেন হুজুর।

আর দেরি হয় না। পিপুলতলার অন্ধকার থেকে টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে আসে দুটি ছায়ামূর্তি। ঘোড়ার উপরে চৌধুরী, আর ঘোড়া

মুখের লাগামের কড়া ধরে রামাই দিগোয়ার। খুট্ খুট্, ঠুক্ ঠুক্, ঘোড়ার খুরের নাল সড়কের বুকের উপর ছোট ছোট শব্দ শিউরে দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে থাকে। সেই সঙ্গে ছোট ছোট হাসির ঢেঁকুরও বাজে। মাঝে মাঝে নেশাতুর নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন তপ্ত হয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে ওঠে; মধুকুপির এই সন্ধ্যার ঠাণ্ডা অন্ধকারের গা শুঁকে শুঁকে একটা নরম-গরম মাংসল স্বাদুতা খুঁজে বেড়াচ্ছে দুটি টলমল খুশির ক্ষুধা।

সড়ক থেকে নেমে মেঠো পথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে যায় এই ছায়াময় অভিযান। রাংচিতার ঝোপের উপর জোনাকি জ্বলে; তারই গা ঘেঁষে ছোট একটা মাটির ঘর।

গলা ফাটিয়ে হাঁক দেয় রামাই—খবরদার!

রামাইয়ের এই হাঁকের মধ্যে যেন একটা বিভীষিকা আছে। রাংচিতার জোনাকির দল কেঁপে ওঠে; আর কেঁপে ওঠে মাটির ঘরের ভিতরে লুকিয়ে আর ঘুমিয়ে পড়ে থাকা একটা প্রাণ।

ঘরের দরজার কাছে এসে আর একবার গলা কাঁপিয়ে হাঁক দেয় রামাই—মিঠুয়া ঘাসী আওয়াজ দাও।

ঘরের ভিতরে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ওঠে একটা মেয়েমানুষ; যেন মেয়েমানুষটার বুকের সব পাঁজর ভয় পেয়ে একসঙ্গে আর্তনাদ করে ফেটে গিয়েছে।

রামাই দিগোয়ার হাসে: বাইরে বের হয়ে এসে কথা বল, তেতরি।

দরজা খুলে বের হয়ে আসে তেতরি ঘাসিন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চেঁচাতে থাকে: তুই আবার মানুষটার নাম ধরে হাঁক দিলি কেন রামাই?

রামাই হাসে—তাতে ভয় পাস কেন?

তেতরি গুনগুন করে কাঁদে—মরা মানুষের নাম ধরে হাঁক দিলে যে বড় ডর লাগে। তুই এটা বুঝিস না কেন? তোকে কত বললাম, কত পরবী দিলাম, তবু তুই মানলি না রামাই!

চৌধুরী—কি বটে রামাই? মাগি কাঁদে কেন?

রামাই হাসে: ওর মরা মরদের নাম হেঁকেছি বলে ভয় পেয়ে কাঁদছে। কিন্তু আমার দোষ নাই হুজুর। থানাতে দাগীর খাতায় ওর মরদ মিঠুয়া ঘাসীর নাম লিখা আছে।

চৌধুরী হাসে—তুই কেন মিছা এত রস করিস রামাই? যখন জানিস যে লোকটা নাই, তখন ওর নাম হেঁকে লাভ কি?

রামাই—থানা যদি নামটা না কাটে, তবে আমি বা কেন…।

চৌধুরী—ওসব কথা এখন রাখ্ রামাই। এখানেকে এলি কেন বল?

রামাই ফিসফিস করে: তেতরির ঘরে থাকবেন কি হুজুর?

চৌধুরী—নাঃ।

রামাই—তবে চলেন হুজুর।

আবার খুট্ খুট্, ঠুক্ ঠুক্। ঘোড়ার খুরের নাল পথের কাঁকর পাথরের

উপর দিয়ে ছোট ছোট চোরা শব্দের টোকা মেরে মেরে চলতে থাকে। সড়ক ধরে অনেক দূর এগিয়ে আসার পর আবার মেঠো পথে নেমে দূরের একটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে চৌধুরী আর রামাই দিগোয়ারের অভিযান।

পাকুড়তলার কাছে পেঁাছেই একটা কুঁড়ে ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে রামাই—খবরদার! ভরত শিয়ালগীর আওয়াজ দাও।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ দেয় একটা উগ্র কণ্ঠস্বর। চিৎকার করে রামাইয়ের নামে অভিশাপ বর্ষণ করে পল্টনী দিদি।—মর্ মর্ মর্, মুখপোড়া খালভরা। তোর ঘরে জোড়া মড়া মরে না কেন? তোর মাগ দশবার রাঁড় হয় না কেন?

সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষের কান্নার করুণ শব্দ মেশামেশি হয়ে অদ্ভুত এক বিলোপের মত বাজতে থাকে।

হি-হি করে গলা কাঁপিয়ে হাসতে থাকে রামাই। চৌধুরী বলে—এটা যে একটা ক্ষেপী শিয়ালী বটে, রামাই?

রামাই—হ্যাঁ, হুজুর। কিন্তু জিনিসটা ভাল। মাগি লড়াইয়ের সময় অনেক সলজারের অনেক পয়সা খেয়েছে, কিন্তু এখন তালপাখা বেচে আর কাঁদে; আর নিজেরেই ভুখা পেটটাকে গালি দিয়ে চিল্লাচিল্লি করে।

গলা কেশে নিয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে আবার চেঁচিয়ে রুক্ষ স্বরে ধমক দেয় রামাই—গালি দিবি না পল্টনী; খবরদার! বের হয়ে এসে মুন্সীজীকে সেলাম দে।

পল্টনীর চিৎকার হঠাৎ ভয়ে রুদ্ধ হয়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে একটা ঢিবরি জ্বালে পল্টনী। তার পরেই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েই কাঁদতে থাকে: আপনি এই কসাইটাকে একটুক বলে দেন হুজুর; ও যেন আর মানুষটার নাম ধরে হাঁক না দেয়।

চৌধুরী—কেন?

পল্টনী—কপালবাবা দয়া করে মানুষটাকে কবেই নিয়ে গিয়েছে হুজুর। মিছা সেই মানুষটার নাম হেঁকে এই কসাইটা মজা করে কেন?

রামাই—দাগীর খাতায় ভরতের নাম লিখা আছে; আমি কি করবো বল?

চৌধুরীর মুখেও বিচিত্র কৌতুকের হাসি মিটমিট করে: বেশ বেশ, ব[illegible] দিচ্ছি, আর তোর মরদের নাম হাঁকবে না রামাই।

কথা শেষ করে আর ঘরের ভিতর উঁকি দিতে গিয়েই চমকে ওঠে চৌধুর[illegible] —তোর ঘরের ভিতর ওদুটা কেমন জানোয়ার বটে রে পল্টনী?

পল্টনী দিদির দুই ছেলে, ধবধবে ফরসা আর নীলচে চোখ, কটা আর মো[illegible] ঘরের ভিতরে একগাদা ছেঁড়া কাঁথার উপর বসে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে চৌধুরীর চোখের বিস্ময়কে আরও চমকে দিয়ে হাসতে থাকে রামাই—ও দু[illegible] সলজারের দয়া বটে।

রামাইয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পল্টনী—তাতে তো

চোখ পুড়ে কেন রে ডাইনের বেটা ?

—চুপ। ধমক দেয় চৌধুরী।

পল্টনীও মাটির উপর ধপ করে বসে পড়ে আর কপালে হাত দিয়ে গুনগুন করে কাঁদতে থাকে ঃ ধমক দিলে আমি মানবো কেন হুজুর! আমার কটা আর মোটার উপর ডাইনের নজর পড়েছে হুজুর। একবার দেখেন হুজুর, আমার কটা আর মোটার হাড়মাসের কী দশা হয়েছে।

কটা আর মোটা; একটা সাত বছর, আর একটা ছ বছর বয়সের ধবধবে সাদা ও রোগা জিরজিরে অপার্থিব প্রাণী। চৌধুরীর সেই বিস্মিত চাহনির রকম দেখে যেন আরও আতঙ্কিত হয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে কটা আর মোটা।

—মরে গেলাম গো মা। চেঁচিয়ে ওঠে কটা।

—তুই এখানকে আয় গো মা। ফোঁপাতে থাকে মোটা।

—চল রামাই। বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চৌধুরী।

চৌধুরীর কাছে এগিয়ে এসে, আর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে রামাই ঃ পল্টনীর ঘরে থাকেন না কেন, হুজুর।

—না। ভাল জায়গা থাকে তো চল, নয় তো ফাঁড়ি ফিরে চল।

মাথা চুলকোয় রামাই; কি যেন ভাবে। তারপর, যেন একটা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে হঠাৎ ছটফট করে ওঠেঃ ভাল জায়গা আছে হুজুর। সেটাও দাগর ঘর বটে। কিন্তু…।

চৌধুরী—কি ?

রামাই—দাগীটা যদি ঘরে না থাকে, তবে·· তবেও একটুক বুঝে সুঝে কাজ নিতে হবে, হুজুর।

খুট্ খুট, ঠুক্ ঠুক্! টাট্টু ঘোড়ার খুরের নাল আবার পাকা সড়কের উপর দিয়ে ছোট ছোট শব্দ বাজিয়ে চলতে থাকে।

খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে হয় না। কয়েকটা নিমগাছ, আর একটা বাঁশ-ঝাড় যেখানে পথের দু পাশে দাঁড়িয়ে রাতের বাতাসে গা দুলিয়ে অন্ধকার নাড়ছে, সেখানে এসেই হাঁক ছাড়ে রামাই—খবরদার!

চৌধুরীর নেশার আবেশ একটা বিপুল আশার চমক সহ্য করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে ঃ হাঁ হাঁ রামাই। বড় ভাল জায়গাতে এসেছিস।

রামাই হাঁক দেয়—দাশু ঘরামি আওয়াজ দাও।

কোন আওয়াজ নেই। একটা নীরব ও নিস্তব্ধ মাটির ঘর; জামকাঠের জীর্ণ কপাট ভিতর থেকে বন্ধ। এই ঘরের সামনে এসে এই প্রথম হাঁক দিল রামাই। এই পাঁচ বছর ধরে এই ঘরের ভিতরে একটা সুন্দর চেহারার মেয়েমানুষ একলা পড়েছিল; তবু কোন রাতে এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াবার সাহস পায় নি রামাই। কিন্তু আজ যে কোন সন্দেহ নেই, এই ঘর দাশু ঘরামি নামে এক দাগীর ঘর। আজ অনায়াসে এই ঘরের দরজার উপর লাঠির বাড়ি মারতে পারে; দাগীর ঘুম ভাঙিয়ে দাগীকে ঘরের বাইরে আনতে পারে রামাই। আর দাগীর কোন ভুলের আঁচ পেলে জোর গলায় পরবী দাবিও করতে পারে।

—সরদার ঘরে আছ কি নাই ? আবার ডাক দেয় রামাই।

কোন সাড়া শোনা যায় না। ঘরের ভিতর একটা বাতিও জ্বলে ওঠে না।

নিরুত্তর ঘরটার উপর যেন একটা আক্রোশ নিয়ে আবার হাঁক দেয় রামাই—সরদারিন কি নাই ?

কপাটের উপর রামাইয়ের টাঙ্গির হাতলের বাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে।

রামাই বলে—আওয়াজ দাও সরদারিন।

—কে বট ? ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীত কণ্ঠস্বর ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করে।

—আমি রামাই দিগোয়ার।

—তুমি এখানে আস কেন ?

দাগীর হাজিরা নিতে এসেছি। তোমার মরদ দাশু ঘরামিকে দেখতে চাই।

—সে নাই।

—কোথায় গেল ?

—কয়লা খাদে।

—তবে তুমি বের হয়ে এসো।

—না।

—খবরদার। মুন্সীজী দাঁড়িয়ে আছেন। জলদি বের হয়ে এসো।

—না।

—তোমার বয়ান নেবেন মুন্সীজী।

—আমি কিছু বলতে পারবো না।

—বলতে হবে।

—না।

—আমরা তোমার বাপের বাড়ির মানুষ নই গো সরদারিন ; আমরা থানার মানুষ। যা বলছি, চুপচাপ শুন আর মেনে নাও।

দাগীর ঘরটা এইবার কোন উত্তরই না দিয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায়।

জামকাঠের কপাটের উপর মুখ রেখে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে রামাই ঃ বাতিটা জ্বাল সরদারিন। একবারটি বের হয়ে এসো। মুন্সীজীর কাছে একটুক বসো। একটুক হেসে কথা বল। মুন্সীজী তোমার উপর বড় খুশি হবেন।

দাগীর ঘরটা তবু যেন একটা বধির কবরের মত নীরব হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে বাতি জ্বলে না ; কোন সাড়াও শোনা যায় না।

দরজার দিকে এইবার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে স্বয়ং চৌধুরী। নেশাক্রান্ত নিঃশ্বাসের জ্বালাটা আহত অজগরের মত ফুঁসে ওঠে ঃ একটা লাথি মেরে দরজাটাকে ভেঙ্গে ফেল রামাই। তারপর দেখি, সরদারিনের গতর ভাল, না, গমর ভাল ?

জামকাঠের যে জীর্ণ কপাট বাচ্চা-নেকড়ের থাবার আঘাত সহ্য করতে গিয়ে

নড়বড় করে, সে কপাট ভেঙে দু টুকরো করে ফেলতে কতটুকুই বা জোরের দরকার।

কিন্তু আর কোন জোরের দরকার হয় না। ঘরের ভিতরে রেড়ির তেলের মেটে বাতির আলো জ্বলে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় কপাট। দরজার চৌকাঠের কাছে বাতিটাকে রেখে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় মুরলী।

মুরলীর আদুড়ে শরীরের উপর শুধু দেড় হাত বহরের একটা মোটা খেরো শাড়ির আবরণ; এক পাক দিয়ে জড়ানো একটা বিচিত্র শিথিলতা। রেড়ির তেলের মেটে বাতির শিখাটা নেচে নেচে জ্বলে, সেই সঙ্গে মুরলীর মুখের উপর একটা অদ্ভুত হাসির শিখাও যেন জ্বলে জ্বলে নাচে। দেড় বোতল সরাবের নেশায় টলমল চৌধুরীর নতুন পিপাসার সব আক্রোশের উপর যেন একটা বিস্ময়ের কুহক ছড়িয়ে দিয়েছে মুরলীর এই মূর্তি: চৌধুরীর চোখে পলক পড়ে না। রামাই দিগোয়ারও কথা বলতে ভুলে যায়।

কথা বলে মুরলী। আস্তে ঘাড় দুলিয়ে সড়কের অন্ধকারের দিকে একবার তাকায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে আর ভুরু বাঁকা করে বাতিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দূর আকাশের তারার মত একটা মিটিমিটি হাসি মুখের উপর ফুটিয়ে তুলে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকায়। কি যে শুনলাম, কি যেন দেখবে বলে তুমি এখনি কসম খেলে চৌধুরীজী?

চৌধুরী—অ্যাঁ? অ্যাঁ? কিসের কসম?

মুরলী—কি দেখবার ইচ্ছা হয়েছে? আমার গমর ভাল, না, গতর ভাল?

গলা কাশে চৌধুরী, রামাই দিগোয়ার ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আর, সরু কোমরের উপর যেন একটা মত্ত ঝুমুরের ঢং হঠাৎ মোচড় দিয়ে দুলিয়ে ও খিলখিল করে হেসে ওঠে মুরলী: আমার গতর ভাল, গমরও ভাল। কিন্তু…।

চৌধুরী বিড়বিড় করে: রাগ করো না সরদারিন।

মুরলী—কেন রাগ করবো না বল? যে লোক মেয়েমানুষের সাথে কথা বলতে জানে না, মেয়েমানুষের মন বুঝে না, সে লোক এখানে আসে কেন?

চৌধুরীর গলার স্বর আরও মৃদু হয়ে যেন অনুনয় করে: ওসব কথা ভুলে যাও। তুমি এখন খুশি হয়ে দুটা কথা বল।

হেসে ছটফট করে দু পা পিছনে সরে গিয়ে ভাঙা খোঁপাটাকে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধতে চেষ্টা করে মুরলী: খুশি কর, তবে তো খুশি হব।

চৌধুরী—কি চাও বল?

মুরলী—সরাব কই? শাড়ি কই?

চৌধুরী—কুণ্ঠিতভাবে হাসে: সব দিব। সব দিব।

মুরলী—দেবতার নামে কিরা করে বল।

চৌধুরী—হে বৈকুণ্ঠনাথ, হে বিষ্ণু ভগবান, কিরা করে বলছি।

আবার ভুরু বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে হেসে ওঠে মুরলী: তোমার চৌধুরিনের দোহাই?

চৌধুরী এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর চোখের চাহনিটাও টলমল করে:

আরে হ্যাঁ, তাই বটে। তুই বড় বেশি নখড়া জানিস সরদারিন।

মুরলী—আমিও কিরা করলাম।

চৌধুরী—কিসের কিরা?

আঁচল তুলে মুখ চাপা দিয়ে হেসে ওঠে মুরলী : সব দিব।

ব্যস্তভাবে ডাকে চৌধুরী—রামাই।

রামাই—হুজুর।

চৌধুরী—তুই এখন তবে…।

রামাই—আমি ঈশান মোক্তারের কুঠিতে চললাম হুজুর। আপনি এখানে থাকেন।

আবার হেসে ওঠে মুরলী : আজ নয় চৌধুরীজী।

চমকে ওঠে চৌধুরী : অ্যাঁ, কি বটে? কি বললে সরদারিন?

মুরলী—আজ নয়; এখানেও নয়। আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

চৌধুরী বিড়বিড় করে : নিয়ে যেতে হবে?

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী : হ্যাঁ, যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব। আমাকে ঘর দিবে, শাড়ি দিবে, সরাব দিবে, সুখে রাখবে। মেয়েমানুষের মন বুঝতে পার না, কথা বল কেন?

চৌধুরী ডাক দেয়—রামাই!

রামাই—বলেন হুজুর।

চৌধুরী—সরদারিন ভাল কথা বলছে।

রামাই—খুব ভাল কথা। এমন গতর, এমন সুরত, আর এমন মিঠা রংঢং, এই মানুষ কিষাণের ঘরে থাকবে কেন? কোন্ সুখে? দাগীর মাগ হয়ে এর কোন্ ইজ্জতটি হবে?

চৌধুরী—তবে গোবিন্দ বাবুর বাজারে একটা ঘর নিতে হয়।

রামাই—ভাল হয় হুজুর।

মুরলীর দিকে দু পা এগিয়ে আসে চৌধুরী : বল, কবে যাবি সরদারিন?

দু পা পিছিয়ে সরে যায় মুরলী : অমন হুকুম করলে যাব না। ডর দেখালে যাব না।

চৌধুরী বিচলিত হয় : না না, হুকুম করছি না, ডর দেখাচ্ছি না। আমি তোকে সাধছি।

যেন রূপের গমরে আর অভিমানে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী : আমাকে পায়ে ধরে সেধে নিয়ে যাবে, তবে যাব। তা না হলে যাব না, মেরে ফেললেও না।

ঝুঁকতে ঝুঁকতে আরও এক পা এগিয়ে যেয়ে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়ে চৌধুরী; আর ব্যাকুলভাবে হাত দুটোকে ছুঁড়ে দিয়ে মুরলীর দু পায়ের পাতা ছুঁয়ে ফেলে : আমি সাধছি, সরদারিন।

আবার হেসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে যায় মুরলী : ঢের হয়েছে। এবার ঘরে যাও, আর…।

চৌধুরী—বল।

মুরলী—একটা খবর দিয়ে ঝালদা থেকে আমার বাপকে নিয়ে এসো।

চৌধুরী—শুনে নে রামাই।

মুরলী—আমার বাপ, মহেশ রাখাল।

এইবার সত্যিই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে মুরলী ঃ বুড়া বাপের সাথে একবার দেখা না করে আমি যাব না, কভি না।

রামাই—কাঁদ কেন? আমি বলছি, কালই তোমার বাপকে ঝালদা থেকে ডেকে এনে···।

চৌধুরী– সে তো হলো, তারপর?

মুরলী চোখমুখ আবার প্রসন্ন হয়ে ওঠে, আর ঠোঁটের ফাঁকের সূক্ষ্ম হাসিটাও দূরের তারার আলোর মত আবার মিটমিট করে কাঁপে ঃ তারপর আর কি? তোমরা খবর দিও, কবে যেতে হবে।

রামাই বলে—বাস্, এখন চলেন হুজুর।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে ডাকে চৌধুরী—সরদারিন! তোর ভাল গমর তো দেখলাম, কিন্তু···।

মুরলী—কি?

চৌধুরী—কিন্তু তোর এত ভাল গতর কানে কানে একটা কথা বলতে চাই শুনবি?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মুরলী ঃ আর কোন কথা বললে আমি আবার কেঁদে ফেলবো গো বাবু। আজ আর কিছু শুনবো না।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয় মুরলী। রেড়ির তেলের মেটে বাতিটাও এক ফুৎকারে নিভে যায়।

খুট খুট, ঠুক ঠুক, টাট্টু ঘোড়ার খুরের নাল সড়কের বুকের উপর টোকা দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। সে শব্দ শুনতে শুনতে খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর যেন আছাড় খেয়ে পড়ে মুরলী, আর মেঝের মাটির উপর কপালটাকে ঘষে ঘষে ছটফট করতে থাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর একটা যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলছে।

পুরনো জামকাঠের এই নড়বড়ে কপাট, আর এই মাটির ঘর; দাশু ঘরামি নামে একটা দাগীর ঘর। বাইরের অন্ধকার থেকে যে-কোন সাপ আর বাঘ এই ঘরের ভিতরে ঢুকে দাগীর মাগের মাংস গিলে খাবার জন্য হাঁ করবে। অসহ্য! এই মুহূর্তে এই ঘরের মাটির উপর থুতু ফেলে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করে।

না, এখনই চলে যাওয়া যায় না। খবর পেয়ে ঝালদা থেকে চলে আসুক বুড়া মহেশ রাখাল। তারপর আর এক মুহূর্ত দেরি করবে না মুরলী। বাঁচতে হবে, পেটের ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে; কয়লাখাদের মালকাটা হপ্তা পরে ঘরে ফিরে এসে দেখুক, ভাত নাই, মান নাই আর কোন সুখের আশা নাই যে ঘরে, সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে মুরলী।

স্তব্ধ রাতের বাতাসে অনেক দূর থেকে কলের বাঁশির ক্ষীণস্বরের কাঁপুনি ভেসে আসছে। কয়লাখাদের কাজের বাঁশিটা আজ এই রাতে ক'কিয়ে ক'কিয়ে

কাঁদছে কেন বোঝা যায় না। খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে চোখ বুজতে গিয়ে চোখের উপর একটা আতঙ্কের ছবি দেখে আবার ছটফট করে মুরলী। কী ভয়ানক ছবি! কালো লেংটি পরা, সারা গায়ে কয়লার ধুলো, চোখের চারদিকে ঘামে ভেজা কয়লাগুঁড়ো কাদা হয়ে রয়েছে, আর কাঁধে একটা গাঁইতা; একটা ভয়ানক জীব এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছে—কপাট খোল মুরলী।

মুরলীর বুকের পাঁজরগুলি একটা প্রচণ্ড শাস্তির রূপ দেখে শব্দ করে চমকে ওঠে। কানের কাছে একটা ঠাট্টার হাসিও বাজছে। হাসিটা পলুস হালদারের হাসি: কি মুরলী? আমাকে চোর বলে গালি দিয়ে ভাগিয়ে দিলে, তবে এখন কাঁদ কেন? এখন হাস না কেন? সুখ কর না কেন?

খেজুরপাতার চাটাই ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। বাতি জ্বালে। খাটিয়ার তলা থেকে টিনের তোরঙ্গটাকে টেনে আনে। দেড় হাত বহরের মোটা খেরো শাড়িটাকে এক টানে নামিয়ে ফেলে। নীল রঙের শাড়ি, মোলায়েম আর মিহি জমিন! গোলাপী রঙের ব্লাউজ। লেসের ঝালর লাগানো সায়া। জীবনের সব চেয়ে বড় সাধের ইচ্ছার অভিসারে এখনি যেন ছুটে চলে যেতে চায় মুরলী।

সিস্টার দিদি যেমনটি সাজ করতে শিখিয়ে দিয়েছেন, নিজের হাতে মুরলীকে যে সাজে কতবার সাজিয়েছেন, সেই সাজে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে আয়নাটাকেও মুখের কাছে তুলে ধরে মুরলী। চিরুনি চালায়, নতুন করে খোঁপা বাঁধে। গোটানো বিছানাটাকে ঘরের এক কোণ থেকে তুলে নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতে। নরম তুলোর তোশক বালিশ আর চাদর। সেলাই কলটাকেও আবার হাতের কাছে টেনে নেয়। গাঁটরি করে বাঁধা লেসগুলিকেও হাতের কাছে রাখে।

ঘর্ ঘর্, ঘর্ ঘর্—কল চালিয়ে কাপড়ের টুকরোর উপর সুতোর নক্শা আঁকে মুরলী; গেঁয়ো মধুকুপির যত দীনতা আর হীনতার বিরুদ্ধে গর গর করে যেন নতুন আক্রোশের গান গাইছে মুরলীর প্রাণের ফিরে-পাওয়া একটা সাধ।

পিলার কাটাই। এজরা ব্রাদার্সের কয়লাখাদের ভিতরে ও বাইরে একটা ব্যস্ততার মহোৎসব।

বিকাল থেকে পিলার কাটাই শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা পার হয়ে রাতেরও প্রায় আধ প্রহর পার হয়ে গিয়েছে। হাবিস করে হয়রান হয়ে যাচ্ছে টালোয়ান। অফুরান ক্ষুধার আবেগে খাদের গভীরে নেমে যাচ্ছে শূন্যোদর টবগাড়ি; আর এক একটা বিশহন্দরের উদর ভর্তি করে চাপ চাপ কয়লার টুকরোতে পরিপূর্ণ হয়ে উপরে উঠে আসছে। ম্যানেজার দু বার খাদের ভিতরে গিয়ে পিলার কাটাইয়ের ব্যবস্থা তদারক করে গিয়েছেন।

আজ সব ব্যাপারেই অতিরিক্ততা। বেশি করে মালকাটা লাগানো হয়েছে।

বেশি করে টবগাড়ি ছাড়া হয়েছে। টবের হিসাব করবার জন্য দুজন বেশি মুন্সী খাদের নীচে নেমে গিয়েছে। একজনের জায়গায় তিনজন ওভারম্যান কাজে নেমেছে। ফার্স্ট এড্ সরঞ্জাম নিয়ে ডাক্তারও খাদের ভিতরে নেমেছেন।

দখিনা সুঁদের আগুতে আর মাল নেই; পাথরের ফাঁড় দেখা দিয়েছে। সেখানে আজ পিলার কাটাইয়ের মহোৎসব। ছাড় কয়লার যে-সব পিলার পাথুরে ওভারবার্ডেন মাথায় নিয়ে চুপ করে সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল, তারই উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে শত শত গাঁইতার কোপ। কয়লা-গুঁড়োর ঝটকা উড়ছে, হাজার শালের রোলা দিয়ে ঠেকানো পাথুরে ছাদের একটা অন্ধ আক্রোশের ভার পট্ পট্ করে শব্দ করে ফাটছে। মাঝে মাঝে বিদীর্ণ পাষাণের শব্দ রাক্ষুসে হুংকারের মত ফেটে পড়ছে।

মালকাটার বুকের পাঁজর কেঁপে উঠলেও মালকাটার হাতের গাঁইতার দুঃসাহস একটুও বিচলিত হয় না। পিলারের উপর কোপ দিয়ে কয়লার এক-একটা প্রকাণ্ড চাঙ্গড় টেনে এনে টব বোঝাই করছে সবাই। যে টব বোঝাই করতে অন্যদিন চার ঘণ্টা লাগে, সে টব আজ এক ঘণ্টায় ভরে ফেলেছে এক-একজন মালকাটা। আজকের রোজগারের আশাও একটা ভয়ানক নেশা; লুঠেরা ডাকাতের মত হিংস্র হয়ে আর মরিয়া হয়ে যেন একটা ভাণ্ডার লুঠ করছে মালকাটার দল। তারই মধ্যে দেখা যায়, সব চেয়ে বেশি দুরন্ত দুঃসাহসে মরিয়া হয়ে গাঁইতা চালিয়ে যাচ্ছে মধুকুপির দাশু ঘরামি।

সরদার হাঁক দেয়—খবরদার! দাশু ঘরামি, খবরদার! আর আগে যাবে না, খবরদার!

কিন্তু দাশু বোধহয় শুনতে পায় না। মজুরী লুট করবার এই প্রচণ্ড মহোৎসবে মন-প্রাণ লুটিয়ে দিয়ে গাঁইতা চালিয়ে যাচ্ছে দাশু। এরই মধ্যে পাঁচ টব বোঝাই করে ফেলেছে দাশু; কিন্তু তবু শ্রান্তি নেই। জিরোতে চায় না দাশু।

ছাদ ফাটে, কালো ধুলোর ঝট্‌কা ছোটে, শালের রোলা ছিটকে পড়ে, আর মাথার উপরে অন্ধ পাথরের ভার গুমরে গুমরে আরও কাছে নেমে ঝুলতে থাকে। সরদার হাঁক দেয়—খবরদার!

বার বার হুঁশিয়ারি দাগ এক লাফে টপকে গিয়ে ভাঙা পিলারের চাঙড় টেনেছে দাশু। চিৎকার করে ধমক হাঁকে সরদার: মরবি নাকি রে দেহাতী গাধা! দাশুর গাঁইতার উপর লাঠি মেরে, দাশুকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেয় সরদার। চুপ করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে দাশু।

সেই মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে হাঁক ছাড়ে সরদার—গাঁইতা রোকো, মালকাটা। পিছে হটো, মালকাটা। ঢিবরি নিভাও, মালকাটা। সুঁদ ছাড়ো, বাইরে ভাগো মালকাটা!

বেজে উঠেছে গ্যাসবাবুর হুইসিল। গ্যাস দেখা দিয়েছে। আতঙ্কের হুইসিলটা বাজতে বাজতে খাদের মুখের দিকে চলে যায়। ঢিবরি নিভিয়ে দিয়ে ওভারম্যানের সেফটি ল্যাম্পের সঙ্কেতের দোলানি লক্ষ্য করে মালকাটার দল ছুটতে থাকে।

কিন্তু একটা মিনিট পার না হতেই দখিনা সুঁদের অন্ধকারময় বিরাট রন্ধ্রটা যেন গুমরে ওঠে ; আর, প্রচণ্ড হাওয়ার একটা ঝাপটা ছুটে চলে যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তিনটা মালকাটা। গ্যাসের হাওয়া ফেটেছে।

খাদের মুখের কাছে সাইরেনের করুণ আর্তনাদ শিউরে শিউরে বাজতে থাকে। খোলা ভাঙা পার হয়ে দূরের মধুকুপির বড়কালুর আর ছোটকালুর মাথার উপর দিয়েও এই আতঙ্কের ক্ষীণ স্বর ভেসে চলে যায়। মাথা গুণতির পর দেখা গেল, চারজন মালকাটা নেই। দুশ্চিন্তিত ম্যানেজার বিচলিত স্বরে হাঁকডাক করেন : রেস্কু্য ! রেস্কু্য !

টর্চ দড়ি স্ট্রেচার আর জল নিয়ে খাদের ভিতরে নামবার জন্য যে রেস্কু্য পার্টি প্রস্তুত হয়, তাদেরই একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার বলেন— এক শো টাকা বকশিশ দেব, পলুস।

পলুস বলে—বহুৎ আচ্ছা স্যার।

কে না জানে, কলঘরের বড় মিস্তিরি এই পলুস হালদার এর আগে তিনবার এই খাদেরই তিনটে দুর্ঘটনায় রেস্কু্যর কাজ করেছে। তিনবার বকশিশ পেয়েছে কলঘরের বড় মিস্তিরি পলুস হালদার। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সুড়ঙ্গের ঢালু ধরে খাদের গভীরে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে নেমে যেতে থাকে পলুস আর রেস্কু্য দল !

দখিনা সুঁদের মুখের কাছে এক জায়গায় জড়সড় হয়ে বসে ছিল যারা, তারা হলো জামুনগড়ার তিনজন দেহাতী মালকাটা। হাওয়ার ঝটকার চোট বুকে পিঠে লেগেছিল, হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। তাই মুখের এখানে-ওখানে চাম ছড়ে গিয়েছে, জখমগুলি সাংঘাতিক কিছু নয়। জখমের চেয়ে ওদের হতভম্ব চোখ আর মুখগুলি বেশি করুণ। এক হাতে নেবানো ঢিবরি আর অন্য হাতে গাঁইতা ধরে যেন একটা আতঙ্কের ভারে অনড় হয়ে বসে ছিল ওরা।

পেঁছে যায় রেস্কু্য দল ; কলঘরের বড় মিস্তিরি পলুস হালদার, তিনজন মেশিন খালাসী, তিনজন কুলী মেট আর কম্পাউণ্ডার। রেস্কু্য দলের হাঁক-ডাকে চমকে ওঠে তিন মালকাটা। উঠে দাঁড়ায়, জল খায়, তারপর হাঁপ ছেড়ে হাসতে থাকে। একজন কুলি মেটের হেপাজতে তিন মালকাটাকে খাদের বাইরে রওনা করিয়ে দিয়ে সুঁদের ভিতরে টর্চের আলো ছোঁড়ে পলুস।

বিপদ যত ভয়ানক বলে মনে হয়েছিল, তত ভয়ানক নয়। গ্যাসে আগুন লেগেছে বলে মনে হয় না। বোধহয় সুঁদের ছাদের শেষ দিকটা ধসেছে ; তাই প্রচণ্ড হাওয়ার ঝটকা ছুটে গিয়েছে।

কিন্তু আর একটা মালকাটা কোথায় ? গ্যাসে জখম হয়ে সুঁদের ভিতরে কোথাও পড়ে আছে কি।

উপর থেকে তিনটে টবগাড়ি জলে ভরা বড় বড় ড্রাম নিয়ে নেমে আসে। তিন মেশিন খালাসী একসঙ্গে হাত লাগিয়ে পাম্প চালায় ; হোস পাইপ হাতে তুলে নিয়ে সুঁদের ভিতরে জলের ফোয়ারা ছড়াতে থাকে পলুস হালদার।

—গ্যাস মরে এসেছে বোধহয়। বিড়বিড় করে কম্পাউণ্ডার।

—না মরলেও এই গ্যাসের তেজ নাই মনে হয়। ফিসফিস করে একজন কুলি মেট।

—তোমরা এখানে থাক। আমি একটুক তল্লাস করে দেখি। ভেজা গামছা নাকের কাছে ধরে রেখে, আর টর্চ হাতে নিয়ে সুঁদের ভিতরে এগিয়ে যায় পলুস। একশো টাকা বকশিশের সবটুকু পেতে হলে যে সাহস আর বুদ্ধি দরকার, তার সবটুকু কলঘরের বড় মিস্তিরি এই পলুস হালদারের আছে।

টর্চের আলো ছড়িয়ে দেখতে থাকে পলুস। না, কোন জখমী মালকাটার শরীর সুঁদের ভিতরে কোথাও পড়ে নেই। মাঝে মাঝে ভিতরের দিক থেকে গুম গুম শব্দ, আর ছোট ছোট হাওয়ার ঝটকা ছুটে আসছে। তবে কি ছাদের ধসে চাপা পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল মানুষটা?

গ্যাসের তেজ নাই ঠিকই; আরও ভিতরে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পলুস। কী আশ্চর্য, পলুসের পায়ের কাছেই পড়ে আছে একটা ঢিবরি। দেখে খুশি হয় পলুস। না, ধস চাপা পড়ে নি বোকা মালকাটা; এতদূরে যখন পালিয়ে আসতে পেরেছে, তখন এদিকেই কোথাও না কোথাও পড়ে আছে। সুঁদের গায়ের ডাইনে বাঁয়ে টর্চের আলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখতে থাকে পলুস; তারপর একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেয়ে একটা মানুষের হাত চেপে ধরে।

যেন কালো পাথরের হাত-পা দিয়ে তৈরি একটা মজবুত চেহারার লোক, কয়লার গুঁড়োতে চোখ মুখ ছেয়ে গিয়েছে; সুঁদের গায়ে হেলান দিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে, চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁইতাটাকে তবু শক্ত করে এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে লোকটা। লোকটার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

লোকটার মুখের উপর টর্চের আলো স্থিস্থির করে ধরে রেখে, ভেজা গামছা দিয়ে লোকটার চোখ নাক মুখ মুছে দিতে থাকে পলুস: ডর নাই, কথা বল মালকাটা।

লোকটার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে পলুস। তারপর চমকে ওঠে, দু পা পিছিয়ে সরে যায়।

লোকটার নাক মুখ চোখ থেকে কয়লাগুঁড়োর আবরণ ভেজা গামছার জলে ধুয়ে যেতেই ফুটে উঠেছে একটা চেনা মুখ। এই তো সেদিন, এক জঙ্গলের নিভৃতে ঘোর কালো রাতের অন্ধকারে একটা গাছের কাছে পলুসের হাতের এই টর্চেরই আলোর ঝাঁজ সহ্য করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এই মুখটা; এরই নাম দাশু ঘরামি, পলুসের দয়ায় আর ক্ষমায় যে মানুষটার প্রাণ বার বার দুবার অনেক শাস্তির মার থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছে। এই লোকটা আজও মুরলীর মত নারীর জীবনের মরদ হয়ে আছে। মুরলীর দুর্ভাগ্য; আর পলুস হালদারের বুকের সেই দুর্বার পিয়াসেরও দুর্ভাগ্য।

দাশুর কাছে এগিয়ে এসে, দাশুর দু কাঁধের উপর হাত রেখে আর শক্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে ওঠে পলুস—মধুকুপির দাশু ঘরামি বটে কি?

চোখ মেলে মিটমিট করে তাকায় দাশু। জোরে জোরে দুবার নিঃশ্বাস টানে; তারপর চোখ বড় করে একটা নিথর ও অপলক দৃষ্টি তুলে পলুস হালদারের ছায়াময় অস্পষ্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর থরথর করে কেঁপে ওঠে। এখানেও পলুস হালদার! দাশুর জীবনের সেই অভিশাপের মূর্তি!

পলুস হাসেঃ মুরলীর মরদ, মধুকুপির কিষাণ এখানে কেন? কী অদ্ভুত পলুসের এই হাসির শব্দ! কিষাণের ঘরের সাধ আর শান্তির শত্রু হাসছে। দো-আঁশ মাটির আর সবুজ ক্ষেতের শত্রুটা কথা বলছে। মধুকুপির মাদল-ঝুমুরের শত্রু সেই পলুস হালদার দাশুর ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করছে। পরম জয়ের আনন্দে হি-হি করে হাসছে কালো নরকের দানব। দাশুর বুকের ভিতর থেকে যেন এক ঝলক তপ্ত রক্ত উথলে উঠে দাশুর চোখের উপরে ছড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে রক্তপিপাসু নেশার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে।

গাঁইতার হাতল দুহাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে আর-একবার কেঁপে ওঠে দাশু। তারপর একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেয়ে পলুসের মাথা লক্ষ্য করে গাঁইতা তোলে।

—এ কি? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে সরদার? পলুসের হাসিটা করুণ আর্তনাদ হয়ে কেঁপে ওঠে। পলুসের হাতের টর্চও থরথর করে কাঁপে। কিন্তু দাশুর গাঁইতার মুখটাও চিকচিক করে একটা শাণিত হাসি কাঁপাতে থাকে। দাশুর হাতের বধির গাঁইতা পলুস হালদারের এই আর্তস্বরের আবেদন যেন শুনতেই পায় নি। পলুসের মাথার উপর লাফিয়ে পড়ে একটা কোপ দিয়ে কাঁচা রক্তের ফোয়ারা পান করার জন্য দুরন্ত পিপাসার আক্রোশ নিয়ে আবার দুলে ওঠে গাঁইতা।

চেঁচিয়ে ওঠে পলুস—তুমি আমাকে মারবে কেন সরদার? ভুলে যাও কেন, আমি তোমাকে কত দয়া করেছি, তোমাকে কত সাজার ভয় থেকে বাঁচিয়েছি। আমি যে তোমার জখমের রক্ত এখনই নিজের হাতে মুছে দিয়েছি।

দয়া! পলুস হালদারের এই দয়াই যে দাশু ঘরামির অদৃষ্টের সবচেয়ে কঠোর সাজা। আর সহ্য হয় না এই দয়া। দাশুর নিশ্বাসের শব্দ আরও রুষ্ট হয়ে ঘড়ঘড় করতে থাকে। গাঁইতাটাকে একবার নামিয়ে নিয়ে আবার পলুসের মাথার উপর কোপ দেবার জন্য তুলে ধরে আর লাফিয়ে ওঠে দাশু।

—দয়া কর সরদার। পলুসের বুকে ভিতর থেকে আরও করুণ ও আরও ভীরু স্বরের একটা আবেদন ঠিকরে বের হয়ে কাতরাতে থাকে।

দয়া চাইছে পলুস হালদার। দাশু ঘরামির জীবনকে বার বার দয়া করে নিষ্ঠুর দেমাকের বিষে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে পলুস হালদারের জীবনের যে অহংকার, সেই অহংকার এইবার দাশুর মুখের দিকে ভিক্ষুকের মত তাকিয়েছে।

দাশুর হাতের গাঁইতা যেন পলুসের ভীরু প্রাণের প্রার্থনার শব্দ শুনে লজ্জায় পড়ে; নেতিয়ে পড়ে গাঁইতা। গাঁইতাটাকে মাটিতে নামিয়ে একহাতে

অলসভাবে শুধু একটু ছুঁয়ে ধরে, আনমনার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে পলুস। আর, গাঁইতাটাকে হাতে তুলে নিয়েই পিছনে সরে যায়, কয়লার ধুলোর উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁতে ঘষে চেঁচিয়ে ওঠে—কিষাণের বাচ্চা কিষাণ!

দুহাত দিয়ে নিজেরই চুলের ঝুঁটি খিমচে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু।

—দাগী, ডাকু, চোট্টা, দেহাতী ভিক্ষুক! পলুসের মুখের এক-একটা গালির গর্জন যেন দাশুর বুকের উপর গাঁইতার কোপ মারতে থাকে।

দাশুর লাল চোখ দুটোও যন্ত্রণায় কুঁচকে যেতে থাকে।

—তোকে আমি এখানে মেরে এখানেই পুঁতে দিতে পারি। একটা লাথি মেরে এক রাশ কয়লার ধুলো দাশুর গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে পলুস।

—তাই দাও না কেন। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—না।

—কেন?

—মুরলীকে বুঝাতে চাই, তুই কত ছোট আর আমি কত বড়।

—তাতে তোমার লাভ কি?

—তাতে মুরলী আমার হবে।

—কি?

—হ্যাঁ। তোর ঘরে থুক ফেলে দিয়ে মুরলী আমার কাছে ছুটে আসে কিনা দেখি।

—তুমি কি চাও যে, মুরলী তোমার কাছে চলে আসুক?

—চাই।

—মুরলীকে সে কথা বল না কেন?

—বলেছি।

—কি বলে মুরলী?

—একবার বলে যাব, একবার বলে যাব না। কাছে ডেকে নিয়ে কোমর ছুঁতে দেয়, আবার চোর বলে গালিও দেয়। মুরলীকে আমি চিনে নিয়েছি সরদার। লাফ দিবার আগে একটুক ছটফটিয়ে নিচ্ছে মুরলী। দেখ নাই কি, সোতের জলে লাফ দিবার আগে হরিণগুলা কেমনতর ছটফট করে?

বলতে বলতে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস। সেই ভয়ানক হাসির প্রতিধ্বনি সুঁদের পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি খেয়ে আর গুমরে গুমরে গড়াতে থাকে। আর দাশুর লাল চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে মড়ার চোখের দৃষ্টির মত ঘোলা হয়ে যায়। যেন একটা অন্তহীন শূন্যতার দিকে তাকিয়ে দাশুর চোখ দুটো গলে গলে ঝরে যাচ্ছে। না; মুরলী নেই। পলুস হালদারের হাতের ছোঁয়া কোমরের উপর বরণ করে কবেই মরে গিয়েছে মুরলী।

না না না, অসম্ভব। মহেশ রাখালের মেয়ের প্রাণ এত কপট হতে পারে না। দাশুর বুকের কাছে শুয়ে দাশুর ছেইলার প্রাণ বরণ করে নিয়েছে যে মুরলী,

তার কোমর পরের লোভের ছোঁয়া যেচে নিতে পারে না। যতই হিসেব করে হাসুক কাঁদুক মুরলী, হিসেব করে দাশুর ভালবাসার চোখে এমন ভয়ানক ধুলো দিতে পারে না।

—তুমি মিথ্যুক বট হালদার। হুংকার দিতে চেষ্টা করে দাশু। কিন্তু পারে না। গলার স্বর জড়িয়ে যায়, আর বুকটা হাঁসফাঁস করে।

—তুমি একটা গাঁওয়ার বট দাশু। পলুসের ঠাট্টাও হুংকার দিয়ে বেজে ওঠে।

কেঁপে কেঁপে হাঁপ ছাড়ে দাশু; চওড়া বুকটা যেন সব নিঃশ্বাস হারিয়ে চুপসে যায়। না, পলুসের এই ঠাট্টার হুংকার মিথ্যা হুংকার নয়। জাতপঞ্চও যে ঠিক এই রকম হুংকার দিয়ে মুরলীর কোমরের দুর্নাম ঘোষণা করেছে। দাশুর চোখ দুটোও যে স্পষ্ট করে দেখেছে, পলুসের নাম শুনলেই মুরলীর চোখের তারা দুটো ছটফট করতে থাকে। তবে আর এই মিথ্যা লড়াই লড়ে হয়রাণ হওয়া কেন?

তবু বিড়বিড় করে দাশু: তুমি যা খুশি বল হালদার। মুরলী না বললে আমি বিশ্বাস করবো না। দুনিয়া বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। আমি মুরলীকে শুধাবো।

—আর কবে শুধাবে? গাঁইতাটা কাঁধে তুলে আর দাশুর চোখের উপর টর্চের আলো দুলিয়ে আবার হেসে ফেলে পলুস।

দাশু—আমি আজই এই কয়লাখাদের নরক ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে চলে যাব।

—যেতে দিলে তো যাবে?

—কি বললে?

—তোমাকে যে আজই গোবিন্দপুর থানাতে যাওয়া করাবো। তুমি গুপী লোহারের সাকরেদ বট; তুমি আমাকে খুন করতে গাঁইতা উঠিয়েছিলে। এত শক্ত পাপীকে আর মাপ করা চলে না। তোমার ফাঁসি যদি না হয়, তবু তো দশ বছরের শক্ত কয়েদ হবে।

—যা ইচ্ছা হয় কর হালদার, কিন্তু আমাকে একবার গাঁয়ে যেতে দাও।

—কেন?

—মুরলীকে একবার শুধাতে চাই।

—মুরলীকে শুধায়ে কি হবে?

—জেনে নিব, কি চায় মুরলী।

—যদি বলে পলুসের ঘরে যেতে চাই?

—তবে পলুসের ঘরে যাবে মুরলী।

—তুমি যেতে দিবে?

—দিব।

—তোমার কপালবাবার নামে কিরা কর।

—কপালবাবার নামে কিরা করছি হালদার। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—তবে এসো। আমিও কসম করছি, তোমার নামে থানাতে এজাহার দিব না।

টর্চের আলো ফেলে আগ আগে চলতে থাকে কলঘরের বড় মিস্তিরি পলুস হালদার। আর, পলুসের ছায়ার পিছু পিছু দাশু। আশার পিছু পিছু একটা হতাশা। জয়ের পিছু পিছু একটা পরাজয়। ব্যস্ততার পিছু পিছু একটা ক্লান্ততা।

—চল বাপ। আর এ গাঁয়ে থাকবো না। এখানে থাকলে তোমার বেটির জান মান আর সুখ কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মুরলী; আর মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ো মহেশ রাখাল: চল, চল, এখনই চল।

ভুবনপুর ফাঁড়ির চৌকিদার ঝালদাতে গিয়ে যখন খবর দিয়েছিল, তখন ঠিক বুঝতে পারে নি মহেশ রাখাল, এই খবরের অর্থ কি? যে মেয়ে এই পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও বাপের বাড়ি আসবার কথা মনেও করে নি, সে মেয়ে আজ বাপকে ডাকে কেন? বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে চাইছে, তাই বা কি করে হয়? এই মুরলীই যে বার বার তিনবার মহেশ বুড়াকে মধুকুপির এই ঘরের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে: না আমি যাব না। যতদিন না সরদার ঘরে ফিরে আসে, ততদিন এঘরেই থাকবো। মেয়ের সেই দেমাকের কথাগুলি আজও মহেশ রাখালের মনে পড়ে।

কিন্তু আজ আর এক মুহূর্তও মধুকুপির আলোছায়ার ছোঁয়া সহ্য করতে পারছে না মুরলী। যার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষায় ছিল মুরলী, সেই দাশু কিষাণের ছায়াকেও ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার জন্য ছটফট করছে মুরলীর প্রাণ। কেন? জানতে পেরেছে মহেশ রাখাল, দাশু কিষাণ মানুষ নয়; দাশু একটা দাগী। মুরলীর কপালের সুখ মরাতে চায়। মুরলীর পেটের ছেইলাকে বাঁচিয়ে রাখবারও মুরোদ নাই। আর, দাগীর ঘরণীর গতর লুঠ করবার জন্য শয়তানের লোভ রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি এসে ঘরের দরজা ভাঙতে চায়।—চল চল, এখনই চল! আবার চেঁচিয়ে ওঠে মহেশ রাখাল।

ভুবনপুর থেকে যে গো-গাড়িতে চড়ে মধুকুপি এসেছে মহেশ রাখাল, সেই গো-গাড়ি সড়কের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বড়কালুর গায়ে বিকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আর দেরি করবার সময় নেই। দেরি করা উচিতও নয়। রামাই দিগোয়ার নামে সেই শয়তানের চর যদি হঠাৎ এসে যায়, তবে মুরলীর এত কষ্টের চালাকিটা আবার বিপদে পড়বে।

সেলাইয়ের কল, টিনের তোরঙ্গ, সুতোর নক্শা আর লেসের গাঁটরি, আয়নাটা আর চিরুনিটাও, আর গোটানো জড়ানো বিছানাটা; মুরলীর নিজের রোজগারের যত গৌরব আর আশাময় ভাগ্যের যত উপহার এক এক করে তুলে নিয়ে গো-গাড়ির ভিতরে রাখে মহেশ রাখাল। জামকাঠের জীর্ণ কপাট ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় মুরলী। মুরলীর নীল রঙের রেশমি শাড়ির চুমকি বিকালের রোদের আলোতে ঝিকমিক করে হাসে।

কিন্তু চমকে ওঠে মুরলী। এ কি! সড়কের উপর এত মানুষের ভিড় কেন? কি ভেবেছে ওরা? যেন মুরলীর মুক্তির পথ আটক করে গেঁয়ো মধুকুপির একটা মতলব শক্ত হয়ে সড়কের উপর দাঁড়িয়েছে। তাই কি? ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

সব চেয়ে আগে চেঁচিয়ে ওঠে সনাতন লাইয়াঃ দাশু দাদা ঘরে নাই; আর সরদারিন ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে; এটা কেমন কাণ্ড বটে?

গরুচরানি মেয়েগুলি ফিকফিক করে হাসে। ফুলকি মাসী, পল্টনী দিদি আর তেতরি ঘাসিনের চোখ ধিকধিক করে জ্বলতে থাকে। ছিয়া ছিয়া ছিয়া। ভিড়ের মুখে মুখে একটা চাপা ধিক্কারের রব ফিসফিস করে।

মহেশ রাখাল হুমকি দেয়ঃ আমার বেটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি; তাতে তোমাদিগের কি? তোমরা এখানে ভিড় কর কেন?

মহেশ রাখালের চোখের সামনে এগিয়ে এসে রোগা চেহারাটাকে একেবারে ক্ষেপিয়ে নিয়ে একটা গর্জন করে জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতনঃ এই গাঁ মধুকুপি বটে, ঝালদা নয়। এখানে তোমার বেটি তোমার কেউ নয়; আমার গাঁয়ের বউ। দাশুর ঘরণীকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না।

—নিয়ে যাব। মহেশ রাখাল চিৎকার করে।

—যেতে দিব না। বড় বুড়া রতনের গর্জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভিড়ের গলাও চেঁচিয়ে ওঠে। সড়কের পাশের বাঁশঝাড়ও কটকট শব্দ করে দুলতে থাকে।

মুরলীর মুক্তির পথে বাধা। সেই বাধা নিরেট হয়ে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। বিকাল ফুরিয়ে আসে। বড়কালুর মাথার পিছনে সূর্য ডুবে যায়। সন্ধ্যার আবছা আঁধারের সঙ্গে ডাঙার বুকের বাতাসও ঠাণ্ডা হয়ে ফুরফুর করে। তবু ভিড় নড়ে না।

হঠাৎ সব হল্লার রব শান্ত হয়ে যায়। ভিড়ের মুখগুলি নীরব হয়ে আর চোখগুলি অপলক হয়ে দেখতে থাকে, সড়কের একটার পর একটা নিমের কালো ছায়া পার হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসছে দাশু।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কের গো-গাড়ির দিকে একবার, আর মহেশ রাখালের মুখের দিকে একবার তাকায়। দাশুর চোখে কোন ভ্রূকুটি নেই; শুকনো শ্রান্ত উদাস মুখের উপর কোন আক্ষেপ আর কোন আক্রোশ নেই।

মুরলীর দিকে তাকায়; আর এগিয়ে গিয়ে একেবারে মুরলীর চোখের সামনে দাঁড়ায় দাশু। মুরলীর সরু কোমরে রেশমি শাড়ির ঘের রঙীন পালকের মত কাঁপছে আর দুলছে। দাশুর চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত শান্ত হাসির শিহর খেলতে থাকে।

—আমি তোকে শুধাতে এসেছি, মুরলী। মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে এই সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাসের চেয়েও মৃদুস্বরে কথা বলে দাশু।

—কি?

—এই ঘরে থাকবি না?

—না।

—কার ঘরে যেতে চাস? পলুসের ঘরে?

—হ্যাঁ।

—পলুসকে কোমর ছুঁতে দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—এতদিন কেন বলিস নাই?

—বলবার দরকার হয় নাই।

—ভাল কথা।

—আর কি শুধাতে চাও?

—কিছু না। আমার ছেইলা তোর কাছে আছে, মনে রাখিস। আমাকে ছাড়লি, কিন্তু ওকে ছাড়িস না।

—কেন ছাড়বো? ছেইলা কি আমার নয়?

—নিশ্চয়। ভুঁইসাল ভাই বড় ঠিক কথাটি বলেছিল।···আচ্ছা।

দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে দাশু। কিন্তু তখনি আবার ফিরে আসে। দাশুর হাতে কেঁদকাঠের একটা কুচকুচে কালো লাঠি। লাঠি দুলিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দাশুও যেন প্রচণ্ড এক মুক্তির আনন্দে মরিয়া হয়ে হাঁক ছাড়েঃ জাতপঞ্চ শুনে যাও।

হুড়মুড় করে দৌড়ে এসে সড়কের ভিড়টা ঘরের দরজার কাছে জড়ো হয়। ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে দাশুর এই বিকট আনন্দের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে মুরলী। মহেশ রাখালের বুক দুরদুর করে কাঁপতে থাকে।

—মহেশ রাখালের বেটি আমার ঘর করবে না, পঞ্চ। ওকে চলে যেতে দাও। পঞ্চের কাছে আবেদন করে দাশু।

সনাতন লাইয়া চেঁচিয়ে ওঠেঃ তবে এখনি সিঁদুর মাটি করুক মহেশ রাখালের বেটি।

বড় বুড়া রতন হাঁক দেয়—তবে এখনি পাতপানি চিরে ফেল, দাশু।

গরুচরানি মেয়েগুলি চেঁচায়—ওর হাতের বালা এখনি ভেঙে দাও, দাশু দাদা।

লাল গালার বালা আছে যে হাতে, সেই হাতটা দাশুর চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে তেমনি ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। কেঁদকাঠের কালো কুচকুচে লাঠির একটি বাড়ি দিয়ে মুরলীর হাতের বালা ভেঙে দু টুকরো করে দেয় দাশু। মুরলীও সেই মুহূর্তে সেই হাত নামিয়ে আর চিমটি দিয়ে মাটির ধুলো তুলে নিয়ে সিঁথির সিঁদুরের উপর ঘষে দেয়। আর, বড় বুড়া রতন একটা পাকুড়পাতার উপর এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে পাতাটাকে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

জটা রাখাল এগিয়ে এসে বড় বুড়া রতনের কানের কাছে চেঁচিয়ে ওঠেঃ নাম বলতে হবে, নাম বলুক দাশু। তা না হলে পাতখানি চিরা হয় না।

রতন—কার নাম?

জটা রাখাল—যার সাথে নষ্ট হয়েছে সরদারিন।

—খিরিস্তান পলুস হালদার। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। আর, ভেজা পাকুড়পাতা ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেয়।

মহেশ রাখালের পিছু পিছু হেঁটে আর এগিয়ে যেয়ে গো-গাড়ির ভিতরে উঠে পড়ে মুরলী।

ভিড় ভাঙে, ভিড়ের হল্লাও মিলিয়ে যায়; তার আগে মিলিয়ে যায় গো-গাড়ির চাকার শব্দ। সন্ধ্যার অন্ধকারে মধুকুপির ডাঙা কাঁপিয়ে ঝিঁঝিঁর ডাকের যে শব্দ উথলে ওঠে, জামকাঠের দরজার কাছে বসে সেই শব্দ শুনতে শুনতে যেন নিঝুম হয়ে যায় দাশু ঘরামির শূন্য মন, ক্লান্ত প্রাণ, আর পাথুরে ছাঁদে গড়া অলস শরীরটাও।

এই শূন্যতা ক্লান্তি আর আলস্যও যে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের জ্বালায় জ্বলছে। কত সহজে, মধুকুপির সব মায়া আর সব আক্রোশ তুচ্ছ করে চলে গেল মহেশ রাখালের বেটি।

অনেক তারা ফুটেছে আকাশে। ঘরের ভিতরে ঢুকে রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা জ্বালতেই দেখতে পায় দাশু, ঘরের এক কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে টাঙ্গিটা। না; এই টাঙ্গিরও সাধ্যি হল না; মুরলীর পথ আটক করবার মত কোন জোর এই মাটিমাখা মধুকুপির প্রাণের মধ্যেই নেই। খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর গড়িয়ে পড়ে, আর দু হাত দিয়ে দুই চোখ চেপে ধরে ছটফট করতে থাকে দাশু।

হঠাৎ গুমরে ওঠে মধুকুপির রাতের বাতাস। বড়কালু আর ছোটকালুর সব পাথর একটা ভয়ানক গর্জনের প্রতিধ্বনি সহ্য করতে গিয়ে গুমু গুমু করে বাজতে থাকে। হাঁক ছেড়েছে বাঘিন কানারানী।

বেশি দূরে নয়, জঙ্গলের ভিতরেও নয়। বাঘিন কানারানীর গর্জন যেন ভুবনপুরে যাবার সেই সড়কের উপর ছুটোছুটি করছে, যে সড়কের কাঁকর মাড়িয়ে আজই কয়লাখাদের মালকাটা জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে মধুকুপিতে ফিরে এসেছে দাশু। কিন্তু, মহেশ রাখালের বেটি যে এখন গো-গাড়িতে চড়ে, নীল রঙের রেশমি শাড়িতে সাজানো গতর নিয়ে আন-মরদের পিয়াস আর পিয়ার নেবার জন্য এক ভয়ানক আশার অভিসারে ওই সড়ক ধরেই এগিয়ে চলেছে! কানারানীর হাঁক, যেন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত একটা আপত্তির হাঁক। কানারানীর হাঁকে এমন ভয়ানক রাগের ধমক কোনদিন শুনতে পায় নি দাশু।

মহেশ রাখালের বেটির অভিসারের পথ আটক করেছে কি কানারানী? আতঙ্কিত গো-গাড়িটা কি মরণভয়ে ভীরু হয়ে এক ছুট দিয়ে আবার এই পথে ফিরে এসে এই ঘরের সামনে ওই সড়কের উপর দাঁড়াবে? গো-গাড়ির ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে জামকাঠের এই জীর্ণ কপাটের উপর মাথা ঠুকে আছড়ে পড়ে করুণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠবে কি মুরলী?—কানারানী আমাকে যেতে দিলে না।

কে জানে কত রাত হয়েছে! এল কি মুরলী? সত্যিই ফিরে আসবে কি মুরলী? জানে না দাশু, অদ্ভুত এক আশার শব্দ শোনবার জন্য বন্ধ দরজার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো কখন ক্লান্ত হয়ে মুদে গিয়েছে।

বাঘিন কানারানীর হিংস্র ধমকের হাঁক আর শোনা যায় না। মানঝিপাড়ার আতঙ্কের হল্লাও অনেকক্ষণ হল ক্লান্ত হয়ে শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝিঁঝি ডাকা রাতটাও যেন নিজের ক্লান্তিতে এখন একেবারে নীরব হয়ে ঝিমোতে শুরু করেছে।

কয়লা-খাদের ধাওড়া থেকে বিদায় নেবার সময় স্থরেন মানঝির কাছে দেনার হিসাব মিটিয়ে দেবার পর বার বার দু বার স্নান করেও মনে হয়েছিল দাশুর, এই কদিনের মালকাটা জীবনের কালো ধুলো জলে ধুয়ে গেলেও বুকের ভিতর সেই ধুলো যেন ভয়ানক এক অভিশাপের ময়লার মত এখনো লেগে আছে।

মধুকুপি ফিরে যাবার পথে ভুবনপুর সড়কেরই ধারে গালা-বাজারের কাছে আবগারী ভাটিখানার বোতলা সরাব বিক্রি হয় যে লাইসেনী দোকানে, সেই দোকানের দাওয়ার উপর কিছুক্ষণ জিরোতে হয়েছিল। আর, একটু জিরোতে বসেই বুঝতে পেরেছিল দাশু, গলার ভিতর বড় পিয়াস, মাথার ভিতর বড় জ্বালা!

স্থরেনের দেনা চুকিয়ে দেবার পরও মালকাটা জীবনের সেই উন্মত্ত রোজগারের বারোটা টাকা দাশুর কোমরের গোঁজের ভিতরেই ছিল। বুকের ভিতরের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। এক টাকা খরচ করে এক বোতল সরাব গিলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল দাশু। মাথার জ্বালাকেও সেই নেশা দিয়ে শান্ত করে নিয়েছিল দাশু। সেই নেশার রেশ অনেকক্ষণ হল ক্লান্ত হয়ে দাশুর চোখে একটা স্বপ্নের ঘোর ধরিয়ে দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দাশু।

স্বপ্নটাও যেন একটা ভাদুরে বিকালের বৃষ্টি। রিমঝিম করে বাজে, আর ঝির ঝির করে ঝরে পড়ে। তারপর বড়কালুর মাথার উপরে আকাশের এপার-ওপার জুড়ে রঙিন রামধনু ফুটে ওঠে। দাশুর কাঁধের উপর ছেইলাটা, বুকের কাছে মাদলটা, পাশে পাশে মুরলী। ধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আখড়ার দিকে যেতে যেতে দাশুর মাদলের বোল ভেজা বাতাসে মিষ্টি শব্দের শিহর তুলে বাজতে থাকে—দিপির দিপাং ধিতাং ধিতাং!

দাশুর স্বপ্নের মাদল যেন আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায়। চমকে ওঠে, ঘুম ভেঙে যায় দাশুর। মনে হয়, রাতের বাতাস একটা বন্দুকের গুলির শব্দে আহত হয়ে গুমরে উঠেছে।

ঠিকই, আবার বন্দুকের গুলির শব্দ। তুবনপুর সড়কের দিক থেকে সেই শব্দের গোমরানি বাতাসে গড়িয়ে এসে আস্তে আস্তে এই মধুকুপির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

খেজুর পাতার চাটাই থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দাশু। আর একটা লাফ দিয়ে একেবারে দরজা পার হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ,

সড়কে এখনও বেশ অন্ধকার আছে, আকাশে তারা আছে। রাত ভোর হতে বাকি আছে।

ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে দু হাতে বুক চেপে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু। কার বন্দুক? কে গুলি ছাড়ল? কে মরল? কানারানী আর হাঁক দেয় না কেন?

খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর আবার গড়িয়ে পড়ে ছটফট করে দাশু। একটা ভয়ানক সন্দেহের বেদনার সঙ্গে মনে মনে লড়াই করতে থাকে। না না না, মিছা সন্দেহ। কানারানী আছে, নিশ্চয় আছে। এখনি আবার হাঁক দিবে কানারানী। ও যে বনমাতা! ও যে মধুকুপির কিষাণ দাশুকে ওর মানুষ ছেইলা বলে মনে করে। মুরলীও যে ভয় পেয়ে ওকে শাশুড়ী বলে মেনে ফেলেছিল। কিন্তু কই, সেই কানারানী আর হাঁক দেয় না কেন?

কখন ভোর হবে? ভোরের আলোর অপেক্ষায় ছটফট করতে করতে আবার কখন যে ঘুমে অসাড় হয়ে গিয়েছিল ছেঁড়া স্বপ্নের বেদনা, তাও বুঝতে পারে নি দাশু। ঘুম ভাঙে যখন, তখন বাঁশঝাড়ের মাথার উপর সকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই চমকে ওঠে দাশু।

মানঝিপাড়ার একদল লোক সামনের সড়ক দিয়ে যেন একটা উল্লাসের ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল। কিন্তু এ কি ভয়ানক কথা চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল ওরা!—কানারানী মরেছে! কানারানী মরেছে!

কলকল করে হেসে আর চেঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চলে গেল একদল গরুচরানী মেয়ে।—ডর কেনে ডরানি এল গুড়ুম ভাই, চল শিয়ালিন বিহা করবি কানারানী নাই।

মরা কানারানীর মুখ দেখবার জন্য ছুটে যাচ্ছে ওরা? তাই তো। দাশুরও পা দুটো টলমল করে ওঠে। তার পরেই যেন একটা বন্ধ আর্তনাদের জ্বালায় পাগল হয়ে ঘরের দাওয়া এক লাফে পার হয়ে সড়কের উপর এসে দাঁড়ায়। ছুটতে থাকে দাশু।

খুব বেশিদূর ছুটে যেতে হয় না। ভুবনপুর সড়কের পাশে সেই জোড়া ডুমুরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কের পাশেই ঘেসো মাঠের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে একটা গরুর গাড়ি। গাড়ির একটা গরু গোবরমাখা ধড় নিয়ে গাড়ির কাছেই পড়ে আছে, এখনও যেন মরণ আতঙ্কে গরুটা ধুঁকছে। আর, ডুমুরের ছায়ায় চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে একজন। চিনতে পারে দাশু আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে, এই তো সেই গাড়িয়াল লোকটা। আর ওই তো সেই গাড়ি, মুরলীকে মধুকুপির কিষাণের ঘর থেকে তুলে নিয়ে আন-মরদের বুকের কাছে পেঁছে দেবার জন্য কাল সন্ধ্যাতে যে-গাড়িটা যাত্রা শুরু করেছিল।

সড়কের ডাহিনে যে মাঠ, সে মাঠের শেষদিকে একটা খাত, আর খাতের চারদিকে কেঁদ ও বাবলার ভিড়। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু, সেই খাতের কাছে অনেক মানুষ জমা হয়েছে।

হাঁপ-ধরা বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ সামলে নিয়ে ফিস্ ফিস্ স্বরে প্রশ্ন করে দাশু।—কি ব্যাপার বটে গাড়িয়াল ?

উত্তর দেবার জন্য মুখ তুলেই দাশুকে চিনতে পারে আর চমকে ওঠে গাড়িয়াল লোকটা। আস্তে আস্তে বলে—বাঘিনটা মরেছে সরদার।

—কে মারলে ?

উত্তর দিতে গিয়ে আবার যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে গাড়িয়াল : কয়লা খাদের বড় মিস্তিরী, পলুস হালদার।

—সে এখানে কেমন করে এল ?

—আমি ডেকে নিয়ে এলাম।

—কেন ?

—বাঘিনটার ডরে।

—কি করেছিল বাঘিনটা ?

—সে আর শুধাও কেন ? কি করে নাই বল ? একটি থাবা মেরে গরুটাকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল আর টুঁটি ফেড়ে দিল বাঘিনটা।

সড়কের বাঁয়ে যে মাঠ, সেই মাঠের আর-এক দিকে শকুনের ভিড় একটা সাদা পিণ্ডের চারদিক ঘিরে নিরেট হয়ে বসে আছে। সেই দিকে হাত তুলে ফুঁপিয়ে ওঠে গাড়িয়াল লোকটা : হোই দেখ। এক মাসও হয় নাই সরদার, তেইশ টাকা দিয়ে গরুটাকে খরিদ করেছিলাম।

গাড়িয়ালের এই ফোঁপানির কোন করুণতার শব্দ যেন দাশুর কান স্পর্শও করে নি। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—আর কি কসুর করেছিল বাঘিনটা ?

—বুড়া মহেশ রাখালকে ঘায়েল করলে ; থাবা মেরে বুড়ার একটা হাত ছেঁচে দিলে বাঘিনটা।

—আর কি করলে ?

—যমের বেটি আমার গাড়িটার কি দশা করেছে দেখ। সে কী লাফ, কী রাগ আর কী ধমক সরদার ! এক থাবা দিয়ে গাড়ির ছাপর ভাঙ্গলে, সরদারিনের যত জিনিস কামড় দিয়ে এক-একটা আছাড় দিয়ে ছিটিয়ে দিলে। সিলাইয়ের কলটাকে লাথি মারলে।

—আর কি ?

—আমাকে ছিঁড়ে দিত যমের বেটি ; কিন্তু আমি পালাতে পেরেছিলাম, সরদার।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—সরদারিনের কি হলো বল ?

—সরদারিনের গায়ে একটা আচড়ও দাগে নাই বাঘিনটা। সরদারিন নিজেই ভয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল।

ছলছল করে দাশুর চোখ, সেই সঙ্গে সারা মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক প্রসন্নতার হাসি। দাশুর অন্তরাত্মা যেন কানারানীর এক অদ্ভুত করুণার রহস্যের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসছে। মুরলীকে ব্যথা দেয় নাই কানারানী ; ভুলে নাই কানারানী, মুরলীর পেটে যে দাশুর ছেইলার প্রাণটা ঘুমিয়ে আছে।

কানারানী। কেঁপে কেঁপে বিড় বিড় করে দাশুর ঠোঁট দুটো। গাড়িয়াল লোকটা এইবার আতঙ্কিতের মত দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে।

দাশু বলে—ওরা গেল কোথায় ?

গাড়িয়াল ভয়ে ভয়ে বলে—সে কথা বললে তুমি আমার উপর রাগ করবে না তো সরদার ?

—না।

—আমি ছুটে গিয়ে কয়লাখাদে খবর দিতেই খাদের সাহেব মটরগাড়িতে বড় মিস্তিরীকে আর আমাকে তখনি রওনা করিয়ে দিলে। মিস্তিরী বড় ভাল শিকারী বটে।

—সে আমি জানি।

—মিস্তিরী সরদারিনকে জানে বলে মনে হলো।

—হ্যাঁ, জানে।

—সরদারিনও মিস্তিরীকে···।

—কি ?

—বড় পিয়ার করে মনে হলো।

—কেমন করে বুঝলে ?

—মিস্তিরী এসেই সরদারিনকে কোলে তুলে নিলে; আর সরদারিনও মিস্তিরীর গলা জড়িয়ে ধরলে।

দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ তপ্ত হয়ে রাঙ্গী কয়লার আগুনের মত লাল হয়ে জ্বলতে থাকে। আরও ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে গাড়িয়াল লোকটা।—আর আমি কিছু বলবো না, সয়দার।

—বল গাড়িয়াল। শুনতে বড় মজা লাগছে !

—আর তেমন কিছু বলবারও নাই, সরদার। বুড়া আর বুড়ার বেটিকে মটরগাড়ি করে কয়লাখাদের হাসপাতালে রওনা করিয়ে দিলে মিস্তিরী।

—তারপর কি হলো, সেটা বল না কেন ?

—তারপর বন্দুক হাতে নিয়ে এই ডুমুরের উপর মিস্তিরী বসলে; আর ওই ডুমুরের উপর আমি।

—তারপর ?

—শেষ রাতে চাঁদ উঠলো যখন, তখন বাঘিনটা আবার এল।

—তারপর ?

—পর পর দুটো গুলি মেরেছিল মিস্তিরী। একটা গুলি বাঘিনের গলা ফুটা করে দিলে। আর একটা গুলিতে বাঘিনটার পা ভেঙে গেল।

—তারপর ?

—আর শুধাও কেন সরদার ? মরা বাঘিনকে দেখতে সাধ থাকে তবে দেখে নাও। মিস্তিরী খাদে খবর দিতে চলে গিয়েছে, এখনি খাদের লোক এসে বাঘিনের লাস বাঁশ-দড়ি করে বেঁধে গোবিন্দপুর থানায় নিয়ে যাবে। হোই যে

ওরা দেখছে দেখ।

হ্যাঁ, দেখতে সাধ আছে বইকি। আস্তে আস্তে হেঁটে মাঠ পার হয়ে কেঁদ আর বাবলার ছায়াময় ভিড়ের কাছে এসে মানুষের ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দেয় দাশু। ভাল করে দেখবার জন্য আরও এগিয়ে যেয়ে একেবারে খাতের কিনারায় এসে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়ে, বুকের ভিতরের একটা যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করে।

খাতের ভিতরে একটা কালো পাথরের উপর মাথা রেখে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে কানারানী। কাদামাখা গোঁফ নেতিয়ে পড়েছে। লেজ দিয়ে ভাঙা পা জড়িয়ে ধরে রেখেছে, কানা চোখের উপর পিঁচুটি জমে রয়েছে। একটা বোলতা কানারানীর শিথিল চোয়ালের উপর সুড় সুড় করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মরবার আগে বোধহয় কাঁকরের উপর খুব জোরে মুখ ঘষেছিল কানারানী, তাই মুখটা পানখাওয়া মুখের মত লাল হয়ে রয়েছে। গলার ফুটো থেকে ঝরে পড়া রক্ত লাল কাদার মত পাথরের উপর পড়ে আছে।

কাঁধের গামছা হাতে তুলে নিয়ে বার বার চোখ মোছে দাশু। একটা বুড়ি সাধুনীর শান্ত ও উদাস মুখের মত দেখতে কানারানীর এই মুখটা। সাধুনীটা যেন ভীরু সংসারের যত হিংসুটে সোরগোল আর ঝামেলা থেকে পালিয়ে এসে কেঁদ-বাবলার ঘন ছায়ার এই ঠাণ্ডা শান্তির মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে।

না, আর কিছু দেখবার নেই। লোকের ভিড়, আর বাবলা ও কেঁদের ছায়ার ভিড়ের কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে যায় দাশু!

রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা মিটি মিটি জ্বলে। উনানের আগুন চিড়চিড় করে। একলা ঘরের ভিতরে শুধু নিজের ছায়াটাকে সঙ্গে নিয়ে মকাইয়ের ঘাট্টা রাঁধে দাশু। তার আগে ছোট হাঁড়ি মুখের কাছে তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে হাঁড়িয়া মদ গিলে নেয়।

নেশা দিয়ে একটা আশাকে যেন জীইয়ে রাখতে চায় দাশু। একদিন নিশ্চয় ফিরে এসে এই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াবে মুরলী, আর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলবে। আশার ছবিটা মাঝে মাঝে যেন কথা বলে ফেলে : এই দেখ সরদার ; তোমার ছেইলাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

রেড়ির তেলের মেটে বাতি নিবিয়ে দিয়ে নেশাতুর চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে গিয়ে আরও একটা আশার ছবি দেখতে থাকে দাশু। ডরানির ধারে পাঁচ বিঘা ভাল দো-আঁশের কানালি কিংবা গরাঙ্গি। ধান ফলেছে। সব্জী ধরেছে। সব্জীক্ষেতের গুলঞ্চের বেড়ার উপর বসে কালা কোকিল ডেকেই চলেছে। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে মুরলী।—কবে এমন ভাল ক্ষেত জোত করলে আর সব্জী ফলালে গো ছেইলার বাপ?

তাই তো হবে ; মুরলীর ঐ লোভী আশার হাত দুটো কি চিরকাল পলুস মিস্তিরীর গলা জড়িয়ে ধরে থাকতে পারবে? ক্লান্ত হবে না কি হাত দুটো?

দেখা যাক্, কতদিন মিস্ত্রিরির ঘরের সুখের স্বাদ ভাল লাগে মুরলীর ?

হ্যাঁ, ঈশান মোক্তারের কাছ থেকে পাঁচ বিঘা দো-আঁশ নিতেই হবে। জাতপঞ্চের সভা ডেকে বলতে হবে, ঈশান মোক্তার কেন আমাদিগে শুধু মনিষ খাটাবে, পঞ্চ ? বিনা নজরানায় জমি বন্দোবস্ত দিবে না কেন ? জমি নিব, জমি নিয়ে ছাড়ব।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে জমিহারা জীবনের এই নতুন প্রতিজ্ঞার জ্বালাটা নেশার আবেশে নরম হয়ে হেসে ওঠে। কিষাণের ঘরের সুখের খবর পেয়ে আবার ফিরে এসে এই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে মুরলী। বলছে মুরলী —আমাকে কি আর ঘরে নিবে না সরদার ? আমি যে তোমার মুরলী বটে গো।

দাশু কিষাণের জীবনের অহংকার ধন্য হয়ে যায়।—দেখলি তো, বলেছিলাম কিনা, এই ঘরেই অনেক সুখ হবে, অনেক মাদল বাজবে···।

দিপির দিপাং, ধিতাং ধিতাং! সত্যিই যে মাদল বাজছে। ধড়ফড় করে উঠে বসে আর ভাঙা ঘুমের চোখ ঘষে দাশু।

ভাদ্রের সকালবেলার রোদ মধুকুপির ক্ষেতের বুকে ঝলমল করে। করম এসেছে। আখড়াতে মাদল বাজছে। করম গাছ ঘিরে ঝুমুর নাচের আসর এই সকালেই মত্ত হয়ে উঠেছে। গান গেয়ে উঠেছে মধুকুপির মাটিমাখা প্রাণ। হলুদ-ছোপানো শাড়ি, আর খোঁপাতে ধানের শিষ ; করম পুজতে আর ঝুমুর নাচতে দলবেঁধে চলে যাচ্ছে গরুচরানী মেয়েগুলি !

কিন্তু এত হাসে কেন ওরা ? ঝুমুর গেয়ে বৃষ্টি ডাকবে, আর নেচে নেচে খুব সোহাগে ঢলে ঢলে হাত তুলে জল ছিটিয়ে করমের হাঁড়ির মাটিতে বীজ কলাবে মেয়েগুলি ; কোমর দুলিয়ে ধানের আঁটি মাথায় তুলে নিবার সাধও দোলাবে ; কিন্তু জমি কই ? আপন জমি না হলে যে এই নাচ নেশা আর গানেতে মনের সুখ ভরে না।

তবু দাশুর প্রাণটা আজ আর একলা হয়ে পড়ে থাকতে চায় না। একটা মাদল হাতে নিয়ে মধুকুপির এই উৎসবের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।—কিন্তু ও কে বটে ? এদিকপানে ছুটে আসে কেন ?

সড়কের নিমগছের ছায়ার দিক থেকে ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে, আর একেবারে দাশুর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে সনাতন।

খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—আমাকে একটা মাদল দিবে সনাতন ?

সনাতন হাসে—তা দিব। কিন্তু দুখনবাবু আবার জাতপঞ্চকে ডেকেছে। তুমি যাবে কি ?

—কেন ?

—রাগ করেছে দুখনবাবু ; গাঁয়ের বউ বেটি বহিন করমে যদি নাচে, তবে জাত ভাগ করবে দুখনবাবু।

—কি করবে দুখনবাবু ? ভ্রূকুটি করে দাশু।

—আর একটা পঞ্চ করবে দুখনবাবু। যাদিগের বউ বেটি বহিন নাচবে, তাদিগের ভাত-ভাইয়ারিতে আসবে না দুখনবাবু।

দাশুর ভ্রূকুটিও আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। মধুকুপির প্রাণের এত রকমের শত্রুও ছিল!—চল। দাঁতে দাঁত চেপে, একটা আক্রোশ চাপতে চাপতে সনাতনের সঙ্গে চলতে থাকে দাশু।

পিপুলতলার ছায়ার কাছে মধুকুপির মনিষদের সমাবেশ আজকের উৎসবের দিনেও বেশ একটু বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। মনে হয়, উৎসবের আনন্দটা হঠাৎ আহত হয়েছে, যদিও মনিষদের সাজের মধ্যে রঙিন উৎসবের ছিটেফোঁটা দেখা যায়। কারও কারও কোমর হলুদ-ছোপানো গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মনে হয়, করমের নাচে যাবার জন্য ওরা মাদল হাতে নিয়ে মাত্র তৈরি হয়েছিল। কারও কারও রুক্ষ চুলের উপর তেলের প্রলেপ পড়েছে। স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে কালো কোঁকড়া চুলের রাশ। দু-চার চুমুক হাঁড়িয়ার পাতলা নেশার আবেশও কারও কারও চোখে এই সকালেই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সকলেই জানে, রাগ করেছে দুখনবাবু।

নিকটেই যে বনচণ্ডীর মন্দির, তারই কাছে ঝুমকো জবার গা ঘেঁষে একটি চৌকির উপর বসে আছেন যিনি, তিনিই হলেন বনচণ্ডীর সেবাইত চক্রবর্তী। আজকের জাতপঞ্চের সভার দিকে তাকিয়ে চক্রবর্তীর চোখ দুটোও কি-যেন আশা করে রয়েছে।

সভার একেবারে মাঝখানে একটি চারপায়ার উপর বসে আছে দুখনবাবু। আর জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতন তার শীর্ণ শরীরটাকে কুঁকড়ে নিয়ে সভার এক কোণে অসহায়ের মত বসে আছে।

সভার কাছে এসে দাঁড়ায় সনাতন লাইয়া, তার পিছনে দাশু। দাশুর মুখের দিকে একবার আড়চোখের দৃষ্টি হেনে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায় দুখনবাবু।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু: জাতপঞ্চের সভায় দুখনবাবু চারপায়ার উপর বসে, আর বড় বুড়া রতন মাটির উপর বসে কেন? তুমি চারপায়া থেকে নেমে যাও দুখনবাবু।

—কেন নামবো? দাঁতে দাঁত ঘষে দাশুর মুখের দিকে তাকায় দুখনবাবু।

দাশু বলে—জাতপঞ্চের সভায় চারপায়ার উপর যদি কেউ বসে, তবে বড় বুড়া রতন বসবে। তুমি না, আমিও না।

দুখনবাবু—ঈশান মোক্তারের কুঠিতে তোমরা যখন কাজ মাগতে আস, তখন তোমাদের বড় বুড়া কোন্ চারপায়াতে বসে হে?

দাশু—কুঠিতে তুমি বড় গুমস্তা বট। সেথা তুমি চারপায়াতে বসবে, আর মনিষেরা ভুঁইয়ের উপর বসবে। কিন্তু, জাতপঞ্চের সভায় তুমি জাতের মানুষ বট। হেথা বড় বুড়ার মান তোমার মানের চেয়ে বড়। তুমি চারপায়া থেকে নেমে যাও, আর ভুঁইয়ের উপর বস।

দাশুর মুখের দিকে আর একবার কটমট করে তাকিয়ে চারপায়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দুখনবাবু। কিন্তু ভুঁইয়ের উপর বসে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় জটা রাখাল ও আরও কয়েকজন। বাবু দুখন সিংহের উপর এই অপমানের আঘাত সহ্য করতে গিয়ে ওরা ব্যথিত হয়েছে। দাশুর মুখের দিকে রুষ্টভাবে তাকিয়ে কি-যেন বলতে চেষ্টা করে জটা রাখাল। দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ।

বড় বুড়া রতন তার শীর্ণ শরীরটাকে টান করে উঠে দাঁড়ায়, যেন নতুন মান পেয়ে বড় বুড়ার বিমর্ষ প্রাণটা হঠাৎ বলীয়ান হয়ে উঠেছে। বড় বুড়া বলে—কেন জাতপঞ্চ ডেকেছ, সেই কথাটা বলে ফেল দুখনবাবু।

দুখনবাবু—সেদিন যে-কথা বলেছিলাম, আজ আবার সে-কথাই বলছি। জাতের সুধার চাই।

দাশু—সেটা কি বটে?

দুখনবাবু—গাঁয়ের বউ বেটি বহিন করমে নাচবে না।

দাশু—নাচবে।

দুখনবাবু—তবে জাতের সুধার হবে কেমন করে বল? যদি বামন না মান, যদি বনচণ্ডীর পূজো না কর, যদি বেটি-বহিনের বিয়া দিতে লাজের বয়স পার করে দাও, তবে জাতের ভাল হবে না, পঞ্চ।

দাশু—জাতের ভাল হবে দুখনবাবু, যদি তুমি জাতের একটা কথা মান।

—কি কথা?

—জাতের মানুষকে জমি পাইয়ে দাও।

—জমি! চেঁচিয়ে ওঠে দুখনবাবু।

দাশু—হ্যাঁ; তোমার জাতের মানুষ ঈশান মোক্তারের জমিতে শুধু মনিষ খাটে, তাতে তোমার কি দুখ হয় না? যত ভাল ভাল দো-আঁশ আর দুই-ফসলী মাটিতে আমাদিগে মনিষ খাটাবে ঈশান মোক্তার, আর ভাগজোত করতে দিবে যত টাঁড় জমি; এটা কেমনতর বিচার বটে?

দুখনবাবু—কি চাও তোমরা?

দাশু—আমরা আর মনিষ খাটবো না। আমরা ভাল জমি ভাগজোত করবো। কুঠি বীজ লাঙ্গল দিবে।

দুখনবাবু—নজরানা?

দাশু হাসে—তোমার গরীব জাতভাই নজরানা দিতে পারে কি দুখনবাবু? তুমি কি সেকথা জান না?

দুখনবাবু হেসে ফেলে—গরীব হয়ে গরীবের মত কথা না বলে ডাকাইতের মত কথা বলছো কেন?

দাশু—আমাদিগে তুমি ডাকাইত বলছো?

দুখনবাবু—হ্যাঁ। তোমার ঈশান মোক্তারের জমি লুটে নিবার কথা বলছো।

দাশু—লুটে নিলে দোষ কি?

দুখনবাবু—কি বললে?

দাশু—যদি ঈশান মোক্তারের ভাল জমি ভাগজোত করতে না পাই, তবে মধুকুপির কোন কিষাণ ওর জমিতে মনিষ খাটবে না।

দুখনবাবু হাসে—ভিন গাঁ হতে মনিষ আসবে, দাশু। ঈশান মোক্তারের চিন্তা নাই।

দাশু—তবে শুনে রাখ দুখনবাবু, ভিন গাঁ হতে মনিষ এলে ওরা মরবে।

দুখনবাবু—কে মারবে ওদিগে?

জাতপঞ্চের নীরব মুখগুলির দিকে তাকিয়ে আর হাত দুলিয়ে চিৎকার করে দাশু—জবাব দাও পঞ্চ।

বড় বুড়া রতন উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশজন মনিষের রুক্ষ ও কঠোর হাত একসঙ্গে দুলে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে জাতপঞ্চের ভিড়ঃ আমরা মারবো। মধুকুপির কিষাণের টাঙ্গি এখনও মরে নাই।

কেঁপে ওঠে দুখনবাবুর চোখ দুটো। জটা রাখালের দলও ভীরুর মত আস্তে আস্তে সরে গিয়ে দুখনবাবুর পিছন দিকে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে দুখন। তারপর হঠাৎ লজ্জিত হয়ে আর মৃদু হাসিতে চোখমুখ স্নিগ্ধ করে নিয়ে হাতজোড় করে জাতপঞ্চের উত্তেজিত মুখগুলির দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায় জাতপঞ্চের মত্ত আক্রোশের মুখরতা আর চেহারার রুদ্রতা।

—কি বলছো দুখনবাবু? বড় বুড়া রতন শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে।

দুখনবাবু বলে—ঠিক ঠিক ঠিক; খুব ঠিক কথা বলেছে পঞ্চ। আগে জমি চাই। আমি ঈশান মোক্তারকে বলে তোমাদিগে ভাগজোতের ভাল জমি পাইয়ে দিব। এক পয়সা নজরানা দিতে হবে না।

দাশু একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে দুখনবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে। ছলছল করে দাশুর উৎফুল্ল দুটো চোখের আশাঃ তুমি জাতের দুখ বুঝেছ, তোমাকে কপালবাবা অনেক সুখ দিবে। অনেক দুখে তোমাকে কড়া কথা বলেছি দুখনবাবু; তুমি রাগ করবে না।

শান্তভাবে হাসতে থাকে দুখনবাবু, সেই সঙ্গে দুখনবাবুর চোখ দুটোও অদ্ভুতভাবে যেন ধিকধিক করে হাসতে থাকেঃ না হে দাশু, দুখন সিংহ রাগ করে নাই। দুখন সিংহ যদি বেঁচে থাকে, তবে তোমাদিগে জমির সুখ পাইয়ে দিবে। আমি আজই ঈশান মোক্তারের দরবারে যাব।

দিপির দিপাং!

আঁটি আঁটি ধান কাটি কানালির মাটি গো। কিষাণের ধিয়াপুতা কত সুখে খাটি গো! হে করম দয়া কর!

করম ডালে জল ঢেলেছে মেয়েরা। ঝুমুর গেয়েছে আর নেচে নেচে সারা হয়েছে। আর দাশুও যেন জমিহারা জীবনের সব অভিমান মুছে ফেলে মাদল হাতে নিয়ে সারা দুপুর আর বিকেলে মত্ত হয়ে উৎসবের আসরে একটা জয়ের নাচ নেচেছে। হাঁড়িয়ার তরল নেশার রসে দাশুর অমন পাথুরে পাটার মত বুকের ভিতরটা যেন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছে। জমি হবে, জমি হবে। বাবু দুখন সিংহ বলেছে, জাতের সব মানুষকে জমি পাইয়ে দিবে।

জমির স্বপ্নের মধ্যেই বার বার যার সুন্দর মুখের ছবিটা ফুটে ওঠে, সে

আজ মধুকুপির এই মাদল-বাঁশির মত্ত উল্লাসের আসর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। কিন্তু দাশুর জীবনের এই সঙ্গীবিহীন শূন্যতার বেদনাও যেন আজকের একটা আশাময় মত্ততার কলরবে ভরে গিয়েছে। মুরলী আজ নেই; কিন্তু আসবে। দেখি, কেমন করে না এসে থাকতে পারে মুরলী? দাশু কিষাণের জমিতে ধানের শিস যেদিন দুলে উঠবে, সেদিন কয়লাখাদের কলঘরের বড় মিস্ত্রীর ঘর মুরলীকে আটক করে রাখতে পারবে কি? কখনই না।

বিকেল হতেই মাদল রেখে দিয়ে আর সনাতন লাইয়ার হাত ধরে টলতে টলতে ঘরে ফিরে আসে দাশু। সনাতন বলে—আজ সাঁঝে আর আখড়াতে যেও না দাশু।

দাশু হাসে—তুমি আমার নাচ দেখে ভয় পেলে নাকি সনাতন?

সনাতন—হঁ্যা।

দাশু—কেন?

সনাতন—তুমি সরদারিনকে ভুলতে পার নাই।

দাশু—তুমি কেমন করে বুঝলে?

সনাতন—নাচতে নাচতে কাঁদলে কেন?

জলে ভরে যায় দাশুর চোখঃ হঁ্যা সনাতন। করমের দিনে মুরলী আমার কাছে নাই, এ কেমন দয়া করলে কপালবাবা?

সনাতন—ওসব কথা আর মিছা কেন মনে কর দাশু?

দাশু—কিন্তু মুরলী একদিন আসবে।

সনাতন—কেন?

দাশু—আমি ওকে আনা করাবো।

সনাতন—কেমন করে?

দাশু—জমি নিব, ক্ষেতজোত করবো, নতুন মাটি দিয়ে ঘর বানাবো। মুরলী তখন না এসে পারবে কেন? জমি নাই, তাই মুরলী নাই।

সনাতন হাসে—হলে বড় ভাল হয় দাশু। কিন্তু…।

দাশু—কি?

সনাতন—মধুকুপির কপাল ভাল নয় দাশু। আমার বড় ডর লাগছে।

দাশু—ছিয়া! গাঁয়ের লাইয়া হয়ে তুমিও এমন ডরের কথা বল, সনাতন?

সনাতন বোধহয় দাশুর এই অভিযোগের উত্তর দিত; কিন্তু সনাতন সত্যিই একটা নতুন ভয়ে ভীরু হয়ে সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সড়কের উপর দাঁড়িয়ে দাশু কিষাণের ঘরের এই জীর্ণ জামকাঠের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে একটা লোক। আধবুড়া চেহারার একজন বাবু মানুষ। গায়ে কালো কাপড়ের জামা। মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি। পায়ে ধুলোমা[illegible] একজোড়া জুতো, আর হাতে ছাতা ও একটা থলি। বাবু মানুষটা অপল[illegible] চোখ তুলে দাশুর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবু মানুষটার মুখটা মিটমি[illegible] করে হাসছে মনে হয়।

—ও কে বটে সনাতন? প্রশ্ন করে দাশু।

সনাতন—ওটা হারানগঞ্জের সিস্টার দিদির লোক। খিরিস্তান বটে। তোমার সরদারিনের যত সিলাই নকশা এই লোকটা কিনে নিয়ে যেত। এতদিন বাঘিন কানারানীর ডরে আসে নাই।

দাশুর লাল চোখ দপদপ করে—সিস্টার দিদির লোক আবার হেথা আসে কেন?

সনাতন—কে জানে?

দাশুর রুষ্ট গলার স্বরের শব্দ বোবহয় শুনতে পায় সিস্টার দিদির লোকটা। সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হনহন করে হেঁটে পাকুড়তলার দিকে চলে যায়।

আবার কারা যেন গল্প করতে করতে ভুবনপুরের দিক থেকে সড়ক ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে।

সনাতন বলে—বাস্, আর কি? কানারানী নাই। আবার শুরু হলো দাশু।

দাশু—কি?

সনাতন—কয়লাখাদের ঠিকেদারের লোক আবার গাঁয়ে ঢুকছে।

দাশু—কেন?

সনাতন—মালকাটা যোগাড় করতে।

হঠাৎ হতভম্ব হয়ে যায় দাশু। ঠিকেদারের লোকগুলি মধুকুপির কিষাণের ঘর ভাঙবার জন্য কী কুৎসিত আনন্দের হাসি হেসে কত সহজে মধুকুপির মাটি মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে দাশু: একটুক ডেঁটে দিলে কেমন হয়, সনাতন?

সনাতন ভয় পেয়ে দাশুর হাত চেপে ধরে: তুমি ঘরের ভিতরে যাও আর শুয়ে থাক। হাত ধরে দাশুকে টেনে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সনাতন চলে যায়।

নিঝুম হয়ে ঘরের ভিতরে খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে একটা অস্বস্তির জ্বালায় ছটফট করে দাশু। আজকের জয়ের উৎসবটার সবসুখ যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। কয়লাখাদের ঠিকেদারের লোক গাঁয়ের ঘরে ঢুকে হাঁক দিয়ে মজুরির লোভ দেখাবে। মধুকুপি যে শূন্য হয়ে যাবে। সিস্টার দিদির লোক, ঐ পাপটা আবার মধুকুপির কোন্ কিষাণের ঘরের আশা ছিঁড়ে নিয়ে যাবার জন্য চোরনেকড়ের মত গাঁয়ের পথে ঘুরঘুর করছে? তুই কেন মরলি কানারানী? পাপগুলো যে মধুকুপির ঘরে ঢুকতে আর ভয় করে না!

না, বড় জোর নেশা ধরেছে। ঠিক বলেছে সনাতন। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই ভাল হয়। খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর গড়িয়ে পড়ে দাশু। কিন্তু সেই মুহূর্তে করুণ চিৎকারের মত একটা বুকফাটা কান্নার শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে। কে কাঁদে? এমন সুন্দর করমের দিনে মধুকুপির কার প্রাণের দুখ এমন করে কেঁদে উঠল?

ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় দাশু, সড়কের উপর দাঁড়িয়ে

আর অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে ছটফট করছে, দু হাত ছুঁড়ে বুক চাপড়ে আর চিৎকার করে কাঁদছে পল্টনী দিদি।

পল্টনী দিদির পরনে একটা ছেঁড়া ঘাগরা। ময়লা একটা কাঁথা গায়ে জড়ানো। মাথার চুলগুলি ক্ষেপী ভিখারিনীর চুলের মতো এলোমেলো হয়ে মাথার চারদিকে ঝুলে রয়েছে।

দৌড় দিয়ে এগিয়ে আসে দাশু ঃ কি হলো পল্টনী ?

—নিয়ে গেল, নিয়ে গেল। ডাইনে আমার ছেইলা দুটাকে ছিনে নিয়ে গেল দাশুদাদা। চেঁচিয়ে কাঁদিতে থাকে পল্টনী।

আশ্চর্য হয় দাশু ঃ কে ডাইন ? তোমার ছেইলা ছিনে নিয়ে যায় কেন ডাইন ?

সড়কের অনেক দূরে, চলমান কয়েকটা ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুক চাপড়ায় পল্টনী দিদি ঃ হারানগঞ্জের সিস্টার দিদির লোক আমার ছেইলা দুটাকে অনাথবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে, দাশুদাদা। কটা রে, মোটা রে ! আমাকে এত দুখ দিতে কেন এসেছিলি রে !

সড়কের অনেক দূরের সেই চলমান ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে দাশু, হ্যাঁ, আধবুড়ো বাবুটা ছাতা হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। বাবুটার দুই পাশে ছোট চেহারার দুটো কচি ছেলে রোগা-রোগা দুটো ছায়ার মতো হেঁটে চলেছে।

বুকের উপর চাপড় মেরে কান্নাটাকে গুমরে তোলে পল্টনীদিদি—সিস্টার দিদি কতবার এসে ছেইলা দুটাকে টেনেছে, তবু ছাড়ি নাই গো। বাঘিনের ডরে মাঠে যেতে দিই নাই ? গো। ডাইনের ডরে বাজারে যেতে দিই না গো !

—পল্টনী ! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—কি দাশু দাদা ?

—তুই কাঁদিস না।

আরও জোরে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে পল্টনীদিদি। দাশুও সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে সেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা টাঙ্গি হাতে তুলে নিয়ে এসে আবার পল্টনীদিদিকে সান্ত্বনা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—আমি এখনই তোর কটা আর মোটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পল্টনীদিদি হঠাৎ কান্না থামিয়ে, আর, একটা ঝাঁপ দিয়ে দাশুর গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে দাশুর টাঙ্গিটাকে শক্ত করে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে ঃ তুমি থাম দাশুদাদা। তোমার পায়ে পড়ি দাশুদাদা।

—কি বলছিস পল্টনী ? হতভম্ব হয়ে পল্টনীদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু !

পল্টনীদিদি বলে—মারতে হলে আমাকে মার। সিস্টার দিদির লোক কোন কসুর করে নাই।

—কেন ?

—আমি ছেড়ে দিয়েছি, তবে না আমার কটা আর মোটাকে নিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে ফোঁপাতে থাকে পল্টনীদিদি।

—কেন ছেড়ে দিলি ?

ময়লা কাঁথার কোণা তুলে চোখ মোছে পল্টনীদিদি ঃ তিন দিন হলো ছেইলা দুটা কিছু খায় নাই। খেতে দিতে পারি নাই দাশুদাদা।

দাশুর লাল চোখের জ্বালা হঠাৎ জল হয়ে ঝরে পড়ে। কথা বলতে গিয়ে দাশুর গলার স্বর ভেঙে যায় ঃ কেন খেতে দিতে পারিস নাই ?

—যে মাগির মরদ নাই, জমি নাই সে মাগি তালপাখা বেচে আর কতদিন ছেইলা পুষতে পারে ? আমার কটা আর মোটা আমার বুকের উপর থেকেও মরবে, তার চেয়ে সিস্টার দিদির অনাথবাড়িতে গিয়ে বেঁচে থাকুক। সেটা ভাল বটে কি না দাশুদাদা ?

দাশুর শক্ত হাতের মুঠো হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়। গেঁয়ো গর্বের টাঙ্গিটা অলস অক্ষম ও অসার বস্তুপিণ্ডের মত যেন একটা আবর্জনা হয়ে ধপ করে সড়কের ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে।

আরও কিছুক্ষণ গুনগুন করে কাঁদে পল্টনীদিদি। তারপর সেই মৃদুস্বরের কান্নাটা যেন ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ গাঁয়ে আর থাকবো না, দাশুদাদা।

—কেন ? আস্তে আস্তে টাঙ্গিটাকে আবার অলসভাবে হাতে তুলে নিয়ে উদাসস্বরে প্রশ্ন করে দাশু।

—গাঁয়ের ঘরে মান নাই, ভাত নাই, কিছু নাই।

—কিন্তু যাবি কোথায় ?

—কয়লাখাদে যাব।

—কি বললি ? ভ্রূকুটি করে দাশু।

—হ্যাঁ দাশুদাদা। ময়লা কামিন হয়ে খাদে খাটবো। ঠিকেদার বললে, দশ ঘণ্টা খাটলে এক টাকা সওয়া টাকা মজুরি হবে।

—কিন্তু তুই কি শুনিস নাই, দুখনবাবু গাঁয়ের সব মানুষকে জমি পাইয়ে দিবে ? জমি কর পল্টনী, মনের সুখে ক্ষেত-জোত কর। গাঁয়ের বার হবি কেন ?

হেসে ফেলে পল্টনী—দুখনবাবুর নাম নিও না দাশুদাদা। গাঁয়ের দুখ দেখে সাপও কাঁদবে, কিন্তু দুখনবাবু কাঁদবে না।

—কেন ?

—ডাকাইতের কুকুরও যে ডাকাইত বটে।

—ডাকাইতটা কে বটে ?

কুঠিয়াল বাবুটা গো, তোমাদিগের ঈশানবাবু। আমার পাঁচ-পাঁচটা ছাগল ধরে নিয়ে গিয়ে কাটলে আর সাহেবদিগে খাওয়ালে ; আজ তক দামটা দিলে না। টাকা মাগতে গেলে ডাকাইতটা বলে, রাতে এসে টাকা নিয়ে যাবি।

দাশু—কিন্তু খাদের ঠিকেদার বেটা কোন্ দয়ার দেবতা বটে ? সে বেটা কি গাঁয়ের দুখে কাঁদে বলে গাঁয়ে ঢুকেছে ?

পল্টনী—জানি না দাশুদাদা। কিন্তু গাঁয়ে আর থাকবো না।

—ঠিকেদার বেটা কোন্‌দিকে গেল ? হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে, আর লাল চোখ

দ্টোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে প্রশ্ন করে দাশ্।

—দাশ্দাদা! পল্টনীর গলার স্বরেও একটা আতঙ্ক কে'পে ওঠে!

—কি?

—তুমি মিছা মাথা গরম করে খাদের ঠিকাদারের সাথে মারামারি বাধিও না।

পল্টনীর আতঙ্কের আবেদন তুচ্ছ করে, আর পল্টনীর আতঙ্কিত ম্খটার দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে হনহন করে হে'টে সড়ক ধরে এগিয়ে যায় দাশ্।

কিছ্ দ্রে এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ায়। সড়কের পাশেই যে অড়হরের ক্ষেত, তার পিছন দিকে একটা মেটে ঘরের কাছে চিৎকারের হানাহানি চলেছে। যেন একটা কঠোর হ্ংকারের সঙ্গে একটা কর্ণ অট্টহাসির ঝগড়া চলেছে। ওটাই যে তেতরি ঘাসিনের ঘর। কয়লাখাদের ঠিকেদার বেটা কি ভয় দেখিয়ে তেতরিকে ময়লা কামিন করে নিয়ে যাবার জন্য গর্জন করছে?

তেতরির ঘরের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা নির্মম লজ্জার ধাক্কা খেয়ে চমকে ওঠে, আর চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশ্। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে একটা সাইকেল। বেড়ার ফাঁকে উ'কি দিয়ে দেখতে পায় দাশ্, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাব্রবাজার ডাকবাংলার খানসামা। খানসামার পা ঘে'ষে একটা রোগা কুকুর হাঁ করে আর জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে যেন একটা ঘটনার জন্য লোল্প হয়ে ওৎ পেতে বসে আছে।

চিৎকার করে খানসামা—যাবি কি না বল মাগি?

—না, যাব না। বলতে বলতে একটা লাল রংয়ের ছে'ড়া সায়া হাতে তুলে নিয়ে পটপট করে ছি'ড়ে মাটির উপর ছ্'ড়ে ফেলে দেয় তেতরি। রোগা কুকুরটা একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছে'ড়া সায়ার টুকরো কামড়ে ধরে আর ছ্টে পালিয়ে যায়।

খানসামা—মনে করে দেখ তেতরি, ভুখা মরে যেতিস কিনা, যদি আমি তোকে দশটা টাকা দাদন না করতাম।

তেতরি—সব মনে আছে; কিন্তু তুমি এখন যাও।

খানসামা বলে—তা হলে আমার টাকা ফেরত দে।

তেতরি—না, দিব না।

খানসামা—তা হলে বল, কবে ফেরত দিবি?

তেতরি—সে বলবো না। যেদিন পারবো ফেরত দিব।

খানসামা—সে হবে না। হয় আমার টাকা ফেরত দে, নয় আমার সাথে চল কলকাতা থেকে ভাল বাব্সাহেব এসেছে। তাদিগে খ্শী করে দিয়ে চলে আয় তোর দ্টো টাকা হবে, আমারও কিছ্ হবে।

তেতরি—না, যাব না।

খানসামা—তবে তোর ঘরের মাল বের করে দে।

তেতরি—তাই নিয়ে যা।

ঘরের ভিতরে ঢোকে তেতরি। পিতলের একটা থালা আর একটা ঘটি নিে এসে খানসামার দিকে ছ্'ড়ে দেয়: নিয়ে যা।

খানসামা—এতে কি দশ টাকা উসুল হয় ?

আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা রূপার হাঁসুলির আধখানা টুকরো হাতে করে নিয়ে এসে খানসামার দিকে ছুঁড়ে দেয় তেতরি ;

খানসামা চেঁচিয়ে ওঠে—হলো না। আর কি আছে বের করে দে।

একটুও বিচলিত না হয়ে, একটাও কটু কথা না বলে যেন একটা নতুন অহংকারের আনন্দে হেসে ওঠে তেতরি ; আর, খানসামার দস্যুতাকেও তুচ্ছ করে।—আর কিছু নাই। তুমি এবার চলে যাও।

—না, যাব না। এতে উসুল হয় নাই। আবার চিৎকার করে খানসামা।

—তা হলে আমার মাথায় লাঠি মার, আমার লেহু পিয়ে নিয়ে চলে যাও। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসতে থাকে তেতরি।

—তোর মত মাগির লেহু পিয়েও আমার রাগ যাবে না। তেতরির মুখের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়ে খানসামা।

ঘরের বেড়া মড়মড় শব্দ করে কাতরে ওঠে। ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—খানসামাটা যায় না কেন তেতরি ? ভেবেছে কি ?

দাশুর লাল চোখ আর হাতের চকচকে টাঙ্গির দিকে চোখ পড়তেই তেতরি ঘাসিনের মুখ শুকিয়ে যায় ঃ যাচ্ছে দাশুদাদা, এখনি চলে যাবে। তুমি ওকে কোন কথা বলবে না।

দাশু বলে—ওকে ঝাড়ু মার না কেন, তেতরি !

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না খানসামা। থালা ঘটি আর হাঁসুলির টুকরো হাতে তুলে নিয়েই সরে যায়। দৌড়ে গিয়ে সাইকেলটাকে ধরে, আর অড়হর ক্ষেতের কিনারা ধরে উড়ন্ত ছায়ার মত পালিয়ে যায়।

হাঁপ ছাড়ে দাশু ঃ তুই ওকে ঘরের চিজ ছেড়ে দিলি কেন ?

তেতরি হাসে ঃ পাপের ধার শুধে দিলাম। ভাল হলো দাশুদাদা।

দাশু আশ্চর্য হয়ে তাকায় ঃ তুই যেন কি মনে করেছিস তেতরি।

তেতরি—আর গাঁয়ে থাকবো না।

চমকে ওঠে দাশু ঃ কোথায় যাবি ?

তেতরি—কয়লাখাদে যাব, কামিন খাটবো।

দাশু—খাদের মালকাটার ঠিকেদার এসেছিল ?

তেতরি—হ্যাঁ।

দাশু—কোন্‌দিকে গেল ?

তেতরি—মানঝিপাড়ার দিকে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে দাশু। তারপর অসহায়ের মত চোখ তুলে অড়হরের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—কয়লাখাদে যাবি ?

তেতরি—হ্যাঁ ; এমন গাঁয়ের এমন ঘরে থাকলে গতর পচে যাবে। মরে যাব গো দাশুদাদা। মানও নাই ভাতও নাই, এমন গাঁয়ে কেন থাকবো ?

দাশু—জমি যদি পাস, তবে ?

তেতরি—কে দিবে জমি ?

দাশু—ঈশান মোক্তার দিবে। দুখনবাবু বলেছে, জমি পাইয়ে দিবে।

তেতরি হেসে ওঠে : দিবে না। ওরা আমাদিগে কখনো জমি দিবে না।

দাশু বিরক্ত হয় : কেন দিবে না?

তেতরি—ওরা যদি জমি দিবে, তবে আমাদিগে দুখ দিবে কে?

কী কঠোর অবিশ্বাস! যেমন পল্টনী, তেমনি তেতরি; ঈশান মোক্তার আর দুখনবাবুকে বিশ্বাস করবার মত একটা প্রাণী বলেও ওরা মনে করে না। পল্টনী আর তেতরির এই অবিশ্বাসের জ্বালা দেখে দাশুর মনের ভিতরেও একটা ভয়-ভয় অস্বস্তি শিউরে উঠতে থাকে।

চলে যায় দাশু। অলস হাতের মুঠোর মধ্যে টাঙ্গির হাতল শিথিলভাবে চেপে ধরে, আস্তে আস্তে হেঁটে, অড়হরের ক্ষেত পার হয়ে আবার সড়কের উপর এসে দাঁড়ায়।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ছোটকালুর মাথার পিছনটা লাল হয়ে উঠেছে। ডরানির বুকের উপর দিয়ে বকের সারি উড়ে চলেছে। কিন্তু ওরা কারা?

চমকে ওঠে দাশু। একটা আশার চমক। মনে হয়, পল্টনী আর তেতরির এই অবিশ্বাসের হাসি, একটু বেশিরকমের রাগী দুঃখের হাসি। সত্যিই যে জমি পাইয়ে দেবে দুখনবাবু। সত্যিই যে ঈশান মোক্তারের দরবারে গিয়েছিল দুখনবাবু।

বেশ কিছু দূরে হলেও এখান থেকেই ওদের চিনতে পারা যায়। সড়ক থেকে নেমে কুঠির পথে সবার আগে এগিয়ে চলেছে যে, সে হল ঈশান মোক্তারের বড় ছেলে লালবাবু। পাঁচ বছর আগে দেখা লালবাবুর সেই চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে। সেই রকমই ধবধবে ফরসা সুন্দর চেহারা আর বড় বড় কোঁকড়া চুল বটে, কিন্তু সেই কাঁচা মুখটি আর নেই। এক জোড়া কালো গোঁপ নিয়ে লালবাবুর মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। বড় হয়েছে, বেশ ডাগর হয়েছে লালবাবুটা!

আগে আগে লালবাবু। তার পিছনে দুখনবাবু। তার পিছনে দুটো পালোয়ান চাকর। একটা চাকরের হাতে বন্দুক, আর একটা চাকরের হাতে ব্যাগ। আরও পিছনে একটা মোটরগাড়ি। বোধ হয় গাড়িটার তেল ফুরিয়েছে, অনেক লোক হল্লা করে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার মধ্যে জটা রাখালের মুখটা বেশ স্পষ্ট করে চিনতে পারা যায়। গলার স্বর সবচেয়ে বেশি জোরে বাজিয়ে আর চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে জটা রাখাল : রাজাবাবু এইলেন, কত দয়া করলেন, হেঁইও।

—হেঁইও! একসঙ্গে দম ছাড়ে গাড়ি ঠেলা ভিড়টা।

জটা রাখাল—রাজাবাবু খুশি হে, কত আশা পুষি হে, হেঁইও!

—হেঁইও!

বিকালের লাল আলোতে রঙিন হয়ে উঠেছে মধুকুপির ক্ষেত আর ডাঙ্গা। আখড়াতে করমের মাদল বাজতে শুরু করেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে দাশু। গাড়ি-ঠেলা ভিড়টাও বিশ্বাসের গান গাইছে। মধুকুপির বুকের

উপর আশা আর আশ্বাসের উৎসব মেতে উঠেছে।

ওই তো লালবাবু; মনে পড়ে দাশুর জেলে যাবার ঠিক আগের বছরে শীতের সময় যে-বার বড় ভাল গম ফলেছিল ডরানির কানা নালার দু পাশে, সে-বার ডরানির দহের নতুন হাঁস শিকার করতে এসেছিল লালবাবু। শীতের সকালে দহের জলে নতুন হাঁস ভাসতে দেখে ছেলেমানুষের চোখে সে কী খুশি, মুখে সে কী হাসি! ছেলেমানুষ হয়েও কী সুন্দর বন্দুক চালাতে পারত লালবাবু। সেদিন দাশুই তো লালবাবুকে কাঁধে চড়িয়ে ডরানির কনকনে ঠাণ্ডা জল পার হয়ে শিকার খেলাতে ওপারে নিয়ে গিয়েছিল।

মধুকুপির কিষাণের দুখ বুঝতে পেরেছে কি লালবাবু? তাই তো মনে হয়। হে কপালবাবা, তাই যেন হয়! পল্টনী আর তেতরির সন্দেহ যেন মিথ্যা হয়!

কপালবাবার জঙ্গলের দিকে তাকায় দাশু। কপালবাবা ছাড়া মধুকুপির কিষাণের আর কেউ সহায় নাই। এখনই কি কপালবাবার আসনের কাছে গিয়ে একবার মাথা ঠেকিয়ে চলে আসতে পারা যায় না? সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? এক দৌড়ে যাওয়া, আর এক দৌড়ে ফিরে আসা, রাত হলেও কতই বা রাত হবে?

কপালবাবার আসনের কাছে মাথা ঠেকিয়ে যখন উঠে দাঁড়ায়, তখনও আকাশের সব তারা ফুটে ওঠে নি। ফিরে আসবার পথে ডরানির পুল পার হয়ে মধুকুপির মাটির উপর এসে দাঁড়াতেই থমথমে অন্ধকারের মধ্যে শিয়ালের দল আগ রাতের প্রথম হাঁক হেঁকে ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল।

কিন্তু কই মাদলের শব্দ শোনা যায় না কেন? করম পরবের উল্লাস এত তাড়াতাড়ি আগ-রাতের পহরে ক্লান্ত হয়ে আর নীরব হয়ে যাবে, এ কেমন পরব? বড় বুড়া রতনের কলিজায় না হয় জোর নাই; কিন্তু সনাতন লাইয়ার কি হল? মাদল পিটতে আর হাঁড়িয়া টানতে সনাতনেরও কি সাধ নাই, আর কলিজার জোর নাই? একজনারও কি হুঁশ নাই, দম নাই? হাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েগুলিও; গরুচরানী জগমোতি বুধনি আর কালিমণি? ওরাও কি বমি করে করে ঝুমুর গান থামিয়ে দিল, আর নাচ ছেড়ে দিয়ে ভুঁইয়ের উপর লুটিয়ে পড়ল?

না, আখড়াতেই যেতে হবে। সড়ক থেকে নেমে একটা চষা ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে হন্তদন্ত করে হাঁটতে থাকে দাশু। চিনতে পারে দাশু, এই ক্ষেত হল ঈশান মোক্তারের সেই ক্ষেত, জেলে যাবার আগে রোজ এক সের চালের সিধা আর চার আনা নগদ পেয়ে যে ক্ষেতে বরবটি বুনেছিল দাশু। কেমন ফলন হয়েছিল, নিজের চোখে দেখে যেতে পারে নি।

কিন্তু এ কি? আবার কাঁদে কে? যেন দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ভয়ানক করুণ স্বরের একটা কাঁদুনির গান গাইছে কেউ।

ওই যে একটা ঘর, ঘরের সামনের ছোট আঙ্গিনায় টিম টিম করে একটা বাতি জ্বলছে। ওটা তো ফুলকি মাসীর ঘর।

হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরে, নারকেল তেলে চুল ভিজিয়ে খোঁপা বাঁধে, লাল গালার রস দিয়ে নখ রাঙায়, সে ফুলকি মাসী আজ কাঁদে কেন? ঈশান মোক্তারের সেবা করবার জন্য জীবনটাকে বাঁধা দিয়েছে যে ফুলকি, কুঠি থেকে বছরের সিধা যার জন্য বরাদ্দ করা আছে, ঈশান মোক্তারের কাছ থেকে জমি খয়রাত পেয়েছে যে, সে ফুলকির প্রাণ আবার কিসের ব্যথায় কাঁদে?

এগিয়ে যেয়ে ফুলকি মাসীর আঙ্গিনার উপর দাঁড়ায় দাশু। ফুলকি মাসীর চাপা কান্নার স্বর ডানাভাঙা চিলের আর্তস্বরের মত আরও করুণ তীক্ষ্ণতায় কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে: আর এ গাঁয়ে থাকবো না দাশু।

আবার সেই অভিশাপের শব্দ! কী আশ্চর্য, ফুলকি মাসীও যে পল্টনী আর তেতরির মত সেই এক ধিক্কারের ভাষায় মধুকুপির মাটিকে গালি দিয়ে অপমান করছে।

—তোমার আবার কাঁদতে সাধ হলো কেন মাসী? ফুলকির মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

আবার মুখের উপর আঁচলচাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে ফুলকি। ঘরের দাওয়ার এক কোণ থেকে মরা জীবের মত একটা অনড় চেহারা হঠাৎ নড়ে ওঠে। ফুলকির স্বামী খোঁড়া তিনকড়ির গলার স্বরটাও যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলে—লালবাবু ফুলকির কোমরে জুতাপায়ে লাথি মেরেছে।

—কেন? গর্জন করে দাশু।

তিনকড়ি বলে—ফুলকি জানে। আমাকে শুধাও কেন?

—কি মাসী? তোমার ঈশান মোক্তারের ছেইলা হয়ে লালবাবু তোমাকেই জুতার ঠোকর মারে কেন? ফুলকির কাছে এগিয়ে এসে আবার প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর দাঁত কড়মড় করে বেজে ওঠে।

হঠাৎ মুখের উপর থেকে চাপা আঁচল সরিয়ে খোঁড়া তিনকড়ির দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ফুলকি—তুই আমার জ্বালা বুঝবি কি রে খোঁড়া গরু। তোর লেগেই তো আমাকে মরতে হয়েছে রে মড়া! তোকে পুষবার লেগে সিধা মাগতে গিয়ে যে আমার ধরম করম সব গেল রে কপালপোড়া। তুই মানুষ হলে ভিখ মেগে খেতিস, জরুর ভাত খেতিস না।

খোঁড়া তিনকড়ির চেহারাটা আবার একটা মড়া জানোয়ারের মত গুটিয়ে পাকিয়ে অনড় হয়ে যায়। ফুলকি বলে—ঈশান মোক্তারেরর বেটা আমার সিধা বন্ধ করে দিলে, জমিটাও ছিনে নিলে।

—কেন?

—আমি ওর সেবা করতে রাজী হই নাই।

দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে ফুলকি: আমি ভাবি নাই দাশু, বুড়া মোক্তারের বেটাও আমাকে এমন কথা বলবে। যাকে ছেইলা বলে মানি, সে আমাকে মাগি বলে মনে করে আর গতর ছুঁতে চায়; কী কপাল করেছিলি

রে ফুলকি !

দাশুর লাল চোখের কোণে জলের ফোঁটা কাঁচা রক্তের ফোঁটার মত টলমল করে। ফুলকি মাসীকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা আর খুঁজে পায় না দাশুর মন। দাশুর পাঁজরের হাড়গুলি যেন পুড়ছে। সারাদিনের একটা ভুয়া আশার নেশা এইবার একেবারে ছাই হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। লালবাবু একটা অভিশাপ, দুখনবাবু একটা হিংসা। মধুকুপির কিষাণের প্রাণের সব সুখ শুষে নিয়ে রক্তমাখা জিভ দুলিয়ে নাচবার জন্য দুই পিশাচের মতলব আরও কঠোর হয়ে উঠেছে।

টাঙ্গিটা কাঁধের উপর তুলে, আর নিজের মুখের চেহারাটাকেও একটা আক্রোশের পিশাচের মত বীভৎস করে তখনি একটা দৌড় দিত দাশু, কিন্তু ফুলকি মাসী আগে উঠে এসে দাশুর হাতের টাঙ্গি চেপে ধরেঃ তুমি ওদিক পানে আর যেও না, দাশু।

দাশু—কি বলছিস মাসী ?

ফুলকি—তুমি কুঠিতে যেও না।

দাশু—কেন ?

ফুলকি—যেয়ে লাভ নাই। কুঠির দয়া আর চাই না দাশু। আমি এ গাঁয়ে আর থাকবো না।

দাশু—কোথায় যাবে ?

ফুলকি—কয়লাখাদে যাব।

আস্তে একবার চমকে ওঠে দাশু। মাথার ভিতরের সব আক্রোশের উত্তাপও যেন হঠাৎ শিউরে ওঠে আর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মাথা হেঁট করে একটা হাঁপ ছাড়ে দাশুঃ ছেড়ে দে মাসী, ঘরে যেতে দে।

ঘরের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। চষা ক্ষেতের মাটির ঢেলা মাড়িয়ে, টলতে টলতে সড়কের উপর এসে উঠে একবার পিপুলতলার দিকে চোখ পড়ে দাশুর। অনেক আলো জ্বলছে পিপুলতলায়, আর বেশ নতুন রকমের একটা হল্লার শব্দও বাজছে। বাবু দুখন সিং আবার একটা নতুন অভিশাপের উৎসব মাতিয়ে তুলেছে বুঝি ! চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবার পথে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু।

ঘরের কাছে এসে পেঁছিতেই দেখতে পায় দাশু দাওয়ার উপর একটা ছায়া বসে আছেঃ কে বটে ? ডাক দেয় দাশু।

—আমি সনাতন।

—কি বটে সনাতন ?

দুখনবাবু নতুন জাতপঞ্চ চালু করলে। যারা ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খাটতে রাজী আছে, শুধু তাদের নিয়ে নতুন জাতপঞ্চ হলো। জটা রাখালের দল আছে। সাধু, ভনু আর পচুও আছে। শুন নাই পিপুলতলার হল্লা ?

—শুনেছি। কিন্তু ···।

দাশুর হাত ধরে টান দেয় সনাতন : না দাশু। আজ আর ওদের কিছু বলতে যেও না। তুমি ঘরে থাক।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—কিন্তু কাল আমাদিগের জাতপঞ্চ ডাকতে হবে সনাতন। ডর করলে চলবে না।

—বেশ, বেশ। তাই হবে দাশু। দাশুকে ঘরের ভিতরে ঠেলে দিয়ে আর দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায় সনাতন।

ওদিকে পিপুলতলায় চারটে খুঁটির গায়ে চারটে লণ্ঠনের আলোর কাছে বনচণ্ডীর নামে শপথ করে যে নতুন জাতপঞ্চ হেসে আর চেঁচিয়ে উঠল, সেই জাতপঞ্চের সভার মাঝখানে দুখনবাবুর পাশে তখন আর একটি চৌকির উপর বসেছিল, একজন, বেশ হাসি-হাসি মুখ, বনচণ্ডীর সেবাইত চক্রবর্তী।

দুখনবাবুর প্রাণের আশা উৎসাহ আর প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি এই জাতপঞ্চ জাতের সুধার মেনে নিয়েছে। না, ঘরের বউ বেটি বহিন আর নাচবে না। লাজের বয়স হবার আগেই বেটি বহিনের বিয়া দিতে হবে। বিয়ার কাজে বামনে মন্তর পড়বে। কেউ আর কুঁকড়া খাবে না।

তা ছাড়া, জমি চাই না। কুঠির জমিতে বাপদাদারা যেমনটি মনিষ খেটে এসেছে, সবাই তেমনটি মনিষ খাটবে।

আর, আর একটা প্রস্তাব করল দুখনবাবু, আর চক্রবর্তীও বুঝিয়ে দিল। জাতের তিনটা ভাগ দল। জাতিয়া, খাদিয়া, আর কুঁকড়াশী। যারা বামন মানবে তারা জাতিয়া; যারা কয়লাখাদে কাজ নিয়ে মালকাটা আর ময়লাকামিন হবে, তারা খাদিয়া। যারা কুঁকড়া খাওয়া ছাড়বে না, তারা কুঁকড়াশী। ভাত-ভাইয়ারীতে জাতিয়ারা সবার আগের সারিতে বসবে, পরের সারিতে খাদিয়ারা; শেষ সারিতে কুঁকড়াশী। যদি খাদিয়া আর কুঁকড়াশীরা এই নিয়ম না মানে, তবে জাতিয়ারা তাদের সাথে কোন ভাত-ভাইয়ারীতে বসবেই না।

জটা রাখাল বলে—বড় ভাল নিয়ম হলো, দুখনবাবু।

বনচণ্ডীর প্রসাদ বিতরণ করে চক্রবর্তী; জাতপঞ্চের সভা যখন ভাঙে, তখন পিপুলতলার ছায়ার অন্যদিকের একটা চৌকির উপর নড়ে চড়ে বসে একটি প্রসন্ন মূর্তি, আর ঢেঁকুর তুলে নিয়ে সরাবের বোতলটাকে তারই পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে থাকা একটি বিনীত মূর্তির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—নে রামাই, একটু তাড়াতাড়ি কর।

পুলিশ মুন্সী চৌধুরীর হাত থেকে সরাবের বোতলটা হাতে তুলে নেয় রামাই দিগোয়ার। আজই দুপুরে লালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দপুর থানাতে গিয়ে এজাহার দিয়েছিল দুখনবাবু, মধুকুপির একদল দুর্দান্ত কিষাণ কুঠির ভাণ্ডার লুঠ করতে চায়।

কুঠিতে লালবাবু আছে, বন্দুক আছে আর দুটো পালোয়ান চাকরও আছে। আর, এখানে আছে পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজী ও রামাই দিগোয়ার। চৌধুরীর কাঁধেও বন্দুক। আর কিসের পরোয়া? কার ডর? বড়বুড়া রতনের শীর্ণ কণ্ঠের হুংকার, দাশু দাগী আর সনাতন লাইয়ার চিৎকারকে বার

ঘণ্টার মধ্যেই জব্দ করে দিয়েছে দুখনবাবু। চৌধুরীর আশ্বাসে প্রসন্ন আর নির্ভয় হয়ে নতুন জাতপঞ্চ চালু করে ফেলেছে দুখনবাবু। শালুর রুমালে বাঁধা দশটা টাকার নগদ উপহার চৌধুরীর খাকি কোটের পকেটের ভিতরে অনেকক্ষণ হল ঠাঁই পেয়েছে।

—আর কি চাই, আজ্ঞা করেন চৌধুরীজী। চৌধুরীর কাছে এগিয়ে এসে বিনীতভাবে প্রশ্ন করে দুখনবাবু।

—একটা গো-গাড়ি চাই দুখনবাবু।

গো-গাড়ি আসতেও দেরি হয় না। তারপরেই পিপুলতলার সড়কের উপর দিয়ে দুটি ছায়ামূর্তি যেন দুলে দুলে হাঁটতে শুরু করে। চৌধুরীর পায়ের ভারী বুটের শব্দ খট খট করে বাজে। রামাই দিগোয়ারের খালি পা পথের কাঁকর ঘষে ঘষে চলে। পিছনে গো-গাড়ির চাকাতেও যেন একটা লালসার্ত স্বরের শিহর। চৌধুরী ডাকে—রামাই।

—বলেন হুজুর।

—সরদারিনের হাসিটা বড় মিঠা, নয় কি?

রামাই—হ্যাঁ হুজুর · বাস্…এই তো ওর ঘর। আপনি এখানে গাড়ির কাছে একটুক দাঁড়ান; আমি সরদারিনকে ডেকে নিয়ে আসছি।

জীর্ণ জামকাঠের দরজার উপর আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে একটা আদুরে আহ্বানের নরম শব্দ বাজিয়ে ডাক দেয় রামাই—সরদারিন; আমরা এসেছি গো। গো-গাড়িও এনেছি।

দরজা খুলে যায়। ঘরের ভিতর বড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে যে ছায়াটা, তারই দিকে তাকিয়ে রামাই দিগোয়ার বলে—তুমি যেমনটি বলেছিলে, তেমনটি বন্দোবস্ত হয়েছে সরদারিন। গোবিন্দপুর বাজারে তোমার লেগে ঘর নিয়েছেন চৌধুরীজী।

ঘরের ভিতরের ছায়াটা আরও অস্থির হয়ে ওঠে। রামাই হাসে—আরও ভাল খবর আছে, সরদারিন। দাশুর নামে থানাতে অনেক এজাহার পড়েছে। জঙ্গলের শিশাল চুরি, খয়ের চুরি, আর কাঠকয়লা চুরি। গত মাসে থানাতে হাজিরাও দেয় নাই দাগীটা। কাল ওর গেরেপ্তারি হবে। আবার পাঁচ বছর ধরে জেলের ভাত খাবে দাগীটা। তোমার কোন ভাবনা নাই সরদারিন। এসো…চলে এসো। চৌধুরীজী দাঁড়িয়ে আছেন। আর দেরি কর কেন, সরদারিন?

ঘরের ভিতরের ছায়াটা আবার ছটফট করে ওঠে। তার পরেই একেবারে শান্ত হয়ে যায়। দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ায় ছায়াটা।

—তুই কে বটিস? চিৎকার করে দু পা পিছিয়ে যায় রামাই দিগোয়ার। তার পরেই একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের ডাক ছাড়ে—জলদি আসেন হুজুর। দাগীটা ঘরে আছে।

একটা ঝোলার ভিতর থেকে হাতকড়া আর দড়ি বের ক'রে, কাঁধের বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে ছুটে আসে চৌধুরী: শালাকে বেঁধে

ফেল রামাই।

কোন আপত্তি করে না, নড়েও না দাশু। রামাই দিগোয়ার দাশুর দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে, হাতকড়া পরিয়ে দেয় চৌধুরী। দাশুর কোমরটাকেও দড়ি দিয়ে দু পাক বেঁধে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চৌধুরী—সরদারিন গেল কোথায়?

দাশু—ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

চৌধুরী—যাবেই তো; তোর মত দাগীর ঘরে থাকবে কেন মুরলীর মত মাগি? কিন্তু ভাল ঠগিন বটে মাগিটা!

রামাই বলে—মাগিটা এই দাগীটার চেয়েও চালাক আর বদমাশ বটে হুজুর।

দাশুর কোমরের দড়ি ধরে টান দেয় চৌধুরী: চল।

গোবিন্দপুর থানার হাজতঘরে সাতটা দিন আর রাত পার করে দেবার পর যেদিন জেল হাজতে চালান হয় দাশু, সেদিন দাশুর প্রাণ যেন একটা দুঃসহ জ্বরের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছাড়ে। গোবিন্দপুর থানার পিশাচটা, চৌধুরীজী যার নাম, তার ছায়া আর চোখে দেখতে হবে না। ঐ ঘড়ঘড়ে স্বরের হাঁকডাক আর শুনতে হবে না।

যখন তখন এসে মুরলী কিষাণীর নাম করে এক-একটা গালভরা লালসার গালি আর ঠাট্টার বুলি চেঁচিয়ে বলতে ও হেসে উঠতে বড় মজা পায় চৌধুরী। মুরলীর মত কিষাণীর আগুনপারা যৌবনটি, গতরের ঠাটটি, আর বুকটির ও কোমরটির বাহারটি কি এক ভাতারের বশ হতে পারে রে বোকা কিষাণ? মাগি ঘরের বার হয়েছে, বেশ হয়েছে। চৌধুরীজীর কথা শুনে হাজত-ঘরের বন্দী যত কালো-কালো মুখগুলিও হো-হো করে হেসে ওঠে।

ভেজা ঠোঁটের সরস হাসিটাকে জিভ দিয়ে চেটে চৌধুরী আক্ষেপ করে: কিন্তু মাগিটা বড় চালাক বটে হে, সরদার। খিরিস্তান পলুস হালদারের সাথে চলেছে। মাগি শেষে মেমসাহেব হয়ে যাবে নাকি হে?

হাজত-ঘরের ভিড় আবার হেসে ওঠে। চৌধুরীজীর চোখে হঠাৎ ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে শিউরে কাতরাতে থাকে।—বড় শক্ত ঠাঁই নিয়েছে মাগি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, হারানগঞ্জে গিয়ে সিস্টার দিদির আদরের কবুতরটি হয়েছে মাগি। তা না হলে ওকে টেনে এনে থানার ভাত খাইয়ে ছাড়তাম হে।

—সিস্টার দিদি কওন ছে? হাজত-ঘরের ভিড়ের ভিতর থেকে একটা রুক্ষ মুখ দুপাটি দাঁতের সাদা বের করে হেসে ওঠে।

চৌধুরী—হারানগঞ্জের সিস্টার দিদির নাম শুনিস নাই মেড়ুয়া? এত বড় লাল মুখ, নীল চোখ, আর সাদা চুলের ঝুঁটি; বিলাতী বুড়ির একটা ভাই যে লাট সাহেব হয়েছিল হে! আজাদী হবার পর বিলাত পালিয়েছে সিস্টার দিদির লাট ভাই। কিন্তু, সিস্টার দিদির ডাঁট তবু মরে নাই।

ছোটকালুর বহেড়া জঙ্গলের একটা নেকড়ে একব'র ডরানির বানভাসির

যত মড়ার মাংস খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। নেকড়েটার গলার স্বরও বদলে গিয়েছিল। মনে হয় দাশুর, গোবিন্দপুর থানার এই চৌধুরীর গলার স্বরের মধ্যে সেই পাগল নেকড়েটারই গলার স্বর ঘড়ঘড় করছে। একদিন ধানক্ষেতের আলের কাছে দেখতে পেয়ে নেকড়েটাকে কাটবার জন্য টাঙ্গি হাতে নিয়ে তাড়া করেছিল দাশু। কিন্তু পালিয়ে গিয়েছিল নেকড়েটা।

সেই ব্যর্থতার আর অক্ষমতার আক্ষেপ তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু চৌধুরীজী নামে এই নেকড়েটাকে সেদিন রাতের অন্ধকারে ঘরের দরজার কাছে পেয়েও টাঙ্গির এক কোপে কেটে দু টুকরো করে দেবার ইচ্ছা কেন হয় নি, সে কথা এখন ভাবলে একটা জ্বালাময় আক্ষেপ দাশুর মনের ভিতরে ছটফট করে ওঠে। ভুল হয়েছিল; বড় খারাপ ভুল। সে ভুলেরই শাস্তি। একটা লুচ্চা লোভের ঠোঁট-চাটা নেকড়ে মুরলীর নাম করে যা-খুশি তাই বলে নিচ্ছে; আর দাশুকেও তাই নিজের কানে শুনতে হচ্ছে। আর যে সহ্য করতে পারা যায় না।

তাই জেল হাজতে যাবার দিনে দাশুর প্রাণটা সাত দিনের অভিশাপের গ্রাস থেকে সরে যাবার সৌভাগ্যে খুশি হয়ে ওঠে। গোবিন্দপুরের ছোট জেলখানা; ফটককটা পুরুলিয়ার জেলখানার ফটকের মত দরাজ নয়। কিন্তু গোবিন্দপুরের ছোট জেলখানার ভিতরের সব্জীবাগানটা দেখতে কী চমৎকার! মাটিটা লাল এঁটেল বটে; কিন্তু পচা হিঞ্চের সবুজ সার দিয়ে মাটি মজানো হয়েছে নিশ্চয়; তা না হলে মাটির রংয়ে এত কালোকালো দানা কেন, আর গন্ধটাও সোঁদা কেন? বাগানের একদিকে পুঁই আর লাউয়ের লতা মাচান উপচে ঝুলে পড়েছে। আর একদিকে শুধু চষা হয়ে পড়ে আছে মাটি। ওখানে ফুলকপির চারা লাগানো হবে বলে মনে হয়, নয়তো মুলো আর পালং।

জেল-হাজতে প্রথম রাতেই আধা-ঘুমের ঘোরে হেসে ফেলে আর জেগে উঠে কম্বলের উপর কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর বুঝতে পারে দাশু, কেন হেসে উঠল মনটা, আর মাথার ভিতরে একটা স্বস্তির আরামই বা বোধ হচ্ছে কেন?

মনে পড়েছে দাশুর, নেকড়ের মাংশসাশী আহ্লাদের চক্রান্তটাকে কী সুন্দর বুদ্ধির খেলায় বেকুব করে দিয়েছে মুরলী! ওর প্রাণের আর গতরের মান বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে! তুই সত্যিই হিসাব জানিস, বড় ভাল হিসাব জানিস, মুরলী।

ভাল হয়েছে। খুব ভাল। দাশুর আধা ঘুমের স্বপ্নটা যেন মুরলীর সৌভাগ্য দেখে খুশি হয়েছে। না, আর আক্ষেপ করার কিছু নেই। মুরলী যখন নিরাপদ, তখন পাঁচ বছরের কয়েদ নির্ভাবনায় সহ্য করতে পারা যাবে।

পাঁচ বছর? সত্যিই কি আবার পাঁচ বছরের শক্ত সাজা হবে? যদি হয়, হেই গো কপালবাবা, দাশু কিষাণের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবে তো? মুরলীর পেটে যে দাশু কিষাণের ছেইলা আছে। দেখতে কেমনটি হল, দেখতে কত ভাল লাগে নিজের ছেইলার মুখটা, সে সুখ জীবনে না বুঝে নিয়ে মরে যেতে ইচ্ছা করে না।

না, মরব কেন? দাশুর জীবনের আশা আর প্রতিজ্ঞা আবার আশ্বস্ত

হয়ে তন্দ্রাময় হাসি হাসে; কলঘরের বড় মিস্ত্রী খিরিস্তান পলুসের ঘরের সুখের গৌরবকে হার মানতে বাধ্য করবে যে দাশু, সে দাশু মরবে না। জেল থেকে ফিরে এসে ক্ষেতজোত করবে, নতুন মাটির ঘর তুলবে। আঙিনায় খড়ের মাচানের পাশে বসে সাঁঝের চাঁদের দিকে তাকিয়ে যখন মাদল বাজাবে দাশু, তখন আঙিনার দিকে মুরলীকে আস্তে আস্তে আর হেসে হেসে এগিয়ে আসতে দেখে একটুও আশ্চর্য হবে না দাশু—আমি তো জানতাম মুরলী, একদিন তোর ফিরে আসতে হবে। কিন্তু···তুই বল এবার, আজ আমি তোকে কেমন করে ঘরে ঢুকতে বলি?

—কেন সরদার? আমার লেগে কি তোমার মনে একটুকও মায়া নাই?

জেল-ফটকে বিউগল বাজে। হাজত-ঘরের দরজার বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। দাশু কিষাণের ঘুমভাঙা চেতনার মধ্যে একটা অভিমান যেন নীরবে গুনগুন করে, সত্যিই কি মধুকুপির গরীব কিষাণকে আবার পাঁচ বছরের কয়েদ খাটাবে কপালবাবা?

তারপর আর বেশি দেরি হয় না। জেল ফটকে সকাল নটার ঘণ্টা বাজতেই রুটি-গুড় আর জল খেয়ে যখন হাঁপ ছাড়ে দাশু, তখন হাজতঘরের দরজা খুলে যায়। দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে দুই সিপাহীর পাহারায় গোবিন্দপুরের আদালতের পথে এগিয়ে যেতে হয়। তিনটে চুরির অপরাধ, থানায় হাজিরা না দেবার অপরাধ, আর ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডার লুঠ করবার জন্য হাঙ্গামা মাতাবার অপরাধ। পাঁচটি অপরাধের বিচার বরণ করতে হবে। দাশু জানে, চৌধুরীজীই জানিয়ে দিয়েছে—এই পাঁচ কসুরের জন্য তোকে চালান করা হয়েছে রে দাগী।

জেল-হাজত থেকে আদালত, দাশুর জীবনটা আবার আসামী হয়ে দুই সিপাহীর পাহারায় আনাগোনা করে। প্রায় রোজই আধ ক্রোশেরও বেশি পথের লাল ধুলো মাড়িয়ে আদালতে যেতে হয়। আসামীর কাঠগড়ায় একবার দাঁড়াতেও হয়। কে জানে কি বলেন আর কি লেখেন হাকিম! তারপর আবার কোমরের দড়িতে টান দেয় সিপাহী। কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে হয়। আবার জেলের পথে ফিরে যেতে হয়, আবার জেল-হাজতের নিভৃতে কম্বলের উপর শুয়ে বসে শুধু ভাবনা। সেই ভাবনার মধ্যে একটা ক্ষেত আর গুলঞ্চের বেড়া, একটা নতুন মাটির ঘর; মুরলী আর মুরলীর ছেইলা, মাদল আর মহুয়ার মায়া তন্দ্রাময় হয়ে ওঠে। ভোরের বিউগল বাজলে তবে সেই তন্দ্রার ছবি ভাঙে।

কে জানে কবে বিচার শেষ হবে? আদালতের বাইরে একটা আমবাগান। তারই ছায়ায় বসে আসামী দাশুর কোমরের দড়ি ধরে হাঁকের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে রোজই হাঁপিয়ে ওঠে সিপাহী দুজন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সিপাহী গোকুল সামন্ত—এ অর্জুন সিং?

—কি হো? মাথা ঝেঁকে ক্লান্ত চোখের আলস্য ঝেড়ে ফেলে উত্তর দেয় অর্জুন সিং।

গোকুল সামন্ত বলে—ভালা পাগল হয়েছে আদালত। এক বেটা দেহাতী

চাষার ছটাকা চুরির মামলা খতম করতে আর কতদিন নিবে? রোজ রোজ সাক্ষী রে; সাবুদ রে; তারিখ রে। আর আমাদিগের দিনভর হয়রানি রে! ভালা, এতদিনে যে কোলের ছেইলার মোচ গজায়ে যায় হে।

অর্জুন সিং মুখ কুঁচকে দাঁতের ব্যথা চাপতে চেষ্টা করেঃ মত্ কহো ভাইয়া! থোড়াসা শিশাল, দো-চার সের কত্থা, ইতনাসা কোয়লা, সাড়ে চার রুপাইয়াকা মাল চোরিকে মামলা; ইসকে লিয়ে শও শও রুপেয়া খরচা! ইয়ে তো মামলা নেহি; তামাশা হ্যায় ভাইয়া!

দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে একটা রাগের হাঁক ছাড়ে সিপাহী গোকুল সামন্ত—তোমার লাজ লাগে নাই সরদার? মাগের কানে কোন্ সোনার মাকড়ি পরাতে সাধ হয়েছিল যে সাড়ে চার টাকার মাল চুরি করলে? সত্যি চুরি করেছিলে কি?

দাশু হাসেঃ হ্যাঁ, চুরি বল তো চুরি। ডাকাতি বল তো ডাকাতি, লুঠ বল তো লুঠ! যাদিগের মাল তাগিদের হুকুম না নিয়ে ওই সাড়ে চার টাকার মাল তুলে এনেছিলাম।

অর্জুন সিং—সে তো হলো, কিন্তু ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডার লুঠ করবার লেগে তুমি যে···;

গোকুল সামন্ত চেঁচিয়ে ওঠে—দূর দূর! দুখন গুমস্তার মত শয়তানের এজাহার তুমিও বিশ্বাস কর সিংজী?

অর্জুন সিং—কি সরদার? ঝুট বটে কি?

দাশু—হ্যাঁ।

গোকুল সামন্ত—নিশ্চয় তোমার উপর ওর রাগ আছে?!

দাশু—হ্যাঁ।

গোকুল—তবে আর তোমার ছাড়া নাই সরদার। চৌধুরী আর দুখনবাবু, ওরা দুজন হল দুটা ভগবান; আর থানাটা ওদের বৈকুণ্ঠ। ওদের দয়া খণ্ডাবে, কারও বাপের এমন জোর নাই।

অর্জুন সিংয়ের চোখ আবার ঢুলুঢুলু হয়। ঘুমের আবেশে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় করে অর্জুন সিং—সাড়ে চার রুপেইয়ার মাল চোরি না করে ভিখ মাংনা যে ভাল আছে রে ভাই। কাজ না মিলে তো ভিখ মাংগো। বাজারে বাজারে রাম নাম হাঁকতে চলো, আউর ভিখ মাংগতে চলো। পুনভি হোবে, ভুখভি মিটবে।

দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ ভয় পেয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। এ কি ভয়ানক অদৃষ্টের খবর শুনিয়ে দিয়ে ঘুমের আরামে মাথা ঝুঁকিয়ে ঢুলতে শুরু করেছে সিপাহীটা! ওর কপালে হলুদ রংয়ের কত বড় তিলক! মধুকুপির কিষাণের জীবনটা কি সত্যিই ভিক্ষুক হয়ে যেতে চলেছে?

দাশু কিষাণের পাথুরে ছাঁদের বুকটাও ধড়ফড় করে ওঠে; সত্যিই একটা ভিক্ষুকের নাকি সুরের চিৎকার আদালতের চারদিকের সব সোরগোলের বুক ভেদ করে উথলে উঠেছে। ভীরু কুকুরের আর্তনাদের মত একটা আবেদনের

ভাষা যেন কেঁউ কেঁউ করে ভিড়ের ভিতর ঘুরছে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু, নাকি সুরের গানের মত সুর করে ছড়া কাটছে ভিক্ষুকটা—দাতা দেবতা, দেবতা দাতা। দাতার মাথায় সোনার ছাতা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে ভিক্ষুকটা, আর পথের ভিড়ের মানুষগুলির চোখের সামনে একটা টিনের কৌটা দুলিয়ে বুড়ো কুকুরের মত ধুঁকে ধুঁকে নাকিসুরের বুলি ছাড়ছে—বাবা গো বাবা। একটা পয়সা যে তোমার পানের পিক গো বাবা! দুটা পয়সা যে তোমার চা-পানির থুক গো বাবা! খোঁড়া সাধুকে একটা-দুটো পয়সা দয়া কর গো বাবা!

সড়ক থেকে নেমে আমবাগানের ভিড়ের কাছে এগিয়ে আসে ভিক্ষুকটা; আর, দাশুর চোখের কাছ দিয়ে যেতে যেতে হাঁক দেয়—বাবা গো বাবা!

দাশুর বুকের পাঁজরগুলি যেন এক সঙ্গে ছিঁড়ে গিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ ছাড়ে—মেসো হে, ও তিনকড়ি মেসো!

থমকে দাঁড়ায় ভিক্ষুকটা। হ্যাঁ, মধুকুপির তিনকড়ি মেসোই বটে। বটের আঠা আর ধুলো মাথায় মেখে বড় বড় চুলের জটা করে, গিরিমাটি দিয়ে রঙিন করা এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়িয়ে, আর বুকের উপর এক মুঠো ছাই ছড়িয়ে দিয়ে সাধু সেজেছে যে তিনকড়ি, সে তিনকড়িও দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে দাশুর আরও কাছে এগিয়ে আসে।

সিপাহী গোকুল সামন্ত বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—না না না, আসামী হয়ে পাব্লিকের সাথে কথা বলবে না সরদার।

অর্জুন সিং চোখ মেলে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে হাঁ হাঁ হাঁ; রুল আছে, কারও সাথে বাতচিত করবে না আসামী।

দাশু—এ আমার গাঁয়ের মানুষ বটে।

সিপাহী গোকুল সামন্ত কি-যেন ভাবে। তারপর নরম স্বরে বলে—আচ্ছা, দুটা একটা কথা বলে নাও।

—তুমি এ কেমন দশাটি করলে মেসো? তিনকড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর গলার স্বরে একটা রাগের ঝাঁজ তপ্ত হয়ে ওঠে।

তিনকড়ি বলে—ফুলকিকে আর দুখ দিতে চাই না দাশু, তাই…।

দাশু—তাই ভিখমাগা হয়ে গেলে?

তিনকড়ি—হ্যাঁ রে বাপ।

দাশু—মাসী কি বলে?

তিনকড়ি—তোমার মাসী গাঁ ছেড়েছে, কয়লাখাদে চলে গিয়েছে। আমিও গাঁ ছেড়ে দিলাম দাশু।

দাশু—মাসীর সাথে তুমিও খাদে গেলে না কেন?

তিনকড়ি হাসে: না দাশু, আর নয়। তোমার মাসী সুখে থাকুক; আমার ভাত আমি করে নিব।

তিনকড়ির ফ্যাকাশে চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে আর জলে ভরে যায়। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলতে থাকে তিনকড়ি।

বাবা গো বাবা! বুড়া কুকুরের আর্তনাদের মত শব্দটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে আর টিনের কৌটা দুলিয়ে দুলিয়ে আদালত এলাকার ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু।

মরেছে, তিনকড়ি মেসো মরেই গিয়েছে! গাঁ ছাড়ল আর ভিখমাগা হল যে, তার আর মরণের বাকি কি আছে? দাশুর বুকের ভিতরের আতঙ্কটা আরও ভয়াল হয়ে ওঠে।

দুপুর পার হতে চলল। আমবাগানের ছায়াও গরম হয়ে উঠেছে। আজও কি মামলার রায় দিবে না হাকিম? ছটফট করে দাশু কিষাণের প্রাণ। দাশুর প্রাণটা যেন ভিক্ষুক হয়ে যাবার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই মুহূর্তে কয়েদ হয়ে যেতে চায়।

জানে না দাশু, কতক্ষণ ধরে এই ভয়াতুর ভাবনার মধ্যে ছটফট করতে করতে ঝিমিয়ে পড়েছিল মন; চোখ বন্ধ করে দুই হাঁটুর উপর মাথা পেতে দিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর আবার চোখ দুটো একটা ব্যাকুল পিপাসায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদিক-ওদিক তাকায় দাশু। না, জেলে যেতে ইচ্ছে করে না; এক ঝটকা দিয়ে অর্জুন সিংয়ের হাত থেকে কোমরের দড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

রোদ পড়ে বড়কালুর গায়ের ঝরনা চিকচিক করছে, কাছে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে। পলাশবনের ছায়ায় তিতির ডাকছে, একবার শুনে আসতে ইচ্ছে করে। জামকাঠের জিরজিরে কপাটের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ডরানির জল বড় ঠাণ্ডা! ছোটকালুর জঙ্গলের কেঁদ আর পিয়াল বড় মিঠা। সনাতনের মাদলের আওয়াজ আরও মিঠা। না, জেল যেতে চাই না কপালবাবা। তোমার দাশু কিষাণকে ছাড়া পাইয়ে দাও। দাশুর যে ঘর আছে, গাঁ আছে; মুরলীও যে একদিন এসে পড়বে; মুরলীর কাছে দাশুর ছেইলা যে আছে!

টিহা টিহা টিহা! আমবাগানের ছায়া আর বাতাস মিঠা করে দিয়ে শিউরে ওঠে একটা পাখির ডাক। চমকে ওঠে দাশুর বুক। দাশুর স্বপ্নকে যেন ঠাট্টা করছে পাখিটা। কী সর্বনাশ; এটা কি সেই পাপিয়া?

নিশ্চয় সেই পাপিয়ার ডাক। তা না হলে দাশু কিষাণের এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে কেন সকালী?

বেদেনী সকালীর কালো চোখ দুটোও হাসছে। দেখতে একটু রোগা আর শুকনো হয়েছে সকালী। কিন্তু মুখটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। সকালীর কাঁকালে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িতে লাল টুকটুক একগাদা পাকা তেলাকুচা। সকালীর হাতে জ্যান্ত তিতিরের একটা মালা। মধুকুপির পলাশবনের একটা বিহ্বল স্মৃতি এই আমবাগানের ছায়ার ভিতরে ঢুকে দাশুর দড়ি-বাঁধা কোমরের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে।

—এটা তোমার কে বটে হে সরদার? সকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বিরক্ত হয়, আর প্রশ্ন করে সিপাহী গোকুল সামন্ত।

দাশু বলে—আমার কেউ নয়। কিন্তু…।

গোকুল—কি?

উত্তর দেয় না দাশু। যেন সকালীর হাসির স্বরের জ্বালা সহ্য করবার জন্য মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

আরও কাছে এগিয়ে আসে সকালী: আমি তো তোমার কেউ নই; কিন্তু মুরলী তোমার কে বটে সরদার? একবার বল শুনি। মুরলীকে নিয়ে কেমন সুখের ঘর করছো, খবরটি একবার বল।

টিহা টিহা টিহা! আমবাগানের পাপিয়া ভয়ানক ঠাট্টার আমোদে আত্মহারা হয়ে পাতার আড়ালে লুটোপুটি করে ডাকতে থাকে।

গোকুল সামন্ত একবার অর্জুন সিংয়ের মুখের দিকে তাকায়। অর্জুন সিং মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ, দু-চারটে বাতচিত হোবে, এই তো। হোনে দেও ভাই।

গোকুল বলে—তোমরা একটুক আস্তে কথা বল, সরদার।

হাতের দড়ির তিনটে পাক আলগা করে দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বসে অর্জুন সিং। গোকুল সামন্ত আরও একটু দূরে। সরদারটার করুণ মুখের চেহারা দেখে দুজনের আপত্তি আর সাবধানতাও যেন একটু করুণ হতে চাইছে।

ফিস ফিস করে চাপা গলার স্বরে যেন একটা আক্রোশের জ্বালা দাশুর কানের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে সকালী: যে মুরলীর লেগে আমাকে ঠকালে, সে মুরলী এখন কোথায় আছে সরদার?

মাথা হেঁট করে দাশু।

সকালী—নিজেই ছুটে এসে সকালীর বুক ছুঁয়ে দিলে, শেষে সকালীকে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেলে সরদার। ছিয়া ছিয়া; মরদে কি মেয়েমানুষকে এমন দুখও দেয়?

দাশু—আমার দোষ হয়েছে। মাপ করবে কি?

হেসে ফেলে সকালী: তুমি মুরলীকে চিনেছ কি?

—চিনেছি।

—কিন্তু মুরলীকে ঘিন্না কর কি?

চমকে ওঠে আর বোকা বোবার মত শুধু ঠোঁট নাড়ে দাশু। সকালীর মুখের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে।

সকালী হাসে: তবে বল সরদার। আমার মরদ হতে ইচ্ছা হয় কি?

দাশু কিষাণের মাথার রক্তে একটা নেশার স্মৃতি চনচন করে ওঠে। বুকের উপর একটা নগ্ন কোমলতার স্মৃতি তপ্ত হয়ে ওঠে। চোখের উপর স্বচ্ছ জলের তরলতা দিয়ে গড়া একটা মধুরতার ছবি টলমল করে।

সকালী বলে—কিসের গাঁ, কিসের ঘর, কিসের বিয়া সরদার? সব ভুলে যাও। আমার সাথে থাক। আমার মরদ হয়ে মন ভরে সুখ কর। আমি তোমাকে ভাত দিব, কাপড় দিব, হাড়িয়া দিব। যেদিন ইচ্ছা হবে চলে যেও।

ইচ্ছা হলে সকালীকে টুঁটি চিপে মেরে রেখে চলে যেও।

—সকালী! আস্তে ডাকতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আদালতের বারান্দার উপর এসে হাঁক দিয়েছে পিয়াদা। দাশু আসামীর মামলার হাঁক।

একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সিপাহী গোকুল সামন্ত আর অর্জুন সিং।

—বাস্, আর বাতচিত হোবে না, খবরদার! দাশুর কোমরের দড়ি ধরে টান দেয় অর্জুন সিং।

ঝুড়ির তেলাকুচা সরিয়ে শালপাতায় মোড়া একটা বস্তু বের করে কাতরভাবে মিনতি করে সকালী—একটুক সবুর করেন সিপাহীজী।

—ওটা কি বটে? চোখ বড় করে তাকায় গোকুল সামন্ত।

সকালী—মকাইয়ের খইয়ের দুটা মোয়া বটে। সরদারকে মোয়া দুটা খেয়ে নিতে দেন সিপাহীজী।

—আর না। খবরদার। ধমক দেয় অর্জুন সিং।

আমবাগানের ছায়ার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকালী। ব্যস্তভাবে হেঁটে দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে আদালত ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে সরদারের যে পাথুরে ছাঁদের চেহারাটা, সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁকালের ঝুড়ির দিকে তাকায় সকালী। লাল হয়ে ওঠে আর চিকচিক করে সকালীর কালো চোখ। সকালীর ভেজা চোখে টুকটুকে লাল পাকা তেলাকুচার ছায়া পড়েছে।

আদালত এলাকার ভিড় বেশ ফাঁকা হয়ে যায়। বিকালের আমবাগানের ছায়া বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু চলে যায় না, আর সরেও যায় না সকালী। এক ঠায় দাঁড়িয়ে আদালত ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঢং ঢং করে চারটা ঘণ্টা বাজল। আদালত ঘর থেকে বের হয়েছে দাশু। দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে। দাশুর কোমরের দড়ি শক্ত করে ধরে আছে অর্জুন সিং। গোকুল সামন্ত প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে তুলে আর দাশুর প্রায় গা ঘেঁষে ঘেঁষে মচমচ করে হেঁটে আসছে।

সকালীর হাতে মকাইয়ের মোয়া দুটো কেঁপে ওঠে। সকালীর চোখের কাছ দিয়েই যেতে যেতে হেসে ওঠে দাশু: তিন বছর কয়েদ হলো সকালী। ফিরে আসি, তারপর তোমার মোয়া যদি খাওয়াতে চাও…।

অর্জুন সিং হাঁকে—খবরদার, আর বাতচিত নেহি।

সড়কে দাঁড়িয়ে তাকালে সবার আগে চোখ পড়বে গির্জাবাড়ির চূড়া, তারপরেই চোখ পড়বে তিন হাত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা সমাধিভূমি। সারি সারি, আবার এদিকে ওদিকে ছড়ানো যত ঢিবি, ঢিবিগুলির উপর কাঠের ক্রস। কোনটা হেলে পড়েছে, কোনটা ক্ষয়ে গিয়েছে, আবার খাড়া দাঁড়িয়ে আছে কোনটা। সমাধিভূমির ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলেই প্রথমে যে ছায়াময় প্রকাণ্ড একটা আমগাছ চোখে পড়ে, সেটাই বোধহয় এই সমাধিভূমির

সব গাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সের গাছ। সে গাছের কাছে পাথর-বাঁধানো যে সমাধি আজও শক্ত হয়ে বসে আছে, সেটাই হল সবচেয়ে পুরনো সমাধি। সমাধির পাথুরে বুকের উপর লেখা আছে সমাহিতের নাম—ফাদার হার্ন।

ফাদার হার্নের নাম নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে গড়ে উঠেছিল যে হার্নগঞ্জ, তারই আজকের নাম হারানগঞ্জ। ডাঙার পর ডাঙা পার হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে ফাদার হার্নের পঞ্চাশ বছর আগের স্বপ্নের উপনিবেশ। একটা কনভেণ্ট আছে। দুটো স্কুল আছে। একটা অনাথবাড়ি আছে। আর আছে একটা কুষ্ঠী আশ্রম—লেপার আসাইলাম।

এক-একটা ডাঙার বুকের উপর এক-একটা বসতির রূপও চোখে পড়ে। লাল খাপরার চালা আর চুনকাম করা দেয়াল, ছোট ছোট ঘরগুলি পরিষ্কার ছকের ছবির মত ফুটে রয়েছে। এইসব ঘরে যারা থাকে, তারা সবাই খিরিস্তান। প্রতি রবিবারের সকালবেলায় গির্জাবাড়ির ঘণ্টা যখন ডিং ডাং করে বাজতে থাকে, তখন এইসব ঘরের ভিতর থেকেই ছোট ছোট ভিড় বের হয়ে আসে আর প্রেয়ার সাধবার জন্য গির্জাবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

এরাও চারদিকের নানা গাঁয়ের নানা জাতের মানুষ। কিন্তু সেইসব গাঁয়ের আর জাতের স্মৃতি ওদের জীবন থেকে মুছে গিয়েছে। আজ ওরা শুধু হারানগঞ্জের মানুষ। একই বিশ্বাস, একই আশ্বাস আর একই প্রীতির শাসনে ঘষামাজা একটা নতুন জীবনের মানুষ। ওদের জীবন মাটি-কোপানো আর লাঙল-ঠেলা জীবন নয়। সকাল হলে কিংবা দুপুর হতেই ওরা সাইকেলের সওয়ার হয়ে চারদিকের দু ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে চলে যায় মতিডিহিতে রেলওয়ের মেরামতি কারখানাতে, এজরা ব্রাদার্সের যত কয়লাখাদের কল-ঘরে, রামনগরের পটারিতে, আর কলিয়াবাগের ফ্যাক্টরিতে। এইসব কল খাদ আর কারখানার বিলাতী মালিকেরা আজও হারানগঞ্জের মানুষকে কাজ দিতে আর কাজের সুবিধা দিতে ভুলে যান না। তা ছাড়া, যে সিস্টার মাদলিনের স্নেহে হারানগঞ্জের খিরিস্তান কলোনি আজও লালিত হয়ে চলেছে, তাঁর ইচ্ছার সুপারিশও কেউ তুচ্ছ করতে পারেন না। সিস্টার দিদির এক চিঠিতে একদিনেই চাকরি হয়ে যায়, এই কথা এই কলোনির বাইরের মানুষও জানে।

খিরিস্তান হোক আর অখিরিস্তান হোক, সিস্টার দিদিকে কে না শ্রদ্ধা করে করে? এই হারানগঞ্জে আর এই হারানগঞ্জের চারদিকের অন্তত পঞ্চাশটা গাঁয়ের ঘরে ঘরে যেয়ে সুখদুঃখের খবর নিয়ে জীবনের ত্রিশটা বছর এখানেই পার করে দিলেন যিনি, তাঁর মুখে সদা-সর্বদা একটা ক্লান্তিহীন আনন্দের শান্ত হাসি ফুটেই রয়েছে। সে হাসি দেখলে নিতান্ত অখিরিস্তান অভক্তের মনেও ভক্তি দেখা না দিয়ে পারে না। সদরের সদরালা থেকে শুরু করে থানার কনস্টেবল পর্যন্ত সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, আর একটু ভয়ও করে বোধহয়। ঝড়-বাদলের দিনেও যখন ষাট বছর বয়সের সিস্টার মাদলিন তাঁর সেই নীল রঙের ছোট সাইকেলে চড়ে তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে জংলী ডিহির এক নতুন খিরিস্তান চাষীকে জ্বরের ওষুধ খাওয়াবার জন্য ছুটে যেতে থাকেন, তখন

তাঁর মুখের সেই শান্ত হাসি যেন অদ্ভুত এক জেদের জ্বালায় দপদপ করে জ্বলে। তখন তাঁকে দেখতে একটু অদ্ভুত রকমের লাগে বইকি! যারা দেখতে পায়, তারা আশ্চর্য হতে গিয়ে একটু ভয়ও পায়; সিস্টার দিদির দয়া যেন একটা একরোখা প্রতিজ্ঞার অভিযান।

বেশি দিন হয় নি, এই তো মাত্র দিন পনর আগে এইরকমই একটা একরোখা প্রতিজ্ঞার আবেগে নীল রঙের সাইকেলে চড়ে এক সকালে হারানগঞ্জ থেকে ভুবনপুরের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন সিস্টার দিদি। মধুকুপির সেই সুন্দর চেহারার কিষাণী মেয়েটি গাঁ থেকে তাড়িত হয়ে, বাঘের হামলা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আর ছুটে এসে এজরা ব্রাদার্সের কয়লাখাদের হাসপাতালে ঠাঁই নিয়েছে, খবর পেয়েই তার সঙ্গে দেখা করতে আর একটি দিনও দেরি করেন নি।

কয়লাখাদের হাসপাতালের ঘরে ঢুকেই মুরলীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সিস্টার দিদি : মুরলী, লাভলি মুরলী বহিন, চল, তোমাকে এখনই আমার কনভেন্টে নিয়ে যাব।

সিস্টার দিদির দয়া, আর সিস্টার দিদির হাসি। দেখতে পেয়ে মুরলীর প্রাণটাই হেসে ওঠে। কল্পনা করতে পারে নি মুরলী, এত তাড়াতাড়ি এত বড় সৌভাগ্য এত কাছাকাছি এসে মুরলীর জীবনের আশাকে জড়িয়ে ধরবে।

পলুস হালদারের দিকে চোখ পড়তেই একটু আশ্চর্য হন সিস্টার দিদি : তোমার কি খবর পলুস?

পলুস—খবর ভাল বটে দিদি, এখন শুধু তোমার দয়া চাই।

—বল ভাই, কিরকম দয়া মাংতা হ্যায়! আচ্ছা নোকরি?

পলুস—না দিদি।

—তবে?

হঠাৎ মুরলীর মুখের লাজুক হাসিটা সিস্টার দিদির চোখে পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে যেন বিপুল কৃতার্থতার আনন্দে হেসে ওঠে সিস্টার দিদিরও চোখ দুটো : খুব ভাল কথা। মুরলীর সাথে তোমার বিবাহ হবে, অতি ভাল কথা বটে।

সিস্টার দিদির সঙ্গে হারানগঞ্জে চলে যাবার আগে শুধু একবার ক্ষণিকের মত গম্ভীর হয়ে মহেশ রাখালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মুরলী : তুমি ভাল হয়ে ঘরে চলে যেও বাপ। আমি হারানগঞ্জে চললাম।

—ঝালদা যাবি না? চমকে উঠেছিল বুড়ো মহেশ রাখাল।

—না। হেসে ফেলে মুরলী : আমার যেথা যাবার ছিল সেথা যাচ্ছি বাপ; তুমি রাগ করো না।

মুখ ফিরিয়ে নেয় মহেশ রাখাল। মুরলীর মুখের দিকে আর তাকায় না।

এই হাসিমুখ নিয়েই রওনা হয়ে হারানগঞ্জের কনভেন্টে চলে এসেছে মুরলী। হারানগঞ্জের কনভেন্টের জীবনও এত ভাল লাগবে, কল্পনা করতে পারে নি মুরলী। সবই নতুন, তাই সবই ভাল লাগে। মুরলীর কালো চোখের চাহনি সব সময় যেন হেসে হেসে ঝকঝক করে। ঘরটা কী সুন্দর! ঘরের

দেয়ালে একটা জানলা, সে জানলার কাছে দাঁড়ালে গির্জাবাড়ির চূড়াটা দেখা যায়।

কনভেণ্টের মেয়েরা খিলখিল করে হাসে। কী মিষ্টি কলরবের ঝুমুর! মেয়েগুলির খোঁপার ছাঁদও দেখতে কত ভাল লাগে। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকবার পর মুরলীর মনের আশা আবার হেসে ওঠে।

ডিং ডাং, ডিং ডাং, গির্জার ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যায় মুরলী। আর বেশিদিন বাকি নেই, সিস্টার দিদি বলেছে একদিন গির্জাবাড়িতে গিয়ে ঈশাই মানবে মুরলী। তার কয়েক দিন পরেই···।

ভাবতে গিয়ে মুরলীর চোখের চাহনি নিবিড় হয়ে ওঠে, আর ঠোঁট দুটোও নিবিড় হাসির আবেগে ফুলে ফুলে কাঁপে।

সিস্টার দিদি এসে একদিন মুরলীকে বলে গেলেন—যদি ইচ্ছা কর, তবে বিবাহের পর এখানে এসে রোজ লেখাপড়া শিখে যেতে পার বহিন। ওই দেখো ওই মেয়েটি, উহার নাম মেরিয়া, মেয়েটি ছয় মাসের মধ্যে বাইবেল পড়তে শিখে ফেলেছে।

মুরলীর সারা মুখ জুড়ে আবার একটা স্বপ্নময় আশার হাসি ঝিলিক দিয়ে ফুটে ওঠেঃ হ্যাঁ দিদি, দয়া করে আমাকে লিখাপড়া শিখিয়ে দিও।

সিস্টার দিদি—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি যে সব সময় খিরিস্তানের সেবার জন্য বলিদান হয়ে আছি।

তারপর আর দেরি হয় না। গির্জাবাড়িতে গিয়ে ঈশাই মেনে নিয়ে সিস্টার দিদির প্রার্থনার গান শুনতে হল; মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন সিস্টার দিদিঃ ধরম বুঝে করম করবে, ধরমের মান রাখবে, খিরিস্তান বেরাদারী আর সিস্টারীর সেবিকা হবে; সুখী হও জোহানা।

জোহানা! নামটা যেন মুরলীর নতুন অদৃষ্টের জন্মোৎসবের ধ্বনি! বেদীর মোমবাতির আলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মুরলী, এই জীবনটাকে কিষানীর কষ্টের জীবন বলে আর ধিক্কার দেবার দরকার হবে না। গির্জাবাড়ির ঘরভরা ভিড়ের গলায় একটা আশীর্বাদের গান বেজে চলেছে; শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যায় মুরলীর মন, হাসতে হাসতে গির্জাবাড়ি থেকে কনভেণ্টের ঘরে ফিরে এসে জানলার কাছে দাঁড়ায় মুরলী। দেখতে পায়, জানলার দিকে তাকিয়ে আর চোখমুখ হাসিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছে পলুস হালদার। হাত তুলে, হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে মুরলীর মনের চঞ্চলতাকে সান্ত্বনা দেয় পলুস। এই তো, আর মাত্র পাঁচটা দিন বাকি।

সেই পাঁচটা দিনও মুরলীর চোখ আর মুখ শুধু হেসে হেসে তৃপ্ত হয়ে যায়। কনভেণ্টের মেয়েরা এসে পলুসের নাম ধরে কী সুন্দর আর কত নতুন রকমের ঠাট্টা করে! সে ঠাট্টার ভাষাও নতুন রকমের।

—কে কাকে বেশি ভালবাসে জোহানা?

মেরিয়ার প্রশ্নের হাসি শুনে চমকে ওঠে মুরলীঃ কি বলছো বহিন?

মেরিয়া—তুমি পলুসকে বেশি বেসেছ, না, পলুস তোমাকে বেশি বেসেছে?

হেসে ফেলে মুরলী : গড জানে!

মেরিয়া—গড তো জানে; কিন্তু তুমি জান কি না?

মুরলী—আমি জানি না।

মেরিয়া—বিয়ার পরে জানতে চাও?

মুরলী—হ্যাঁ।

মেরিয়া—আগে জান নাই?

মুরলী—না।

মেরিয়া মুখ টিপে হাসে : একবারও না?

—না গো না; ছিয়া! বলতে বলতে মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে মুরলী। মুরলীর কোমরে একটা মৃদু চিমটির আদর বুলিয়ে দিয়ে চলে যায় মেরিয়া।

পাঁচদিন পরে মেরিয়া নিজের হাতে মুরলীর খোঁপাটাকে নতুন ছাঁদে বেঁধে দিল। রঙিন ফুলের মালা দিয়ে খোঁপা জড়িয়ে নিয়ে গির্জাবাড়িতে গিয়ে আবার বেদীর মোমবাতির আলোকের দিকে যখন তাকায় মুরলী, তখন মুরলীর জীবনের আশা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মুরলীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে পলুস হালদার।

আবার সিস্টার-দিদির প্রার্থনার গান শুনে, আর ঘরভরা ভিড়ের আশীর্বাদী গানের কোরাস শুনে যখন গির্জাবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায় পলুস হালদার আর জোহানা হালদার, তখন ফুলের সাজ পরা একটা গো-গাড়ি গির্জাবাড়ির ফটকের কাছে সড়কের উপর চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মেরিয়ার মিষ্টি ঠাট্টার ভাষা শুনে হেসে হেসে আর মুগ্ধ হয়ে গো-গাড়ির ভিতরে ঠাঁই নেয় হারানগঞ্জ কলোনির এক নবদম্পতি। চলতে থাকে গো-গাড়ি।

মুরলী—তোমার ঘর কি এখান থেকে ঢের দূর বটে?

পলুস হাসে—না।

লাল খাপরার চালা; আর ইঁটের দেয়াল; একখানি ঘর। ছোট একটা দাওয়া; দাওয়ার উপর ছোট্ট একটা রোঁয়াভরা আদুরে কুকুর। ঘরের দিকে চোখ পড়তেই হেসে ওঠে মুরলীর কালো চোখের চাহনি।

গো-গাড়ি থেকে নেমে ঘরের দিকে এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। আদুরে কুকুরটা এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর কোলের উপর উঠতে চায়। কুকুরটাকে কোলে তুলে নেয় মুরলী। পলুস হাসে : কুকুরটা বড় চালাক বটে!

মুরলী—কেন?

পলুস—তোমাকে চিনে নিয়েছে।

মুরলী হাসে : কি চিনলে?

পলুস—তোমার কোল নরম বটে।

মুরলীর মুখের হাসি আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে। ঘরের ভিতরে ঢুকে

মুরলীর মুখের এই মিষ্টি হাসিটাই যেন চমকে ওঠে। এই চমকও একটা নতুন চমক। নিজের এমন রূপের ছবি নিজেই কখনও দেখতে পায় নি মুরলী।

পলুসের ঘরের ভিতরে একটা কাঠের বাক্সের উপর প্রকাণ্ড একটা আয়না। সেই আয়নার বুকে মুরলীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ঢলঢল করছে। মুরলীর চোখ দুটো কত কালো আর কেমন টানা-টানা, আজ এই প্রথম ভাল করে দেখতে পেল মুরলী। মুরলীর ঠোঁটের হাসিটা যে এমন ফুলে ফুলে কাঁপে, তাও আগে কোন দিন দেখতে পায় নি মুরলী। ফুলের মালা জড়ানো খোঁপা, আর রঙিন আঁচলের শাড়ি পরে পলুসের পাশে দাঁড়ালে কেমন দেখায় মুরলীকে, আয়নাতে তারও ছবি দেখতে পেয়ে ধন্য হয়ে যায় মুরলীর দুই চোখের সাধ।

পলুসের পরনে সাদা পেণ্টালুন, গায়ে নীল রঙের একটি কামিজ, গলায় রামধনুর মত পাঁচমিশালী রঙের একটা রুমাল জড়ানো। মুরলীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে পলুস। মনে হয় মুরলীর, এই পলুস হালদার মুরলীকে একটা ভয়ানক বাঘ-ডাকা জঙ্গলের ভয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে মুরলীর স্বামী হয়েছে। পলুসের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে, তাই না আজ নিজেকেও এত ভাল করে দেখতে চিনতে আর বুঝতে পারছে মুরলী।

পলুস বলে—আয়নাটা তোমার লেগে কিনেছি, জোহানা।

মুরলী হাসে ঃ কবে কিনলে? যেদিন আমার হাতের জল খেলে, সেদিন কি?

পলুস—না, কাল গোবিন্দপুর বাজার থেকে কিনে এনেছি।

মুরলী আবার চোখ টিপে হাসে ঃ এত দেরিতে কিনলে কেন? বিশ্বাস কর নাই বুঝি।

পলুস—বিশ্বাস করেছিলাম জোহানা, তুমি আমার কাছে না এসে পারবে না। সেটা কোন কথা নয়। কথা হলো, বাঘিনটাকে মেরে গোবিন্দপুরের থানা থেকে পঁচিশ টাকা বকশিশ পেলাম। ভাবলাম, বকশিশের টাকা দিয়ে সবার আগে যে জিনিসটা কিনবো, সেটা জোহানার জিনিস হবে। তাই আয়নাটা কিনলাম।

পলুসের কাঁধের উপর মাথা লুটিয়ে দেয় মুরলী। মুরলীর শরীর যেন একটা নেশার আবেশে অলস হয়ে গিয়েছে। মুরলীকে দু হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাক দেয় পলুস—জোহানা!

উত্তর দেয় না মুরলী। পলুসের বুকে লুটিয়ে পড়ে থাকা নতুন জীবনের ছবিটাকেই আয়নার দিকে তাকিয়ে দুই কালো চোখের পিপাসা মিটিয়ে নিতে থাকে মুরলী।

পলুস বলে—তোমার জ্বর হলো না তো, জোহানা?

মুরলী—না।

পলুস—গা এত গরম কেন?

মুরলী হাসে—গা জানে।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলুস হালদার। মুরলীর চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিদ্যুতের মত একবার হেসে উঠল। তারপরেই ভিজে গেল।

—কাঁদলে কেন জোহানা? প্রশ্ন করতে গিয়ে পলুস হালদারের গলার স্বরে একটা বিস্ময়ও কেঁপে ওঠে।

মনে মনে একটা প্রবল কুণ্ঠার সঙ্গে লড়তে গিয়ে হেরে গিয়েছে মুরলী; এই চোখের জল বোধহয় সেই পরাজয়ের ব্যথার একটা বানভাসি তরলতা। দাশু কিষাণ নামে একটা মানুষের ছায়াকে যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে মুরলী, আর সেই ছায়াটাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে।

জোরে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে মুরলী বলে—না, কিছু নয় পলুস। মনে পড়েছে, তোমাকে একদিন বড় দুখ দিয়েছিলাম। ভেজা চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে মুরলী।

—কবে? আরও আশ্চর্য হয় পলুস।

—তুমি আমাকে ছুঁয়েছিলে বলে গালি দিয়েছিলাম।

হো-হো করে হেসে ওঠে পলুস: সে কথা আজ আবার মনে কর কেন জোহানা?

মুরলী—তোমার রাগ হয় নাই কি?

পলুস—হ্যাঁ, হয়েছিল।

মুরলী—আজও রাগ আছে কি?

পলুস হাসে—আছে।

মুরলী—তবে?

—আঃ, তোমার প্রাণটাও বড় নরম বটে জোহানা। মুরলীর নরম গতরের অদ্ভুত উষ্ণতার স্বাদ যেন প্রাণের ভিতরে বরণ করে নেবার জন্য মুরলীর এই অভিমানভীরু অথচ ছলনাহীন সরু কোমরটাকে নিবিড় আগ্রহের বাঁধনের মত দু হাতে জড়িয়ে ধরে পলুস হালদারও জীবনের এক নতুন নিঃশ্বাসের নেশায় ফিসফিস করে: আজ আমি যে তোমারই মরদ বটি জোহানা; আমাকে সাধতে হবে কেন?

মুরলী বলে—চুপ কর।

চুপ করে পলুস হালদার।

কিন্তু লাল খাপরার চালা আর ইঁটের দেয়াল, এই ছোট ঘরটা যেন দুরন্ত এক নিশ্বাসময় ব্যস্ততার মধ্যে ফিসফাস করতে শুরু করেই হঠাৎ একটা আতঙ্কের রূঢ় চিৎকার ছেড়ে কেঁপে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে পলুস—জোহানা!

আর মুরলীও হঠাৎ আতঙ্কে বিব্রত হয়ে নিবাবরণ শরীরটার শিহরিত লজ্জা লুকিয়ে ফেলবার জন্য মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে থাকা রঙিন শাড়ির আঁচলটাকে একটা থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরে; কিন্তু গায়ে জড়াতে পারে না। মুরলীর হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে পলুস আবার ডাক দেয়—জোহানা! মুরলী ভ্রূকুটি করে—কি?

পলুস—এ তোমার কেমন কোমর বটে ?

মুরলীর চোখ দুটো ছলছল করে হাসে ঃ তুমি যা বুঝেছ, তাই বটে পলুস।

পলুস—আমাকে আগে বল নাই কেন ?

—মুরলী—আগে না বলে কি কোন দোষ হলো ?

পলুস—হ্যাঁ।

মুরলী আশ্চর্য হয় ঃ আগে বললে কি তুমি আমাকে ঘরে নিতে না ?

পলুস—তোমাকে নিতাম, কিন্তু সরদারের ছেইলাকে নিতাম না।

ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী—সরদারের ছেইলা ভাবছো কেনে পলুস, ও যে আমার ছেইলা !

পলুসের চোখের হাসিটা যেন কটমট করতে থাকে ঃ তা হয় না জোহানা। কোন পাগলেরও পরের ছেইলার বাপ হতে সাধ হয় না।

কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—কিন্তু ও যে আমারও ছেইলা বটে গো ! আমাকে এত মায়া কর তুমি, আমার ছেইলার লেগে তোমার মায়া হয় না কেন পলুস ?

পলুস—তোমার এই ছেইলাকে ওর বাপের ঘরে রেখে এলে ভাল করতে।

কেঁদে ফেলে মুরলী ঃ তা হলে আমার ছেইলা যে মরে যেত পলুস !

—মরে যেত যদি, তবে মরে যেত। কিন্তু আমি পরের সাধের বোঝা মাথায় নিব কেন ?

মুরলীর বুক কাঁপিয়ে দিয়ে একটা করুণ আর্তনাদের তীক্ষ্ণ স্বর ঠিকরে বের হয় ঃ এমন কথা বলতে হয় না পলুস।

মুরলীর হাত ছেড়ে দিয়ে সরে যায় পলুস। শাড়িটাকে তুলে নিয়ে এলোমেলো করে গায়ে জড়িয়ে মেঝের উপর বসে আয়নার দিকে দুটো ভীরু চোখ তুলে দেখতে থাকে মুরলী, পুড়ে গিয়েছে মুরলীর মুখের হাসি। ঠোঁট দুটো কয়লার টুকরোর মত কালো হয়ে গিয়েছে। বিয়ের ফুল খোঁপা থেকে খসে পড়ে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আস্তে আস্তে মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে মুরলীর মাথায় হাত দিয়ে পলুস বলে—যা হবার হয়েছে, কিন্তু তুমি এত ভাবছো কেন জোহানা ?

পলুসের কথাগুলি অদ্ভুত এক সান্ত্বনার ভাষার মত মুরলীর কানের কাছে বাজতে থাকে। চমকে ওঠে মুরলী ; শুকনো ঠোঁটের পোড়া হাসিটাই আবার সজীব হয়ে ওঠে ঃ কি বলছো ?

পলুস—হারানগঞ্জের অনাথবাড়ি আছে ; তুমি ভাবছো কেন ?

—এমন কথা বলো না পলুস। আবার আর্তনাদের মত শিউরে ওঠে মুরলীর গলার স্বর।

—কিসের ডর জোহানা ?

তুমি বুঝে দেখ। তোমার কুকুরটা আমার নরম কোলে বসবে, কিন্তু আমার ছেইলাটা অনাথবাড়িতে যাবে…তোমার পায়ে পড়ি পলুস ; একটুক বুঝে দেখ।

পলুস হাসে : আমি বুঝেছি জোহানা ; তুমি বুঝছো না।

মুরলী—আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

পলুস—সিস্টার দিদিকে একবার শুধিয়ে দেখ ; তবে বুঝবে আমি ঠিক কথা বলছি কি না।

সিস্টার দিদি ! নাম শুনেই মুরলীর চোখ দুটো চমক দিয়ে হেসে ওঠে। কথায় কথায় হঠাৎ যার নাম করে ফেলেছে পলুস হালদার, তারই দয়া যে আলোকের মত পথ দেখিয়ে মুরলীর জীবনকে নতুন সুখের জগতে নিয়ে এসেছে। এই নামটা মনে পড়লেই নির্ভয় হয়ে যায় মুরলীর জীবনের আশা। সিস্টার দিদির নীল চোখের চাহনির সামনে দাঁড়ালেই মুরলীর কালো চোখে যেন ভরসার বিদ্যুৎ হেসে ওঠে। সাচ্চা দেবী বটে সিস্টার দিদি, ভুবনপুরের মাঈথানের মাটির দেবীর মত মিথ্যা দেবী নয়। মধুকুপির দুখি কিষাণী মাঈথানের দেবীর পায়ের কাছে ফুল আর গুড় রেখে দিয়ে কতবার ছেইলা চেয়েছিল, কিন্তু পেয়েছিল কি ? পায় নাই। কাছে গিয়ে চাইলেও মাটির দেবী দয়া করতে জানে না। আর, সিস্টার দিদির কাছে চাও বা না চাও, সাচ্চা দেবীর মত নিজেই ছুটে এসে দয়া করে। যখন ইচ্ছা তখন সিস্টার দিদির হাতের ছোঁয়া কপালে বুলিয়ে নিতে পারা যায়। মুরলীর গালে টোকা দিয়ে, মুরলীর চিবুক টিপে আজই তো বার বার আদর করেছে সিস্টার দিদি : আমি তোমার দুখ মিটাতে সব সময় রেডি আছি বহিন জোহানা ! যখনই দরকার হবে, আমাকে ডাকবে।

মুরলীর বুকের ভিতরে মানতের মত একটা আবেদনের ভাষা নীরবে বিড়বিড় করতে থাকে—আমি তোমার কাছে মানত করছি সিস্টার দিদি, আমার ছেইলা আমাকে পাইয়া দাও।

পলুস বলে—আমার কথাটা কানে গেল কি ?

হেসে ওঠে মুরলী : শুনেছি।...হ্যাঁ...সিস্টার দিদি যা বলবে, তা তুমি মেনে নিবে তো ?

পলুস—নিশ্চয় মেনে নিব। কিন্তু...।

মুরলী—কি ?

পলুস—তুমি মেনে নিবে তো ?

মুরলীর কালো চোখের হাসি আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে : নিশ্চয়। সিস্টার দিদির বিচার না মেনে নিব তো কার বিচার মেনে নিব, বল ?

খুশি হয় পলুস। পলুসের এতক্ষণের গম্ভীর ও করুণ একটু বিষণ্ণ যে-মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া থমকে ছিল, সেই মুখটাও হেসে ওঠে : ঠিক বলেছো জোহানা ; সিস্টার দিদির বিচার বড় ভাল বিচার। হোই পাহাড়টা, ডরানি নদীটা আর হাতিয়া তারাটারও ভুল হয়, কিন্তু আমাদিগের সিস্টার দিদির ভুল হয় না।

মুরলী খিলখিল করে হাসে : বড় ভাল কথা বলেছ, পলুস।

পলুস—হ্যাঁ জোহানা ; পাহাড়ের পাথরও ফাটে আর ধুলা হয়ে যায় ;

ভরানির জল ক্ষেতের ধান মারে, আর হাতিয়া তারাতেও কালা বাদল আনে না। কিন্তু, সিস্টার দিদির দয়া দেখ ; যার যেমনটি দুখ, তার লেগে তেমনটি দয়া। তোমাকে দাগী কিষাণের ঘরের দুখ থেকে বাঁচায় ; আর আমাকে ক্ষেপী কিষাণীর জংলী সাধের মার থেকে বাঁচায়।

মুরলী—বেঁচে থাকুক সিস্টার দিদি ; আমাদিগের মত পাপী-তাপীর দুখ মিটাতে আরও বয়স নিয়ে, শ' বছরের বুড়া হয়ে বেঁচে থাকুক সিস্টারদিদি।

পলুস—সে আর বলতে হবে না। সিস্টার দিদির সাথে সাথে ইঞ্জেল থাকে ; কোন ডেভিলের সাধ্যি নাই সিস্টার দিদির গায়ে একটা ঢেলা ফেলতে পারে। শুনবে তো বলি···বাবুরবাজারে আমি নিজের চোখে দেখেছি···।

ধড়ফড় করে, একটা দুরন্ত কৌতূহলের আমোদে নড়ে-চড়ে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী : বল।

পলুস—বাবুরবাজারে দেখেছিলাম, সিস্টার দিদি পথ হেঁটে চলেছে ; আর, পথের পাশের কাঁটাঝাড়ের ভিতর হতে একটা গরলের শয়তান···।

মুরলী—কি ?

পলুস—তিন হাত লম্বা একটা কালা করাইত ফণা উঁচা করে সিস্টার দিদিকে কামড়াবার জন্য তেড়ে এল। দেখলাম জোহানা, তখনি একটা চিল এসে ছোঁ মেরে গরলের শয়তানটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মুরলীর কালো চোখের বিস্ময় বিশ্বাসের আবেশে একেবারে নিবিড় হয়ে সুস্থির আলোর মত জ্বলতে থাকে।

পলুস বলে—ভুবনপুরের মানঝিদের একটা ওঝা বাজারের ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে থেকে সিস্টার দিদির পিঠের দিকে তাক করে তীর ছেড়েছিল। কিন্তু···।

মুরলীয় সুস্থির চোখের চাহনিতে যেন একটা তির বিঁধেছে। কেঁপে ওঠে চোখ দুটো ; গলার স্বরও কাঁপে—সিস্টার দিদির গায়ে লাগে নাই তো ?

পলুস হাসে—না জোহানা ; লাগবে কেন ? শয়তানের মতলব কি সিস্টার দিদিকে ছুঁতে পারে ? তীরটা লেগেছিল এক বেটা মানঝির হাতে ; সে বেটা মানঝি হলো ওঝারই ভাইটা।

মুরলী—মরে নাই পাপীটা ?

পলুস—কোন্ পাপীটা ?

মুরলী—দুটাই, ওঝাটা আর ওর ভাইটা ?

পলুস—না, মরে নাই। কিন্তু দুটারই কয়েদ হয়েছিল। ওঝাটা সাত বছর, আর ভাইটার তিন বছর।

মুরলীর চোখের চাহনি ধিকধিক করে। দাঁতে দাঁত চেপে আর নরম ঠোঁট দুটোকে শক্ত করে নিয়ে একটা ধিক্কার ছাড়ে মুরলী—মরলেই ভালো হতো।

পলুস হাসে : হ্যাঁ, মরলে ওদের ভালো হতো। কয়েদ হবার সাজা যে কী কষ্টের সাজা, সেটা সে-ই বুঝে, যার কয়েদ হয়। কয়েদের চেয়ে মরণ ভাল।

চমকে ওঠে মুরলী। হঠাৎ একটা যন্ত্রণার তীর যেন বুকের ভিতরে গিয়ে

বিঁধছে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, আর বার বার হাঁপ ছেড়ে যেন মনটাকে একটা মিথ্যা স্মৃতির মিথ্যা বেদনা থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়েও থাকে, তারপরেই হেসে ওঠে : তোমার কপাল বড় ভাল, এমন সিস্টার দিদির দয়া তুমি পেয়েছ।

পলুস—তুমি কি পাও নাই ?

মুরলী হাসে—তুমি বেশি পেয়েছ।

পলুস—কেন ? আমার তো মনে হয়, তুমি বেশি পেয়েছ।

মুরলীর ঠোঁট দুটো হঠাৎ শিউরে ওঠে, যেন একটা লাজুক কৌতূহলের পিপাসা চাপতে চেষ্টা করে।

পলুস—কি বটে জোহানা ?

মুরলী মুখ ফিরিয়ে বলে—আমার কাছে এসে বসো, তবে বলবো।

উঠে এসে, মুরলীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে, মুরলীর অলস লাজুক শরীরটাকে তুলে নিয়ে একটা চারপায়ার উপর বসিয়ে দেয় পলুস ; আর নিজেও মুরলীর গা ঘেঁষে বসে।

মুরলী বলে—মেরিয়া একটা কথা বলেছিল।

—কি ?

—তুমি আমাকে বেশি বাস, না, আমি তোমাকে বেশি বাসি ?

—এ কথা কেন শুধাও, জোহানা !

—বুঝতে চাই, সিস্টার দিদি কাকে বেশি দয়া করলে ?

—আমি বুঝেছি, আমি তোমাকে বেশি পিয়ার করি।

—আমি বুঝেছি, আমি।

পলুস কৃতার্থভাবে হাসে : এ তো ভাল ঝগড়া বটে।

পলুসের গলা জড়িয়ে ধরে মুরলী : বিচার হয়ে যাক না কেন ?

—জোহানা ! ডাকতে গিয়ে পলুসের গলার স্বরে যেন হঠাৎ-আকুল পিপাসা ছলছল করে।

—চুপ কর পলুস। বলতে গিয়ে পলুসের গলার রামধনু রঙের রুমালের উপর মুরলীর খোঁপাটা ঘষা খায় আর ভেঙে পড়ে।

পলুস বলে—তুমি এখনও কিছু খাও নাই, জোহানা। আগে খেয়ে নাও।

মুরলী—না।

পলুস—আমার কথা শুন।···হোই দেখ, কত খাবার জমা হয়ে রয়েছে।

ঘরের দেয়ালে কাঠের তাকের উপর নানারকমের খাবার, তার নানারকমের রূপ আর রঙ। নানারকমের বাসন ; কালো পাথর, সাদা মাটি আর কাঁসা-পিতলের বাসন। মুরলীর চোখে সবই নতুন লাগে। মুরলীর জীবনের জন্য এক নতুন গেরস্থালির বিচিত্র যত উপহার তাকের উপরে সাজানো রয়েছে। চঞ্চল হয়ে ওঠে মুরলীর চোখের দৃষ্টি।

পলুস—বলে—হোই দেখ, ওটা হলো কেক, যেটা সিস্টার দিদি দিলে। আর, চিনামাটির বড় বাটিতে কবুতরের তরকারি, আমি নিজের হাতে রেঁধেছি।

আর্থারবাবুর বউ থালা ভরে পেঁড়া দিয়ে গেল। আর, হোই দেখ, চারটা পাউরুটি এনে রেখেছি।

—আমি এতটা ভাবি নাই পলুস! বলতে বলতে পলুসের বুকের কাছ থেকে একটু আলগা হয়ে আর ঘরের চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে মুরলী। কী সুন্দর ঘর! ওদিকে চৌকির উপর পাতা বিছানা। বিছানার উপর পাশাপাশি একজোড়া বালিশ। দেয়াল ঘেঁষে কাঠের একটা আলনা, তার উপরে পলুসের জামা-কাপড় সাজানো। এক কোণে একটা লোহার উনান, তার পাশে ঝুড়ির মধ্যে খাদের কয়লা। দেয়ালের গায়ে পলুসের বন্দুক আর টোটার মালা। ঝকঝক আর তকতক করছে মুরলীর নতুন জীবনের সুখের ঘর।

—এ ঘর আমার ঘর, পলুস! চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—হ্যাঁ, জোহানা। হাসতে থাকে পলুস।

পলুসের মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে মুরলী: এ পলুস আমার পলুস বটে।

পলুস—হ্যাঁ।

মুরলী—এসো।

পলুস—আগে খেয়ে নিবে না?

মুরলী রাগ করে ফুঁপিয়ে ওঠে: না। যাকে ছুঁতে গিয়ে তুমি দুই-দুইবার দুখ পেলে, তার উপর তোমার এখনও রাগ হয় না কেন?

পলুস—জোহানা!

মুরলী—না, আগে এসো। আগে আমাকে বুঝে নিতে দাও, এটা আমারই মরদের ঘর বটে।

আবার কি একটা হোঁচট খেয়েছে মুরলীর জীবনের আশা? তা না হলে, এত রাত হয়ে যাবার পরেও বিছানা থেকে উঠে বসতে আর উৎসবের খাবারগুলি খেতে চায় না কেন মুরলী?

যেন ওইসব বাহারদার খাবারের কোন স্বাদ নেই। এই ঘরের বাতাসেও কোন স্বাদ নেই। আর, এই বিছানাটারও কোন স্বাদ নেই। বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে মুরলীর অতৃপ্ত শরীরটার রক্ত।

নতুন সুখের ঘরে এসে মুরলীর আশার প্রাণ যে বিহ্বলতা নিয়ে বুকের উপর পলুসের পিয়াস বরণ করেছে, কী আশ্চর্য, সেই বিহ্বলতাই হঠাৎ হতাশ হয়ে গিয়েছে। পলুসের পিয়াস যেন একটা অসার দৌরাত্ম্য, মুরলীর আশার নিঃশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছে। দম বন্ধ করে যেন একটা উপদ্রবের লোলুপ চেষ্টাকে ঢোক গিলে কোন মতে সহ্য করেছে মুরলী; তারপর, পলুসের ক্লান্ত ও তৃপ্ত শরীরের অলস স্পর্শটাকে বেশ একটু কঠোরভাবে একহাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে—ভাল সুখের ঘর বটে! ভাল মরদের ঘর বটে।

—কি হলো জোহানা ?

—কিছু না।

বার বার অনুরোধ করে পলুস ঃ এবার উঠে বসো জোহানা।

মুরলী—না।

পলুস—কেন ?

মুরলী—ও খাওয়া তুমি খেয়ে নাও ; আমার সাধ নাই।

পলুস—এটা কেমনতর রাগ বটে ?

উত্তর দেয় না মুরলী। বিছানার এক পাশে, যেন পলুস হালদারের ছোঁয়া থেকে গতর বাঁচিয়ে চুপ করে কুঁকড়ে পাকিয়ে একটা আশাহত প্রাণের লাসের মত পড়ে থাকে।

আশ্চর্য হয়, ব্যথিত হয়, শেষ পর্যন্ত মনে মনে একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পলুস ঃ তুমি যদি না খাও, তবে আমি একাই খেয়ে নিব।

মুরলী—হ্যাঁ, একা খাবে না কেন ? একা খেতেই জান। তুমি তো আর মধুকুপির একটা কিষাণের মত···

পলুস ভ্রূকুটি করে—কি বললে ?

ঘরের অন্ধকারে পলুসের ভ্রূকুটি মুরলীর চোখে পড়ে না। উত্তর দেয় না মুরলী।

পলুস—কথাটা কানে যায় নাই কি ?

মুরলী—কি কথা ?

পলুস—আমার কথা নয়, তুমি এখনই যে কথাটা বললে।

মুরলী—বললাম তো, মধুকুপির কিষাণেরা একা খেতে জানে না ; ওরা গাঁওয়ার বটে।

আলো জ্বালে পলুস হালদার। খাবারও খায়। সবই দেখতে পায় মুরলী। কিন্তু মুরলীর সারা অন্তরাত্মা যেন একটা দুঃসহ বিস্বাদের ভারে ক্লিষ্ট হয়ে নতুন ঘরের বিছানার এক পাশে পড়ে থাকে।

আবার কখন ঘর আঁধার হয়ে গিয়েছে, জানে না মুরলী। ঘুম ভাঙে যখন, তখন মুরলীর গায়ের উপরে ঘুমন্ত পলুসের অলস একটা হাতের ভার ঘুমন্ত আদরের মত পড়ে ছিল। কিন্তু চমকে ওঠে মুরলী ঃ কে ? কে ? তুমি কে বটে গো ?

মুরলীর ভাঙা ঘুমের বিস্ময় হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পলুসের হাতটাকে একটা ঠেলা দিয়ে নামিয়ে দেয়।

জেগে ওঠে পলুস ঃ কি হলো জোহানা ? কিসের ডর ?

মুরলী—অ্যাঁ···না, ডর নাই, কিন্তু তুমি এখানে কেন ?

পলুস হাসে ঃ আমি যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।

মুরলী—তুমি আমাকে ছুঁবে না ; দয়া কর পলুস।

পলুস—আমার যে তোমাকে আবার ছুঁতে সাধ হয়েছে জোহানা ; আমার জোহানা।

মুরলী—না, না, না। তোমার মিছা আদরের জ্বালা ভাল লাগে না পলুস।

বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে যায় মুরলী। পলুস বিব্রতভাবে বলে—কি হলো ?

মুরলী—আমি ভুঁইয়ের উপর চাটাই পেতে শুয়ে থাকি।

পলুস—তোমার মাথায় কোন দোষ আছে নাকি ?

মুরলী—আছে বুঝি ?

পলুসের এতক্ষণের নিরেট ধীরতা এইবার একটা আক্রোশের ধমক হয়ে ফেটে পড়ে : কিষাণীর মত ভুঁইয়ের উপর শুতে সাধ হয়েছে বুঝি।

মুরলী—হয়েছে বুঝি।

পলুস—কিন্তু এটা কিষাণের ঘর নয়।

মুরলী—নয় বুঝি।

পলুস—তুমি কি আমার সাথে হাসি করছো জোহানা ?

মুরলী—না পলুস। হাসি করবো কেন ?

পলুস—তবে ?

মুরলী—আমাকে ঘুমাতে দাও।

ঘরের মেঝের উপর চাটাই পাতে মুরলী। হঠাৎ ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরে পলুস : আমি বুঝেছি।

—কি ?

—তোমার মনে দুখ হয়েছে।

—কিসের দুখ ?

—আমি তোমাকে আজ কিছু দিই নাই।

—কি বললে ?

মুরলীর শূন্য গলায় হাত বুলিয়ে পলুস বলে—তোমার গলাটা খালি। একটা হাঁসুলিও নাই।

মুরলী হাসে : তাতে আমার গলার কোন দুখ নাই।

পলুস—আমি কালই গোবিন্দপুর বাজারে গিয়ে তোমার লেগে একটা চিজ কিনে নিয়ে আসবো।

মুরলী—দরকার নাই।

পলুস—আমি নিয়ে আসবোই। চাঁদির সুতলির মালা, তার সাথে তিনটা সোনার মটরদানা।

মুরলী হেসে ফেলে : ফাঁসি দিবে নাকি গো ?

হেসে হেসেই পলুসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায় মুরলী।

পলুস—বিছানাতে আসবে না ?

মুরলী—না।

রাত আরও গভীর হয় যখন, তখন ভুঁইয়ের উপর ঘুমের ঘোরে অচেতন মুরলীও জানতে পারে না যে, মুরলীকে আবার বার বার ডেকে শেষে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে পলুস।

কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী—ও কিসের আওয়াজ পলুস! হায় বাপ, এ কেমন আওয়াজ!

বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসে পলুস: ডর নাই জোহানা, ওটা নদীর সোতের আওয়াজ বটে।

মুরলী—কোন্ নদী?

পলুস—ডরানি।

আরও ভীরু হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলীর গলার স্বর: এখানে আবার ডরানি আসে কেন পলুস?

পলুস—এই তো, হারানগঞ্জের ডাঙা পার হয়েছ কি শালের জঙ্গলটা ধরেছ; আর, তার পরেই ডরানির সোত। পেঁছা হাওয়া ছাড়লেই সোতের আওয়াজ এদিক পানে ছুটে আসে।

মুরলীর বুকের পাঁজর একবার শিউরে উঠেই অলস হয়ে যায়। পেঁছা হাওয়া যেন দূরের ডরানির ঠাণ্ডা স্রোতের ঝুরঝুরু ঝরানির শব্দ তুলে নিয়ে এসে মুরলীর বুকের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই তো, ঘরের এই অন্ধকারটা যে সেই ঘরের অন্ধকারের মত গাঁয়ের গায়ের গন্ধে ভরে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের ধড়টা কটমট করে দুলছে মনে হয়। জামকাঠের কপাটটা কাঁপে। আখড়ার ঝুমুর থেমে এল বুঝি। এত রাতে মাদল বাজায় কোন্ কিষাণ? আর, কি আশ্চর্য…মুরলীর গা ঘেঁষে এই তো শুয়ে আছে সেই মরদ মানুষটি। শিলের পাটার মত সেই বুকটা।

—কি গো সরদার, মুরলীকে ছুঁতে আর সাধ হয় না কি?

—তোর সাধ হয় কিনা বল?

—কিসের সাধ?

—আমাকে ছুঁতে।

—কি বল সরদার? তোমার মত মরদের গতর যে সোনা বটে গো। তুমি না ছুঁলে যে মুরলীর হাড়মাস মিঠা হয়ে যায় না।

—তবে বল না কেন মুরলী?

—বলছি তো, এসো।

জোহানা! একটা একেবারে অচেনা ও অজানা ডাক রূঢ় আওয়াজের আঘাতের মত মুরলীর তন্দ্রাতুর শরীরের উতলা সাধের উপর যেন আছড়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে, ভুঁইয়ের চাটাই-এর উপর ধড়মড় করে উঠে বসে মুরলী।

পলুস হাসে—সকাল হয়ে এলো, জোহানা।

মুরলী—হলো তো…কিন্তু তুমি চেঁচালে কেন?

পলুস—আমি গোবিন্দপুর চললাম।

মুরলী—কেন?

পলুস—মনে নাই?

মুরলী—না।

পলুস—চাঁদির সুতলির মালা, আর তিনটা সোনার মটরদানা।

মুরলী—আমি ওসব চিজ নিব না পলুস।

পলুস—নিতে হবে। তোমাকে হাসতে হবে। তোমাকে দুখ দিবার লেগে আমি তোমাকে বিয়া করি নাই।

সাইকেলটাকে ঘরের ভিতর থেকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় পলুস হালদার।

ডরানির স্রোতের ঝুরঝুর ঝরানির শব্দ আর শোনা যায় না। ভোরের আলো দেখে ভয় পেয়ে পেঁছা হাওয়া কি মরে গেল? তা না হলে মুরলীর চোখে আর ঘুমের আবেশ লাগে না কেন? মুরলীর নিশ্বাসের শব্দই বা কেন মাঝে মাঝে থমকে যায়? আর, বার বার কেন চমকে উঠে, দু হাতে চোখ ঘষে, হাই তুলে ও গা-মোড়া দিয়ে শয়ান শরীরটাকে স্বপ্নে-পাওয়া একটা নেশার মিথ্যা আদর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসতে হয়?

ঘরের ভিতরে আবছা আঁধার, কিন্তু বাইরে পাখি ডাকে। তবু খুব বুঝতে পারা যায় আর এই আবছা আঁধারেই চিনতে পারা যায়, এই ঘর পলুসের ঘর বটে।

—তুমি চলে গেলে কিগো? ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে কপাট খুলে পথের দিকে তাকায়।

ভোরের আলোর ঝলক মুরলীর চোখের উপর লুটিয়ে পড়ে। ধাঁধিয়ে যায় চোখ; সঙ্গে সঙ্গে মুরলীর প্রাণটাও যেন ধাঁধিয়ে যায়। কি হল? কোথায় গেল পলুস? যেন রাতের মুরলীকে ভয় পেয়ে ভোর হতে না হতেই পালিয়ে গেল বেচারা।

রাতের আঁধারে যেন জংলা বিষের গন্ধ আছে। সেই গন্ধে মুরলীর বুকের বাতাসও জংলা হয়ে যায়। তা না হলে পলুসের মত মানুষকে একটা অবেহেলার ঠেলা দিয়ে বুকের কাছে থেকে সরিয়ে দিল কেন মুরলী? ছিয়া ছিয়া, এ কেমন ভুল!

পথের উপরে রোদ ঝলমল করে আর দেখতে পাওয়া যায়, অনেক দূরের সেই পিয়ালবনের গা ঘেঁষে ডাইনে বেঁকে গিয়েছে পথটা, তারপরেই বড় সড়ক। মনে পড়ে মুরলীর, গোবিন্দপুরে গিয়েছে পলুস, মুরলীরই মুখের সেই হাসির জন্য চাঁদির সুতলির মালা আর সোনার মটরদানা আনতে, যে হাসি দেখতে না পেয়ে বড় দুখ পেয়েছে বেচারা। কেন হাসবো না পলুস? আমি যে হেসে আর বেঁচে থাকবার লেগে তোমার কাছে এসেছি। আমি যে তোমারই জোহানা বটি গো।

মুরলীর প্রাণের একটা উতলা আক্ষেপ যেন কাতর অনুনয়ের মত মুরলীর মুখে বিড়বিড় করে।—তুমি সিস্টার দিদির বিচার মেনে নিবে। আমার ছেইলা তোমারই ঘরে থাকবে পলুস। আমার লেগে তোমার কত মায়া!

মুরলীর বুক ঠেলে কৃতজ্ঞতার যত ব্যাকুল কথা উথলে ওঠে। রাগ হয় এই

গতরটারই উপর। একটা বোকা ভীরু আর জংলী গতর। কে বললে, পলুসের ছোঁয়া পেলে জোহানার এই শরীরের হাড়মাস মিঠা হয়ে যাবে না?

মিথ্যে নয়, পলুস হালদারের হাত ধরবার জন্য, পলুসের বুকের উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য ভোরের আলোয় বিহ্বল মুরলীর এই শরীরের হাড়মাসের পিয়াস যেন এখনই সিক্ত হয়ে উঠেছে। কখন ফিরে আসবে পলুস?

ছোট্ট কালো কুকুরটা বড় বড় রোঁয়ায় ভরা শরীর; কোথা থেকে ছুটে এসে মুরলীর গায়ের উপর লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুকুরটাকে দু হাতে সাপটে ধরে বুকের উপর তুলে নেয় মুরলী।

কুকুরটার মুখ এক হাতে টিপে, জোরে একটা আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে ওঠে মুরলী: ভাল লোভী বটে এটা! হিংসা করবি না তো রে কুটু? পেটাকে ভাই বলে বুঝতে পারবি কি? চুমা নিতে চাস তো এখনই বলে দে।

ছোট্ট কালো রোঁয়াভরা নরম দেহ কুকুরটার মুখের উপর গাল ঠেকিয়ে দিয়ে সারা শরীরটাকে দোলাতে থাকে মুরলী।

টুং করে একটি মিষ্টি শব্দের শিহর মুরলীর কানের কাছে চমকে ওঠে। সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ। মুরলীও চমকে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মুরলীর মুখের হাসিটাও যেন রঙিন ফোয়ারার মত উথলে ওঠে। সিস্টার দিদি এসেছে।

সাচ্চা দেবী বটে সিস্টার দিদি। যেন মুরলীর জীবনের একটা গোপন মানতের ভাষা, আর মুরলীর সুখ ও আশার একটা ভয়ের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে নিজেই ছুটে এসেছে সিস্টার দিদি।

—জোহানা বহিন, ভাল আছ? সিস্টার দিদির নীল চোখে স্নেহময় হাসির আভা ভোরের আলোর চেয়েও সুন্দর হয়ে ঝলমল করে।

—আমি তোমার ঠাঁই যাব ভেবেছিলাম, সিস্টার দিদি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেন বহিন? বলতে বলতে এগিয়ে এসে আর সাইকেলটাকে ঘরের দেয়ালের গায়ে হেলিয়ে দিয়ে বারান্দার উপর ওঠেন সিস্টার দিদি।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছোট একটা চারপায়া নিয়ে এসে সিস্টার দিদির সামনে রেখে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে মুরলী: বসো দিদি।

সিস্টার দিদি—হ্যাঁ, বল, আমার ঠাঁই কেন যাবে ভেবেছিলে?

কেঁপে ওঠে মুরলীর চোখ। মাথা হেঁট করে। ধপ করে মেঝের উপর বসে পড়ে মুরলী। তারপর সারা শরীর কুঁকড়ে নিয়ে সিস্টার দিদির কোলের উপর মাথা পেতে দেয়। মুরলীর মাথায় হাত বুলিয়ে সিস্টার দিদি স্নিগ্ধ স্বরে হাসেন: বল জোহানা।

মুরলী—আমার পেটে ছেইলা আছে দিদি।

চমকে ওঠেন সিস্টার দিদি—লর্ড!

—দিদি! ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী।

—বুঝলাম, তুমি আমার উপদেশ মান নাই জোহানা। সিস্টার দিদির

গম্ভীর গলার স্বর যেন একটা গম্ভীর ভর্ৎসনা।

মুরলী—ভুল হয়েছে দিদি।

সিস্টার দিদি—হ্যাঁ, খুব ভুল। পরের সন্তান পেটে নিয়ে পলুসের ঘরে এসেছ তুমি। তুমি পলুসকে বিপদে ফেলেছো জোহানা।

—বিপদ কেন হবে দিদি?

—পলুস যদি বিপদ মনে করে, তবে বিপদ নিশ্চয়।

—তুমি পলুসকে বুঝিয়ে দিলে কোন বিপদ হবে না, দিদি।

—পলুস কি বলে?

—সে চায় না। আমার এই ছেইলাকে পরের ছেইলা মনে করে পলুস।

হেসে ফেলেন সিস্টার দিদি: পলুস ঠিক মনে করেছে।

—তুমি বলে দিলে পলুস মেনে নিবে।

—কি বলবো?

—আমার ছেইলা আমার কাছে থাকবে।

—আমি পলুসের উপর অবিচার করতে পারি না জোহানা। ওকে তুমি বিয়ে করো পলুসের ইচ্ছা যদি না থাকে, তবে পরের সন্তান উহার ঘরে তুমি রাখবে কেন? পলুসকে তুমি অকারণে শাস্তি দিবে কেন? এতটা অধিকার তোমার নাই জোহানা।

—কিন্তু আমার উপর অবিচার কর কেন, দিদি?

—না, তোমার উপরেও অবিচার করতে চাই না। সেই কথাই বলছি, শুন।

—বল দিদি। সিস্টার দিদির হাঁটুর উপর চোখ ঘষে মুরলী।

—তিন-চারটি মাস পরে তুমি আমার অনাথবাড়িতে চলে আসবে।

—না দিদি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। তীব্র করুণ ও ভীরু একটা আর্তনাদ; যেন জীবনের আশার পথে একটা রক্তলোলুপ বাঘের ছায়া দেখতে পেয়েছে মুরলী। মুরলীর পেটের ছেইলাকে খেতে চায় ওই বাঘ।

—হ্যাঁ বহিন, ইউ মাস্ট। সিস্টার দিদির গলার স্বর একেবারে শান্ত ও অবিচল।

মুরলীর মাথাটা একবার কেঁপে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যায়; আর একেবারে অলস হয়ে একটা নির্জীব পাথরের ঢেলার মত সিস্টার দিদির হাঁটুর উপর পড়ে থাকে।

—আমি তোমাকে উত্তম উপদেশ দিলাম, তোমারই জীবনের সুখ আর শান্তির জন্য। তুমি বুঝে দেখ জোহানা। সিস্টার দিদির গলার স্বরে যেন একটা সান্ত্বনার সাড়া ফুটে ওঠে।

মুখ তোলে মুরলী। সিস্টার দিদির মুখের দিকে একজোড়া অবুঝ চোখের কাতর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ছটফট করতে থাকে।

সিস্টার দিদি আবার গম্ভীর হন: তুমি আমায় কথা বুঝতে পার নাই মনে হয়।

—বুঝি নাই দিদি।

—তবে, তুমি বল। আমি কি করতে পারি?

—তুমি যা বলবে দিদি, তাই হবে।

—অনাথবাড়িতে যাবে? কিছুদিন থাকলেই মন অনাথ হবে। তুমি সংসার চাইবে পাবে?

—যাব।

—অনাথবাড়িতে ছেইলা রেখে দিয়ে আবার স্বামীর ঘরে চলে আসবে?

—হ্যাঁ, দিদি।...কিন্তু...।

—কি?

—ছেইলাটার কি হবে?

—অনাথবাড়িতেই থাকবে, বড় হবে।

—ভাল কথা দিদি, কিন্তু আরও ভাল হয়, যদি তুমি ছেইলাটাকে...।

—কি?

—একটুক বড় করে নিয়ে ওকে ওর বাপের কাছে দিয়ে দাও।

—নো, নেভার। তুমি খুব অধম কথা বলছো জোহানা। আমার অনাথবাড়ি ধর্মবাড়ি আছে, হাসপাতাল নহে। ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ান সিস্টার দিদি।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। সিস্টার দিদির কথাগুলিকে একটা ভয়ানক রাগী রহস্যের গর্জন বলে মনে হয়। বুঝতে পারে না মুরলী, সিস্টার দিদির মত এত শান্ত ও এত মায়ার মানুষ এই সামান্য আবেদনের উপর এত রাগ করে কেন।

—সিস্টার দিদি! আস্তে আস্তে ডাক দেয় মুরলী।

সিস্টার দিদি—না বহিন। খিরিস্তান হয়েও তোমার মনে ধরমের গরব নাই; এ বড় দুঃখের কথা বহিন। তুমি তোমার সেই ধরমহীন পুরাতন স্বামীর জন্য এখনও দরদ কর।

—না দিদি।

—নিশ্চয়। তা না হলে, তুমি কেন আমাকে অখিরিস্তানের ছেইলার ধাই হতে বলছো, জোহানা?

—তবে কি উপায় হবে, বল দিদি।

—তোমার ছেইলা অনাথবাড়িতে থাকবে, খিরিস্তান হবে। তা না হলে মানুষ হবে কেমন করে?

বুকের ভিতরের সব নিশ্বাস ফুঁপিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে মুরলীঃ তাই ভাল দিদি।

হেসে ওঠে সিস্টার দিদির স্নেহাক্ত নীল চোখঃ সুখী হও জোহানা। তোমার কোন ভাবনা করবার দরকার হয় না।

মুরলীর কাছে এগিয়ে আসেন সিস্টার দিদি। মুরলীর মাথায় আবার হাত বোলাতে থাকেনঃ তুমি ভুলে যাও কেন জোহানা, তুমি নতুন হয়ে গিয়েছ? পুরানা জীবনের সহিত তোমার আর কোন সম্পর্ক নাই। আছে কি?

—না দিদি।

—তবে আর পুরানা ঘরের কথা মনে কর কেন ? মায়া কর কেন ?

—না দিদি, মায়া আর করবো কোন্ সাধে ?

—ঠিক বুঝেছ জোহানা। তোমার যা কিছু পেতে সাধ হবে, সব এই ঘরেই পাবে। এই ঘর সুখী খিরিস্তানের ঘর।

—হ্যাঁ দিদি।

—আচ্ছা, আমি এবার চলি বহিন·· হ্যাঁ, পলুস কোথায় ?

—গোবিন্দপুরে গেল।

—কেন ?

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে মুরলী।

সিস্টার দিদি—কি জোহানা ? পলুস আজই গোবিন্দপুরে গেল কেন ?

মুরলী—চিজ সওদা করতে।

সিস্টার দিদি—কি চিজ ?

মুরলী—চাঁদির সুতলির মালা আর সোনার মটরদানা।

ঝিক করে সুন্দর এক খুশির হাসি চমকে ওঠে সিস্টার দিদির মুখে : তোমার সৌভাগ্য জোহানা ; কত ভাল স্বামী তোমার। আমার কাছে না এলে কি এই সুখ পেতে বহিন ?

মুরলী—একটা কথা কি তোমার মনে আছে, দিদি ?

—কি ?

—তুমি আমাকে লিখা-পড়া শিখাবে বলেছিলে।

—মনে আছে বহিন। কিন্তু তুমি কি এখনও চাও ?

—চাই দিদি।

—তবে আমার কনভেণ্টের স্কুলে ভর্তি হও।

—স্কুল যে বড় দূর বটে দিদি।

—পলুসকে বল, তোমার জন্য গো-গাড়ি ঠিক করে দেবে। যেতে চার আনা আসতে চার আনা, রোজ আট আনা গো-গাড়ির ভাড়া দিবে।

—কে দিবে ?

—দিবে তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী পলুস। আবার কে ? তোমার সাধ মিটাবে, তোমার সব সুখ এনে দিবে পলুস। তা না হলে তোমাকে ঘরণী করেছে কেন পলুস ?

হেসে ওঠেন সিস্টার দিদি ; আর, মুরলীর গম্ভীর মুখটাকে যেন একটা প্রবল স্নেহাক্ত আশ্বাসের আবেগ দিয়ে হাসিয়ে দেবার জন্য মুরলীর থুতনি টিপে ধরেন : এইবার হাস বহিন। হাস···আমি বলছি হাস—এক দুই তিন··· হ্যাঁ।

হেসে ফেলে মুরলী ; এই হাসি একেবারে নতুন হাসি। জীবনের যত পুরনো মায়ার বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়ে হেসে উঠেছে মুরলীর প্রাণ। ঝকঝকে তকতকে শাগু ঠাণ্ডা নিথর হাসি।

চলে যান সিস্টার দিদি।

কিন্তু ঘরে ফিরতে আর কত দেরি করবে পলুস ?

দুপুর হয়ে যাবার পর একবার ঘরের জানালা খুলে বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়েই জানালা বন্ধ করে দেয় মুরলী। রোদের জ্বালায় মাঠটা পুড়ছে না হাসছে, বোঝা যায় না।

কিন্তু আর দেরি করে না মুরলী। বালতি হাতে নিয়ে নিকটের ইঁদারার কাছে এগিয়ে যায়। জল তোলে। স্নান করে। তারপর, নিজেরই ভেজা শরীরের স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে আর ভেজাশাড়ির শব্দ শুনতে শুনতে ঘরে ফিরে আসে। রঙিন শাড়ি, জামা আর সায়াতে সুন্দর করে সেজে নিয়ে আয়নার দিকে তাকায় মুরলী। আর, খুশি হয়ে নিজেরই নরম ঠোঁটের নতুন হাসিটাকে দেখতে থাকে। ঝকঝকে তকতকে হাসি। মুরলীর নতুন জীবনের হাসি ; যে হাসি পলুসের এই তকতকে ঝকঝকে ঘরের শোভার সঙ্গে বড় সুন্দর মানায়।

পলুসের ফিরে আসতে আরও দেরি হবে বলে মনে হয়। কিন্তু মুরলী আর দেরি করে না। এগিয়ে যেয়ে দেয়ালের তাকের উপর থেকে থালা গেলাস আর বাটি নামিয়ে নিয়ে মেঝের উপর রাখে। এই ঘরে দুখ পেতে আসে নাই মুরলী। মিছা ক্ষুধা পুষে রেখে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়।

কবুতরের তরকারি, পলুস বেচারা কত সাধ করে নিজের হাতে রেঁধেছে। চিনেমাটির সাদা থালার উপর কবুতরের তরকারি ঢেলে নেয় মুরলী। পাঁউরুটি ছিঁড়তেও দেরি করে না।

খাওয়া শেষ হবার পর, নতুন জীবনের স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত শরীরটাকে নরম বিছানার উপর এলিয়ে দিতেও দেরি করে না মুরলী।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে দেরি করে মুরলী ; সিস্টার দিদির হাসির ঝঙ্কার এখনও মুরলীর কানের ভিতরে বেজে চলেছে। মুরলীর চোখ দুটো অপলক হয়ে যেন এই নতুন জীবনের অনুভবগুলির জন্য অপলক শ্রদ্ধার মত জেগে থাকে। আর নরম ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে থাকে সেই ঝকঝকে তকতকে ঠাণ্ডা হাসি।

ঘরের দরজার কাছে আগন্তুক পায়ের শব্দ শোনা যায়। শোনা যায়, একটা সাইকেলের ধড় যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে। আস্তে আস্তে দরজার দিকে মুখ ফেরায় মুরলী।

হ্যাঁ, পলুস ফিরে এসেছে।

ঘরে ঢুকেই একটু আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ায় পলুস। পলুসের উদ্বিগ্ন মুখটা হাসতে চেষ্টা করেও হেসে ওঠবার জোর পায় না : কি বটে জোহানা ?

মুরলী—কি ?

পলুস—তুমি হাসছো মনে হয়।

মুরলী—হ্যাঁ।···তুমিই যে বলেছ, আমাকে হাসতে হবে।

পলুস—কিন্তু এ কেমন হাসি বটে ? তোমার কি··· ।

মুরলী—না গো, আমার মাথা খারাপ হয় নাই।

পলুস—সে-কথা নয় ; তোমার কি···।

মুরলী—না গো, আমার অসুখ করে নাই।

পলুস—তবে কেন…।

মুরলী চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—কি পলুস ?

পলুস হাসে—এটা মিঠা হাসি, না মিঠা ছুরি ?

আরও জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর বিছানার উপর উঠে বসে মুরলী : সিস্টার দিদি এসেছিল।

—কি বললে সিস্টার দিদি ?

—তুমি যা বলেছ, তাই বললে।

—কি বলেছি আমি ?

—আমার ছেইলাটা অনাথবাড়িতে থাকবে।…বড় ভাল কথা বলেছিলে পলুস, আমি বুঝি নাই। আমার ছেইলা অনাথবাড়িতে থাকবে, তোমার মত ভাল খিরিস্তান হবে ; আমার কিছু ভাবনা নাই। সিস্টার দিদির বড় দয়া।… কই, আমার লেগে কি চিজ নিয়ে এসেছ দেখি ?

কাগজে মোড়া একটা জিনিস পকেটের ভিতর থেকে বের করে পলুস। খুশির আবেগে চঞ্চল হয়ে একটা ছোঁ মেরে পলুসের হাত থেকে কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়েই আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মুরলী।

আস্তে আস্তে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলে পলুস—চিজটার দাম নিল আশি টাকা দশ আনা।

পলুসের কথা বোধ হয় শুনতেই পায় না মুরলী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুপোর সুতলির চকচকে হার গলায় পরতে থাকে। হারের সঙ্গে তিনটে সোনার মটরদানা দুলছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে গলার এই নতুন গৌরবের রূপ দেখতে দেখতে মুরলীর কালো চোখের চাহনি ছটফট করে : আরও দুটা দানা হলে ভাল হতো পলুস।

পলুস—হ্যাঁ, ভাল হতো।

মুরলী—দিবে কি ?

পলুস—দিব।

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে আবার বিছানার উপর বসে মুরলী : আমি সিস্টার দিদির ইস্কুলে যাব, পলুস।

—কেন ?

—লিখা-পড়া শিখতে।

—কিন্তু, ইস্কুল যে অনেক দূর বটে।

—গো-গাড়িতে যাব। রোজ আট আনা ভাড়া লাগবে।

—মাসে যে পনের টাকা লাগবে !

—লাগুক না কেন ? ··হ্যাঁ, আমার সিলাই কলটা মেরিয়ার কাছে পড়ে আছে। ওটা আনিয়ে দাও।

—দিব।

জানালা খুলে দিয়ে বাইরের পথ, মাঠ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি-

যেন ভাবতে থাকে মুরলী। নিকটে ও দূরে ছোট ছোট বসতির ঘরগুলির দিকেও তাকায়। গির্জার চূড়াটাকেও একটা সুন্দর দূরের ছবির মত দেখতে পাওয়া যায়।

—চল পলুস। যেন একটা দুর্বার খুশির আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কোথায় যাবে ?

—চল, তোমার হারানগঞ্জের খিরিস্তানদিগের ঘর দেখে আসি। আর্থারবাবুর ঘরণী দেখতে কেমনটি গো ?

—বেশ তো, দেখে এসো একদিন।

—এখনই চল।

—আমি যে এখনও খাই নাই।

—খেয়ে নাও।

—তুমি খেয়ে নিয়েছ মনে হয়।

—হ্যাঁ।

বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে মুরলী। আর পলুস হালদার যেন একটা অনিচ্ছার ক্লান্ত মূর্তির মত আস্তে আস্তে হেঁটে ইঁদারার দিকে চলে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে মুরলীর মুখের দিকে আবার কি-যেন আশা করে তাকিয়ে থাকে পলুস।

মুরলী—খেয়ে নাও পলুস। মিছা দেরি কর কেন ?

আর দেরি করে না পলুস। বিছানা থেকে নামবে না মুরলী; পলুসের খাবার নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে মুরলীর প্রাণে কোন ব্যস্ততা নেই। তাকের উপর রাখা পাউরুটি আর বাটির কবুতরের তরকারি একটা থালাতে ফেলে দিয়ে চুপ করে খেতে থাকে পলুস।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন চুল আঁচড়ায় মুরলী, তখন ঢক-ঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে নিয়ে জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে পলুস হালদার : চল জোহানা।

ছোট ছোট ঘর, লাল খাপরার চালা। হারানগঞ্জের ডাঙার বুকের উপর এদিকে-ওদিকে ছকের ছবির মত সাজানো এক-একটা বসতির কাছে পলুস আর মুরলীকে এগিয়ে আসতে দেখেই ঘরের মানুষগুলি হেসে হেসে আর হল্লা করে পথের উপর ছুটে আসে। মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে—হোই দেখ, পলুস আর পলুসের ঘরণী জোহানা আসছে।

—হেই মা, পলুসের ঘরণীর রূপটা দেখ না কেন মা ? চেঁচিয়ে ওঠে আর্থারবাবুর মেয়েটা।

আর্থারবাবুর বউ হাসে—আমি দেখেছি ; তুই দেখে নে।

পলুসের পাশে দাঁড়িয়ে, আর মুখের সেই সুন্দর তকতকে ঝকঝকে হাসির

শিহরটুকু ফুটিয়ে রেখে খ্রিস্তান ভাই আর বহিনদের ছটফটে উল্লাসের মুখ-গুলিকে দেখতে থাকে মুরলী। মুরলীর বুকের ভিতরটাও যেন একটা নতুন গরবের স্বাদে ভরে যায়।

পলুসের একটা হাত শক্ত করে ধরে মুরলী। এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় মুরলীর মন। পলুসের পাশে মুরলী, আর মুরলীর পাশে পলুস, যেন সারা হারানগঞ্জের আত্মা খুশি হয়ে আর মুখর হয়ে এই মিলনের ছবিকে আশীর্বাদ করছে।

জনের মা, বুড়ি আনিয়া, মুরলীর হাতে একগাদা ফুল তুলে দিল : গড বাবা দয়া করেন ; সুখে থাক গো বহিন।

আরও এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। বিকালের সূর্য বড় তাড়াতাড়ি লাল হয়ে গির্জার চুড়ার পিছনে নেমে পড়ছে। বড় সড়কের দু' পাশের আম-গাছের মাথার উপর হুটোপুটি করে কাক আর কবুতর।

পলুস বলে—আর কত ঘুরবে জোহানা ? এক ক্রোশ তো হাঁটা হলো।

—এটা কার ঘর বটে পলুস ? সড়কেরই এক পাশে একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে, আর, যেন একটা বিস্ময়ের চমক লেগে মুগ্ধ হয়ে যায় মুরলী।

—এটা রিচার্ড সরকারের বাড়ি বটে।

—দাওয়ার উপর বসে আছে যে, সে কে বটে ?

—রিচার্ডবাবু।

—বাবুটা এখানে থাকে কেন ?

—রিচার্ডবাবু ডাক্তার বটে।

—খ্রিস্তান বটে কি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু···খ্রিস্তান যদি হবে, তবে··।

—কি ?

—তবে তোমাকে আমাকে দেখেও আসে না কেন ? কথা বলে না কেন ?

হেসে ফেলে পলুস : ডাক্তার রিচার্ডবাবু আমাদিগে দেখে ছুটে আসবে না।

—কেন না ?

—রিচার্ডবাবু আমাদিগের আর্থারবাবুর মত ত্রিশ টাকার মাস্টারবাবু নয় জোহানা, কল-ঘরের মিস্তিরীও নয়। রিচার্ডবাবুর কত নাম, কত মান, কত টাকা!

ধবধবে সাদা একটা ছোট বাংলো বাড়ি। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেও ছবি বলে ভুল হয়। লাল টালির চালার উপর সবুজ লতা ছড়িয়ে আছে। লতার ফুলগুলি নীল। বাড়ির দরজায় আর জানলায় রঙিন রেশমী কাপড়ের ঝালর উড়ছে। বাড়ির চারদিকে ইঁটের খাটো দেয়াল আর ফুলের কেয়ারি। ছোট একটা ফটক, ফটকের মাথার উপর লতার বিতান। বাড়ির বারান্দার উপরে একটি চেয়ারের উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছে ডাক্তার রিচার্ড সরকার।

দেখতে পায় মুরলী ; রিচার্ডবাবু মানুষটাও জোয়ান বটে। চোখে চশমা

আছে। পায়ে জুতোমোজাও আছে।

পেন্টালুনের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে রিচার্ড সরকারও একবার পথের দিকে তাকায়। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে থাকে।

পলুস বলে—চল জোহানা।

মুরলী চলতে চলতে বলে—বাবুটা কি গির্জায় যায় না?

পলুস—যায়।

মুরলী—আঁধার হয়ে এল।

পলুস—হ্যাঁ।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুরলীর একটা হাত ধরতে গিয়ে চমকে ওঠে পলুস। পলুসের হাতটাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে মুরলী।

পলুস—কি বটে, জোহানা?

মুরলী—কিছু না। আমি কানা নই, হাত ধরতে হবে না।

ঘরে ফেরবার পথের উপর সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পথের দু পাশের গাছগুলি যেন কতগুলি ঘন ছায়ার ধড়। আর, পলুস হালদার যেন একটা লঘু আবছায়া।

মুরলীর সঙ্গেই হেঁটে চলেছে পলুস; আর পলুসের দু পায়ের শক্ত চামড়ার জুতো মচ মচ শব্দ করে বেজেও চলেছে। কিন্তু পলুস যেন মুরলীর চোখেই পড়ছে না। যেন একলা হয়ে একটা অচেনা পথে হেঁটে চলেছে মুরলী।

একটাও কথা বলে না মুরলী; ভুলেও একবার পলুসের গা ছুঁয়ে ফেলে না। এই তো, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, বিকালের আলোতে পথ হাঁটবার সময় আর্থারবাবুর মেয়ের চোখের সামনে যে পলুসের হাত ধরতে গিয়ে মুরলীর প্রাণটা গর্বে ভরে গিয়েছিল, সেই পলুস যেন সন্ধ্যার আঁধারের ছোঁয়া লাগতেই ছোট্ট একটা ছায়া হয়ে গেল, এইটুকু একটা মরদের ছায়া। পলুসের হাতটা মুরলীর হাত স্পর্শ করবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ ছটফটিয়ে সরে গিয়েছে মুরলীর হাত।

পলুসও কোন কথা বলে না। ভাবতে গিয়ে শুধু আশ্চর্য হয় পলুস, মিথ্যা নয় বোধহয়, জোহানার মাথায় দোষ আছে। কে জানে দিনের বেলাতে যে মানুষ এত হাসে, রাত এলেই সে মানুষ এত রাগে কেন? কিংবা হতে পারে, এটা জোহানার গতরের আর গমরের রীত বটে।

কিন্তু এ কেমন রীত? অদ্ভুত! পথ চলতে চলতে পাশের মুরলীর ছায়াময় চেহারটার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে পলুস। গায়ের কাপড়ে আগুন লাগলেও কোন মেয়ে বোধ হয় এতটা বে-লাজ হয়ে যেতে পারে না; কিন্তু শরীরের সব লাজ একেবারে খুলে মেলে ও আলুথালু করে দিয়ে হেঁটে চলেছে জোহানা। খোঁপাটা ভেঙে গিয়েছে, কাঁধ পিঠ আর বুকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে চুল। শাড়িটাকে কোমর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আর গুটিয়ে পাকিয়ে এক হাতে চেপে রেখেছে। সায়াটাও যেন জোহানার এই পথ-চলার উদ্দামতার একটা বাধা; এক

হাতে সায়াটাকে তুলে ধরে রেখেছে। ভেবেছে কি জোহানা? হারানগঞ্জের এই রাতের আঁধারও একটা জঙ্গল? এই সড়কটা কি গাঁয়ের ক্ষেত? আর, সময়টা কি ভুঁইমানতের লজ্জাহীন লগন?

ভাগ্য ভাল, ঘরে ফেরবার পথে কোন সাইকেলের আলো বা পথচারীর লণ্ঠন, কিংবা কোন ছোকরার টর্চ ছুটে আসে নি। কিন্তু ঘরে ফিরে এসেই বা কি হল?

আলো জ্বালে পলুস হালদার। কিন্তু কথা বলে না মুরলী। যেমন পলুসের মুখের দিকে তাকায় না মুরলী, তেমনই নিজের সাজ-হারানো এই আলুথালু বেলাজ চেহারার দিকেও তাকাতে ভুলে যায়।

পলুস বলে—তুমি একটুক ঠিক হয়ে নাও, জোহানা।

মুরলী—কি?

পলুস—আর্থারবাবুর মেয়ে, কিংবা জনের মা, না হয় তো আর কেউ এখনই এখানে এসে যেতে পারে। তোমাকে এমনটি উদাস দেখলে ওরা যে তোমাকে ক্ষেপী মনে করে ডরাবে। শাড়িটা পরে নিয়ে ঠিক হয়ে বসো জোহানা।

চমকে ওঠে না, ব্যস্ত হয়ে ওঠে না, লজ্জা পেয়ে শিউরেও ওঠে না মুরলী। কিন্তু আস্তে আস্তে শিথিল হাত দুটোকে নেড়ে চেড়ে যেন আনমনা চিন্তার আবেশে অলস হয়ে যাওয়া শরীরটাকে শাড়ি দিয়ে জড়াবার চেষ্টা করে।

পলুস বলে—এইবার রাঁধতে হয়, জোহানা।

পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী; কিন্তু মুরলীর চোখে কোন আগ্রহের সাড়া নেই। পলুসের কথাটা শুনতে পেয়েছে, এই মাত্র।

—শুনলে কি জোহানা? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

—শুনেছি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী: কিন্তু আমাকে রাঁধতে বল কেন?

পলুসের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে: তোমার ঘরে তুমি রাঁধবে না তো কে রাঁধবে?

—ভাল আমার ঘর! বিড় বিড় করে মুরলী।

—কি বললে? প্রশ্ন করতে গিয়ে পলুসের স্বরটাও দপ্দপ্ করে জ্বলে!

মুরলী মুখ ফেরায়: তোমার লোহার উনান আর তোমার খাদের কয়লা; তুমি জান কেমন করে আগুন জ্বালতে হয়। আমি জানি না।

হেসে ফেলে পলুস—সে কথাটা বল; মিছা ঘরের দোষ দাও কেন?

উনানে আগুন ধরায় পলুস। রান্নাও শুরু করে পলুস। ফেন-ভাত, কুরথির ডাল, আর মশলা দিয়ে ডিম। চামচে ভরে ঘি নিয়ে, সেই ঘি এলাচ-দারচিনির সঙ্গে ফুটিয়ে কুরথির ডালে ছোকা দেয়। পলুসের ঘরের বাতাস আবার স্বাদু গন্ধের বাষ্পে ভরে উঠে থমথম করে। কিন্তু ততক্ষণে বিছানার উপর এলিয়ে পড়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী।

সেই মুহূর্তে ঘরের খোলা দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে হেসে ওঠে জনের মা আনিয়া বুড়ি: দেখতে এলাম পলুস, তোমার

ঘরণী কেমনটি রাঁধে আর কি রাঁধলে ?

চমকে ওঠে পল্টুস, আর মনে মনে নিজেরই একটা সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায়। মান বেঁচেছে পল্টুসের ; পল্টুসের এই ঘরের মান বেঁচে গিয়েছে। ভাগ্যিস রান্নাটা হয়ে গিয়েছে, আর ভাগ্যিস মুরলী ঘুমিয়ে পড়েছে।

জনের মা আনিয়া বুড়ির দুটো জ্বলজ্বলে কৌতূহলের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে পল্টুস : এই তো, কত কি রাঁধলে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লে বেচারা। জ্বর হয়েছে ; তবুও রাঁধলে, আমার মানা শুনলে না।

জনের মা—আহা, জ্বর কেন হলো গো ? আহা, বড় ভাল রাঁধে তোমার ঘরণী। এত সুবাস কি এই কুরথি ডালের সুবাস বটে পল্টুস ?

পল্টুস—হ্যাঁ গো দিদি।

জনের মা—আহা, গড বাবা করেন, জোহানার হাত মিঠা হয়ে থাকুক।

ধড়ফড় করে উঠে বসে মুরলী। জনের মা বলে—ভাবনা নাই জোহানা ; জ্বর সেরে যাবে।

চলে গেল জনের মা।

পল্টুস হাসে—বুড়ি জেনে গেল, তুমি রেঁধেছ।

মুরলী—তুমি বলেছ ?

পল্টুস—হ্যাঁ।

মুরলী—তাতে কার মান বাড়লে ?

পল্টুস—তোমার।

মুরলী—ভাল মান বটে।

পল্টুসের চোখ আবার কেঁপে ওঠে। জোহানার প্রাণের সেই জংলী নেশার রাগটা যেন এখনও ক্ষেপী হয়ে নিজেরই জীবনের এই নতুন ঘরের সুখ আর মানের উপর ঢিল ছুঁড়েই চলেছে।

চেঁচিয়ে ওঠে পল্টুস—কিন্তু খাওয়ার চিজগুলো ভাল বটে। একবার দেখে নাও। এ খাওয়া কখনো খেয়েছ কিনা ভেবে দেখ।

কথাটা মিথ্যে নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। ঝালদার মহেশ রাখালের বেটি মুরলী, মধুকুপির দাশু কিষাণের ঘরণী মুরলী জীবনে এমন স্বাদের খাবার কোনদিন খেতে পায় নি। কলঘরের মিস্তিরি, আশি টাকা মাইনের পল্টুস হালদারের এই ঝকঝকে তকতকে ঘরের অহংকার কিষাণী মুরলীর জীবনের সেই রিক্ততাকে যেন একটা কঠোর ঠাট্টার বাড়ি মেরেছে।

মাথা হেঁট করে মুরলী। চোখ দুটো জলে ভিজে যায়। কিষাণী মুরলীর দীন জীবনের সেই রিক্ততার স্মৃতিটাই বোধহয় কেঁদে ফেলেছে। কিন্তু শুখা মরিচ দিয়ে সিঝানো ভুমুরের জাউ, আর মকাইয়ের দানা ; স্বাদ ছিল না কি ? ভাল লাগে নাই কি ?

মুরলী বলে—আমি খাব না পল্টুস। তুমি খেয়ে নাও।

পল্টুসের মুখটা ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে। দুই চোখের উপরে একটা সন্দেহের ছায়াও কাঁপে। পল্টুসের এই ঘরের রাতের জীবনের

সব সুখ মিথ্যে করে দিয়ে জোহানা যেন ওরই জীবনের একটা ভয়ানক অভিমানের শোধ তুলছে।

—এই ঘর কি তোমার ভাল লাগছে না জোহানা? দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করে পলুস। কিন্তু উত্তর দেয় না মুরলী।

—আমি জানি, কেন এই ঘর তোমার ভাল লাগছে না; আবার চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে পলুস। পলুসের চোখে যেন তীক্ষ্ন একটা হিসাবের শাণিত আভা জ্বলজ্বল করে।

স্তব্ধ হয়ে বসে শুধু শুনতে থাকে মুরলী। মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে মুরলীর নীরব মুখটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে পলুস।—এ ঘরের ভাত খেতে মনে সাধ লাগে না, এ ঘরের বিছানায় শুতে সাধ লাগে না, মাটিতে চাটাই পেতে গতর ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে আর মরে যেতে সাধ হয়; বটে কিনা জোহানা?

মুরলীর হেঁট মাথাটাকে এক হাতে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে গরগর করে পলুস—আমার ছোঁয়া নিতে ভাল লাগে না, নিলেও ভাল লাগে না; নয় কি জোহানা?

যেন বুঝতে পেরেছে পলুস, পলুসের পিয়াস বুকের উপর বরণ করেও কেন তৃপ্তিহীন বিস্বাদের জ্বালায় ক্ষুব্ধ হয়ে এই ঘরটাকে ধিক্কার দেয় জোহানা। পলুস হালদারের চোখে যেন একটা ক্রূর কৌতুকের অভিসন্ধি হাসতে থাকে।

উত্তর দিতে চায় না মুরলী; কিন্তু পলুস হালদার এখনই সেই উত্তর জোহানার এই সুন্দর গতরের রক্তমাংসের কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে বুঝে ফেলতে চায়, কেন এই ঘরের সুখকে সুখ বলে মনে করতে পারছে না জোহানা।

—জোহানা। মুরলীর কাছে এগিয়ে যেয়ে আর চোখের সেই ক্রূর কৌতুকের তীক্ষ্ন হাসিটাকে যেন একটা ধূর্ত মৃদুতা দিয়ে ঢেকে মুরলীর হাত ধরে পলুস।

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে মুরলী; কিন্তু পলুসের হাত যেন প্রচণ্ড আগ্রহে কঠোর হয়ে মুরলীর হাতটাকে আঁকড়ে ধরে, আহত হরিণের বেদনা-দুরন্ত শরীরটাকে জব্দ করবার জন্য শিকারীর হাত যেমন কঠোর হয়ে হরিণের শিংটাকে মুচড়ে দেয় আর আঁকড়ে ধরে থাকে। ভয় পেয়ে চমকে ওঠে মুরলী: হাতটা ভেঙে দিতে সাধ হয়েছে কি?

পলুস—তোমার ছেইলাটা যদি অনাথবাড়িতে না যায়, এখানেই থাকে, তবে …তবে বড় ভাল হয় না কি জোহানা?

—বড় ভাল হয় পলুস। গড বাবা তোমাকে অনেক দয়া করবে পলুস। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

পলুস হাসে: সে কথাটি ভাবছি; তোমার ছেইলা এই ঘরেই থেকে যাক না কেন?

পলুসের বুকের উপর মাথা এলিয়ে দেয় মুরলী: হাতটা ছাড় পলুস।

পলুসের মুখের হাসি উগ্র হয়ে ওঠে: কেন জোহানা?

মুরলী আঃ, ছাড় পলুস, ব্যথা লাগছে, এমন করে ঘরণীর হাত ধরতে নাই।

মুরলীর হাত ছেড়ে দেয় পলুস। মুরলীও দু হাতে পলুসের গলা জড়িয়ে ধরে একটা ইচ্ছার আবেশে বিহ্বল হয়ে পলুসের বুকের উপর মাথা গুঁজে দেয়।

পলুসের বুকের উপর ছোট্ট একটা দাঁত-ফোটান মিষ্টি কামড়ের জ্বালা চিন করে ফুটে ওঠে। চমকে ওঠে পলুস: কি বটে জোহানা ?

—চুপ কর পলুস।

রাতটাও চুপ হয়ে যায়। রাতটা আরও নিঝুম হয়ে যায় যখন, তখন বিছানার কোমলতার উপর লুটিয়ে পড়ে থাকে পলুস আর পলুসের ঘরণী জোহানা। পলুসের একটা হাতও নিবিড় তৃপ্তিতে অলস মুরলীর কোমরের উপর পড়ে থাকে; আর পলুসের সেই হাত নরম করে ধরে রাখে মুরলী। মুরলীর সেই কঠোর অভিমানের শরীরটা নির্ভয় হয়ে পলুসের উষ্ণ নিশ্বাসের আদরে গলে গিয়েছে। হাড়মাস মিঠা হয়ে গিয়েছে। পুরুষ বটে পলুস; কত সহজে মুরলীর ইচ্ছাটাকে সুখের জলে চুবিয়ে দিল পলুস। পলুসের কানের কাছে একটা সফল স্বপ্নের আনন্দ ফিসফিস করে শুনিয়ে দেয় মুরলী: হ্যাঁ পলুস, এ ঘর আমার মরদের ঘর বটে। আমার ছেইলার বাপ বটে তুমি!

মুরলীর হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসে পলুস; তারপর একটা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে যায়। যেন পলুসের গায়ে ভয়ানক এক অপমানের জ্বালা লেগেছে। মুরলীর এই তৃপ্তির ভাষা যে মধুকুপির কিষাণীর রাতের গতরের বুনো আহ্লাদের একটা চিৎকার। পলুসের কাছ থেকে নয়, জোহানার পেটের ছেইলাকে নিজের ছেইলা বলে মেনে নিয়ে আদরের ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি হয়েছে যে, তার কাছ থেকে কত সহজে সুখ নিয়ে খুশি হয়ে গেল জোহানার গা-গতর আর প্রাণ! ওর নামটা জোহানা, প্রাণটা মুরলী।

পরীক্ষা করে যা বুঝতে চেয়েছিল পলুস, তা খুব ভাল করেই বোঝা হয়ে গেল। ভাল হল। জোহানাকে চিনতে পারা গেল। এইবার জোহানাও ভাল করে চিনে ফেলুক আর বুঝে ফেলুক, পলুস হালদারের এই ঘর খিরিস্তানের পরিষ্কার ভালবাসার ঘর; এখানে কপটতা করে সেরে যাবার সুযোগ নেই।

মুরলীও একটু আশ্চর্য হয়ে উঠে বসে।—তুমি সরে গেলে কেন ?

পলুস—এখনও খাই নাই; খেতে হবে কি না ?

মুরলী—আমিও তো খাব।

পলুস—সে তুমি খেয়ে নিও, যখন তোমার খেতে সাধ হবে।

মুরলীর চোখ দুটো হঠাৎ ভীরু হয়ে তাকিয়ে থাকে: এমন কথা ঘরণীকে বলতে নাই।

ভাতের থালা আর ডালের বাটি হাতের কাছে টেনে নিয়ে হাসতে থাকে পলুস, আর হাসিটাও এইবার একটা সার্থক কৌতুকের আমোদে কুৎসিৎ হয়ে

কাঁপতে থাকে : ভাল ঘরণী তুমি !

—কি বললে ? চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

পলুস—পরের ছেইলা নিয়ে আমার ঘরে সুখ করবে যে, সে আমার ঘরণী হবে কেন ?

—তোমার পায়ে পড়ি পলুস, এমন কথা বলো না। কেঁদে ফেলে মুরলী।

পলুস—ঠিক কথা বলছি ; তুমি যেমন হিসাব করে সুখ নিবে, আমিও তেমন হিসাব করে সুখ নিব। আমি তোমাকে ঠকাবো না, তুমিও আমাকে ঠকাবে না জোহানা।

—আমি তোমাকে কখনো ঠকাবো না, পলুস।

—ভাল কথা ; তবে আমার ঘরে কিষাণের ছেইলাকে রাখতে সাধ করো না।

—কিন্তু…তুমি যে আমাকে ঠকালে পলুস·· তুমি যে বললে, আমার ছেইলা এখানে থাকবে ! বিমূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মুরলী।

খাওয়া থামিয়ে মুরলীর দিকে তাকিয়ে এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস —তোমাকে ঠকাই নাই জোহানা। একটুক মজা করে শুধু বুঝে নিলাম, তুমি আমাকে কেমনটি ঠকাও আর মনে মনে…।

—কি ? মুরলীর কালো চোখের তারায় যেন জঙ্গলের আগুনের জ্বালা ঝিলিক দিয়ে ফুটে ওঠে।

পলুস বলে—তুমি তোমার ছেইলার বাপের কাছ থেকে সুখ নিতে চাও, আমার থেকে নিতে চাও না। তুমি তোমার ছেইলার বাপের কাছ থেকে সুখ দিতে চাও, আমাকে দিতে চাও না।

নীরব হয়ে যায় মুরলী।

এক ঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে আরও ভয়ানক একটা সন্দেহের ঢেঁকুর তোলে পলুস : তুমি আমাকে ছুঁয়ে থেকেও মনে মনে তোমার ছেইলার বাপের মরদানি নিয়ে সুখ কর। তোমার গতর বড় চালাক বটে জোহানা। ও চালাকি এ ঘরে চালাতে চেয়েছ কি ঠকেছ ! আমি হিসাব জানি। মধুকুপির একটা কিষাণীর চেয়েও ভাল হিসাব জানি। আমার নাম পলুস হালদার।

বিছানা থেকে নামে মুরলী। ঝকঝকে ও তকতকে এই ঘরের দরজার দিকে অপলক চোখ তুলে আর নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে নিয়ে ঘরের কোণের দিকে তাকায় মুরলী। চাটাইটা তুলে নিয়ে এসে মেঝের উপর পাতে। আর, বিষমাখা তীরের বিঁধ লাগা জানোয়ারের মত মুখ থুবড়ে গড়িয়ে পড়ে। ছোট একটা আর্তনাদও মুরলীর ঠোঁট কাঁপিয়ে শিউরে ওঠে : হে কপালবাবা !

—খবরদার জোহানা। চেঁচিয়ে ওঠে পলুস : এটা খিরিস্তানের ঘর বটে, এখানে জংলী ধরমের ডাক ডেকে পাপ করবে না, খবরদার।

না, আর কোন আর্তনাদ করে না মুরলী। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে পলুসও বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে।

হারানগঞ্জের ডাঙার ঝোপেঝাপে ঝিঁঝিঁ ডাকে। বিছানার উপর শুয়ে

বারবার চোখ চেপে ধরে পলুস ; ঘুমটা এসে এসেও যেন ঝিঁঝিঁর ডাকের শব্দে চমকে ওঠে আর পালিয়ে যায়।

হায়, হায়, এ কেমন ঝিঁঝিঁর ডাক ! কুলডিহার ডাঙাতেও রাতের ঝিঁঝিঁ এখন ডাকে নাকি ? মাটি কেটে গঞ্জ থেকে গাঁয়ে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় নাকি ? সেই ঝিঁঝিঁর গান শুনতে বড় ভাল লাগে যে !

হঁ্যা বাবা বড়পাহাড়ী। বড় ভাল তোমার দয়া ! তুমি আঁধার পথের সাদা ফুল। পথ ঠাহর হয় ; পথ হাঁটতে কোন ডর নাই।

দুর দুর দুর, হেই হেই হা, দুরুর্ ! পাথরের উপর কোদাল ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেই ছটফট করে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায় পথের হুঁড়ার আর ভালুক।

তিতির মিতির ধিপাং ধিতির ; তিতির বোলে না গো ! কেনে নয়ান ছিপে হাস গো ! বাঁশি শুনে হাস গো ! তিতির মিতির হা !

চেঁচিয়ে গান গেয়ে ঘরের দরজার কাঁচা বাঁশের ঝাঁপ ধরে একটা টান দিতেই ঘরের ভিতরের বাতিটা হেসে ওঠে। তার চেয়ে ভাল হাসি হাসে সকালী।

—এ কি সকালী ? তুই এখনো ঘুমাস নাই কেন ? এখনো খাস নাই বুঝি ?

সকালী হাসে : তুমি এসে খাওয়াবে, তবে তো খাব।

—ঘরে কিছু নাই বুঝি ?

—না।

—নাই তো নাই, এইবার খেয়ে নে।

—কি ?

—এই যে গঞ্জ থেকে নিয়ে এলাম ; মুড়ি আছে, গাজর আছে, নিমক আছে।

কোঁচড় থেকে ছোট সওদার সম্ভার একটা বাঁশের ডালার উপর উপুড় করে ঢেলে দেয় পলুস। সকালী বলে—তুমি খেয়ে নাও।

—না, তুই আগে না খেলে আমি খেতে পারবো না।

—কেন গো ?

ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ ছটফট ক'রে হাত বাড়িয়ে কি-যেন ধরতে চেষ্টা করে আর ফুঁপিয়ে ওঠে পলুস।—হায় বাবা বড়পাহাড়ী !

মেঝের চাটাই-এর উপর ধড়ফড় করে উঠে বসে আর হেসে ওঠে মুরলী।—কি বটে পলুস ?

—কি জোহানা ?

—ছিয়া ছিয়া ! কার নাম ধরলে ?

—কার নাম ?

আবার হেসে ওঠে মুরলী।—ঘুমাও পলুস। গড বাবা দয়া করেন, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।

—তুমি কি এখনও খাও নাই, জোহানা ?

—না।

—খাবে না?

—না।

চুপ করে পলুস হালদার। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করে। জোহানাকে হাত ধরে সেধে খাওয়াতে ইচ্ছা করে। কিন্তু রাতটা যেন একেবারে নীরব হয়ে গেল। ঝিঁঝির ডাক আর নেই।

পেঁছা হাওয়াটা মেতে উঠলো বোধহয়। ডরানির স্রোতের ঝুরঝুর ঝরানির শব্দ ভেসে আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী। কী আরামের ঘুম! মুরলীর নিশ্বাসের শব্দটা যেন আখড়ার নাচুনি মেয়ের ক্লান্ত বুকের শব্দের মত তালে তালে দুলছে।

কি যেন বলছে জোহানা। পলুসের কান দুটো উৎসুক হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত জোহানার নিশ্বাস যেন ফিসফিস করে থেমে-থেমে হেসে উঠছে।—ক্ষেতের মাটিতে···জাদু চালতে···হবেক কি?

আরও সতর্ক হয়ে আর নিশ্বাস বন্ধ করে একটা চোরা রহস্যের ভাষা ধরবার জন্য কান পেতে থাকে পলুস। হ্যাঁ, আবার ফিসফিস করে উঠেছে জোহানা: তবে এসো সরদার···বড় ভাল আঁধার হয়েছে সরদার।

জোহানার স্বপ্নের প্রলাপ; জোহানার প্রাণটা এখন ওর সেই জংলী স্বামীর হাত ধরে ভুঁইমানতের বীভৎস উৎসবের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে উলঙ্গ মিলনের সুখ চাইছে। এমন জোহানাকে আর কতদিন সহ্য করা যাবে? জোহানই বা এই ঘর কতদিন সহ্য করতে পারবে? ছেইলা নিয়ে আবার কিষাণের ঘরে পালিয়ে যাবে না কি?

মাথা টিপে, চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে বসে যেন এই সন্দেহের জ্বালাটাকে নিঝুম করে দিতে চেষ্টা করে পলুস। নিজেরই বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যায়।

এখান থেকে অনেক দূরে, যেখানে ডরানির স্রোতের শব্দ নেই, কিন্তু ঘন মহুয়াবনের ঝড়ের শব্দ আছে, সেই কুলডিহার একটা কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক ঘটি জল চাইতে গিয়েও বুকটা ঢিপ ঢিপ করে!

—ঘরে আসে না, ঘরণীর লেগে মায়া নাই যার, ঘরণীর গতর ছুঁতে ঘিন্না করে যে, খিরিস্তান আবার ঘরের জল খেতে চায় কেন?

—দিবে না?

—না।

—তুমি খিরিস্তান হবে না?

—না।

—তবে মর।

—আমিও বড়পাহাড়ীর কাছে তোমার মরণ মানত করলাম। দেখে নিব আমি, তুমি কাকে নিয়ে কত সুখ সেধে ঘর কর।

কী ভয়ানক হিংস্র হয়ে সকালীর চোখ দুটো জ্বলছে! ভয় পেয়ে বিড়বিড়

করে পলুস—এমন কথা বলতে নাই সকালী।

—বড়পাহাড়ীকে এত ডর কেনে গো খিরিস্তান? হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হিংস্র হাসি হাসতে থাকে সকালী।

—না না না···। বিড়বিড় করে যেন একটা বোবা বেদনার পিণ্ড উগরে ফেলতে চেষ্টা করে পলুস।

—পলুস, ও পলুস! একটা ঘুম-ভাঙানো শব্দের আঘাত পেয়ে চমকে জেগে ওঠে পলুস।

মুরলী বলে—কিসের ডর পলুস? গোঙ্গার মত চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

পলুস একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে: না, কিছু না।

পেঁছা হাওয়া কি মরে গেল? রাত ভোর হতে আর কত বাকি? চুপ করে বিছানার উপর বসে আবার ঘুমন্ত মুরলীর নিশ্বাসের শব্দ শুনতে থাকে পলুস।

আবার চমকে ওঠে পলুস। সাবধানে কান পাতে।

—জোহানা! আস্তে আস্তে ডাকে পলুস।

বিড়বিড় করে মুরলী—নাও সিস্টার দিদি···আমার কলিজা নাও···ডাইনে নজর দিবে না তো···ঢের আদর হবে তো···তবে নাও··তোমাদিগের ধরম বড় ভাল বটে গো দিদি।

শান্ত হয়ে যায় পলুসের প্রাণের এতক্ষণের জ্বালা। না, চলে যাবে না জোহানা। চলে যেতে কোন সাধ নেই জোহানার।

জানে না পলুস, কখন ভোর হল, পাখি ডাকল আর হারানগঞ্জের ডাঙার উপর ছকের ছবির মত ছড়ানো যত ঘরের লাল খাপরার চালার উপর কাঁচা রোদের আলো হেসে হেসে লাল হয়ে গেল। ঘুমিয়ে আছে পলুস। পলুসের স্বপ্নে আর কোন আর্তনাদ নেই। পলুসের বুকটা সব উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে নাকডাকা আরামের শব্দের সঙ্গে উঠছে আর নামছে।

কিন্তু মুরলী জানে, কখন কেমন করে হারানগঞ্জের কালো রাতের শেষ আঁধার আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেল, পাখি ডাকল আর পুবের আকাশটা লাল হয়ে হেসে উঠল। ভোর হবার আগেই মেঝের চাটাইয়ের উপরে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছে মুরলী, আর দু হাতে চোখ মুছে নিয়ে, ব্যস্তভাবে দরজা খুলে বাইরের বারান্দার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। যেন মুরলীর স্বপ্নের মধ্যেই অনেকক্ষণ ধরে ভোরের আলো দেখবার জন্য একটা পিপাসা ছটফট করছিল।

ছোট্ট কালো কুকুরটা, রোঁয়ায় ভরা নরম তুলতুলে কুটু, একটা লাফ দিয়ে মুরলীর গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুকুটার নখের সঙ্গে মুরলীর শাড়ির আঁচলও জড়িয়ে যায়। আঁচলটাকে আস্তে আস্তে সেই আবদেরে নখরবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কুকুরটাকে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয় মুরলী।

কিন্তু ভোরের আলোর আভা মুরলীর মুখের উপর যখন ছড়িয়ে পড়ে,

ঠিক তখনই হেসে ওঠে না মুরলী। মুখ ঘুরিয়ে আর ঘুম-ভাঙা চোখের চাহনিটাকে বড় সড়কের আমের সারি ছাড়িয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে দিয়ে যখন গির্জার চূড়াটাকে স্পষ্ট দেখতে পায় মুরলী, তখন মুরলীর কালো চোখের আঁধারের উপর যেন হঠাৎ ভোর হয়ে যায়, চোখের তারা দুটো খুশির ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে, আর আভাময় মুখটা হেসে ঢলঢল করতে থাকে।

আজ রবিবার! আর কিছুক্ষণ পরেই গির্জার ঘণ্টার সেই ডিং ডাং শব্দের সুরেলা শিহর বাতাসে ভেসে ভেসে ডাঙার এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে যাবে। হারানগঞ্জের ভালমানুষেরা প্রেয়ার সাধবার জন্য দলে দলে চারদিকের যত সড়ক আর মেঠো পথের উপর দিয়ে গির্জাবাড়ির দিকে চলতে শুরু করবে।

আর দেরি করে না মুরলী। ইঁদারা থেকে জল তুলে নিয়ে এসে মুখ ধুয়ে আর চুল ভিজিয়ে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পলুসই মুরলীর জন্য যে শাড়িটা কিনে এনে রেখেছে, সাদা গোলাপের কুঁড়ির মত দেখতে রেশমী বুটি বসানো লাল রঙের যে ফিনফিনে শাড়িটা, সেই শাড়ি গায়ে জড়ায়।

খোঁপা বাঁধতে গিয়ে সাদা সিঁথিটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে মুরলী। ভাল, খুব ভাল; সিস্টার-দিদি বলেছে, সিঁথিটা এইরকমটি থাকবে; রঙ দিবার দরকার নাই।

কিন্তু মেরিয়া যে বলেছে, সিঁথিতে রঙ নাই বা দাগলে জোহানা, কিন্তু তোমার যে নরম নরম ওঠ দুটা···।

মনে পড়তেই মুরলীর মুখের হাসি রঙিন হয়ে ওঠে। মুরলীর ঠোঁট দুটোকে লোভীর মত টিপে টিপে আদর করে মেরিয়া বলেছিল—এ দুটা রঙাতে হবে জোহানা।

—লাজ লাগে মেরিয়া।

—রাখ তোমার লাজ! ওঠ না রঙালে মরদে লুভাবে কেন?

মেরিয়ার সেই মিষ্টি হাসির ধমকটাও যেন কানে শুনতে পায় মুরলী, মনেও পড়ে যায়; বিয়ের দিনে মেরিয়া যে জিনিসটা মুরলীকে উপহার দিয়েছে, সেটা মুরলীর তোরঙ্গের মধ্যেই আছে। ছোট একটা শিশি, তার মধ্যে গালার রসের মত নরম একটা জিনিস, ঠোঁট লালচে করার রঙ।

তোরঙ্গ থেকে শিশিটা বের করে নিয়ে হেসে হেসে দুই ঠোঁটের উপর একটা নতুন আশার টকটকে লাল প্রলেপ ছড়াতে থাকে মুরলী।

—পলুস পলুস!

মুরলীর গলার স্বর সকালবেলার পাখির ডাকের মত একটা মিষ্টি কলরব হয়ে বেজে ওঠে। চমকে জেগে ওঠে পলুস।

ডিং ডাং, ডিং ডাং, গির্জার ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মুরলী—তুমি কেমন খিরিস্তান বটে গো!

—কি বটে? আশ্চর্য হয়ে মুরলীর রঙিন ঠোঁটের দিকে তাকায় আর চোখ ঘষে পলুস।

—আজ যে রবিবার বটে। গির্জা যেতে হবে না?

পলুসের চোখ যেন একটা অবুঝ বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ কোন্ জোহানা ? রাতের বেলা যে জোহানার বুকের ভিতর থেকে ভয়ানক একটা নিঃশ্বাসের বেদনা ডুকরে উঠেছিল, ভুল করে কপালবাবার নাম হেঁকেছিল যে জোহানা, সেই জোহানা রাতের আঁধার মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছে। কী সুন্দর সেজেছে জোহানা। গির্জাতে গিয়ে প্রেয়ার সাধবার জন্য ছটফট করছে খিরিস্তানী জোহানার নতুন জীবনের বিশ্বাস।

হ্যাঁ, গির্জা যেতে হবে। পলুসের জীবনে গির্জা যাবার আনন্দটাও যে নতুন হয়ে দেখা দিল। আজ আর একা নয়, পরের সঙ্গেও নয়; নিজের ঘরণী এই জোহানাকে সঙ্গে নিয়ে সকালবেলার আলোর ভিতর দিয়ে মেঠোপথ আর সড়ক ধরে ধরে গির্জাবাড়ির দিকে চলে যাবে পলুস। রাতটা যেন কতগুলি মিথ্যা ভয় সন্দেহ আর ঘৃণার উপদ্রব ঘটিয়ে পলুস আর জোহানার জীবনের মিল ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে একটা ভয়ানক ঠাট্টার খেলা খেলেছিল।

পলুস বলে—ভাবতে বড় দুখ লাগছে জোহানা··· ।

মুরলী—কি আবার ভাবতে লাগলে তুমি ?

পলুস—ভাবছি, রাতের বেলাটা কেন তুমি ভুল কথা বলে আর ভুল রাগ রেগে, আমাকে দুখ দাও।

মুরলী হাসে : আর ভুল হবে না। তুমি দেখে নিও।

পলুসও হাসে : ঠিক বটে তো ?

মুরলী—খুব ঠিক।

পলুস—কি ঠিক ?

মুরলী—তুমি যেমনটি চাও।

পলুস—সেটা কি বটে, বুঝেছ কি ?

মুরলী—তুমি তো বুঝিয়ে দিয়েছ।

পলুস—কি ?

হেসে ফেলে মুরলী : হিসাব ক'রে দিব আর নিব।

চমকে ওঠে পলুস—হ্যাঁ···ঠিক···কিন্তু···।

মুরলী—নাও, আর দেরি করো না।

আর দেরি করে না পলুস। হাতমুখ ধুয়ে আর সাজ সেরে নিয়ে মুরলীকে ডাক দিতে গিয়েই বুঝতে পারে পলুস, মুরলী ঘরের ভিতরে নেই। ঘরের বাইরে এসে দেখতে পায় পলুস, মুরলী একেবারে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর দূরের গির্জাবাড়ির চুড়ার দিকে পিপাসিতের চোখের মত চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

—চল। পলুস কাছে এসে ডাক দিতেই যেন তরতর করে এগিয়ে যায় মুরলী।

পলুসের মুখের হাসি হঠাৎ বিষন্ন হয়ে যায়। সকালবেলার রোদে ঝাঁজ নেই, বাতাসটাও ঠাণ্ডা; কিন্তু পথ হাঁটতে ক্লান্তি বোধ করে পলুস। গির্জা যাবার

আনন্দটাই নেতিয়ে পড়তে থাকে। কারণ, পলুসের পাশে পাশে নয়, পলুসের আগে আগে, যেন আবার একটা সাধের আবেগে একলা হয়ে হেঁটে চলেছে মুরলী।

পলুসের বুকের ভিতরে ছোট একটা অভিমানের নিশ্বাস হাঁসফাঁস করে। শুধাতে ইচ্ছে করে, আমিই যদি না দেখতে পেলাম, তবে কার লেগে ঠোঁট দুটা রঙালে জোহানা? আগে আগে চল কেন?

গির্জাবাড়ির ফটকের কাছে পেঁছে যাবার পর আরও একবার আশ্চর্য হয় পলুস। জোহানা পিছুপানে একটিবারও তাকালো না। গির্জাঘরের ভিতরে উধাও হয়ে গেল।

প্রেয়ার শেষে ভাল মানুষেরা গির্জাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আবার যে-যার ঘরের পথের দিকে যখন এগিয়ে যেতে থাকে, তখন পলুসও ভিড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে মুরলীর আনমনা ও একলা চেহারাটার কাছে এগিয়ে এসে বলে —চল।

মুরলী বলে—একটুক থাম; মেরিয়ার সাথে দুটা ভাল কথা না বলে চলে গেলে মেরিয়া রাগ করবে।

পলুস—মেরিয়া?

মুরলী—গির্জাঘরে আছে, এখনই আসবে। কিন্তু…।

পলুস—কি?

পলুসের মুখের দিকে তাকিয়ে মুরলী হাসে—মেরিয়ার সাথে আমার ভাল কথা হবে, তুমি হেথা থাক কেন?

গির্জাবাড়ির সামনে সড়কের উপরে একটা গাছের ছায়ায় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পলুস আর মুরলী, সেখান থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে সড়কেরই পাশের ল্যাম্পের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় পলুস; আর মুরলীর দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাসতে চেষ্টা করে। মুরলীও পলুসের দিকে তাকিয়ে আর মুখ টিপে হাসতে থাকে।

দেখতে পায় পলুস, জোহানার মুখটেপা হাসিটা হঠাৎ চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গির্জাবাড়ির ফটকের দিকে তাকিয়ে কি-যেন দেখছে জোহানা। দেখতে দেখতে জোহানার চোখের তারা দুটো যেন দুরন্ত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। জোহানার নরম ঠোঁটের লাল রঙের প্রলেপ যেন ভিজে গিয়ে চকচক করছে। কি দেখছে, কাকে দেখছে জোহানা? মেরিয়া আসছে কি?

মুখ ঘুরিয়ে গির্জাঘরের ফটকের দিকে তাকায় পলুস। দেখতে পায় পলুস, ফটকের দিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকেই আসছে রিচার্ড সরকার। সাহেবী সাজে সাজা রিচার্ড সরকারের গলার টাই ফুরফুর করে উড়ছে। রোদ লেগে ঝকঝক করছে রিচার্ডের পায়ের জুতোর পালিশ।

সড়কের উপর উঠে গাছের ছায়ার কাছে এগিয়ে এসেই রিচার্ড সরকার আনমনার মত একবার থমকে দাঁড়ায়। মুরলীর মুখের দিকে তাকায়।

মাথা হেঁট করে মুরলী। ফিনফিনে শাড়ির আঁচলটা হাতে তুলে নিয়ে যেন

সারা শরীরের একটা দুর্বহ অস্বস্তির শিহর ঢাকতে চেষ্টা করে।

চোখের চশমা খুলে হাতে তুলে নিয়ে রিচার্ড সরকারও যেন একটা চকিত বিস্ময়ের আবেগ সামলাবার জন্য চশমার কাচ মুছতে থাকে। মুরলীর সেই রঙিন ঠোঁটের শোভাটাকে যেন দেখবার চেষ্টা করছে রিচার্ড সরকারের চোখ। মুখ তোলে মুরলী; রিচার্ড সরকারের দিকে তাকায়। ব্যস্তভাবে চলে যায় রিচার্ড সরকার।

দেখতে পায় পলুস, কবরখানের ফটকের কাছে এগিয়ে যেয়ে কাঠের গুমটির ভিতর থেকে সাইকেলটাকে বের করল রিচার্ড ডাক্তার; আর সেদিকেই ছুটে চলে গেল, যেদিকে আর কিছুদূর এগিয়ে গেলে জেলাবোর্ডের সড়কটা পড়ে; তারপর আর কতই বা দূরে রিচার্ড ডাক্তারের সেই ফুলবাড়ির মত দেখতে সুন্দর বাড়িটা?

মুরলীও এইবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তরতর করে হেঁটে পলুসের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় মুরলী—চল।

পলুসের চোখ দুটো কুঁচকে গিয়ে একটা বিস্ময়ের জ্বালা চাপতে চেষ্টা করে। পলুস বলে—দেখা হলো?

মুরলী—হ্যাঁ।

ভ্রূকুটি করে পলুস: কার সাথে দেখা হলো?

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—না না, দেখা হয় নাই। কারও সাথে দেখা হয় নাই। মেরিয়া আসে নাই।

পলুস—সে তো দেখলাম। কিন্তু তুমি এখনই ঘরে যেতে চাও কেন?

মুরলী—হেথা আর থাকতে হবে কেন? কি দরকার?

পলুস—মেরিয়ার সাথে দুটা ভাল কথা বলবে কে?

হেসে ফেলে মুরলী: হায় গড! ভুলে গেলাম কেন? আর একটুক থাক পলুস। আমি মেরিয়ার কাছে যাই। ওকে একবার শুধিয়ে আসি।

পলুস—কি শুধাবে?

ভ্রূকুটি করে মুরলী—তুমি কি দারোগা বট? মিছা এত কথা শুধাও কেন?

পলুস বলে—হোই দেখ, মেরিয়া তোমাকে খুঁজছে।

মুখ ফিরিয়ে গির্জাবাড়ির ফটকের দিকে তাকায় মুরলী। আর দেখতে পায়, সত্যিই মেরিয়া যেন রাগ ক'রে আর ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজছে।

—মেরিয়া বহিন গো! হাত তুলে হাঁক দিয়ে মেরিয়ার কাছে যাবার জন্য যেন ছটফটিয়ে ওঠে মুরলী।

মুরলীর একটা হাত চেপে ধরে পলুস: মেরিয়াকে কি শুধাতে চাও? পলুসের চোখের চাহনি মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ভয়ানক সন্দেহের জবাব খুঁজছে; কাঁপছে চোখ দুটো।

দপ ক'রে জ্বলে ওঠে মুরলীর চোখ: ছিয়া ছিয়া!

—কিসের ছিয়া! কাকে ছিয়া করছো তুমি?

মুরলী—ছিয়া করছি তোমাকে, খিরিস্তান হয়েও যে মানুষ গাঁওয়ার কিষাণের মত ঘরণীর মনকে··· ।

পলুস—কি ?

মুরলী—বুঝতে পারে না ।···এ কেমন হাত ধরার রীত ?

পলুসের হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুরলী বলে—চল, ঘরে যাই।

পলুসের মুখের আর কোন কথা শোনবার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না মুরলী। সড়ক ধরে এগিয়ে যায়।

আগে আগে মুরলী; পিছনে পলুস। যেন পলুসকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার জন্য মুরলীর প্রাণের অভিমানে একটা নতুন নেশার জ্বালা লেগেছে। গির্জাবাড়ি যাবার সময় মুরলীর প্রাণটা যে উৎসাহে হেসে হেসে পলুসের আগে আগে ছুটেছিল, ঘরে ফেরবার পথে সেই উৎসাহটাই যেন রাগ করে জ্বলছে।

—জোহানা! মুরলীর পিছু পিছু হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বার বার একটা চাপা আক্রোশের ডাক ডাকে পলুস। ঠাট্টার ভাষাও মাঝে মাঝে রাগী ধিক্কারের মত বেজে ওঠে।—ঠোঁটের লাল কাকে দেখাতে চাও জোহানা? আগে আগে চল কেন?

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকায়ও না মুরলী; মেরিয়ার উপহারের রঙ দিয়ে যে ঠোঁট রঙিন করেছে মুরলী, সেই ঠোঁট যেন নতুন স্বাদে ভিজে গিয়েছে। একটা নতুন আশার ছোঁয়া হঠাৎ এসে মুরলীর ঠোঁট এঁটো করে দিয়েছে। পলুস হালদার ধমক দিলেই মুরলীর রঙিন ঠোঁটের এই স্বপ্নময় স্বাদ ঝরে পড়ে যাবে কেন?

ঘরে ফিরে এসেও যখন পলুসের সঙ্গে একটা কথাও বলতে ভুলে যায় মুরলী, তখন পলুস হালদার চুপ করে চারপায়ার উপর বসে থাকে। এই দিনের আলোতেও ভয়ানক একটা অন্ধকারের ঘোর দেখতে পাচ্ছে পলুস। জোহানার মাথার দোষে শুধু এই ঘরের রাতের জীবন নয়, দিনের জীবনও বিষিয়ে যাবে। আজ থেকে তারই শুরু দেখা দিল বোধহয়।

জোহানা কি রাঁধতে রাজি হবে? দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের রোদের দিকে তাকিয়ে যেন স্বপ্ন দেখছে জোহানা। এমন মানুষকে অনুরোধ করতেও যে ইচ্ছে হয় না। বরং মনে হয়, এই মুহূর্তে একটা লাফ দিয়ে উঠে, এই অলস অস্বস্তির ভার থেকে মনটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে, ওই উনান আর ওই সব থালা বাটি আর ডেকচি আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারলেই ভাল হতো।

পলুস ডাকে—জোহানা!

মুরলী—কি ?

পলুস—আমাকে বলতে হবে, তুমি মেরিয়াকে কি শুধাতে চাও ?

পলুসের কাছে এগিয়ে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় মুরলী : শুধাতে চাই, ভাল লিখাপড়া শিখতে কতদিন লাগে ?

পলুস—আর কি শুধাতে চাও ?

মুরলী—লুসিয়া দিদি যে বাজনা বাজিয়ে ধরমের গান করে, সে বাজনা শিখতে কত দিন লাগে ?

পলুসের গলার স্বর যেন একটা ক্ষীণ হাহাকারের মত বেজে ওঠে ঃ আর কি শুধাতে চাও ?

মুরলীর নরম ঠোঁটও কুঁকড়ে কুটিল হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে ঃ আর যদি কিছু মনে নেয় তো শুধাবো।

কী প্রচণ্ড সাধের কথা বলছে জোহানা! কত বড় স্বপ্নের কথা! কলঘরের বড় মিস্তিরীর ঘর এত বড় সাধ আর স্বপ্নের মানুষকে সুখ দিয়ে ধরে রাখবার জোর পাবে কোথায় ? জোহানাকে যে সত্যিই অনেক দূরে এগিয়ে যাবার আর বড় হয়ে যাবার নেশায় পেয়েছে।

পলুস করুণভাবে হাসে—তোমার এত সব সাধ কি সত্যি সাধ বটে জোহানা ?

মুরলী—সাধ না তো কি বটে ?

পলুস—হিসাব বটে।

মুরলী ভ্রূকুটি করে ঃ হিসাব হবে কেন ?

পলুস—হ্যাঁ জোহানা।

মুরলী—তাতে তুমি চোখ মুখ তিতা কর কেন ? তুমিই বা কি কম হিসাব জান।

পলুস—আমি কবে হিসাব করলাম ?

মুরলী—মনে নাই কি ?

পলুস—না।

মুরলী—মধুকুপির কিষাণের ঘরের দরজার কাছে এসে জল চেয়েছিল কে ?

চমকে ওঠে পলুস ঃ আমার পিয়াসকে হিসাব বলছো কেন ?

মুরলী হেসে ফেলে ঃ তোমার পিয়াস লাগে নাই পলুস, তবু জল চেয়েছিলে। হ্যাঁ কি না ?

শুকনো, ভীরু ও বেদনার্ত একটা মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে পলুস—হ্যাঁ।

কলকল করে হেসে ওঠে মুরলী কিষাণের ঘরণীর মন নিবার মতলব করে বেশ তো হিসাব করতে পেরেছিলে।

পলুস—কিন্তু তুমি তো জল দিয়েছিলে।

মুরলী—কেন দিয়েছিলাম ? জান না ?

পলুস—না।

মুরলী—খিরিস্তান শিকারীকে মন দিবার সাধ হয়েছিল।

পলুস—তুমি হেসেছিলে যে, সেটাও কি…।

মুরলী—হ্যাঁ গো, মিছা কথা বলবো কেন, সেটাও হিসাব বটে।

মাথা হেঁট করে আর এক হাতে কপাল টিপে যেন মাথার ভিতরের একটা কামড়ের জ্বালা সহ্য করতে চেষ্টা করে পলুস। আস্তে আস্তে বলে—তুমি যে আজ এত ভাল সেজে নিয়ে গির্জা গেলে, সেটাও কি তোমার হিসাব ?

—রাঁধতে হবে না বুঝি! ভ্রূভঙ্গী করে আর মিষ্টি ধমকের ঝংকার দিয়ে পলুস হালদারের প্রশ্নটাকে সরিয়ে দিয়ে উনানের কাছে এগিয়ে যায় মুরলী।

—গোবিন্দপুর বাজারে আবার যেতে হবে কিনা? আবার চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেন?

—আরও দুটো সোনার মটরদানা আনতে হবে কিনা? না, জোহানাকে দিয়ে সস্তার দাসীর মত শুধু রাঁধিয়ে নিতে চাও? বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে পলুসের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে মুরলী।

সেই হাসি; ঝকঝকে তকতকে ঠাণ্ডা হাসি। মুরলীর সেই হাসি সহ্য করতে গিয়ে বার বার ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে পলুস হালদারের চোখ।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে পলুস। পলুসের এই ঘরের জীবনটাকে যেন হেসে হেসে জাগিয়ে রেখে, আর হেসে হেসে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তর তর করে পার হয়ে যাচ্ছে দিনগুলি আর রাতগুলি: পুরো দুটো মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু এই ঘরের ভিতরে আর কোন অভিমানের আর্তনাদ ফুঁপিয়ে ওঠে নি, কোন আক্ষেপ চিৎকার করে ওঠে নি, কোন আক্রোশ গর্জন করে ওঠে নি। পলুসের নিশ্বাসের সেই ভয়টাই যেন আশ্চর্য হয়ে মরে গিয়েছে।

কত শান্ত হয়ে গিয়েছে জোহানা। পলুসের সব ইচ্ছার শাসন একেবারে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। এই দু মাসের মধ্যে ভুলেও একটা রাগের কথা বলে নি। ঝড় থেমে যাবার পর জঙ্গলের চেহারা যেমন বড় বেশি শান্ত হয়ে যায়, জোহানার চেহারাও সেই রকমের শান্ত। নতুন জীবনের ঘরে ঠাঁই নিতে এসে ওর বুকের ভিতরে একটা ভয়ের ঝড় উতলা হয়ে উঠেছিল। সেই ঝড় সামলে নিয়েছে জোহানা। জোহানা এখন হাসে, সব সময় হাসে। আতঙ্কিত হবার, রাগ করবার এবং আপত্তি করবার একটা ছুতোও খুঁজে পায় না পলুস।

মনে পড়ে পলুসের, সেই যেদিন পলুসের সঙ্গে প্রথম গির্জায় গিয়ে প্রেয়ার সেধে ঘরে ফিরে এল জোহানা, সেদিন লোহার উনানে খাদের কয়লার আগুন ধরিয়ে ভাত ডাল আর বড়ির তরকারি রান্না করবার পর শুধু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। অদ্ভুত রকমের উদাস হয়ে গিয়েছিল জোহানার মুখটা। মেঝের উপর হাতের আঙুল বুলিয়ে হাবিজাবি দাগ এঁকে এঁকে কী যেন ভেবেছিল। ব্যস্, তারপর আর নয়, আর কোনদিন জোহানাকে মুখভার করে বসে থাকতে দেখে নি পলুস। মাঝে মাঝে আনমনার মত বসে থাকে বটে; কিন্তু জোহানার এই আনমনা মুখটাও হাসতে থাকে।

এজরা ব্রাদার্সের কয়লাখাদের কলঘরের বড় মিস্তিরী পলুস হালদার রোজই সকালবেলা কাজে বের হবার জন্য যখন সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়, তখন

মুরলীও তার জীবনের একটা সাধের কাজে বের হবার জন্য আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়ে সাজ করে। ভোর হতেই ঘুম থেকে উঠে যেন একটা উৎসাহের নেশায় চঞ্চল হয়ে রান্না করে মুরলী। ছুটে ছুটে ছটফট করে কাজ করে।

পলুস একদিন বলেছিল—রাঁধাটা তো তুমি একাই করলে, খাওয়াটা দুজনে একসাথে হতে পারে কি ?

মুরলী হাসে ঃ হলে ভাল হয়।

কোন আপত্তি করে নি মুরলী; পলুসের সঙ্গে এক থালাতে ভাত খেয়ে পলুসের' সাধের দাবিটাকে হাসিয়ে দিয়েছে। পলুসের বুকের ভিতরে যে আশা বিষণ্ণ হয়ে মুষড়ে পড়েছিল সেই আশা যেন নীরবে কলরব করে একটা কৃতজ্ঞতার প্রেয়ার সেধে ফেলে, এই তো, ঠিক সুখ দিলেক গড বাবা। জোহানাও ভুল কথা বলে নাই; সুখ নিতে আর সুখ দিতে জানে জোহানা।

কয়লাখাদের কলঘরের বড় মিস্তিরী ভুবনপুরের দিকে চলে যায়; আর মুরলী চলে যায় হারানগঞ্জের সড়ক আর মেঠো পথ ধরে সেই দিকে, যেদিকে কনভেন্টের বাড়িটা বুড়ো বুড়ো বটের প্রকাণ্ড একটা কুঞ্জের পাশে লালরঙা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ কনভেন্ট বাড়ির কাছেই একটা বাড়ি, যেটা হল স্কুলবাড়ি। অনাথবাড়িটা আরও একটু দূরে; এবং আরও কিছু দূরে আসাইলাম। শুনেছে মুরলী, আসাইলামের কুষ্ঠীরাও সিস্টার দিদির দয়ায় ওষুধ পায় আর ভাত পায়। সিস্টার দিদির উপদেশ মেনে নিয়ে যারা ঈশাই মানে আর প্রেয়ার সাধে, তাদের রোগের জ্বালাও দূর হয়ে যায়।

মুরলীকে হেঁটে হেঁটে স্কুলবাড়িতে যেতে হয়। হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে হয়। ভুবনপুরের সড়ক ধরবার আগে এক-একদিন হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস। মুখ তুলে যেন হারানগঞ্জের ডাঙার শোভা দেখবার জন্য পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকে। এক-একদিন দেখতেও পায়, হ্যাঁ, ওই তো মেঠোপথ ধরে তরতর করে হেঁটে কনভেন্ট বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে জোহানা। বেচারা জোহানা!

মুরলীর সাধের কাজে যাওয়া-আসার দরকারে পলুসের কাছে মুরলীর যে দাবী ছিল, সেই দাবী সহ্য করা পলুসের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গরুর গাড়ির ভাড়া; যেতে চার আনা আর আসতে চার আনা। তার মানে মাসে পনের টাকা। আশি টাকা মাইনে থেকে পনের টাকা শুধু এরকম একটা সাধের কাজে খরচ করিয়ে দেওয়া যে উচিত হয় না, সেটা বুঝেছে মুরলী। পলুসের আপত্তির কথা শুনে শুধু দু চোখ অপলক করে পলুসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল মুরলী, তার পরেই হেসে উঠেছিল। কাচের বাটির শব্দের মত ঝনঝনে ঠাণ্ডা হাসি।

—হাসলে কেন জোহানা ?

—হাসালে হাসবো না কেন ?

—কিসে হাসালাম ?

—ঘরণীকে সুখ দিবার লেগে পনেরটা টাকা হয় না কেন ?

পলুসের চোখ যেন হঠাৎ একটা খোঁচা খেয়ে চমকে ওঠে, গলার স্বরও ভীরু হয়ে যায় ঃ তা তুমি কি বুঝতে পার না ?

—খুব বুঝি। হেসে ওঠে মুরলী।

—তবে আর রাগ কর কেন ?

—হেই নাও! রাগ করব কেন ? গো-গাড়ি না হবে তো না হবে ; আমি পায়ে হেঁটে ইস্কুলে যাব।

সত্যিই তো, একটুও রাগ করে না জোহানা। স্বামীর জীবনের একটা অক্ষম অঙ্গীকারের মুখরতাকে কত সহজে ক্ষমা করে দিয়ে হেসে উঠেছে। কিন্তু আর একটা অঙ্গীকার ; সেই অঙ্গীকারও এখনও পালন করতে পারে নি পলুস।

হেসে হেসে একদিন প্রশ্ন করে মুরলী—কই ? বলেছিলে যে আরও দুটো সোনার মটরদানা দিবে, সে জিনিস আজও আনলে না কেন ?

চমকে ওঠে পলুস ঃ আর টাকা নাই। বকশিশগুলো পেতে দাও, তারপর···।

—কিসের বকশিশ ?

—বাঘিনটাকে মেরেছি ; রেল কোম্পানি আর খাদের সাহেব যে বকশিশ দিবে, সেটা পেয়ে নিই, তারপর···।

—দেখ, রেল কোম্পানি আর খাদের সাহেবের দয়াতে যদি ঘরণীকে খুশী করতে পার।

মুরলীর মুখে হাসিটাকে সন্দেহ করতে চেষ্টা করেছে পলুস। মনে হয়েছে, জোহানার মনের একটা ভয়ানক ঠাট্টা কাচের বাটির মত ঝনঝন করে হাসছে। কিন্তু মুরলীই সেই মুহূর্তে পলুসের মনের এই সন্দেহের চেষ্টাটাকেও লজ্জা দিয়ে হাসিয়ে দিয়েছে ঃ দুটা সোনার মটরদানা না পেলে জোহানা মরে যাবে না।

রবিবার গির্জা যাবার আনন্দটাও আর ব্যথিত হয় না। পলুসের ইচ্ছার শাসন মেনে নিয়েছে মুরলী।

পলুস বলেছে—তুমি যদি আমার সাথে সাথে হেঁটে গির্জা যাও, তবে চল। না হয় তো, তুমি যাও, আমি যাব না।

পলুসের কথা শুনেছে, পলুসের মুখের দিকে তাকিয়ে আর ভ্রূকুটি করে নি মুরলী। শুধু কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বড় করে তাকিয়েছিল, আর, তার পরেই হেসে ফেলেছিল ঃ তোমার সাথে সাথে যাব।

পলুস—আমার সাথে যাবে, আমার সাথে আসবে। পথের উপর মিছা থামাথামি করবে না।

মুরলী—হ্যাঁ গো ; তোমার সাথে যাবে আর আসবে তোমার ঘরণী। পথের উপরে থামবে না, আর ডাঙার ঘাসটার দিকেও তাকাবে না !

এর মধ্যে অনেকগুলি রবিবারে গির্জাতে যাবার দরকারও হয়েছে। পলুসের মনও একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। না, জোহানার মাথায় দোষ আর ক্ষেপে ওঠে না। ঘরণী যেমনটি করে, ঠিক তেমনটি পলুসের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে

গির্জাতে যায় জোহানা। আর কেমন ভালটি হয়ে, পলুসেরই পাশে থেকে, এদিক-ওদিক কোন দিকে নজর না তুলে প্রেয়ার সাধে; আর পলুসেরই সাথে একটানা হেঁটে ঘরে ফিরে আসে।

হ্যাঁ, একটা রবিবারে ঘরে ফেরার সময় পলুসের মন আবার চমকে ওঠে, কারণ, পথের পাশে সাইকেল হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার রিচার্ড সরকার। কত বড় চোখ করে জোহানাকে দেখছে ডাগদরটা! কিন্তু…না… জোহানা ওর পানে একটিবারও নজর করলে না।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রিচার্ড ডাক্তারের ছায়া মাড়িয়ে, পলুসেরই সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরে ফিরে আসে মুরলী। পলুস হালদারের মাথার ভিতর থেকে যেন একটা দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণার ঘোর কেটে যায়। ইস্কুলে যায়, সিস্টার দিদির কাছে লেখা-পড়া শেখে; আর মেরিয়ার কাছে নিশ্চয় গানও শেখে জোহানা। না না, হিসাব নয়, জোহানার এসব সাধ ভাল সাধ বটে।

মাঝপথে সাইকেল থামিয়ে পলুসের আর ভাবনা করবার দরকার হয় না। ভাবনা করবার ইচ্ছা হয় না। ভাবনা করা উচিত নয়। পলুসের মুখটাও প্রসন্ন হয়ে হেসে ওঠে। আর, সেই মুহূর্তে একলাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে ভুবনপুর সড়কের দিকে উধাও হয়ে যায় পলুস।

কয়লা-খাদের কলঘর থেকে কাজের ছুটির পর, সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে উঠবার আগেই পলুস হালদারের সাইকেল উদ্দাম হয়ে হারানগঞ্জের দিকে ছুটতে থাকে। পড়ন্ত রোদের রঙে লাল হয়ে গিয়েছে গির্জাবাড়ির চূড়া। ঘরে ফিরতেও আনন্দ আছে। কারণ ঘরে ফিরেই দেখতে পাবে পলুস, জোহানা আগেই ঘরে ফিরে এসে উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে; আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ফিতা হাতে নিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে। বেশ সুন্দর কথা আর সুন্দর সুরের গান।—দেখ মরিয়ম কাঁদে যীশুর কবরে।

কত তাড়াতাড়ি ভাল গান শিখে ফেলেছে জোহানা। তাড়াতাড়ি ভাল লিখাপড়াও শিখে ফেলেছে কি? হ্যাঁ, আজই পথে দেখা হতে সিস্টার দিদি হেসে হেসে বলেছে—জোহানা বহিন এইবার তোমাকে আশ্চর্য করে দিবে পলুস।

—কেন দিদি?

—আর একটা মাস সবুর কর, তারপর বুঝবে!

—কি বুঝতে হবে দিদি?

—তুমি কি দুটা দিন হারানগঞ্জের বাইরে গিয়ে থাকবে না?

—হ্যাঁ, থাকতে হবে দিদি; মাস পুরা হলে বন্দুকের লাইসেনে সহি নিতে গোবিন্দপুরে গিয়ে তিন-চারটা দিন থাকতে হবে।

ঝিক করে হেসে ওঠে সিস্টার দিদির নীল চোখ: বেশ তো, কোন চিন্তা নাই। জোহানা বহিন তোমাকে চিঠি লিখবে।…এখন বুঝেছ পলুস?

ভাল কথা। কী সুন্দর আশ্বাসের কথা বলে আর হাসতে হাসতে চলে গেলেন সিস্টার দিদি।

রাতের রান্না আর খাওয়ার পালা শেষ হয়ে যাবার পর যখন ঘরের মেঝের উপর চাটাই পেতে, কেরোসিন তেলের ল্যাম্পের কাছে বই সেলেট আর খাতা ছড়িয়ে দিয়ে পড়তে বসে মুরলী, তখন চারপায়ার উপর বসে পলুস হালদার মুরলীরই কালো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলে। সুখের হাসি, তৃপ্তির হাসি, আর, একটু গর্বের হাসিও বটে। পলুস হালদারকে চিঠি লিখে ধন্য হবার জন্য যেন একটা মানত করেছে জোহানা। তাই লেখাপড়া শিখছে। পলুসও তো কিছু লেখাপড়া জানে। জোহানার চিঠির সব ভাল কথা পড়ে ফেলতে পারবে পলুস।

—জোহানা! ডাক দেয় পলুস।

পড়ার বইয়ের দিকে চোখ রেখে উত্তর দেয় মুরলী—কি ?

পলুস হাসে ঃ চিঠিতে কি কথা লিখবে জোহানা ?

চমকে উঠে মুরলী মুখ তুলে তাকায়। মুরলীর কালো চোখের তারা থরথর করে কেঁপে ওঠে—কিসের চিঠি ?

পলুস—যে চিঠিটা তুমি লিখতে চাও।

মুরলী—কাকে চিঠি লিখবো ? কি ভাবলে তুমি ?

পলুস—আমাকে যে চিঠিটা লিখবে, যখন আমি গোবিন্দপুরে গিয়ে তিনটা দিন থাকবো।

একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে হেসে ওঠে মুরলী ঃ এই কথাটি বল না কেন ? আমার চিঠি পেতে তোমার সাধ হয়েছে।

—আমার সাধ হবে না তো কার সাধ হবে ?

—ভাল সাধ হয়েছে তোমার !

চমকে ওঠে পলুস ; চোখের দৃষ্টিও যেন হঠাৎ আঘাতে বিমূঢ় হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করতে থাকে। পলুসের প্রাণের এত বড় একটা বিশ্বাসকে ঠাট্টা করে হেসে উঠেছে জোহানা। পলুসের মুখটা ব্যথিতভাবে বিড়বিড় করে—থাম জোহানা। তোমার এত হাসি আমার ভাল লাগে না।

মুরলী—আমাকে কি তুমি হাসতেও দিবে না ? তবে তোমার ঘরে এলাম কেন ?

একটু ব্যথিত না হয়ে, কোন অভিমানে একটুও বিষণ্ণ না হয়ে, এই অভিযোগের কথাগুলিকেও হেসে হেসে ছড়াতে থাকে মুরলী।

কী যেন বলতে চেষ্টা করে পলুস। কিন্তু বলতে পারে না। চারপায়ার উপর চুপ করে বসে সুখী জোহানার বেদনাহীন প্রাণের একটা শব্দ শুনছে পলুস, কিন্তু শুনে সুখী হতে পারছে না। যেন একটা ফাঁকা প্রতিধ্বনি এই ঘরের ভিতরে হেসে হেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর চেয়ে ভাল ছিল, জোহানা যদি একটু ঝগড়া করত, ভ্রূকুটি করে তাকাত, আর কেঁদে ফেলত।

বই পড়া শেষ না হতেই যখন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পারে মুরলী, হাত ধরেছে পলুস, তখন বই বন্ধ করে হেসে ওঠে মুরলী। পলুসের সেই ইচ্ছার কাছে সেই মুহূর্তে শরীরটাকে এগিয়ে দেয়। কয়লা-খাদের বয়লটের কলকব্জাও

মাঝে মাঝে ভুল করে। কিন্তু পলুসের ঘরণী জোহানা যেন কলের চেয়েও নিখুঁত। কোনও ভুল করে না।

কী আশ্চর্য, পলুস হালদারের কাছে জোহানার এই অবাধ বাধ্যতাই যেন বিস্বাদ হয়ে একটা চরম অতৃপ্তির জ্বালা হয়ে উঠেছে! পলুসের ইচ্ছার নিশ্বাস যতই তপ্ত হয়ে উঠুক, সে নিশ্বাসের তপ্ততা মুরলীর মুখের উপর যতই নিবিড় হয়ে লুটিয়ে পড়ুক, মুরলীর ঠাণ্ডা মুখটা কিন্তু ঠাণ্ডা হাসির কলের মত শুধু হাসতে থাকে। সেই হাসি সহ্য করতে না পেরে পলুসের শরীরের রক্ত যেন তেতো হয়ে যায়।

আরও কতদিন পার হয়ে গেল। ডরানির স্রোতের শুরু যেখানে, সেখানে শালবনের মাথার উপর দিয়ে নতুন মাসের পাতা-ঝরানো ঠাণ্ডা হাওয়া দিনের বেলায় হুটোপুটি করে আর রাতের বেলায় কুয়াশায় ভিজে গিয়ে চুপ করে থাকে। আর, মুরলীর মুখের হাসিটাকে যেন ভয় করে করেই পলুস হালদারের প্রতিদিনের প্রাণটা হাঁপাতে থাকে। ভাল লাগে না; দুঃসহ বোধ হয়। সব চেয়ে দুঃসহ মনে হয় তখন, মুরলীর মুখটা পলুসের বুকের একটা দুরন্ত ইচ্ছার কাছে এসেও যখন হাসতে থাকে।

সে রাতে হারানগঞ্জের আকাশে চাঁদ ছিল। আর খোলা জানালা দিয়ে ঘরের বিছানার উপর চাঁদের আলো ছড়িয়েও পড়েছিল। মুরলীর চোখের উপরে অনেকক্ষণ ধরে পলুসের যে চোখের চাহনি উপুড় হয়ে পড়েছিল, সেই চোখই হঠাৎ একটা দুঃসহ ক্ষোভের জ্বালায় জ্বলে ওঠে! ফুঁসে ওঠে পলুসের গলার স্বর: তুমি হাস কেন জোহানা? এখন কি হাসতে হয়? কোন মেয়েমানুষে কি এখন হাসে? মরদের মান নাশ কর কেন জোহানা?

মুরলী হাসে: হাসি লাগে, তাই হাসি।

সর্বনাশ! ওই ঠাণ্ডা হাসি কী ভয়ানক একটা শীতলতার অভিশাপ! মুরলীর এই শান্ত ও ঠাণ্ডা হাসির অভিশাপ থেকে বাঁচবার জন্য পলুসের নিশ্বাসের আশা একটা নিবিড়-বিহ্বল মুখের ছবিকে কল্পনায় টেনে এনে বুকের কাছে ধরে রাখে। যেন রাগ করে ফুঁপিয়ে রয়েছে সেই ছবির ঠোঁট দুটো, ব্যথার সুখে ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে, পলুসের ইচ্ছার সব ব্যাকুলতা বরণ করবার জন্য কী সুন্দর গম্ভীর হয়ে রয়েছে সেই মুখ।

পলুসের বুকের কাছ থেকে যখন ছাড়া পেয়ে বিছানার এক পাশে সরে যায় মুরলী তখন মুরলীর সেই নীরব ঠাণ্ডা হাসিটা যেন একটা ধূর্ত ঝনঝনে আওয়াজ করে বেজে ওঠে।

—কি হলো? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে পলুস।

মুরলী হাসে: চোখ মুদে নিয়ে কাকে ভাবলে গো?

—কি? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

মুরলী হাসতে হাসতে মুখ ফিরিয়ে নেয় : সকালীকে ভাবলে কি ?

চমকে ওঠে, মাথা হেঁট করে, ভীরু বোবার মত তাকিয়ে থাকে পলুস। কী ভয়ানক জোহানার সন্দেহ, আর কী ভয়ানক সত্য এই সন্দেহ! পলুস হালদারের বুকের ভিতরে লুকোনো অপরাধটা কত সহজে জোহানার চোখে ধরা পড়ে গেল।

—জোহানা! জোহানা! আতঙ্কিতের মত বার বার ডাকতে থাকে পলুস।

মুরলী বলে—আমি একটুও রাগ করি নাই। তুমি ঘুমাও।

—না ঘুমাব না; আমি জবাব নিয়ে ছাড়ব। বলতে বলতে যেন আগুনে পোড়া প্রাণীর মত ছটফট করে মুরলীর একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে পলুস।

—হাত ছাড়। আমি রাগ করি নাই, তুমি রাগ কর কেন? বলতে বলতে মুরলীর শয়ান চেহারাটা হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে বিছানার উপর উঠে বসে।

পলুস—তুমি আমাকে হেসে হেসে ঠকাবে কেন? এত বড় ঠগিন তুমি হবে কেন?

মুরলীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে : কাকে ঠগিন বলছো তুমি?

—তোমাকে।

—কে আমাকে ঠগিন করলে?

—কি বললে? জোহানার হাতটাকে পিষে দেবার জন্য পলুস হালদারের হাতের কব্জির হাড় কড়কড় করে বেজে ওঠে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—হাত ভেঙে দিলেও আমি কাঁদবো না পলুস। আমি হাসবো। হেসে হেসে সিস্টার দিদিকে বলবো, এই দেখ দিদি, তোমার আদরের খিরিস্তান, তোমার পলুস ভাই আমার হাত ভেঙে দিলে।

মুরলীর হাত ছেড়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পলুস।

নীরব ও স্তব্ধ পলুস হালদারের এই চেহারা যেন একটা জব্দ হিংস্রতার চেহারা। মুরলীর মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে আর কটমট করে পলুস হালদারের যে চোখ দুটো, সেই চোখ দুটোও যেন এক জোড়া অসহায় ও অক্ষম আক্রোশের চোখ। আর, মুরলী যেন পরম নিশ্চিন্ততার সুখে, দুর্ভাবনাহীন একটা আমোদের আবেশে পলুস হালদারের সেই কটমটে চোখের করুণতার দিকে তাকিয়ে আছে। মুরলীর মনে কোন আতঙ্ক নেই; মুরলীর চেহারা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। বেশ সুন্দর ছটফট করে দু হাত চালিয়ে ভাঙা খোঁপাটাকে পরিপাটি করে বাঁধতে থাকে আর হাসতে থাকে মুরলী।

অনেকদিন আগে, কয়লা-খাদের কলঘরে রাতের ডিউটি সেরে ভোরবেলায় হারানগঞ্জের ফেরবার সময় ভুবনপুর সড়কের ধারে পিয়াশালের ছোট্ট জঙ্গলটার দিকে তাকাতেই একটা মজার দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল পলুস হালদার। একটা গো-বাঘা হুঁড়ার সেদিন দুটো গাছের মাঝখানের ফাঁকের মধ্যে আটকে গিয়েছিল, আর মরা পিয়াশালের প্রকাণ্ড একটা ডাল হুঁড়ারের কোমরটাকে চাপা দিয়ে পড়েছিল। হুঁড়ারটা সেই চাপা-পড়া কোমর নিয়ে একেবারে অনড় হয়ে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল, এক পা ও এগিয়ে যাবার সাধ্য ছিল না। হুঁড়ারটার

চোখের সামনে, ওর সেই হিংস্র মুখের কাছ থেকে মাত্র তিন হাত দূরে একটা খরগোশ একেবারে নিশ্চিন্ত মনের আরামে দূর্বা ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। হুঁড়ারটার সেই জব্দ মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে খরগোশের লাল চোখ দুটোতে যেন একটা ধূর্ত আনন্দের হাসি টলমল করছিল।

মুরলীর মুখটাও ঠিক সেইরকম ধূর্ত আনন্দের হাসি হাসছে। চুপ করে বসে দেখতে থাকে পলুস; ঘর থেকে বের হয়ে ইঁদারার দিকে চলে গেল মুরলী; মুখ ধুয়ে আর জল নিয়ে ফিরে এল। দেয়ালের তাকের উপর থেকে থালা ডিশ আর বাটি নামাল। থালা ভরে ভাত, বাটি ভরে ডাল আর ডিশ ভরে শাক-মাংস নিয়ে মেজের উপর বসে পড়ল মুরলী।

মটর শাক আর সরষের শাক দিয়ে হরিয়াল ঘুঘুর মাংস রান্না করেছে মুরলী। আজই সকালে একটা মানুঝি ছোঁড়ার কাছ থেকে চার আনা দিয়ে ঘুঘুটা কিনেছিল পলুস। পলুসই মুরলীকে বলে গিয়েছিল—ইস্কুলবাড়ি থেকে আজ ফিরবে যখন, তখন বুড়া জুলিয়াসের ঘরে যেয়ে ওর ক্ষেতের মটর শাক আর সরষের শাক কিনে নিয়ে এসো জোহানা। এক আনাতে ঢের শাক হবে। ঘুঘুটার হাড়মাস ভাল করে ছেঁচে নিবে; নিমক ঝাল বেশি দিবে না। শাক-মাস সিঝে যাবার পর কাঁচা পেঁয়াজের কুচা ঢেলে দিবে।

যা বলে রেখেছিল পলুস, তাই করেছে মুরলী। শাক-মাসের যেমনটি স্বাদ চেয়েছিল পলুস, ঠিক তেমনটিই স্বাদ ধরেছে গরম-গরম শাক মাস। চুপ করে বসে দেখতে থাকে পলুস, পিয়াশালের জঙ্গলের সেই খরগোশটার মত নিরাতঙ্ক মনের একটা সুখের ঝোঁকে পেটভরে ভাত ডাল আর শাক-মাস খেয়ে নিল মুরলী। পলুসের উপর অভিমান করে উপোসী থাকবে আর পেটের ক্ষুধাটাকে দুখাবে, এই জোহানা সেই জোহানা নয়। গতরের উপর বড় দরদ জোহানার। পেটটার উপর বড় মায়া। পেটের ভিতরের একটা মায়াকে বড় যত্ন করে খাইয়ে বাঁচিয়ে আর পুষে রাখছে জোহানা।

মুরলীর নামে যদি পাল্টা একটা অভিযোগ করে সিস্টার দিদির কাছে বলতে পারা যেত—জোহানা আমার ঘরের সুখ নাশ করছে দিদি, তবে কি একটা বিচার করত না, আর মুরলীকে একটা ধমক দিয়ে সাবধান করে দিত না সিস্টার দিদি? কিন্তু···ভাবতে গিয়ে ভয় পায় পলুস হালদার, মুরলীর নামে কি অভিযোগ করবে পলুস? মুরলী শুধু হাসে, এই অভিযোগের কথা শুনলে সিস্টার দিদি যে নিজেই হেসে ফেলবে, আর পলুসকেই ধমক দিয়ে সাবধান করে দেবেঃ তোমার কি মাথা খারাপ হলো পলুস; বেচারা জোহানা যে এত হাসে, সে তো সুখের কথা বটে।

আর, মুরলী যদি ঐ ভয়ানক ঠাণ্ডা হাসির নেশায় খিলখিল করে হেসে সিস্টার দিদির কাছে পলুসেরই বুকের ভিতরের একটা গোপন অপরাধের কথা শুনিয়ে দেয়, তবে? সিস্টার দিদির নীল চোখ যে দপ্ করে আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে। কেন পলুস? খিরিস্তান হয়েও তোমার মনে আজও জংলী পাপ লুকিয়ে থাকে কেন? জোহানার স্বামী হয়েও তুমি মনে মনে এখনও

সকালীর মুখটাকে ভাব কেন? ছিঃ পলুস, ছিঃ!

না, উপায় নেই, সিস্টার দিদির কাছে পাল্টা অভিযোগ করবার কিছু নেই। বরং মুরলীই অভিযোগ করতে পারে—দেখ দিদি, আমি তোমার পলুস ভাইয়ের সব কথা আর সব ইচ্ছা মেনে চলি, দাসীর মত খাটি আর ভালমানুষের মত হাসি; আমি কোন্ দোষ করলাম দিদি?

কল্পনায় দেখতে পায় পলুস আর চোখ দুটো ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। জোহানার মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করছে সিস্টার দিদি, আর পলুসের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে—আমার জোহানা বহিনকে দুখ দিলে তোমার ভাল হবে না পলুস। মনে রেখো, আমি তোমাকে কয়লা খাদের কলঘরে চাকরি পাইয়ে দিয়েছি।

মেঝের উপর আর চাটাই পাতে না মুরলী। আবার খোঁপা ভেঙে চুল এলো করে দিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘরণী যেমনটি করে, ঠিক তেমনটি; মুরলীর আচরণে কোন ভুল নেই, কোন খুঁত নেই। শুনলে সিস্টার দিদি যে আশ্চর্য হয়ে উঠবে, জোহানা বহিন কোন দোষ করে না, এটা কি দোষ বটে পলুস? তোমার বুদ্ধি কি খারাপ হয়ে গেল পলুস?

কিন্তু পলুসের স্তব্ধ শরীরটা মাঝে মাঝে কাঁপে, আর বুকের ভিতরে একটা বিমূঢ় বেদনা থেকে থেকে গুমরে ওঠে।—তুমি বিশ্বাস কর দিদি, তোমার জোহানা বহিনই ঠাণ্ডা হাসি হেসে আমার কলিজার সব জোর খারাপ করে দিচ্ছে। জোহানার গতর বড় ঠগ গতর। কত ঠাণ্ডা ওর শ্বাস, কত শক্ত ওর ঠোঁট দুটা। জোহানার চোখ দুটা এত হাসে বলেই যে আমার মন দুখায়, আর জংলী সকালীর চোখ দুটা মনে পড়ে যায়। আমাকে যে পাপী করে দিলে তোমারই জোহানা বহিনের হাসিটা।

ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী। চুপ করে বসে মুরলীর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে পলুস। মুরলীর শিথিল শাড়িটাও যেন ঘুমের ঘোরে এলিয়ে পড়ে আছে। হ্যাঁ, কি ভয়ানক ঠগ গতর, কত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মুরলীর সরু কোমরের খাঁজ নতুন রক্তমাংসের আহ্লাদে ভরাট হয়ে গিয়েছে।

জ্বলতে থাকে পলুসের নিশ্বাসের বাতাস। এতদিনে একটা ভয়ানক বেহায়া রহস্যের অর্থ বুঝতে পেরেছে পলুস হালদার। যে মানুষের হাতটাকে পিষে দেবার জন্য কড়কড় করে বেজে ওঠে পলুসের কব্জির হাড়, সেই মানুষ তবুও কেন এই ঘরের দরজার কপাট আর ঘর ছেড়ে চলে যায় না? সে মানুষ হেসে ওঠে কেন? পলুসের এই ঘরের সব শাসন এত সহজে মাথা পেতে নিয়ে এত শান্ত হয়ে থাকে কেন সেই মানুষ?

কি ভেবেছে জোহানা? অনাথবাড়িতে না গিয়ে ওর পেটের ছেইলাকে এই ঘরের ভিতরেই রাখতে আর বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে বলে ভরসা করছে? তাই কি এই ঘরের হুকুমের প্রতি এত বাধ্যতা? তাই কি ভুলেও একবার অনাথবাড়ি যাবার নাম করে না?

মুরলীর পেটের দিকে তাকিয়ে পলুস হালদারের চোখ দুটোও হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। বিষ আছে জোহানার পেটে। ওই বিষ আছে বলেই জোহানার গতরটা এমন ঠগ হয়েছে। তাই পলুসের ছোঁয়াকে একটা অসার কৌতুকের ছোঁয়া বলে মনে করে জোহানা, আর মুখ টিপে ঠাণ্ডা হাসি হাসে।

জোহানার এই শরীরকে পলুসের স্পর্শ না করাই উচিত ছিল। এই ঘরটাও বোধহয় পলুসের বৃথা উল্লাসের রকম-সকম দেখে মুখ টিপে হেসেছে, আর ঠাট্টা করেছে। এমন জোহানাকে ছুঁয়ে লাভ কি পলুস? এমন জোহানার গতর বুকের কাছে টেনে নিয়ে যতই আদর কর না কেন, তাতে তোমার ছেইলা তো আসবে না পলুস। যে আসবে, সে হলো একটা কিষাণের ছেইলা।

প্রহরের পর প্রহর রাতের আঁধার পান করে যেন নেশা করেছে হারানগঞ্জের ডাঙার যত ঝোপঝাপের ঝিঁঝি। বাতাস উতলা হলেও ঝিঁঝির স্বর নেতিয়ে পড়েছে। পলুস ডাকে—জোহানা!

ধড়ফড় করে উঠে বসে মুরলী: কি? সকাল হয়েছে কি?

পলুস—সকাল হবে এখনই।

মুরলী—বেশ তো।

পলুস—না, বেশ নয়। তুমি আজ আর ইস্কুলবাড়ি যাবে না।

মুরলী আশ্চর্য হয়ে তাকায়: কেন?

পলুস—তুমি আজ অনাথবাড়ির হাসপাতালে যাবে।

মুরলীর কালো চোখের তারা দুটো জ্বলে জ্বলে হাসতে থাকে: এত তাড়াতাড়ি কর কেন পলুস? মেরিয়া বলেছে, আর এক মাস পরে…।

পলুস—না, আজ তোমাকে যেতে হবে।

—কেন?

—তোমার মতলব ভাল নয়।

—কিসে বুঝলে?

—আমি সব বুঝি জোহানা। চিৎকার করে ওঠে পলুস: তুমি আমার এই ঘরে থেকেই তোমার পেটের বিষ খালাস করতে চাও।

—বিষ?

—হ্যাঁ বিষ বটে। তুমি ভেবেছ, দিনগুলো হেসে হেসে পার করে দিবে, অনাথবাড়ির হাসপাতালে যাবে না, আর আমার ঘরের ভিতরে বসে কিষাণের ছেইলার নাড়ি ছুঁয়ে ছল-কাঁদা কেঁদে আমাকে ভুলাবে। সে হবে না, কভি হবে না জোহানা।

মুরলীর চোখের তারা এইবার ধিক ধিক করে হাসে: না পলুস। তুমি বড় ভুল ভাবলে পলুস। জোহানা আর কভি তোমার কাছে কাঁদবে না, তোমার কাছে মাপ মাগবে না।

—তবে আর কথা বল কেন?

—শুধাই, এত তাড়াতাড়ি কর কেন?

—আমার মনে ডর আছে।

—কিসের ডর ?

—না, ডর নয়। আমার ঘিন্না লাগে।

—কাকে ঘিন্না লাগে ?

—তোমার ঠগ গতরকে।

—ঠগ গতর বল কেন ?

—তোমার এই গতর ছুঁলে আমার এই ছেইলা আসবে না ; কিন্তু আমি যে আমার ছেইলা পেতে চাই জোহানা। বলতে বলতে পলুসের চোখ দুটো যেন ক্ষুধাকাতর পাগলের চোখের মত ছটফট করে জ্বলতে থাকে।

—এই তোমার ডর! হেসে ওঠে মুরলী। সে হাসির শব্দ যেন একটা ঠাণ্ডা কৌতুকের প্রেতের মত শরীরহীন প্রতিধ্বনি হয়ে পলুস হালদারের ঘরের বাতাসে ঢলে ঢলে গড়াতে থাকে।

ঝিঁঝিঁর ডাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরের জানালার ফাঁকের উপর বাইরের আকাশের আভাস হেসে উঠেছে। পলুস হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় সুন্দর শান্ত হাসি হাসে মুরলী: তোমার বড় ভাল সাধ হয়েছে পলুস। কিন্তু…।

—কি ?

—হাসপাতাল যদি এখনই আমাকে নিতে না চায় ? যদি একটা মাস পরে আসতে বলে ?

—সে আমি মানবো না।

—তোমার হাসপাতাল নয় পলুস। সিস্টার দিদির হাসপাতাল।

—তুমি আমাকে মিছা ভুলাবার ছল করো না। তোমাকে আজ হতে হাসপাতালে থাকা করাবো আমি।

—তবে যে টাকা লাগবে পলুস। মেরিয়া বলেছে, আগে ভাগে ভর্তি হলে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা লাগে।

—টাকা দিব।

মুরলীর চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে হাসতে হাসতে যেন বড় হয়ে ওঠে: কয়লাখাদের বড় মিস্তিরী কত টাকা পায় ? মাসোহারা অনেক বেড়েছে কি ?

ভ্রূকুটি করে পলুস। যেন একটা জ্বালাময় হুংকার কোনমতে চেপে রেখে, আস্তে আস্তে আর শক্ত করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে পলুস—ডুমুরের জাউ খেয়ে কাঁদতো যে কিষাণী, সে আবার এমন কথা শুধায় কেন ?

বিছানা থেকে নেমে জানালা খোলে মুরলী। বাইরের আকাশের এক ঝলক আভা ঘরের ভিতর এক ঝলক হাসির মত লুটিয়ে পড়ে। ছটফট করে ঘরের ভিতরে ঘুরতে থাকে মুরলী। বই আর খাতা একটা ঝুলির মধ্যে ভরে। আলনার শাড়ি জামা আর সায়া ধরে টান দেয়। ঝটপট চোখমুখ ধুয়ে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

—চল পলুস. চল। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর মুখটা ক্ষেপী হাসুনির মুখের মত অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। মুরলীর ছটফটে শরীরটা ক্ষেপী নাচুনির

শরীরের মত অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকে।

অদ্ভুতভাবে ছুটে ছুটে চলতেও থাকে মুরলী, পিছনে পলুস। অনাথবাড়ির হাসপাতালের কাছে যখন দুজনে পৌঁছে যায়, তখন সকালবেলার রোদও বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে।

অনাথবাড়ির সেই হাসপাতাল, যে হাসপাতালে দাইয়ের কাজ করে জনের মা আনিয়া বুড়ি। হাসপাতালের বারান্দায় বেঞ্চির উপর চুপ করে বসে থাকে মুরলী। বারান্দার উপর আস্তে আস্তে হেঁটে পায়চারি করে পলুস। তারপর সাইকেল ছুটিয়ে আসাইলামের অফিসে গিয়ে পনের মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে; হাতে একটা চিঠি।

সিস্টার দিদির চিঠি নিয়ে এসেছে পলুস। সিস্টার দিদি হেসে হেসে স্নেহার্দ্র স্বরে বলেছে—হ্যাঁ পলুস, ডাক্তার যদি বলে যে জোহানার এখনই ভর্তি হওয়া ভাল, তবে এখনই ভর্তি হবে জোহানা। টাকা লাগবে না। আমি চিঠিতে এই কথা লিখে দিলাম।

সেই চিঠি মুরলীর হাতে তুলে দেয় পলুস। চিঠিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ভর্তি হবার প্রতীক্ষায় বসে থাকে মুরলী।

জনের মা আনিয়া বুড়ি এসে বলে—ভাবনা করবে না জোহানা। এখনই তোমার ডাগদারি হয়ে যাবে। তারপর গড বাবার দয়া···ভাবনা করবে না জোহানা।

বুঝতে পারে নি মুরলী, কখন চোখ দুটো একটা অলস স্বপ্নের ভারে ছোট হয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলের খুঁট দুই নরম ঠোঁটের একটা শক্ত যন্ত্রণা দিয়ে কামড়ে ধরে নিজেরই এই অপেক্ষার নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনতে থাকে মুরলী। চোখ মেলে তাকিয়েও যেন দেখতে পায় না মুরলী, পলুস হালদারের শক্ত ছায়াটা কেমন ক'রে চলন্ত প্রহরীর মত ওরই চোখের সামনে আনাগোনা করছে।

জনের মা আনিয়া বুড়ি হঠাৎ এসে আদর করে মুরলীর হাত ধরে চেঁচিয়ে ওঠে: চল জোহানা।

থমকে দাঁড়ায় পলুস হালদার। জনের মা আনিয়া বুড়ির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বারান্দার শেষ দিকে ছোট ঘরটার কাছে এগিয়ে যেয়ে যখন দাঁড়িয়ে পড়ে মুরলী, আর ঠেলা দিয়ে দরজা খোলে আনিয়া বুড়ি, তখম বুঝতে পারে পলুস, এইবার জোহানার উপর একটা ডাক্তারী কাজ হবে, আর ভর্তি হয়ে যাবে জোহানা। দেখতে পেয়েছে পলুস, ঘরের ভিতরে মস্ত বড় একটা টেবিল; সেই টেবিলের উপর একটা বালিশও আছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে পলুস, সিস্টার দিদির চিঠিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লো জোহানা। আর, জনের মা আনিয়া বুড়ি জোহানার ঝুলিটাকে হাতে নিয়ে·· কে জানে কোন্ ঘরের দিকে চলে গেল।

চমকে ওঠে পলুস হালদার। পলুস হালদারের চোখ আর কান শিউরে দিয়ে

এক জোড়া চকচকে জুতোর শব্দ পলুসেরই ছায়া মাড়িয়ে চলে গেল। গটমট করে হেঁটে এগিয়ে যেয়ে, ছোট ঘরের ভিতরে ঢুকেই দরজার কপাট বন্ধ করে দিল ডাক্তার রিচার্ড সরকার।

বারান্দার উপর এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে পলুস। গলায় জড়ানো রামধনু রঙের রুমাল ঘামে ভিজে যায়। চোখ দুটো কেঁপে কেঁপে ক্লান্ত হয়। বন্ধ নিশ্বাস বুকের ভিতরে যেন দুম দুম শব্দ করে কিল মারে।

ছোট একটা ঘর, সে ঘরের ভিতরে একটা ভয়ানক নীরবতার মধ্যে শুধু দুটি মানুষ; জোহানা আর রিচার্ড সরকার। এ কি হল? জোহানার ঠগ গতরটাকে চিনতে আর বুঝতে এত দেরি করে কেন ডাক্তারটা? এত কি দেখবার আছে? ওই ভয়ানক ডাক্তারী চোখ দুটোর সব দেখা এখনো শেষ হয় না কেন? জোহানাও কি এখনও লাজ পেয়ে গতর ঢাকে নাই? ওরা দুজনে কি গায়ে গায়ে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করে সুখ-দুখের কথা বলাবলি শুরু করে দিল?

ঘরের দরজা খুলে যায়। তেমনই গটমট করে হেঁটে, ডাক্তারী সরঞ্জামের ব্যাগ এক হাতে ঝুলিয়ে, আর গলার টাই ফুরফুরিয়ে চলে গেল ডাক্তার রিচার্ড সরকার।

আর, আস্তে আস্তে হেঁটে, যেন একটা সুখী শরীরের আলস্যের ভার টানতে টানতে পলুসের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী— যাও পলুস।

—কি? বলতে গিয়ে পলুসের ঠোঁট দুটো ভীরু হয়ে বিড়বিড় করে।

—তুমি এখন ঘরে যাও পলুস।

—তুমি কি যাবে না?

—হে গড! কলকল করে হেসে ওঠে মুরলী—তুমি এ কেমন কথা বলছো? আমি ঘরে যাব কেন?

—তুমি যে বললে, তাড়াতাড়ি নাই। একমাস দেরি আছে।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছি।

—তবে এখন ঘর চলে না কেন?

—না পলুস।

—কেন জোহানা?

—ডাক্তার বললে।

—কি বললে ডাক্তার?

—আমার এখনই হাসপাতালে থাকা ভাল।

—কেন এমন কথা বলে ডাক্তার? ভ্রূকুটি করে, আর, যেন একটা চিৎকার চাপতে চেষ্টা করে পলুস।

মুরলী হাসে: সে কথা আমাকে শুধাও কেন? ডাক্তারটাকে শুধালেই পার।

জনের মা আনিয়া বুড়ি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে যেন আদরের আবেগে চেঁচাতে থাকে—জোহানা, জোহানা বহিন, তোমার বড় ভাল ঠাঁই হয়েছে বহিন

চল বাহিন।

মুরলীর হাত ধরে টান দেয় আনিয়া বুড়ি। আনিয়া বুড়ির সঙ্গে চলতে থাকে মুরলী। জোছানার মুখের সেই ঠান্ডা হাসিটা আরও ঝিকমিক করে। আনিয়া বুড়ির হাত ধরে একটা নতুন আহ্লাদের জগতের দিকে চলে যাচ্ছে জোহানা। শুনতেও পাওয়া যায়, আনিয়া বুড়ি কী ভয়ানক মুখর হয়ে বকবক করতে করতে চলে যাচ্ছে: গড বাবা দয়া করেন, গড বাবা দয়া করেন।

আর দেরি করে না পলুস। বারান্দা থেকে নেমে, সাইকেলটাকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে, সড়কের দিকে এগিয়ে যায়।

অনেক দূরে, ভুবনপুর খাদের কলঘরের চিমনি থেকে কালো ধোঁয়ার ফোয়ারা উথলে উঠে ভুবনপুরের আকাশের রোদটাকে কালো করে দিচ্ছে। সেই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সাইকেলের উপর লাফ দিয়ে উঠে বসে পলুস আর উধাও হয়ে যায়।

অনাথবাড়ির ছোট হাসপাতালের ছোট একটা ঘরে ছোট একটা খাটিয়া। বালিশ আছে, দুটো কম্বল আছে, আর একটা চাদরও আছে। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে নিকটে একটা তাল গাছ দেখা যায়; অনেক রাতে তালের মাথার উপর একটা মাদি শকুন মাঝে মাঝে পাখা ধড়ফড়িয়ে ছটফট করে। কিন্তু দুপুর বেলা রোদের তাতে যখন তালের মাথাও ঝলসে যেতে থাকে, তখন ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকে মাদি শকুনটা। রোদে ভাজা-ভাজা হয়ে যায় শকুনটা, তবু নড়ে না। শকুনটার ডিম ফুটেছে কি ফুটে নাই, কে জানে? বুঝতে পারে না মুরলী। শুধু উদাসভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

লিখতে আর পড়তে কখনও মন লাগে, কখনও লাগে না। কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। মুরলীর গতর ছুঁয়ে নিজের ছেইলা পেতে চায় পলুস, কিন্তু পলুসের ছায়ার কাছে এগিয়ে যেতেও যে মুরলীর মন ঘৃণা বোধ করে; দুঃসহ জ্বালায় ভরা একটা ঘৃণা। মুরলীর ছেইলাকে অনাথবাড়ির অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় যে, তাকে ছেইলা দিবার জন্য এই শরীরটা ছেড়ে দেবার আগে বিষ খেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

কিন্তু মরতে যে একটুও ইচ্ছে করে না। অথচ পলুসের ওই ঘরের আশ্রয় ছাড়া যে আর কোন আশ্রয়ও নেই। হাসপাতাল থেকে পলুস হালদারের ঘরে ফিরে যাবার পর, পলুস হালদারের সেই হিংস্র আহ্লাদের দাবী মুরলীর শরীরটাকে ক্ষুধাতুর জন্তুর মত আঁকড়ে ধরতে চাইবে। এই ভয়। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে দিনের পর দিন শুধু এই ভয় সহ্য করতে গিয়ে দিন দিন হতাশ হতে হয়। মুরলীর নিঃশ্বাস জ্বলতে থাকে। সে অভিশাপ সহ্য করতে পারবে না মুরলী।

এখনও দরকার আছে, তাই পলুসের ঘরটা চাই, পলুসের টাকাও চাই;

কিন্তু পলুসকে চাই না। পলুস যেন মুরলীর গা ছুঁতে না পারে; এমন উপায় কি হয় না?

যারা বিনা টাকাতে এই হাসপাতালে ভর্তি হয় আর এইরকম ঘরে থাকে, তারা সকালে উঠেই নিজের হাতে ঘর ঝাঁট দেয় আর বিছানার চাদর নিজের হাতেই সাবান দিয়ে কাচে। দেখতে পায় মুরলী, পাশের ঘরে যে মোটাসোটা বহুড়িটা থাকে, একমাসেরও বেশি হল যার একটা সুন্দর মোটাসোটা বাচ্চাও হয়ে গিয়েছে, তার ঘরে দুটো দাই দিনরাত খাটে। বহুড়িটাকে কোন বাবুর বহুড়ি বলে মনে হয়। বহুড়িটার গায়ে কতরকমের গয়না! খাটের উপর বসে পানের ডাবর হাতের কাছে নিয়ে পান সাজে আর খায়, সব সময় হাসে। হাসপাতালের ভাত মুখে দেয় না, ছোঁয়ও না। রোজই দু বেলা একটা লোক এসে বহুড়িটার ঘরে নানারকম ভাল ভাল খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়।

এই বহুড়িটাই একদিন মুরলীকে জিজ্ঞেস করে—তুমি নিজে খাট কেন গো বহিন? তুমি কি খয়রাতী বট?

মুরলী হাসে—হ্যাঁ গো দিদি।

—টাকা দিতে পারে না কি তোমার সোয়ামি?

—না।

—কেন? কি কাজ করে তোমার সোয়ামি?

—কয়লা-খাদের কলঘরে কাজ করে।

—মিস্তিরী বটে কি?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

—পলুস হালদার।···কিন্তু তুমি নাম শুধাও কেন দিদি?

গায়ের গয়না দুলিয়ে হাসতে থাকে বহুড়িটা—ওই কয়লা-খাদ যে আমার খাদ বটে।

মুরলী আশ্চর্য হয়ঃ তোমার খাদ কেন হবে? ওটা সাহেবের খাদ!

—হ্যাঁ গো বহিন, সাহেবেরই খাদ বটে; কিন্তু খাদের সব টাকা যার জিম্মায় থাকে, সে মানুষটা যে আমারই···।

—তোমার সোয়ামি?

—ছিঃ, সোয়ামি কেন হবে ওই মুখপোড়া?

মুরলীর বুক দুরুদুরু করেঃ তোমাকে যে কেমনটি মনে হয় দিদি।

—কেমনটি মনে হয়? কয়লা-খাদের খাজাঞ্চিটা আমার কে বটে, বল দেখি বহিন? পান মুখে দিয়ে ঢলে ঢলে হাসতে থাকে মেয়েলোকটা।

—আমার বলতে ডর হয় দিদি। সত্যিই ভীরুর মত চোখ করে মেয়েলোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

মেয়েলোকটা বলে—হ্যাঁ, এক সালও হয় নাই। খাজাঞ্চিটা আমাকে ঝরিয়া থেকে আনা করিয়ে ওর ঘরে রেখেছে। লোকটা কিন্তু ভাল বটে বহিন; বড় ভাল ভেড়াটি বটে! ওর সব টাকা আমি ছিনে নিই, তবু রাগ করে না।

মুরলী—বাবুটার ঘরে আর কেউ নাই ?

—বাবুটার আর-একটা ঘর আছে, সেথা ওর মাগ ছেইলা থাকে। মাগকে দশটা টাকা পাঠাবে যদি, তবে আমাকেই হাত ধরে সাধে বাবুটা, তুমি দয়া কর বিজু, দয়া করে দশটা টাকা দাও। বড় ভাল ভেড়া বটে। ঝরিয়ার বিজু বাঈ-এর মত রাখনি পেলে কে না ভেড়া হবে গো ?

মুরলী—কিন্তু একদিন যদি তোমাকে…।

বিজু বাঈ-এর চোখ দুটো যেন একটা ঠাট্টার রসে চিকচিক করে ওঠে : খেদিয়ে দেয় যদি ? দেয় তো দিবে।

মুরলী—তোমার এই ছেইলার দশা কি হবে ?

বিজু বাঈ—আমার ছেইলার দশা আবার কি হবে ? আমার কাছে থাকবে। বড়টি হবে। আমার যা টাকা আছে তাতে…।

মুরলী—কি ?

বিজু বাঈ—তাতে আমার ছেইলা একদিন একটা রাজপুত কি বামনের বেটিকে বিয়া করে ঘরে নিয়ে আসবে। টাকাতে কি না হয় বহিন ?

বিজু বাঈ-এর হাসির শব্দ শুনতে শুনতে, আর বিজু বাঈ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুরলীর মুখটা যেমন করুণ তেমনই উদাস হয়ে যায়।

বিজু বাঈ বলে—তুমি মুখটাকে কালা কর কেন বহিন ? কি হয়েছে তোমার ?

উত্তর দেয় না মুরলী।

পানের পিক গিলে আর দোক্তার ঝাঁজে নাক কান লাল করে নিয়ে বিজু বাঈ আবার হাসে : ভাবনা কর কেন ?

মুরলী—আমার যে ভাবতে হয় দিদি। তুমিও ছেইলা নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে, কিন্তু আমি শুধু ওই ঝোলাটা হাতে নিয়ে ফিরে যাব।

বিজু বাঈ-এর লাল নাক আর কান যেন হঠাৎ-আতঙ্কে শিউরে ওঠে : না না; এমন কথা ভাব কেন বহিন ? মা কালী দয়া করবে, তোমার পেটের সব বিপদ নাশ হয়ে যাবে। সুন্দর ছেইলা হবে তোমার।

মুরলী—কিন্তু সে সুন্দর ছেইলাটাকে ঘরে নিয়ে যাবার উপায় নাই।

—কে এমন হুকুমটি দিলে ?

—হুকুম দিলে আমার ঘরের মানুষ।

—মানুষটা ক্ষেপা বটে কি ?

—একটুকুও ক্ষেপা নয়। বড় ভাল হিসাব জানে।

—হিসাব কেন ? তোমার ছেইলা কি ওর ছেইলা নয় ?

—না, আমার আগের সোয়ামির ছেইলা।

—তাই বল না কেন ? ভাতারে রাগ করেছে ? বিজু বাঈ-এর আতঙ্কিত মুখটা এইবার একটা আক্রোশের জ্বালায় কুৎসিত হয়ে যেন মুরলীকেই ধিক্কার দিতে থাকে : ভাতারগুলো যে এমন ছুঁচা হয়, আগে বুঝ নাই কেন ? ভাতার

কর কেন?

মুরলী ভ্রূকুটি করে: তুমি এ সব কথা আমাকে বলবে না।

বিজু বাঈ মুখ বেঁকিয়ে হাসে: কেন বলবো না গো? সোয়ামিগুলা ছুঁচা বটে যে গো! মাগের পেটের হিসাব নিবার লেগে কিচকিচ করে। ভাতারের চেয়ে ভেড়ারা ঢের ভাল।

মুরলী—কেন ভাল?

বিজু বাঈ—মাগির পেটের হিসাব নিবার লেগে কিচকিচ করে না ভেড়ারা। ভুবনপুর একদিন যাবে তো দেখতে পাবে, আমার এই ছেইলাকে কোলে নিয়ে কত আদর খাটছে খাজাঞ্চিটা।

মুরলী—বাবুটা ওর নিজের ছেইলাকে কোলে নিয়ে আদর খাটবে, তাতে আর···।

হি হি! হি হি! হাসতে হাসতে এলিয়ে পড়ে বিজু বাঈ। বিজু বাঈ-এর বাজুবন্ধের সোনার ঝালরও যেন একটা দুরন্ত কৌতুকের আমোদে নীরব হি হি হাসি হেসে কাঁপতে থাকে। বিজু বাঈ বলে—এটা খাজাঞ্চির ছেইলা নয় বহিন; এটা একটা ঠিকাদারের ছেইলা। খাজাঞ্চিটা সবই জানে।

মুরলীর হতভম্ব মুখটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তীব্র একটা চাহনি হেনে তাকিয়ে থাকে বিজু বাঈ। তারপর ফিসফিস করে বলে—তোমার যদি ঘরে ফিরে যেতে মন না করে, তবে বল বহিন। আমি তোমার···।

বিজু বাঈ-এর মুখের দিকে মুরলীও তীব্র একটা চাহনি ছড়িয়ে দিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। তার পরেই মুখ নামিয়ে নিয়ে দেয়ালের গায়ে নখের দাগ বোলাতে থাকে। মুরলীর জীবনের একটা আশা যেন একটা সুযোগ পেয়ে এইবার ভয়ানক কঠোর হয়ে উঠেছে আর হিসাব করছে।

মুরলী বলে—তুমি আমার মতলবের একটা কথা আগে শুনবে কি?

—বল।

—তোমার বাবুটাকে বলে কলবরের বড় মিস্তিরীকে বদলি করিয়ে দিতে পার?

আর একটা পান মুখের ভিতরে পুরে দিয়ে বিজু বাঈ ফিসফিস করে—খুব পারি। খাদের মানিজারবাবু খাজাঞ্চিটাকে খুব মানে।

মুরলী—তবে তাই কর।

বিজু বাঈ যেন ফোঁসফোঁস করে হাসে: তবে তাই মনে রেখ বহিন, আমাকে খবর দিলেই···।

বিজু বাঈ-এর ঘরের দরজার কাছ থেকে ছুটে এসে নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকেই হাঁপাতে থাকে মুরলী। মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দ যেন বিজু বাঈ-এর হাসির শব্দের মত ফোঁসফোঁস করতে থাকে। মুরলীর মনের একটা আক্রোশের হিসাব এতক্ষণে তৃপ্ত হয়েছে।

কিন্তু আর ভয় নেই। বিজু বাঈ নামে ওই ভয়ানক হাসির মেয়েমানুষটা যদি সত্যিই দয়া করে, তবে পলুসের স্পর্শের ভয় থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে

মুরলীর জীবন।

কিন্তু, তারপর ?

ডাক্তার রিচার্ড সরকারের চোখ দুটো এমন উদাস রকমের চোখ কেন ? যে-দিন প্রথম ডাক্তারী হল, সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আরও তিনবার মুরলীর এই শরীর চোখে দেখে চলে গিয়েছে রিচার্ড। মুরলীর কোমরে দুবার সুই দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রিচার্ডের ঠান্ডা চোখ দুটো ভুলেও একবার আশ্চর্য হয়ে যায় নি। মুরলীর বুকের দিকে তাকিয়েও মুরলীর বুকের বিচলিত শিহরটা দেখতে পায় নি বোধ হয়। আর মুরলীর চোখের দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখের আশাটাকে একটুও বুঝতে পারে নি।

না, রিচার্ডের উপর রাগ করবার কোন দরকার হয় না। এই মুরলীকে দেখে আশ্চর্য হবে কেন রিচার্ডের মত মানুষ ? রিচার্ডের বাড়ির ফটকে কী সুন্দর ফুলের বাহার রঙিন হয়ে রয়েছে! রিচার্ডের মনের ভিতরেও ফুলের বাগান আছে। শুধু এই সুন্দর গতরটা ছাড়া মুরলীর জীবনের আর কোন সুন্দরতা আছে, যার জন্য লুব্ধ হবে রিচার্ডের মত মানুষের মন ?

রিচার্ডের বাড়ির চেহারাটা বার বার মনে পড়ে। বাড়িটা এখান থেকে খুব কাছে, কিন্তু মুরলীর জীবন থেকে অনেক দূরে। কে জানে, গড বাবা দয়া করবে কি ? রিচার্ডের মত মানুষ একদিন মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হবে কি ?

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে নিকটের তাল গাছটাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু···এ কি ? এত বেশি ছটফট করে পাখা ধড়ফড় করছে কেন মাদি শকুনটা ? শকুনের বাসাতে এমন করুণ কান্নার মত শব্দ বেজে ওঠে কেন ? কাঁদছে কি শকুনের ছা ?

ধড়ফড় করে মুরলীর বুকটা। মুরলীর সারা শরীর জুড়ে যেন একটা যন্ত্রণার আবেশ কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। পেটটা ছিঁড়ে যাবে বুঝি। কোমরটা যেন একটা মাতাল বেদনার রসে ভার হয়ে গিয়ে থরথর করছে। ভিজে যাচ্ছে মুরলীর সায়া। দরজার কাছে এসে, শক্ত করে কপাটটাকে আঁকড়ে ধরে, চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—আনিয়া দিদি গো!

জনের মা আনিয়া বুড়ি ছুটে এসে হাত ধরে বলে—গড বাবা দয়া করেন। ডর নাই বহিন।

মুরলীর একটা হাত সস্নেহে ও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মুরলীকে একটা বড় ঘরের দিকে নিয়ে যায় আনিয়া বুড়ি।

কথা ছিল, আর সাত দিন পরেই হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি চলে যাবে মুরলী। কিন্তু বুকের কাছে তোয়ালের উপর শোয়ানো একটা বাচ্চা মানুষের তুলতুলে দুটো পিপাসী ঠোঁটের কাঁপুনির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই জনের মা আনিয়া বুড়ির দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় মুরলী : আর দুটা দিন

থাকি না কেন আনিয়া দিদি ?

আনিয়া বুড়ি বলে—মিছা আর থাক কেন বহিন ?

এর পরেও আরও সাতটা দিন পার হয়ে যায়। সকাল হতেই মুরলীর ঘরের ভিতরে ঢুকে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় বড়দিদি, হাসপাতালের মেট্রন। বড়দিদির কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি ঝকঝক করে। কোমরে শক্ত করে একটা তোয়ালে জড়ানো আছে। বড়দিদির মোটা মোটা হাত দুটোও যেন একটা লোভনীয় বস্তুকে ছোঁ মেরে আঁকড়ে ধরবার জন্য আস্তে আস্তে দুলছে।

মুরলী বলে—আর কটা দিন থাকি না কেন বড়দিদি ?

বড়দিদি কি-যেন ভাবেন, তারপর আবার হাসতে হাসতে চলে যান।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই ঘরের ভিতর এসে ঢুকলেন সিস্টার দিদি: না জোহানা বহিন ; আর তোমার এখানে থাকা উচিত হবে না। আমি পলুসকে খবর দিয়েছি।

মুরলী কাঁপতে কাঁপতে বলে—কি খবর দিলে দিদি ?

সিস্টার দিদি—পলুস গো-গাড়ি নিয়ে সকালবেলাতেই এখানে আসবে, আর তোমাকে নিয়ে যাবে।

মুরলীর মাথায় হাত বুলিয়ে, মুরলীর থুতনি টিপে আদর করে, ব্যস্তভাবে যখন চলে গেলেন সিস্টার দিদি, তখন মুরলীর সেই ছোট ঘরের জানালার কপাটে একটা দুরন্ত হাওয়ার ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ে।

হ্যাঁ, ঝড় শুরু হয়েছে। হারানগঞ্জের আকাশ কালো হয়ে গিয়েছে ; একটাও তারা দেখা যায় না। তালগাছের মাথা থেকে শিশু-শকুনের কান্নার স্বর ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছুটে এসে মুরলীর কানের ভিতর বিঁধতে থাকে।

—এটা যে এখনো কাছে আছে গো, আমার বুক ছুঁয়ে পড়ে আছে গো। কাল সকালে আর থাকবে না।

বাচ্চাটার ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মুরলী। কপালের উপর জোরে জোরে চাপড় মারে, আর চুলের গোছা খিমচে ধরে: ছিনে নিবে, ছিনে নিয়ে চলে যাবে ডাইনের বেটিরা !

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। জানালা দিয়ে বাইরে ঝড়ো অন্ধকারের ভয়াল চেহারাটার দিকে তাকায়। তারপর, ঘরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে বিড়বিড় করতে থাকে—এ কেমন সুখের নরক গো কপালবাবা ! ছিয়া ছিয়া ছিয়া !

উঠে দাঁড়ায় মুরলী। ঘরের দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে আসে। হাতের এক টানে পটপট করে গায়ের জামার বোতামগুলিকে ছিঁড়ে আলগা করে দিয়ে নিজেরই বুকের অদ্ভুত চেহারাটার দিকে অপলক চেখে তাকিয়ে থাকে। কী ভয়ানক মায়ার জলে ফুলে আর ফেঁপে ভেজা-ভেজা হয়ে রয়েছে, টনটন করছে বুকটা ! বাচ্চাটার ঘুমন্ত মুখের কাছে বুক এগিয়ে দিয়ে, আর, এক হাতে নিজেরই এলোমেলো চুলের গোছা খিমচে ধরে একেবারে

নিঝুম হয়ে যায় মুরলী।

দূর দূর দূর! যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করতে করতে উঠে বসে মুরলী। দূর দূর! যেমন তোমার গড বাবা, তেমনই তোমার কপালবাবা; সব মিছা, সব ঠগ।

ঘুম-ভাঙা ভেজা চোখ দু হাত দিয়ে ঘষে ঘষে আবার ছটফট করে মুরলী। ভাল অনাথবাড়ি করেছে সিস্টার দিদি, বাঘিন কানারানীটার মত মানুষখাগী একটা অনাথবাড়ি। এমন অনাথবাড়ি ডরানির জলে ভেসে যায় না কেন?

মেঝের উপর বসে, খাটিয়ার গায়ে কপাল ঠেকিয়ে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে মুরলী। চোখ দুটা যে জ্বলছে গো কপালবাবা, ঘুমাতে পারা যাবে কি? বুকটা যে জ্বলে গেল গড বাবা! একটুক জল খেতে দিবে কি? আনিয়া দিদি কোথা গেলে গো?

আবার উঠে দাঁড়ায় মুরলী। ঘরের দরজার কপাট খুলে ডাক দেয় মুরলী —আনিয়া দিদি গো।

কোন সাড়া শোনা যায় না। আনিয়া দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। অনেক রাত হল বুঝি। কেউ জেগে নাই বুঝি। হাসপাতালের ফটকের কপাটে কি তালা লাগায় ওরা?

চোরের মত সতর্ক ও তীক্ষ্ন চোখের চাউনি তুলে চারদিকে তাকায় মুরলী। না, কেউ জেগে নেই। নিকটেও কেউ নেই। পাশের ঘরের দরজায় তালা। কবেই চলে গিয়েছে বিজু বাঈ।

রাতের এই আঁধারটা বড় ভাল। ডাকাতেরা আর চোরেরা বড় ভালবাসে এমন আঁধার। লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যেতে কোন বাধা নেই। কেউ দেখবে না।

কোথায় যাব গো! মুরলীর বুকের ভিতরে একটা অসহায় প্রশ্নের শব্দ যেন হাহাকার ছড়াতে থাকে। হারানগঞ্জের এই আমের বাগিচা পার হয়ে, সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে ভুবনপুর পেঁছে যেতে কত সময় লাগে গো কপালবাবা? ভুবনপুর থেকে সকালবেলাতেই একটা মোটর গাড়ি ছাড়ে, বাবুরবাজারের দোকানীদের নিয়ে যায় সেই গাড়ি। বাবুরবাজার থেকে হাঁটা দিলে মধুকুপির ডাঙার মাটি ধরে ফেলতেই বা কত সময় লাগবে? কিষাণের ঘরটা আছে কি? আছে নিশ্চয়। কিষাণটা ছেইলার লেগে ভাবছে আর কাঁদছে যে গো!

লোভী চোরের মত একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে বাচ্চাটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নেয় আর বুকের কাছে তুলে ধরে মুরলী। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হয়। পা দিয়ে দরজার কপাট আস্তে ঠেলা দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়। বারান্দা পার হয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। ফটকের দিকে তাকায়।

—হায় রে গড বাবা। হায় রে তোমার দয়া। বলতে বলতে কাঁপতে থাকে মুরলী।

ভোর হয়ে গিয়েছে। বাইরের আকাশ ফর্সা হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের

দারোয়ান, আনিয়া বুড়ির বড় ছেলে জন গুনগুন করে গান গেয়ে ফটকের কাছে ঘুরঘুর করছে।

একটা দৌড় দিয়ে ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে মুরলী। বাচ্চাটাকে বিছানার উপর শুইয়ে দেয়। তারপর মেঝের উপর বসে আর খাটিয়ার গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে।

ঝড় নেই, ভোরের বাতাস বড় মৃদু হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ে মুরলী।

খোলা জানালা দিয়ে মুরলীর ঘুমন্ত মুখটার উপর যখন রোদের ঝলক এসে লুটিয়ে পড়ে, তখন আবার একটা নতুন শব্দ শুনে চমকে ওঠে মুরলীর বুকের পাঁজর। চোখ মেলে তাকায় মুরলী। হ্যাঁ, শুনতে পায় মুরলী, ঠিকই, কতগুলি দুরন্ত ও নির্মম পায়ের শব্দ এই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে এগিয়ে যায় মুরলী। দেখতেও পায়, কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি ঝিকমিকিয়ে, গটমট করে জুতোর শব্দ বাজিয়ে ঘরের দিকে আসছে বড় দিদি। পিছনে আনিয়া বুড়ি। মুরলীর ছেইলা এখনই অনাথবাড়িতে চালান হবে। আর দেরি নেই।

বিছানার কাছে এগিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে বাচ্চাটার মুখ ঢেকে দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী। আর, একবারও ফিরে তাকায় না। ঝোলাটাকে হাতে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়।

ফটক পার হয়ে সড়কের উপর এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় মুরলী, ব্যস্ত-ভাবে হেঁটে এগিয়ে আসছে পলুস। পলুসের পিছু পিছু একটা গো-গাড়িও আসছে।

গো-গাড়ির দিকে ছুটে যায় মুরলী। আর, যেন বনবিড়ালীর মত লঘু শরীরের ফুর্তির আবেগে একটা লাফ দিয়ে উঠে গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। দেখতে পেয়ে হেসে ওঠে পলুস হালদারের চোখ। সেই ভয়ানক বোঝার ভার খালাস করে দিয়ে কত হাল্কা হয়ে গিয়েছে জোহানা! কী সুন্দর দুলে উঠল জোহানার সরু কোমরটা!

আগে আগে গো-গাড়িটা চলে। পিছনে পলুস। পলুসের মুখের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও করতে ভুলে গিয়েছে মুরলী। গাড়ির ভিতরে খড়ের গদির উপর বসে, দু হাতে দু হাঁটু জড়িয়ে আর মাথা হেঁট করে, মুরলী একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পলুসের কপালটা বার বার রাগ করে কুঁচকে উঠতে থাকে। পলুস ডাকে—জোহানা!

উত্তর দেয় না মুরলী।

পলুসের গলার স্বর গো-গাড়ির চাকার শব্দের মত কর্কশ হয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওঠে: কথাটা শুনলে কি জোহানা?

পলুসের গলার স্বরের এই কর্কশ শব্দটা হঠাৎ একটা আতঙ্কের ডাক হয়ে কেঁপে ওঠে: এ কি? তোমার এ কি হলো জোহানা?

কথা বলে না মুরলী। গাড়ির ছইয়ের গায়ে এলিয়ে পড়েছে মুরলী। চোখ

বন্ধ। মাথাটা কাত হয়ে ঝুলছে।

—থাম হে গাড়িয়াল। চেঁচিয়ে ওঠে পলুস। গরুর নাকের দড়ি ধরে আচমকা টান দেয় গাড়িয়াল। গো-গাড়িটাও আচমকা থেমে যায়।

ফ্যালফ্যাল করে পলুস হালদারের চোখ দুটো। কী অদ্ভুত কাণ্ড! গাড়িটা যে ডাক্তার রিচার্ড সরকারের বাড়ির ঠিক ফটকের কাছে এসে থেমে গিয়েছে। ফটকের লতার ফুলগুলি দুলছে। ফুলগুলির সুবাসও ভুরভুর করছে। আর, পলুসের আতঙ্কের ডাক শুনতে পেয়ে ব্যস্তভাবে বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এইদিকেই ছুটে আসছে ডাগদরটা!

বাঃ, বড় ভাল সময় ভেবে রেখেছিল জোহানা, তা না হলে ঠিক এখানেই এসে জোহানা বেহুঁশ হয় কেন? বাঃ, বেশ মূর্ছা! ঠগ মূর্ছা বটে কি? হ্যাঁ, কেমন বেলাজ হয়ে জোহানার গতরটা ঢুলছে! বুকের উপর কাপড় নাই। বুকের জামাটাও ভিজা! ডাগদরটা যে এসে যাবে এখনই।

রিচার্ড সরকার কাছে এগিয়ে এসে গাড়ির ভিতরে উঁকি দেয়; সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক দয়ালু স্বরে আক্ষেপ করে ওঠেঃ অ্যাঁ? জোহানা হালদার বলে মনে হচ্ছে।

পলুস বলে—হ্যাঁ।

বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে রিচার্ড—জলদি এক ঘটি জল নিয়ে এস দাই।

দাইটা এক ঘটি জল হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু ডাক্তারের মায়াময় ব্যাকুলতা আর তর সইতে পারছে না। রিচার্ড সরকারের হাত দুটো এত বিচিত্র আদরের কায়দাও জানে! এক হাতে মুরলীর থুতনি ছুঁয়ে মুরলীর ঝুলে-পড়া মাথাটাকে তুলে ধরে; আর এক হাত দিয়ে মুরলীর চোখের উপরে ছড়িয়ে-পড়া চুলের একটা গোছা সরিয়ে দিয়ে মুরলীর মুখের বেদনার রহস্যটাকে যেন মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে রিচার্ড। মুরলীর চোখের পাতা ফাঁক করে কালো চোখের মণিটাকেও যেন লোভীর মত একবার দেখে নিল রিচার্ড।

যেন একটা বিকট তামাশা! পলুস হালদারের স্তব্ধ চোখ দুটো দুঃসহ আতঙ্ক সহ্য করতে গিয়ে বার বার শিউরে উঠতে থাকে। ডাগদরটা জোহানাকে এখনই বুক চেপে ধরবে মনে হয়।

জলের ঘটি হাতে নিয়ে দাইটাও কাছে এসে দাঁড়ায়। মুরলীর চোখে-মুখে বার বার জল ছিটিয়ে দিয়ে রিচার্ড ডাক্তার মুরলীর মুখের দিকে আবার চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ডাগদরটা জোহানার এই ভিজা মুখটাকে রুমাল দিয়ে এখনই আদর করে বার বার মুছে দিবে বুঝি, আর…।

—জোহানা! চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

রিচার্ড বলে—আঃ, একটু আস্তে ডাক দিন; চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু পলুস হালদারের এই রূঢ় চিৎকারের শব্দটা সার্থক হয়। সত্যিই মুরলীর চোখের পাতা আস্তে আস্তে নড়তে থাকে। চোখ মেলে একটা লক্ষ্যহীন উদাস সাদাটে দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

রিচার্ড আস্তে আস্তে ডাকে—শুনছেন? বলুন…কিসের কষ্ট? মাথা ঘুরছে কি?

মুরলীর ভেজা মুখটা বিড় বিড় করেঃ বড় জ্বালা গো দিদি।

রিচার্ড—জ্বালা? কোথায় জ্বালা?

আস্তে আস্তে মুখটাকে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে, তারপর হেঁট মাথা হয়ে নিজেরই বুকের জামাটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে মুরলী—ভিজে গেল যদি, তবে আবার জ্বলে কেন?

দাইটা চট করে হাতের এক টানে মুরলীর শাড়ির আঁচলটাকে নামিয়ে মুরলীর বুকের উপর ছড়িয়ে দেয়।

পলুস হালদারের দিকে তাকিয়ে রিচার্ড বলে—এখনও পুরো হুঁশ হয় নি।

পলুসের চোখ দুটো কুঁচকে ওঠেঃ হয় না কেন?

রিচার্ড—কি বললেন?

পলুস—হুঁশ পুরা হতে কত সময় নিবে?

রিচার্ড—কত আর সময় নেবে? বড়জোর আর দশ-পনের মিনিট। কিন্তু… তারপর একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার।

পলুস—ঠিক আছে।

রিচার্ড—না, ঠিক নেই। এখানে রাস্তার ওপর একটা গো-গাড়ির ভিতরে পড়ে না থেকে, আমার ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আপনার…উনি আপনারই স্ত্রী নিশ্চয়?

পলুস—হ্যাঁ।

রিচার্ড—উনি এখন কিছুক্ষণ আমার ঘরে বসে জিরিয়ে নিন; একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে আরও ভাল হয়। তারপর…।

পলুসের কোন প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে রিচার্ড সরকারের ইচ্ছাটাও যেন একটা মায়াময় ব্যস্ততায় ছটফট করে ওঠে। দাইটার দিকে তাকিয়ে আদেশ করে রিচার্ড—হাত ধরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাও। সোফার ওপর শুইয়ে দাও…একটু বাতাস করো…ঘুমোতে চাইলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিও…আর ঘুম ভাঙ্গলেই এক গেলাস গরম দুধ খেতে দিও।…আমি চলি।

সড়কের উপরে একটা লোক, নিশ্চয় রিচার্ড ডাক্তারের চাকর হবে লোকটা, একটা সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। রিচার্ড ডাক্তার ব্যস্তভাবে গটমট করে হেঁটে সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়। একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে এতক্ষণে বুঝতে পারে পলুস, রিচার্ড ডাক্তার কাজে বের হয়ে যাচ্ছে। জোহানাকে নিয়ে আদরের ঘাঁটাঘাটি করবার আর কোন ইচ্ছা রিচার্ড ডাক্তারের নেই।

না, রিচার্ড ডাক্তারের কোন দোষ নেই। একটা দুঃখী মেয়েমানুষের উপর একটু দয়া করেছে রিচার্ড ডাক্তার। দয়া করা যে ওর রোজের কাজ বটে। ডাগদরটার হাতের আদরে কোন মতলব নাই।

দাইটার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে রিচার্ডের বাড়ির ফটকের

দিকে এগিয়ে যেতে থাকে মুরলী।

রিচার্ড বলে—আস্তে দাই, খুব আস্তে।

সেই মুহূর্তে চমকে ওঠে পলুস। কী আশ্চর্য আর কী ভয়ানক চতুর মতলবে মাতাল হয়ে টলে উঠেছে জোহানার শরীরটা! দাইটা জোহানাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। জোহানার মাথাটা আবার কাত হয়ে হেলে পড়েছে। এই মুহূর্তে এই সড়কের উপর লুটিয়ে পড়বে জোহানা।

এক লাফে এগিয়ে এসেই জোহানাকে ধরে ফেলে রিচার্ড সরকার। পলুস হালদারের স্তব্ধ চোখ দুটো আবার সেই সন্দেহের জ্বালা সহ্য করতে থাকে। জোহানার শরীরের চতুর কষ্ট যেন রিচার্ড ডাক্তারের হাত দুটোকে কাছে পাওয়ার জন্য আবার নতুন একটা কায়দা করে আরও ভয়ানক একটা ঢং ধরেছে। ঠিকই, জোহানার মতলব জয়ী হয়েছে। এক হাতে জোহানার একটা হাত শক্ত করে ধরে, আর এক হাতে জোহানার কাঁধটাকে জড়িয়ে ধরেছে রিচার্ড। চেঁচিয়ে উঠেছে রিচার্ড—শিগগির আসুন আপনি, কি-যেন আপনার নাম?

রিচার্ড সরকারের দাইটা উদ্বিগ্ন হয়ে আর কাঁদ-কাঁদ মুখ করে উত্তর দেয় —উনার নাম পলুস হালদার, কয়লা-খাদের কলঘরের মিস্তিরী বটে, বড় ভালটি বটে, কত···।

রিচার্ড আবার ডাক দেয়—শিগগির এখানে আসুন পলুসবাবু।

কিন্তু দয়ালু রিচার্ডের এই ডাক যেন একটা করুণাময় বিদ্রূপের আহ্বান। জোহানাকে বুকের কাছে ধরে রেখে রিচার্ড সরকার জোহানারই স্বামীকে কাছে ডেকে একটা অদৃষ্টের দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখে নিতে বলছে। ব্যস্ত হয় না পলুস। সড়কের কাঁকরের দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে রিচার্ড আর মুরলীর সেই ছায়া দুটোর কাছে এসে দাঁড়ায়, যে ছায়া দুটো জড়াজড়ি করে এরই মধ্যে একেবারে মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছে।

রিচার্ড বলে—চিন্তা করবেন না। ভয়ের কিছু নেই।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় রিচার্ড—শুনছেন?

মুরলীর চোখ দুটো যেন ঘুমের আবেশে ছোট হয়ে গিয়েছে। ভুরু টান করে তাকাতে চেষ্টা করে মুরলী। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ফিস ফিস করে: আর দুটা দিন থাকি না কেন দীদি।

পলুসের দিকে মুখ ফিরিয়ে রিচার্ড বলে—আপনি ধরুন।···নিন, তাড়াতাড়ি করুন।

পলুসের হাত দুটো যেন কলের মত আপনি নড়ে ওঠে; আর, পলুসের সেই এগিয়ে-দেওয়া হাতের উপর মুরলীকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে রিচার্ডও একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে বলে—নিন, কোলে তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।

মুরলীর বিবশ শরীর পলুসের হাতের উপরেও তেমনই বিবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে যায়। মুরলীকে দু হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পলুস হালদারের মন আবার আশ্চর্য হয়। এ কি? সত্যিই যে বেহুঁশ হয়েছে বেচারা জোহানা।

মিছা এতক্ষণ ধরে জোহানার ভয়ানক একটা কষ্টকেই ভয়ানক একটা মতলবের চালাকি মনে করে নিজেকে মিছা কষ্ট দিয়েছে পলুস। পলুসের বুকের কাছে মুরলীর মাথাটা হেলে পড়েছে। কিন্তু…কই…জোহানা তো কোন কায়দা করে পলুসের বুকের কাছ থেকে মাথাটাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে না। ছিয়া, ছিয়া, বড় ভুল রাগ করা হয়েছে। ছলছল করে পলুসের চোখ। ক্ষেপা মানুষেও বোধ হয় এমন ভুল করে না, এত রাগ করে নিজের ঘরণীর মনকে এত সন্দেহ করে না। এই তো সেই মানুষ, যে মানুষ বাঘিনের ভয়ে মর-মর হয়ে ভুবনপুরের সড়কের পাশে ডাঙার উপর একদিন পড়েছিল। আর, পলুস হালদার ছুটে এসে যাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়েছিল।

পলুসের জীবনেরও একটা মর-মর বিশ্বাস এইবার নতুন বাতাস পেয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মুরলীর বিবশ শরীরের ভার আড়াআড়ি করে দুটো শক্ত হাতের উপর শুইয়ে দিয়ে মুরলীকে বুকের উপর তুলে ধরে পলুস। বুকের কাছে ফিরে-পাওয়া একটা সুস্বপ্নের স্বাদ অনুভব করে পলুস। রিচার্ড সরকারের পিছু পিছু আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে। রিচার্ডের যত দয়ালু উদ্বেগ আর মায়াময় ব্যস্ততার আশ্রয় নিতে একটুও খারাপ লাগে না। ফটকটা পার হবার সময় লতার পাতার উপর থেকে অনেকগুলি রঙিন ফড়িং উড়ে এসে মুরলীর ভাঙা খোঁপাটার উপর বসবার জন্য ফরফর করে; লতার একটা ফুল মুরলীর মাথাটাকে ছুঁয়েও দিল। মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে পলুসের মনটা নীরবে প্রার্থনা করতে থাকে—দয়া করেন গড বাবা; আমার জোহানার যেন হুঁশ হয়ে যায়!

ঘরের ভিতরে একটা সোফার উপর মুরলীকে শুইয়ে দেয় পলুস। দাইটা পাখা হাতে নিয়ে মুরলীর মাথার কাছে বসে। রিচার্ড সরকার হাতের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই পলুস হালদারের দিকে তাকায়; আস্তে আস্তে কথা বলে—আমি চললাম। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। এই ধরুন, আর একটা ঘণ্টার মধ্যে, একটু ঘুম হলেই উনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তারপর ওঁকে নিয়ে যাবেন। আপনি ততক্ষণ বাইরের বারান্দায় কিংবা বাগানে একটু ঘুরে ফিরে…।

চলে যায় রিচার্ড ডাক্তার। পলুসও ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বারান্দার উপর যেন নিশ্চিন্ত কৃতজ্ঞতার মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, সাইকেলে চড়ে চলে যাচ্ছে রিচার্ড ডাক্তার। কত মান, কত টাকা! তবু মনে কত দয়া! পলুস হালদারের মত মানুষের ঘরণীকে দয়া করে রিচার্ড ডাক্তার। করবে না কেন? বড় মানুষ যদি ভাল মানুষ হয় তবে সে যে দাই-দাসীদিগেও দয়া করে।

—আমাকে দয়া করেন গো বাবু। সড়কের উপরে গো-গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় গাড়িয়াল।

তাই তো, গাড়িয়াল বেচারা আর কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকবে?

ঘরের ভিতর থেকে দাইটা বের হয়ে এসে বলে—গাড়িটাকে চলে যেতে বল পল্টুসবাবু।

পল্টুস—কেন গো? ওর কি হুঁশ হয় নাই?

—হঁইছে, কিন্তু একটুকু নিঁদ না নিয়ে যাবে কেন? ডাগদরের কথাটি মানতে হবে।

পল্টুস হাসে—তবে তো তুমি ওকে গরম দুধও খাইয়ে ছাড়বে।

—হঁ গো বাবু।

—তবে তো···।

—তুমি একবার ঘরে ঘুরে এসো বাপ। মিছা কেন এত সময় এখানে পড়ে থাকবে?

—আমি একবার খাদ ঘুরে আসি না কেন?

—এইসো।

চলে যায় পল্টুস। আর, মাত্র দুটি ঘণ্টা ঘুমের পর মুরলীর শয়ান শরীরটার সব আলস্য যেন ভয় পেয়ে রিচার্ড সরকারের সেই সুন্দর সাজানো ঘরের একটি সোফার উপর ছটফট করে জেগে ওঠে। জোরে জোরে দু হাত দিয়ে চোখ ঘষে আর দেখতে থাকে মুরলী।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দাইটা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে: পল্টুসবাবু চলে গেল, সে ফিরে এসে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবে।

—কোথায় গেল পল্টুস?

—খাদে গেল।

—এখানে পল্টুস আমাকে নিয়ে এল কেন?

দাইটা হাসে: পল্টুস লিয়ে আসে নাই গো, তুমি এইসেছো।

থরথর করে কাঁপতে থাকে মুরলী: এ ঘর যে ডাগদর রিচার্ডবাবুর ঘর নে হয়।

—হঁ গো।

—আমি এখানে কেন আসবো? আমি কি ক্ষেপী?

—তুমি বেহুঁশ হয়েছিলে গো।

এইবার দাইটার কথার হেঁয়ালি আর ওই হাসির অর্থ বুঝতে পারে মুরলী। হ্যাঁ, গো-গাড়ির ভিতরে বসে থাকতে থাকতেই মাথার ভিতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, আর কলিজার ভিতর থেকে যেন এক ঝলক মিষ্টি ব্যথার জল উথলে উঠে বুকের জামাটাকে ভিজিয়ে দিল! তারপর··পল্টুস রাগ করে ধমক দিলে, রিচার্ডবাবুও এসে ডাক দিলে···তারপর···।

দাইটা বলে—ডাগদরবাবু বলে গেল, তুমি এখন জিরিয়ে লিবে, তবে ঘরকে যাবে।

মুরলীর কালো চোখের সব আতঙ্কিত বিস্ময় হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে: এই কথাটি না বলে মিছা ভুল কথা বলে আমাকে

ডরাও কেন ?

ঘরের চারদিকের যত আসবাব, দেয়ালের যত ছবি, জানালার আর দরজার যত রঙিন পর্দা আর···আরও কত সুশ্রী বিচিত্রতার সম্ভার নিয়ে রিচার্ড ডাক্তারের এই ঘরের অহংকার কী সুন্দর সুখের হাসি হাসছে !

কিন্তু ও কে ? ও যে ঠোঁট দুটোকে মিষ্টি করে শিউরে নিয়ে, আর চোখের তারা দুটোকেও হাসিয়ে নিয়ে সোজা মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুরলীর মুখটা করুণ হয়ে যায় : ও কে বটে গো দাই ?

—কে ?

—ওই যে। ছোট একটা ভীরু ভ্রূকুটি তুলে যাকে দেখিয়ে দেয় মুরলী, সে হল একটা ছবি। বেশ বড় একটা ছবি। ছবির সোনা-রঙের ফ্রেম আর পুরু কাঁচ ঝকঝক করে। সেই সঙ্গে ঝকঝক করে ছবির মুখটা।

সাদা শাড়িতে সেজেছে ছবির সেই নারী, জামাটাও সাদা। জামার হাতের কিনারায় নীল সুতোর জাল। খোঁপাতে সাদা ফুল। গলায় একটা সোনার হার, তার সঙ্গে এক টুকরো ঝকঝকে সাদা পাথর দুলছে। সিস্টার দিদির পায়ে যে রকম জুতো, সেই রকমের জুতো। হাতে একটা বই। পায়ের উপর পা তুলে একটা সোফার উপরে বসে আছে সেই নারী। তার শাড়িটা ভাঁজে ভাঁজে ফুলে ফেঁপে পায়ের উপর লুটিয়ে রয়েছে। পড়তে পারে মুরলী, ছবির পায়ের কাছে নাম লেখা আছে—স্টিফানা মাধবী সরকার।

—কে বটে গো দাই ? প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

দাই বলে রিচার্ডবাবুর ঘরণী।

মুরলীর বুকটা যেন একটা নির্মম ঠাট্টার আঘাত পেয়ে গুমরে ওঠে। আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করে মুরলী। ভয়ে ভয়ে বিড় বিড় করে—রিচার্ডবাবুর ঘরণী কোথায় গেল ?

বুকের উপর দু হাত দিয়ে ক্রুশ বানায় আর ঝুঁকে পড়ে দাইটা : দুখের কথা কেন আর বলা করাও ? বেচারা কবেই মাটি নিয়েছে।

মুরলীর চোখে আবার তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটা দীপ্তির বিদ্যুৎ হেসে ওঠে : কবে ?

দাই—এই তো, তিন সাল হলো।

মুরলী—আবার বিয়া করে নাই কেন রিচার্ডবাবু ?

দাইটা চোখ বড় করে : বলো না, বলো না, এমন কথা বলতে নাই।

—কেন ?

—ঘরণীকে আজও ভুলে নাই রিচার্ডবাবু। উয়াকে ছাড়া···।

ছবির দিকে ইঙ্গিত করে দাইটা বলে—উয়াকে ছাড়া আর কোন ভালমানুষের বিটিকে ভাবে না, কখনো ভাববেক নাই রিচার্ডবাবু।

স্টিফানা মাধবী সরকার! দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড রঙিন ছবিটার দিকে অপলক চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মুরলী।

দাই বলে—হোই যে বাজা, সে বাজা কত ভাল বাজাতো রিচার্ডবাবুর এই ঘরণী। বাবুকে রোজ রোজ কত ভাল গীত শুনাতো বেচারা। দেখ কেনে, ঘরের আসবাবের যত রংদার ঢাকা, সব ওই ঘরণীর হাতের কাজ বটে। হায় গড, এমন মানুষ মাটি লেয় কেনে ?

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। দাইটা চেঁচিয়ে ওঠে।—গরম দুধ না খেয়ে...।

মুরলী হাসে—না গো। আমি এখন ঘর যাই।

দাই—বাবু আমাকে ডাঁটবেক যে গো।

মুরলী হাসে ঃ তুমি আমাকে দুষে দিও।

দাই—কিন্তুক পলুসবাবু যে তুমাকে লিতে আসবেক।

মুরলীর চোখ দুটো দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে ঃ আসুক না কেন, ওকে যা ইচ্ছা হয় বলে দিও।

পলুস হালদারের এই ঘর যেন মুরলীর জীবনের একটা ক্ষণকালের সাজঘর। এই ঘরের বাইরে এমন একটা ঠাঁই আছে, যেখানে গিয়ে মুরলীকে নতুন একটা রূপ নিয়ে কারও চোখের পিপাসা জয় করবার কঠোর পরীক্ষা স্বীকার করে নিতে হবে। শুধু চেহারাটাকে নয় ; মুরলী যেন ওর প্রাণটাকেও নতুন করে সাজাতে চায়।

মুরলীর প্রাণের যা কিছু কাজ, তার সবই এই ঘরের বাইরের কাজ। স্কুল আছে ; কনভেণ্টে গিয়ে মেরিয়ার কাছে বসে সেলাই শেখার কাজ আছে। নিজের সেলাইয়ের কলটাকে মেরিয়ার কাছেই রেখে দিয়েছে মুরলী। এরই মধ্যে তিন রকমের ছাঁট-কাট শিখে নিয়ে নিজেরই গায়ের শোভার জন্য তিনটে শখের ব্লাউজ তৈরী করেছে।

মেরিয়ার চেয়েও ভাল গাইতে পারে লুসিয়া দিদি, কনভেণ্টের স্কুলের বড় টিচার। লুসিয়া দিদির বাড়িতে যে পিয়ানো বাজনাটা আছে, সেটা গির্জাঘরের পিয়ানোর চেয়েও দেখতে ভাল। লুসিয়া দিদি বলেছে—তুমি যদি ঠিক ঠিক রোজ সন্ধ্যায় একটিবার এসে পিয়ানোতে হাত সাধতে পার জোহানা, তবে তিন মাসের মধ্যে তুমি তিনটা প্রেয়ার গাইতে আর বাজাতে শিখে ফেলবে।

তাই আর ঠিক সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে আসতে পারে না মুরলী। ফিরতে রাত হয়ে যায়। আর পলুসও রাত দশটা পর্যন্ত একা একা ঘরের শূন্যতা সহ্য করতে গিয়ে যেন হাঁপাতে থাকে ; মুরলী ঘরে ফেরামাত্র রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে পলুস—তুমি একটুক বুঝে চল জোহানা।

—কি বুঝতে বলছো ?

—লিখা-পড়া শিখতে হলে এমন ক্ষেপীটি হতে হবে কেন ?

হেসে ফেলে আর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মুরলী। আর পলুস হালদারের চোখ দুটো মুরলীর সেই চেহারার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে কুঁচকে যেতে থাকে।

ডরানির স্রোতের ওপারে পিয়ালের জঙ্গলের মধ্যে একটা বনবিড়াল আছে।

অনেকবার দেখেছে পলুস, রঙিন রোঁয়ায় ভরা ইয়া মোটা একটা লেজ পিঠের উপর ফেলে দিয়ে স্রোতের ধারে বসে থাকে বনবিড়ালটা। কেন বসে থাকে, তা-ও জানে পলুস। স্রোত পার হয়ে এপারে এসে জোলাদের বস্তির মুর্গী চুরি করে খেতে চায় বনবিড়ালটা, কিন্তু স্রোতের জল পার হবার সাধ্যি নেই। তাই একটা উপায় বের করে নিয়েছে ধূর্ত বনবিড়াল। ওপারের বেনা ঘাসের বন থেকে বের হয়ে যখন ভুবনপুরের চাষীদের মহিষগুলি সাঁতার দিয়ে স্রোত পার হয়ে এপারে আসে, তখন একটা মোষের পিঠের উপর ঝাঁপ দিয়ে চড়ে বসে বনবিড়ালটা; আর এপারে এসেই এক ছুট দিয়ে কচু ও ওলের বাদাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

জোহানার প্রাণও কি সেই বনবিড়ালটার প্রাণের মত চালাক বটে? সন্দেহ হয়, আর এই সন্দেহ সহ্য করতে গিয়ে পলুসের বুকের হাড় কটকট করে বাজে। জোহানাও একটা স্রোতের বাধা পার হয়ে ওপারে চলে যাবার মতলব ধরেছে। তাই এই ঘরের আশ্রয় আজও ছেড়ে দিতে পারছে না জোহানা। আশি টাকা মাইনের মিস্তিরীর সাহায্য এখনও তুচ্ছ করতে পারছে না। কিন্তু পলুস হালদারকেও কি ভুবনপুরের বোকা মহিষের মত শুধু একটা সাহায্যের প্রাণী বলে মনে করে জোহানা?

—জোহানা? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

—কি বটে? ছোট একটা ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকে মুরলী।

পলুস—তোমার আর ইস্কুলে যেয়ে কাজ নাই।

মুরলী—কেন?

পলুস—না; তোমার এত লিখা-পড়া করবার দরকার নাই। তোমার আর গানা-বাজা শিখতে হবে না। মেরিয়ার সাথে এত হাসাহাসি করে কাজ নাই। এত পাউডার দিয়ে মুখ মেজে লাভ কি? এ ঘরের মানুষের এত ঠাটে কাজ কি?

মুরলী ঠোঁট কুঁচকে হাসে—তুমি যে আমাকে কিষাণীর মত একটা গাঁওয়ারিন হতে বলছো।

পলুস—হতে দোষ কি? কিষাণীরা কি মানুষ নয়?

শাড়ির আঁচল তুলে মুখের একটা উচ্ছল হাসির শব্দ চাপা দেয় মুরলী—তবে···তবে মিছা কেন ·।

পলুস—কি?

মুরলী—বেচারী সকালীকে ছাড়লে?

শিউরে ওঠে পলুস। পলুসের কলিজার গায়ে যেন একটা ছুরির খোঁচা লেগেছে। একটা ঢোঁক গিলে, বুকের ভিতরে গুমরে ওঠা একটা হাহাকারের শব্দ গিলে নেয় পলুস। একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে মুরলীর হাত শক্ত করে চেপে ধরে।—তোমার চালাকি আর চলতে দিব না।

—কিসের চালাকি?

—বুঝে দেখ।

—বুঝিয়ে দাও।

—আমি তোমাকে ঘরের আয়না করে রাখবার লেগে বিয়া করি নাই। আমার ছেইলা চাই।

কটমট করে তাকায় মুরলী—আমার গতর তোমার হুকুমের দাসী নয়।

—হ্যাঁ, দাসী বটে। তোমার ফাঁকি আমি আর মানবো না। বিয়া করলে যাকে, তার ছুঁয়া তোমাকে নিতে হবে। আজই নিতে হবে।

পলুসের চাহনির রকম দেখে ভয় পায় মুরলী; পলুসের মুখের ভাষায় ওর যে দাবী দুরন্ত হয়ে উঠেছে, সে দাবী তুচ্ছ করবার অধিকার নেই মুরলীর। পলুস হালদার ছুটে গিয়ে যদি সিস্টার দিদির কাছে নালিশ করে বসে—দেখ দিদি, তোমার জোহানা বহিন ওর মরদের পিয়াস মিটাতে চায় না, মরদকে ছেইলা দিতে চায় না, তবে যে সিস্টার দিদি নিজেই ছুটে এসে জোহানাকে ধমক দিয়ে ধরম-করম বুঝিয়ে দেবে; সিস্টার দিদির নীল চোখের রাগও জ্বলজ্বল করবে—ছিঃ, জোহানা বহিন, আমার খিরিস্তান ভাই পলুসকে দুখ দিলে তোমার ভাল হবে না।

ভুল হয়েছে। পলুসের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে পলুসকে তুচ্ছ করবার জোর এখনও মুরলীর জীবনে আসে নি। দেরি আছে এখনও। কে জানে কত দেরি? ততদিন পলুসের এই ঘরের আশ্রয় মেনে নিতেই হবে। কিন্তু পলুসের ছোঁয়া? না, কভি না; যেমন করেই হোক, পলুসের এই দুরন্ত ইচ্ছার সাহসটাকে জব্দ করে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কয়লা-খাদের কলঘরের মিস্ত্রিরীকে কি ভেড়াটি করে দিতে পারা যায় না?

মুরলীর কটমটে চাহনি হঠাৎ একটা অভিমানের চাহনির মত ভঙ্গি ধরে করুণ হয়ে যায়। পলুসের চোখের হিংস্র ঘোলাটে চাহনিও মুরলীর এই অভিমানের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয়। জোহানার মুখটাকে দুখিনীর মুখ বলে মনে হয়। কিসের দুখ? কেন ছলছল করে বেচারা জোহানার চোখ?

—কি বটে জোহানা? গলার স্বর মৃদু করে একটা সান্ত্বনার কথা বলতে চায় পলুস।

মুরলী বলে—তোমার লাজ লাগে না পলুস? ঘরণীর সুখের সাধ মিটাতে পার না, দাসী বলে হাঁক দিয়ে ঘরণীর গতর ছুঁতে চাও...ছিয়া ছিয়া!

পলুস—তোমাকে আমি কোন্ দুখটা দিলাম?

মুরলী—কোন্ দুখটা না দিলে? কটা শাড়ি দিলে? কেমন খাওয়া খাওয়ালে? কোন্ সোনার জিনিসটা আনলে? ঘরণীকে খুশী না করে ঘরণীর গতর ছুঁতে চায়, এমন মরদ কেমন মরদ বটে?

হেসে ফেলে পলুস: তাই বল না কেন?

মুরলীর অভিমানও এইবার যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে: তাই তো বলছি। তাই শুনে নাও। আমার খুশি পুরা না হলে আমি তোমার ছুঁয়া নিব না। কভি না। মেরে ফেললেও না।

পলুস বলে—শুনলাম জোহানা। কিন্তু...।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে মুরলী—না, আর তোমার কিন্তুতে কাজ নাই। আমি ইস্কুলে চললাম ; আজ আমার লেগে আসমানী রঙের পাঁচ গজ রেশমী কাপড় নিয়ে আসবে।

চমকে ওঠে পলুস : পাঁচ গজ কেন ? বিশ টাকা লাগবে যে !

মুরলী হাসে : হ্যাঁ, পাঁচ গজ চাই। দুটা কুঁচিদার সায়া পাঁচ গজের কম কাপড়ে হবে না।

—রেশমী কাপড়ের সায়া ? পলুসের গলার স্বরে যেন একটা ভয়-পাওয়া বিস্ময় চমকে ওঠে।

মুরলী মুখ টিপে অদ্ভুত একটা লাজুক হাসি হাসে : হ্যাঁ গো ভালমানুষ ! মেরিয়া বলেছে···।

পলুস—কি ?

মুরলী—বলেছে, জোহানা বহিনের মত নরম কোমরের মানুষ মোটিয়া কাপড়ের সায়া পরে কেন ? পলুস ভাই কি কঞ্জুস বটে, না রেশমী কাপড় চোখে দেখে নাই ?

পলুসের চোখে তবু সেই আতঙ্ক আর সেই বিষণ্ণ বিস্ময় সিরসির করে। ভয় পেয়েছে আশি টাকা মাইনের মিস্তিরী।

পলুসের এই ভীরু চোখের করুণতার দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখ দুটো খুশি হয়ে ধিকধিক করে হাসতে থাকে। মুরলীর প্রাণও যে চায় ; এই রকম ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যাক কলঘরের মিস্তিরীর আহ্লাদ। মুরলীকে খুশি করবার আশা যেন অভিশাপ হয়ে পলুসের আশি টাকা মাইনের জীবনের সব মুরোদ চুরমার করে দেয়। মুরলীর খুশির দাবী মেটাতে গিয়ে রিক্ত নিঃস্ব ও ভিক্ষুক হয়ে যেদিন ফুঁপিয়ে উঠবে পলুস, না জোহানা, আর টাকা নাই ; সেদিন মুরলীও মনের সুখে ধিক্কার দিয়ে হেসে উঠবে, তবে আর জোহানার গতর ছুঁতে সাধ কর কেন ?

যেমন দিনের পর দিন চলতে থাকে, তেমনই মুরলীরও দাবির পর দাবি চলতেই থাকে : টাকা দাও পলুস। আমার আরও পাঁচটা নতুন বহি চাই। খাতা চাই, কাগজ চাই। ছবি আঁকবার রং চাই।

কনভেণ্টের স্কুলের বড় টিচার লুসিয়া দিদি বলেছে, পঁচিশ টাকা চাই, তবে মুরলীর লেখাপড়ার এইসব নতুন দরকারের জিনিসগুলি কিনে আনতে পারা যাবে। টাকা দিয়েছে পলুস। টাকা দেবার সময় হাসতে গিয়ে শুধু একটু গম্ভীর হয়েছে পলুস : তোমার লিখাপড়ার দাম যে বড় বেশি দাম বটে জোহানা।

মুরলী শুধু হাসে ; সেই পরিষ্কার ঠাণ্ডা হাসি : যদি না পার, তবে বল না কেন, ঘরণীর একটা সাধ পুরা করবারও জোর নাই তোমার ?

আবার ভয় পেয়ে চমকে ওঠে পলুস। পলুস হালদারকে জীবনের এক

ভয়ানক পরাভব স্বীকার করে নেবার জন্য হেসে হেসে অনুরোধ করছে মুরলী। জোহানার হাসি যেন একটা ক্ষমাহীন শর্তের হাসি। কলঘরের বড় মিস্তিরী ক্ষণিক দুর্বলতার ভুলে ভীরু হয়ে যে মুহূর্তে এই অক্ষমতা স্বীকার করে ফেলবে, সেই মুহূর্তে খিল খিল করে আরও ভয়ানক ক্ষমাহীন হাসি হেসে উঠবে। জোহানা। জোহানা যে তা হলে এই ঘর ছেড়ে তখনই দরজার দিকে দৌড় দেবে; মুখটা ফিরিয়ে নেবে, আর ফিরে আসবেও না। বলে দেবে, খুব বলে দিতে পারবে জোহানা, তোমার ঘরে তুমি থাক গো মিস্তিরী। এমন ঘরে জোহানা থাকে না।

কয়লা-খাদের সর্দারিদের কাছ থেকে প্রায়ই টাকা ধার করে পলুস। কারণ, মুরলীর ক্ষুধাটারও দাম দিন দিন বড় বেশি বেড়ে চলেছে। রান্না করতে বসলেই ঘি আর মাখনের হাঁক ছাড়ে মুরলী। রোজ খাসির মাংস না পেলে রাঁধতেই ভাল লাগে না। ভাল আনাজ না পেলে রাঁধতে ইচ্ছাই করে না। ভুবনপুর থেকে বাড়ি ফেরবার পথে রোজই একটা পাঁউরুটি কিনে আনে পলুস। নিজের জন্য নয়, মুরলীরই জন্য। গোবিন্দপুর গিয়ে রাংতা মোড়া চায়ের একটা প্যাকেট আর চা তৈরির যত সরঞ্জামও কিনে আনতে হয়েছে। লতাপাতা আঁকা চীনামাটির পেয়ালা, ডিশ আর কেটলি; আর পেতলের জালি দিয়ে তৈরি একটা ছাঁকনিও। একদিন লুসিয়া দিদির ঘরে গিয়ে চায়ের উৎসবের স্বাদ নিয়ে মুরলী যে ওর পিপাসার রুচিটাকেও নতুন করে ফেলেছে। তাই, যে-সব জিনিস আনতে বলে দিয়েছে মুরলী, গোবিন্দপুরের বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরে বেছে বেছে ঠিকই সেই সব জিনিস কিনে নিয়ে এসেছে পলুস। মুরলী বলে, গুড় দিয়ে চা খেতে হয় তো তুমি খাও পলুস, আমি খাব না।

পলুসের শুকনো মুখটা কেঁপে কেঁপে হাসতে চেষ্টা করে: ভাব কেন জোহানা? তোমার লেগে চিনি নিয়ে আসবো; দুই সের চিনিতে হবে না কি?

মুরলী—হলে হবে; না হয় তো আরও নিয়ে আসবে। আর যদি তোমার ডর লাগে, তবে আনবার দরকার নাই।

পলুস—কিসের ডর?

মুরলী—চিনি কিনতে যদি পয়সার কমতি হয়, তবে···।

পলুস ভ্রূকুটি করে: চিনির দামকে তো ডরি না, ডরি তোমাকে।

মুরলী মুখ টিপে হাসে: কেন?

পলুস—চিনি তো আর তোমার মত···।

পলুসের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে মুরলীই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে: আমার মত ঠগ নয়।

পলুস হাসে: দাম পেলে চিনি খুশি হয় আর মিঠাও হয়। কিন্তু তুমি দাম পেয়েও মিঠা হতে চাও না।

মুরলী হাসে: দুই সের চিনি দিয়ে জোহানাকে কিনে নিতে চাও; জোহানাকে তুমি এত সস্তার সওদা মনে কর কেন, পলুস?

হাসপাতাল থেকে ঘরে ফেরবার পর এই তো মাত্র একটা মাস পার হয়েছে। মুরলীর মুখটা একটু রোগা রোগা হয়ে আরও সুন্দর হয়েছে। কালো চোখ দুটো আরও কালো হয়েছে। কী সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে শরীরটা! রঙিন শাড়ির আঁচল দিয়ে জড়ানো সরু কোমরটা ফুলেলা লতার মত সব সময় দোলে। পলুস হালদারের চোখ বার বার পিপাসু হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে পড়ে পলুসের, হঁ্যা, আর ভাবনা করবার কিছু নাই। জোহানার এই গতর ঠগ গতর নয়। পলুসকে এইবার ছেইলা দিতে পারবে জোহানা।

কিন্তু এক মাস ধরে পলুসের চোখের এই পিপাসার বিরুদ্ধে শরীরটাকে কী কঠোর সাবধান রেখেছে মুরলী। ঘুমের ঘোরেও চমকে জেগে ওঠে মুরলী: না না না; তুমি সর পলুস। আমাকে মিছা জ্বালাবে না তুমি। পলুসের হাত ঠেলা দিয়ে সরিয়ে বিছানার উপর ধড়ফড় করে উঠে বসেছে মুরলী।

—সোয়ামিকে ছেইলা দিবে না, কেমন ঘরণী বট তুমি? মুরলীর গায়ে ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে পলুস। মুরলীও যেন ভাঙা ঘুমের বেদনার চোখ ঘষে ঘষে ছটফট করেছে, আর বিছানা থেকে নেমে গিয়ে বিড়বিড় করছে।—দূর দূর।

চিৎকার করে ওঠে পলুস—কাকে দূর দূর কর?

পলুসের চিৎকারের শব্দ শুনে বাইরের বারান্দার কোণে ঘুমন্ত কুকুরটাও চিৎকার করে ওঠে। মুরলী খিল খিল করে হাসে: কুকুটা কার ছেইলা বটে পলুস? তোমার বটে কি?

মুরলীর হাসির শব্দ শুনে পলুসের কান দুটো জ্বলতে থাকে। আবার চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।—পলুস হালদারের ঘর রগড়ের ঘর নয়। এমনটি আর চলবে না জোহানা।

মুরলীর চোখ দুটো আবার অভিমানে কাতর হয়ে পলুসের দিকে তাকায়। পলুসের তপ্ত মেজাজটাও করুণ হয়ে যায়।—কি বটে?

মুরলী—আমি কি তোমার ধমকের কামিন?

পলুস হাসে: না জোহানা। বল না কেন, আর কি চাও তুমি?

মুরলী—বলতে তো পারি; কিন্তু দিতে পারবে কি?

পলুস—নিশ্চয় দিব।

হার মানেননি পলুস। পাঁচটা নতুন শাড়ি কিনতে হয়েছে। গোবিন্দপুরে তিনবার যেতে হয়েছে, সাবান পাউডার আর গন্ধতেল কিনে আনতে হয়েছে। কিন্তু মুরলীর দাবীর ভাষা যেন বিকার রোগীর গানের মত থামতেই চায় না।—রূপার সুতলির হার আর দুটা সোনার মটরদানা; এমন জিনিস ছুঁতে আমার ঘিন্না লাগে পলুস।

—কেন?

—আমি দেহাতের কিষাণী নই; জোহানাকে খুশী করতে চাও তো এইরকমটি নিয়ে এসো।

সত্যিই একটা বই খুলে একটা সোনার হারের ছবি দেখিয়ে দেয় মুরলী।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে পলুস ঃ এটার দাম যে দুশো টাকার বেশি হবে।

—তবে বল না কেন, দিতে পারবে না!

আবার পলুসের বুকের ভিতরে একটা ভীরু নিঃশ্বাসের আতঙ্ক চমকে ওঠে। এ তো সোনার হারের দাম নয়; জোহানার এই সুন্দর গতর স্পর্শ করবার দাম। এই দাম দিতে না পারলে জোহানাকে হাতে ধরে বুকের কাছে টানবার কোন অধিকার হবে না। সেই ভয়ানক শক্ত শর্তের সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে জোহানা।

ভুবনপুরের কাবুলী মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে দুশো ষাট টাকা দামের হার গোবিন্দপুর থেকে কিনে আনতে আর বেশি দিন দেরি করে না পলুস। সেই হার গলায় পরে; গলায়, ঘাড়ে, বুকে আর মুখে পাউডার ছড়িয়ে, আর নরম ঠোঁটের উপর লাল রঙের প্রলেপ বুলিয়ে রবিবারের সকালে যখন গির্জা যাবার জন্য তৈরি হয় মুরলী, তখন আবার একটা বিস্ময়ের জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে বিড় বিড় করে পলুস ঃ প্রেয়ার সাধতে যাবে, তাতে এত ঠাটের কি দরকার হয়?

কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের দরজা পার হয়ে সড়কের উপর গিয়ে দাঁড়ায় আর গির্জাবাড়ির চূড়াটার দিকে তাকায় মুরলী। ডিং ডাং ডিং ডাং—হারানগঞ্জের বাতাস যেন গান গেয়ে মুরলীর প্রাণের একটা স্বপ্নকে কাছে ছুটে আসবার জন্য আহ্বান করছে। পলুস গির্জায় যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্ন আর মুরলীর জীবনে নেই। পলুসের রওনা হবার আগেই রওনা হয়ে যায় মুরলী। মুরলীর সেই ছুটন্ত উল্লাসের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সেদিন গির্জা যাওয়াই বন্ধ করে দিয়ে ঘরে বসে থাকে পলুস।

সেদিন গির্জা থেকে ফিরে এসে মুরলীও একটু আশ্চর্য হয়। এত রোদ উঠেছে, এত বেলা হয়েছে, তবু এখনও কয়লা-খাদের কলঘরে যাবার জন্য পলুসের কোন ব্যস্ততা নেই। আজ কি সারাটা দিন ঘরে বসে থেকে আর মুরলীকে সামনে বসিয়ে রেখে মুরলীর গলায় সোনার হারটাকে ঘাঁটাঘাঁটি করবে পলুস?

পলুস ডাকে—জোহানা?

মুরলীর চোখের পাতা কেঁপে ওঠে। পলুসের আহ্বানের স্বর যেন একটা দুরন্ত গর্বের স্বর। সন্দেহ করে পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী; সেই মুহূর্তে বুঝতেও পারে, ঠিকই সন্দেহ করা হয়েছে। জোহানাকে এখনই বুকের কাছে পাওয়ার জন্য পলুসের চোখে নিবিড় পিপাসার ভার টলমল করছে। পলুসের তাকাবার ভঙ্গীটাও যেন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞার ভঙ্গী।

—কি পলুস? হাসতে চেষ্টা করে মুরলী।

পলুস—এসো।

না, আর উপায় নেই। পলুসের জীবনের হিসাব এইবার প্রচণ্ড হয়ে যেন একটা জয়ের উল্লাস ভোগ করতে চাইছে। হার মানে নি পলুস; আশি

টাকা মাইনের মিস্তিরী দু শো ষাট টাকা দামের সোনার হার নিয়ে এসে মুরলীকে উপহার দিয়েছে। খুশি না হবার যে আর কোন উপায় নেই মুরলীর। আর, পলুসের এই আহ্বান মিথ্যে করে দেবার জন্য সরে থাকবার মত কোন ছুতোই যে কল্পনা করতে পারে না মুরলী।

কলঘরের এই মিস্তিরীটার ছোঁয়া নিতে হবে, ওকে ছেইলা দিতে হবে। হায় গড, এ কোন্ ডাকাইত এসে জোহানার গতর লুঠ করতে চায়? এটার ছায়া ছুঁতেও যে ঘিন্না করে। এটাই তো সেই ডাকাইতটা, মুরলীর পেটের ছেইলাকে মুরলীর কোলে উঠতে দেয় নাই যে; এ ডাকাইতের মার খেয়ে রক্ত বমি করে মরে যাওয়া ভাল, তবু ওর ছেইলা পেটে নিব না। না না না···কভি না।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—না।

পলুস—কি?

মুরলী—তুমি আমাকে ছুঁবে না।

হিংস্র ক্ষুধার বাঘেব মত লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পলুস। মুরলীর গায়ের শাড়িটাকে এক টান দিয়ে খসিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মেঝের উপর লুটিয়ে বসে পড়ে মুরলী। মুরলীর গায়ের জামাটা তিন টানে ফরফর করে ছিঁড়ে তিন ফালি নেকড়া করে দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দেয় পলুস।

রেশমী কাপড়ের কুঁচিদার সায়া, বড় নরম আর বড় মোলায়েম, মুরলীর সরু কোমর ঘিরে নরম পালকের সাজের মত দুলছে যে রঙিন আবরণ, সেটাকেও তিন টান দিয়ে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে দেয় পলুস। পলুসের নিঃশ্বাসের বাষ্প আর মুখের আঠা-আঠা থুথুর কণা মুরলীর আদুড় বুকের উপর ছিটকে পড়তে থাকে। দু হাতে শক্ত করে মুরলীর কোমরটাকে যেন চুপসে দিয়ে জড়িয়ে ধরে পলুস—জোহানা, খবরদার!

দুই হাত দিয়ে পলুসের মাথাটাকে ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—না।

—জোহানা।

—না।

এক পাটি দাঁতের সাদা হিংস্রতা দিয়ে নিজেরই ঠোঁটের উপর কামড় বসিয়ে নিয়ে পলুসের মুখটা বীভৎস হয়ে ওঠে। মুরলীর যে অবাধ্য ও উদ্ধত হাঁটুটা বজ্রপাথরের বাধার মত কঠোর হয়ে পলুসের বুকের হাড়ে ঠেকে রয়েছে, পলুসের একটা হাত মাংসাশী আক্রোশের থাবার মত নখ বের করে মুরলীর সেই হাঁটুটাকে আঁকড়ে ধরে। বাধাটাটাকে নুইয়ে শুইয়ে আর মেঝের উপর চেপে রাখতে গিয়ে পলুসের হাতের হাড়ের গিঁটগুলি মটমট করে বাজতে থাকে।

চমকে ওঠে পলুস। হঠাৎ কুকুরটা ডেকে উঠেছে। সেই সঙ্গে আর একটা ডাকও শোনা যায়—বড় মিস্তিরী ঘরে আছ? কয়লা খাদের চাপরাসী ছটু মিঞার গলার স্বর।

পলুসের হাত কেঁপে ওঠে। হাতের হাড়ের সব আক্রোশও যেন নেতিয়ে

পড়ে। উত্তপ্ত কপালের সব ঘাম হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

—বড় মিস্তিরী! কয়লা-খাদের খাজাঞ্চির গলার স্বর।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় পলুস। খাজাঞ্চি বলে—তুমি আজ কাজে যাও নাই কেন?

পলুস—ঘরে কাজ ছিল।

খাজাঞ্চি—যাই হোক; তোমার এখনই রওনা হতে হবে। ম্যানেজার সাহেবের অর্ডার।

পলুস—কোথায় যেতে হবে?

খাজাঞ্চি—তুমি এখনই বাবুরবাজারে গিয়ে রামগড়ে যাবার বাস ধরবে। তারপর রেলের টিকিট কেটে সোজা চলে যাবে ডালটনগঞ্জ। সেখান থেকে তিন ক্রোশ হবে, মোপুর সিমেণ্টের কারখানা। আমাদেরই মালিকের কারখানা।

পলুস—সেখানে আমার কি কাজ?

খাজাঞ্চি—তুমি অন্তত একটা বছর সেখানে কলঘরে কাজ করবে। তোমাকে বদলি করা হয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস। খাজাঞ্চি এইবার একটু রুক্ষস্বরে হুকুম করে—চলে এসো মিস্তিরী। সড়কে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে এখনই বাবুরবাজারে পেঁৗছে দিয়ে চলে যাব। ম্যানেজার সাহেবের অর্ডার।

ব্যস্তভাবে কথা বলতে বলতে খাজাঞ্চি হঠাৎ নিজেই যেন একটু অব্যস্ত হয়ে যায়। দু বার ঢোক গিলে ও তিনবার গলাখাঁকরি দিয়ে আর ভুরু টান করে দরজার দিকে তাকায়। যার রূপের কথা বলতে বলতে বার বার দোক্তা আর পান মুখে পুরেছিল বিজু বাঈ, দরজার কাছে তারই রূপ দেখতে পেয়েছে খাজাঞ্চি। কী চমৎকার বেলাজ হয়ে, আদুড় শরীরের উপর শুধু একটা গোলাপী রঙের রেশমী শাড়ির ফিনফিনে বাহার এলোমেলো করে জড়িয়ে আর ছড়িয়ে, আর কী সুন্দর মুচকি হাসিটি হেসে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মিস্তিরীর বউটা! এমন জিনিস ঘরের বার হতে চায়? ঠিকই বলেছে বিজু বাঈ, খবর পেলে লাখটাকার বাবু ওই তেজবাবু নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটে এসে এই ঘরের দরজায় দাঁড়াবে আর হাজার টাকা আগাম দিয়ে ওকে লুফে নিয়ে চলে যাবে।

আবার গলাখাঁকরি দেয় খাজাঞ্চিবাবু, পলুসের হতভম্ব মুখটার দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—চল হে মিস্তিরী। দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে যাবে, তারপর ফিরে এসে হারানগঞ্জের হাওয়া যত খুশি খেতে চাও খেয়ো। এখন আর মিছিমিছি···।

মুরলীর কালো চোখের তারা দুটো ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে, হেসে উঠেছে একটা মুক্তির আশ্বাস। আঃ, গড বাবা তোমার ভাল করেন বিজু বাঈ।

দরজার কাছ থেকে সরে ঘরের ভিতরে চলে যায় মুরলী। আর, পলুস হালদারও ঘরের ভিতরে ঢুকে মুরলীর সেই উৎফুল্ল গোলাপী চেহারাটার

দিকে একজোড়া হিংস্র চোখের জ্বালা ছুঁড়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে। তার পরেই ঝোলার মধ্যে কাপড়-চোপড় ভরে, একটা বালিশকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে, আর দেয়ালের গায়ে ঝোলানো বন্দুকটাও তুলে নিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরে পলুস।

—আমি তো চললাম। বলতে গিয়ে পলুসের দাঁতে দাঁতে ঘষা খেয়ে যেন একটা জব্দ অদৃষ্টের আক্ষেপ শব্দ করে বেজে ওঠে।

মুরলী বলে—যাও না কেন? আমি না বলবো কেন?

পলুস—তুমি আর এ ঘরে থাক কেন? যেথা মন চায় এখনই চলে যাও।

মুরলী—কেন যাব? আমি এ ঘরেই থাকবো।

পলুস—খাবে কি? কে টাকা দিবে?

মুরলী—তুমি দিবে।

পলুস—আমি দিব না।

মুরলী—বেশ, দিও না। সিস্টার দিদিকে বলবো, পলুস হালদার ওর ঘরণীকে ভুখা রেখে মরাতে চায়।

চমকে ওঠে পলুস। একটা ভয়ের চমক। সিস্টার দিদি বিরূপ হলে পলুসের চাকরি যে একটি অভিযোগের চিঠিতেই খতম হয়ে যাবে। পলুসের আশি টাকা মাইনের জীবনের সবচেয়ে বড় নির্ভয়ের মধ্যেই যে সবচেয়ে বড় ভয় লুকিয়ে আছে; সেই ভয়টাকে খুঁচিয়ে দিয়ে মুরলীর ঠোঁট দুটো কী ভয়ানক চতুর হাসি হাসছে!

কিন্তু সিস্টার দিদির কি বিচার নাই? কোন্ সাহসে এত ডর দেখায় জোহানা? নিজেরই ঘরের মরদের পিপাসাকে আজ অপমান করে যে পাপ করেছে জোহানা, জোহানার সেই পাপ কি মাপ করতে পারে সিস্টার দিদি?

চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।—আমি সিস্টার দিদিকে বলবো।

—কি বলবে?

—যা বলবার বলবো।

ভ্রূকুটি করে মুরলী—কবে বলবে?

পলুসের চোখে যেন শেষ প্রতিজ্ঞার আর চরম মীমাংসার শেষ আশাটা তপ্ত হয়ে জ্বলতে থাকে: যেদিন ফিরে আসবো।

—এসো তবে। একেবারে নির্বিকার শান্ত ও প্রসন্ন একটা মুখ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী।

বাইরে থেকে খাজাঞ্চির হাঁক শোনা যায়—এসো মিস্তিরী।

চলে গেল পলুস।

পলুস হালদারের এই ঘরটাকে সহ্য করতে আর ইচ্ছা হয় না। এই একলা জীবনটাকেও সহ্য করতে ভাল লাগে না। কনভেণ্টের স্কুলে যাবার সময়, প্রেয়ার

সাধবার জন্য গির্জাবাড়িতে যাবার সময়, আর মাঝে মাঝে লুসিয়া দিদির বাড়িতে পিয়ানোর বাজনা সাধতে যাবার সময় যখন এই ঘরের দরজার শিকল তুলে দিয়ে তালা বন্ধ করে মুরলী, তখন মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দও ছটফট করে ফুঁপিয়ে ওঠে ঃ আর কতদিন ?

প্রথম একটা মাস রোজই ঘরের নিভৃতে চুপ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার না একবার একটু আনমনা হতে হয়েছে। আয়নার বুকের উপর আঙুল বুলিয়ে আশার হিসাব করতে গিয়ে হিসাবটা মাঝে মাঝে হিজিবিজির মত হয়ে গিয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছে। টাকা পাঠাবে কি পলুস ? যদি না পাঠায়, তবে ?

একটা মাস শুধু একটু ভাবতে ভাবতে পার হয়ে গেল। কিন্তু, শুধু একটি মাস, তারপর আর নয়। পলুসেরই পাঠানো চল্লিশটা টাকা ডাকপিওনের কাছ থেকে হাতে তুলে নিতে গিয়ে মুরলীর প্রাণ যেন মুখ টিপে হেসে ওঠে। কলঘরের মিস্তিরী এখনও বোঝে নি যে, জোহানাকে নিয়ে আর ওর ঘর করা হবে না, হতে পারে না। ঘর করবার জোর আর ওর নেই। কয়লা-খাদের একটা সর্দার কিংবা কলঘরের একটা খালাসীর বেটিকে বিয়া করে নিয়ে এসে এই ঘরে থাকুক না কেন পলুস।

পরের মাসগুলি যেন চমৎকার এক নির্ভাবনার হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ে যেতে থাকে। ফিরে আসে নি পলুস। এক মাস পরে নয়, দু মাস পরেও নয়। ছটা মাস পার হয়ে গিয়ে ফাল্গুনের দিন এসে হারানগঞ্জের ডাঙার যত আম নিম আর অশত্থের গায়ে নতুন পাতার উৎসব ছড়িয়ে দিল, তবু ফিরে এসে শেষ প্রতিজ্ঞার হিসেব নিকেশ করবার সুযোগ পেল না পলুস। ছুটি পায় নি বুঝি পলুস মিস্তিরী।

কনভেণ্টের একটি ঘরে মেরিয়ার কাছে বসে লেস বুনতে বুনতে মুরলীর হাতের কাঁটা দুটোও যেন ব্যাকুল হয়ে ছটফট করতে থাকে। কথা বলতে গিয়ে মুরলীর মুখের হাসিও কলকল করে।

মেরিয়া বলে—তুমি তো হাসছো জোহানা, কিন্তু পলুস বেচারা যে এখন···।

মুরলী—কি ?

মেরিয়া—কত তরাস ভুগছে বেচারা !

মুরলী—কেন, কিসের লেগে ?

মুরলীর কোমরে একটা মৃদু অভিযোগের চিমটি কেটে হেসে ওঠে মেরিয়া—এটার লেগে।

মুরলীর মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বেশ একটু বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে—ছিয়া ছিয়া ! এমন কথা আর বলবে না মেরিয়া ; শুনতে ভাল লাগে না।

মেরিয়াও হঠাৎ হাসি থামিয়ে মুরলীর মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকায়। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—পলুস কি তোমাকে চিঠি দেয় নাই ?

মুরলী—কেন চিঠি দিবে ? দরকার কি ?

আরও আশ্চর্য হয় মেরিয়া—তুমি চিঠি দিয়েছ কি ?

মুরলী চেঁচিয়ে ওঠে—আমি কেন চিঠি দিব ? দরকার কি ?

মেরিয়ার চোখের বিস্ময় এইবার কি যেন সন্দেহ করে মুরলীর মুখের এই অদ্ভুত রাগটার দিকে মায়া করে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, কোন্ ঘরণী না এইরকম রাগটি করে, ঘরের মরদ যদি তাকে একা ঘরে রেখে দিয়ে দূর দেশে চলে যায়, আর ছয়টি মাসের মধ্যে একবারও ঘরে না আসে ? জোহানার যে লিখাপড়ার বড় সাধ আছে ; আরও কত কিছু শিখবার লেগে দিনরাত কত খাটছে বেচারা। তাই পলুসের সঙ্গে মৌপুর সিমেন্টের কারখানাতে যেতে পারে নি জোহানা। সেটা কি-এমন অপরাধ হল যে, চিঠি না দিয়ে জোহানার মনটাকে এত কঠোর সাজা দিচ্ছে পলুস ? তাই তো জোহানার মনের রাগ আর অভিমান এমন কঠোর হয়ে উঠেছে !

মেরিয়া হাসে—কবে ফিরবে পলুস ?

মুরলী—জানি না।

মেরিয়া—কতদিনের বদলি ?

মুরলী—এক বছর।

মেরিয়া মুখ টিপে হাসে—তবে তো আরও ছটা মাস বটে জোহানা।

মুরলী—হবে।

মেরিয়া চোখ টিপে হাসে—বড় ভাল হবে।

মুরলী বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে—কেন ?

মুরলীর গায়ের উপর ঢলে পড়ে আর খিলখিল করে হেসে ওঠে মেরিয়া—যত বেশি রাগ হবে, যত বেশি দিন মিছা যাবে, মজাও তত বেশি জমবে।

মুরলী আবার ভ্রূকুটি করে—কিসের মজা ?

মেরিয়া—ফিরে আসুক পলুস ভাই ; তারপর দেখ না কেন, এক বছরের হিসাব কিরকমটি নিয়ে ছাড়ে !

—ছিয়া ছিয়া ! গম্ভীর হয়ে মেরিয়ার এই অসার খুশির মূর্খতা আর মুখরতাকে যেন ধিক্কার দেয় মুরলী, আর মেরিয়াকে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়েও দেয়। তারপর ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিকেল হয়েছে। তাই সড়কের দিকে তাকাতে হয়। মেরিয়ার ঘরে বিকেল পর্যন্ত বসে থাকার উদ্দেশ্য শুধু মেরিয়ার সঙ্গে হাসি-গল্প সেলাই আর লেস বোনবার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল একটা সাধের সাধনা নয়। বিকেল হলে এই সড়কের উপর দিয়ে সাইকেলে চড়ে রোজ একটি মানুষকে চলে যেতে দেখতে পায় মুরলী, ডাক্তার রিচার্ড সরকার। কিন্তু রিচার্ড সরকারের চোখ দুটো আজও উদাস হয়ে রয়েছে। জানালার দিকে তাকিয়েও যেন বুঝতে পারে না রিচার্ড, কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা, মুরলীকে দেখতে পেয়েও যেন চিনতে পারে না। অথবা চিনতে পেরেও একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবার দরকার আছে বলে মনে করে না।

রিচার্ডের মত মানুষের চোখের কাছে একটা বিস্ময়ের শোভা হয়ে উঠতে মুরলীর জীবনে এখনও যে অনেক চেষ্টার কাজ বাকি আছে। রিচার্ডের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সময় এখনো আসে নি।

সড়কের উপর দিয়ে রিচার্ড সরকারের সাইকেল-চড়া মূর্তিটা চলে যেতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে মুরলী।—আমি চলি মেরিয়া। লুসিয়া দিদির সাথে আজ আমার ঝগড়া আছে।

মেরিয়া—কেন জোহানা?

মুরলী—লুসিয়া দিদি আজও আমাকে কিছু শিখালে না কেন?

মেরিয়া আশ্চর্য হয়—তিন-তিনটা গান গাওয়া করতে আর বাজাতে শিখে ফেলেছো তুমি, আর কত শিখবে জোহানা? আর কত চাও তুমি?

মুরলী—ওরকম তিনটা টিটাং টিটাং শিখে কিছু হবে না। লুসিয়া দিদি যে মঙ্গল কোরাস বাজায় সেটা, যদি না শিখে নিতে পারি তবে···।

মেরিয়ার চোখের বিস্ময় আবার সন্দিগ্ধ হয়—তবে কি?

—তবে তোমার মাথা। হাসতে হাসতে মেরিয়ার গালে একটা মৃদু আহ্লাদের চড় মেরে চলে যায় মুরলী।

ঘরে ফিরে এসে হাঁপ ছাড়ে মুরলী; কিন্তু এটা ক্লান্তিভরা জীবনের হাঁপ নয়। পলুসের এই ঘরের ভিতরে মুরলীর একলা-জীবন যেন অক্লান্ত চেষ্টা আর ব্যস্ততার জীবন। মাঝরাতের ঘুমভীরু পাখির ডাকও যখন ক্লান্ত হতে হতে শেষে একেবারে চুপ হয়ে যায়, তখনও জ্বলন্ত বাতির কাছে খোলা-বই রেখে পাঠ মুখস্থ করে মুরলী। কাগজের পাতা ভরে খোলা-বইয়ের চমৎকার ভাষার কথাগুলি লিখে লিখে পড়ে। তারপর আর-একটা বই হাতের কাছে টেনে নেয়।

কী সুন্দর হিসাবের কথা লিখেছে এই বইটা, আট আনা দামের এই সরল-অঙ্ক। রোজের বাজার খরচ থেকে প্রতিদিন সাত আনা পয়সা বাঁচিয়ে জমা করে রাখতে পারলে কতদিনে তুমি ভুবনপুরের মেলা থেকে একটা ভাল গরু কিনতে পারবে? সে ভাল গরুর দাম সত্তর টাকা।

লিখে লিখে হিসাব করে মুরলী। হাসতে থাকে মুরলীর দুই চোখের তারা; সত্যিই গভীর রাতের কালো আকাশের তারার মত ঝিকিমিকি হাসি। কী ভেবেছে মেরিয়া, ঠিক হিসাব করতে পারবে না জোহানা? তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ মেরিয়া বহিন; কোন হিসাবকে ডরায় না জোহানা।

সরল অঙ্কের প্রশ্নটাকে একটুও ভয় করে না মুরলী। কিন্তু সত্যিই ভয় পায় তখন, যখন হিসাব করে বুঝতে পারে যে, মাত্র আর ছটা মাস পরেই এই ঘরে ফিরে আসবে পলুস হালদার। তখন কী হবে উপায়? মুরলীর যে আরও অনেক কিছু শেখবার বাকি আছে। এখনও যে ঠিক তৈরী হতে পারে নি মুরলী। এখনও যে পলুসের পাঠানো টাকা হাত পেতে নিতে হয়। রিচার্ড সরকার যে এখনও মুরলীর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে চায় না।

যতদূর সাধ্যি, মন-প্রাণের সব চেষ্টা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হতে চায় মুরলী। হে গড, এই ছয়টা মাস যেন বেশি তাড়াতাড়ি করে ফুরিয়ে না যায়!

কিন্তু মাসগুলি যেন বড় তাড়াতাড়ি হারানগঞ্জের আকাশের মেঘ হয়ে, ডাঙ্গার ধুলোর ঝড় হয়ে আর জঙ্গলের শালের ফুল হয়ে উড়ে ঝরে শেষ হয়ে যেতে থাকে। ছুটোছুটি করে বার বার লুসিয়াদিদির কাছে যেয়ে, পিয়ানোতে হাত চালিয়ে সুর ঢালতে শিখেও বুঝতে পারে মুরলী, আশার কাজটা সোজা সহজ কাজ নয়। পুরা পাঁচটা মাস পার হয়ে গেল, তবু মঙ্গল কোরাসের সুরটা ঠিকমত তুলতে পারছে না মুরলী। লুসিয়াদিদি কিন্তু আশা করে হাসে—হবে হবে, আরও দুতিনটা মাস লাগবে, তোমার হাতে খুব ভাল সুর খেলবে, জোহানা।

আরও দু-তিনটা মাস? হায় আশা! মুরলীর প্রাণের সব আশার সুর স্তব্ধ করে দেবার জন্য আর একমাস পরেই যে মিস্তিরী পলুস হালদার এসে পড়বে।

যতক্ষণ কনভেণ্টের স্কুলবাড়ির ভিতরে ঘোরাঘুরি আর ছুটোছুটি করে মুরলী, ততক্ষণ মুরলীর আশার প্রাণটাও যেন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে যখন একলা হয়ে যেতে হয়, তখন মনটা মাঝে মাঝে খুব অশান্ত হয়ে ছটফট করে। একদিন স্বপ্ন দেখে চমকে উঠেছে বুকটা; কিন্তু ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নটাকে একটা সান্ত্বনা বলে মনে হয়েছে। ভাল মজার স্বপ্ন; কলঘরের মিস্তিরী পলুস হালদারের একটা পা কাটা পড়েছে, হাসপাতালে গিয়েছে পলুস। ডাক্তার বলেছে, ঠিকমত সেরে উঠতে ছ'টা মাস সময় লাগবে।

রবিবার, তাই আজ আর কনভেণ্টের স্কুলবাড়িতে যেতে হয় নি। শুধু সকালবেলাতে প্রেয়ার সাধবার জন্যে গির্জাবাড়িতে যেতে হয়েছিল। দেখতে পেয়েছে মুরলী, ডাক্তার রিচার্ড সরকারের সঙ্গে দুটো জোয়ান বয়সের মেয়ে হাসাহাসি করে গির্জাবাড়িতে এল আর প্রেয়ার সেধে চলে গেল। কে ওরা? কোথা থেকে এল ওরা? কোথায় থাকে ওরা? ওদের সাথে এত হাসাহাসি করে কেন রিচার্ড সরকার?

বিকেলে একবার, আর সন্ধ্যা হলে একবার, দুবার স্নান করেছে মুরলী। কিন্তু মুরলীর বুকের দুরুদুরু ভাবনার কাঁপুনিটা তবু শান্ত হয় নি। কী সুন্দর কথা বলে ওই দুটো মেয়ে। ওদের কথার মধ্যে যেন রাঙা পলাশের রং আছে, ফোটা গোলাপের গন্ধ আছে, আর মিষ্টি পিয়ানোর সুর আছে। ঠিকই তো, ওদের সাথে হাসাহাসি করবে না কেন রিচার্ড সরকারের মত মানুষ, যে মানুষ ফুলবাড়িতে থাকে?

—কে বটে তুমি? কে দাঁড়িয়ে ওখানে? চমকে ওঠে, উঠে দাঁড়ায়, আর ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী। দরজার কাছে একটা রঙীন শাড়ির আঁচল ফুরফুর করে উড়ছে, আর, সোনালী জরি দিয়ে বাঁধা মস্তবড় খোঁপা নিয়ে একটা মাথা কাত হয়ে রয়েছে। হাসছে একটা মুখ, জরদা দিয়ে পানখাওয়া একটা লালচে হাসির মুখ।

জরি দিয়ে বাঁধা খোঁপাটা দুলে ওঠে, আর, যেন হেসেও ফেলে—আমি গো; আমি বিজু বাঈ।

—তুমি এখানে এলে কেন? দুই চোখ শক্ত করে আর রুক্ষ স্বরে ধমক দিয়ে

কথা বলে মুরলী।

বিজু বাঙ্গী এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে আর খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়।—এরকমটি মেজাজ করে কথা বলছো কেন?

—তুমি যাও। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—যাবই তো, কিন্তু আমার কথাটা একবার শুনবে, তবে তো…।

—না, কিছু শুনবো না। জান না তুমি, এটা যে খিরিস্তানের ঘর? এখানে আসতে ডর লাগে না তোমার?

চেঁচিয়ে ওঠে বিজু বাঙ্গী—থাম গো লাটের বেটি। আমাকে মিছা ডরাতে চেষ্টা করবে না।

নীরব হয়ে, বিজু বাঙ্গীয়ের লালচে মুখের ধমকের কাছে যেন একটা স্তব্ধ ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। বিজু বাঙ্গী এইবার যেন করুণ অভিমানের সুরে কথা বলে—তুমিই বলেছিলে যে, সুখের ঘরে থাকতে চাও। তুমিই বলেছিলে তাই মিস্তিরীকে দূরে সরিয়ে দিলাম। তুমি খুশি হয়ে আমাকে একটা পানও দিলে না, উল্টা আমাকেই ধমক দিয়ে…।

হাসতে চেষ্টা করে মুরলী—বল তুমি; তাড়াতাড়ি বল; কী বলতে চাও?

বিজু বাঙ্গী—তেজবাবুর নাম শুনেছ কি? জিতগড়ের তেজবাবু?

মুরলী—না, শুনি নাই। শুনে কাজ নাই।

বিজু বাঙ্গী—বিশ্বাস কর; টাকার খাদ আছে তেজবাবুর। টাকা দিয়ে দেয়াল গেঁথে তোমার সুখের ঘর করে দিতে পারে তেজবাবু। এক রাতের হরিণ শিকার খেলতে এক হাজার টাকা খরচ করে তেজবাবু! তাই বলতে এসেছি…।

মুরলী—কি?

বিজু বাঙ্গী—তেজবাবুর একটা লোক, আমার নাগর সেই ঠিকাদার বেটা কাল রাতে তোমার এখানে আসবে।

—কেন আসবে? চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

বিজু বাঙ্গী হাসে—পাঁচ শত টাকা, এক হাঁড়ি বালুসাই…ঝরিয়ার মতিচাঁদের বালুসাই গো…এক থান সিলিক কাপড় আর এক বোতল বিলাতী সরাব নিয়ে দাদন করে যাবে ঠিকাদার তুমি ওকে বলে দিও, ঠিক কবে আবার এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

কলকল করে হেসে ওঠে মুরলী—একটুক দেরি করতে বল দিদি; কাল যেন না আসে।

বিজু—তবে কবে?

মুরলীর গলার স্বর হঠাৎ একেবারে নিবিড় হয়ে করুণ মিনতির মত ছলছল করে।—মিস্তিরীকে আরও একটা বছর দূরে সরিয়ে রাখ না কেন, দিদি? আমি যে এখনও মন ঠিক করি নাই দিদি। কিন্তু মিস্তিরী এসে পড়লে আমার সুখের সব আশা মরা ঘাসের পোকাটির মত মরে যাবে। তুমি আমার কথাটি রাখ দিদি।

বিজ্ন বাঙ্গি হাসে—বেশ তো ; তাই হবে। তুমি ভেব না।

ম্নরলী—দেখো দিদি, মিস্তিরীটা যেন দ্নটা দিনেরও ছ্নটি না পায়।

—পাবে না, পাবে না। আমি সব ঠিক করে দিব। হেসে হেসে ছটফট করে একটা হাত এগিয়ে দেয় বিজ্ন বাঙ্গি—দাও দেখি, এক বাটি ভাল জল দাও, পিয়ে নিয়ে চলে যাই। ঠিকাদার বেটা সড়কের আধারে একা দাঁড়িয়ে আছে।

কাচের গেলাসে জল ভরে নিয়ে বিজ্ন বাঙ্গিয়ের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় ম্নরলী। জল খেয়ে নিয়ে আবার হেসে ওঠে বিজ্ন বাঙ্গি—এই জল চাই নাই গো, স্নন্দরী।…আচ্ছা চলি।

চলে গেল বিজ্ন বাঙ্গি। ম্নরলীর চোখ জবলজবল করে। যেন আরও একটা বছরের সময় হাতে পেয়ে নির্ভর হয়েছে ম্নরলীর আশা। এই ফাগ্নন থেকে আর-এক ফাগ্নন, এর মধ্যে কোনদিনও মিস্তিরী পল্নস হালদার আর এই ঘরে ফিরে আসতে পারবে না। হে গড, তাই যেন হয়।

মেরিয়ার নালিশ—দেখছো তো ল্নসিয়াদিদি, জোহানা আজও এল না।

যে জোহানা ঝড়-বাদলের দিনেও কনভেণ্টে এসেছে, স্কুলবাড়ির বারান্দার এক কোণে বসে নতুন বই পড়েছে আর নতুন লেখা লিখেছে, লেস ব্ননে ব্ননে মেরিয়ার সঙ্গে গল্প করেছে, আর পিয়ানোতে ল্নসিয়াদিদির হাতের স্নরেলা খেলা দেখেছে, সে জোহানা একটা নতুন ব্যস্ততার কাজের কাছে হাজিরা দিতে গিয়ে এই ছ'টা মাসের মধ্যে অত্যন্ত ত্রিশটা দিন কনভেণ্টে আসতে পারে নি।

হরগঞ্জের দক্ষিণের ডাঙা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা তালবন আছে। সেই তালবনের পাশে একটা বাড়ি আছে ; কলকাতার স্যাম্নয়েল বাব্নর বাড়ি। স্যাম্নয়েল শশিনাথ রায় তাঁর দ্নই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এই ছ'টা মাস ওই বাড়িতে ছিলেন। জানে মেরিয়া, কাল বিকালেই আবার কলকাতায় চলে গিয়েছেন স্যাম্নয়েল বাব্ন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দ্নই মেয়ে, লিলি আর মলিও চলে গিয়েছে। তাই মেরিয়ার নালিশ, আজ তো ওরা আর নাই, তবে জোহানা কেন আজ এখানে এসে একবারটি দেখা দিয়ে যাবারও সময় পেল না ?

হারানগঞ্জের আকাশের ভাদ্নয়া মেঘ তালবনের মাথা ছ্নঁয়ে আরও কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্নষ্টি ঝরবে না মনে হয়। যদি ঝরে, তবে এই দ্নপ্নরের মধ্যেই সে ঝরানি শেষ হয়ে যাবে। তাই, যদি আসতে ইচ্ছে থাকে জোহানার, তবে বিকাল হবার আগেই একবার আসতে পারে।

জানে মেরিয়া, লিলি আর মলির সাথে খ্নব ভাব হয়েছে জোহানার। জোহানা নিজেই বলেছে, কী স্নন্দর কথাটি বলে ওরা, তুমি শ্ননেছ কি মেরিয়া ?

মেরিয়া—শ্ননেছি।

ম্নরলী—দেখেছো কি ?

মেরিয়া—কি ?

মুরলী—রিচার্ডবাবু ওদের কথা শুনে কত খুশি হয় ?

মেরিয়া—দেখেছি।

কিন্তু বুঝতে পারে না মেরিয়া, কলকাতার মেয়েদের কাছে বারবার ছুটে যাবার মত কী কাজ থাকতে পারে জোহানার ? ওদের সঙ্গে জোহানার ভাব করবার দরকারই বা কি ? মাঝে মাঝে বেশ রাগ করে ফেলে মেরিয়ার মনটা, স্যামুয়েল বাবুর বাড়ির আয়া হবার সাধ হয়েছে নাকি জোহানার ? তবে আর এত খেটে লিখাপড়া শিখে কেন জোহানা ?

জোহানা গল্প করেছে ; তাই জানতে পেরেছে মেরিয়া, একদিন তালবনের ভিতরে পিকনিক করেছে লিলি মলি আর জোহানা। ডিমের কারি রেঁধেছে জোহানা, আর লিলি মলি দুই বোনে হাত মিলিয়ে পোলাউ রেঁধেছে।

কিন্তু আজ তো পিকনিক হবে না। জোহানার দুই নতুন মিতালী এখন কলকাতার বাড়িতে বসে চা খেয়ে খেয়ে হাসছে। আর, বোকা জোহানা এখানে ওর ঘরের ভিতরে একলাটি চুপ করে বসে ভাবছে।

মেরিয়ার মনটা হঠাৎ চমকে ওঠে। কাঁদছে নাকি জোহানা ? তা না হলে আজ এখানে একবার এল না কেন জোহানা ?

দেরি করে না মেরিয়া। সড়ক না ধরে, সোজাসুজি ডাঙা পার হয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে যায়।

তালবনের মাথার মেঘ পালিয়ে গিয়েছে। বিকেলের রোদ লালচে হয়েছে। মুরলীর ঘরের দরজার ভেজানো কপাট আস্তে ঠেলে দিয়ে উঁকি দিতেই মেরিয়ার দুই চোখ হেসে ওঠে। আয়নার দিকে তাকিয়ে জোহানা বহিন মুখ টিপে হাসছে।

দরজার কপাটে টোকা দেয় মেরিয়া। চমকে ওঠে মুরলী ; তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলটাকে তুলে নিয়ে আদুড় বুকটাকে ঢাকা দেয়।

—কী বটে জোহানা ? কী দেখছিলে জোহানা ? ছুটে এসে মুরলীর শাড়ির আঁচলটাকে টেনে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে মেরিয়া।

চোখ পাকিয়ে মেরিয়ার মুখের দিকে তাকায় মুরলী, সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে, আর নিজের হাতেরই একটা টানে বুকঢাকা আঁচলটাকে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—এই দেখ।

মেরিয়া হাসে—তিল বটে !

মুরলী—হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো ছিল না। এক মাস আগেও না।

মেরিয়া—তবে আর ভাব কেন ? আর দেরি নাই, জোহানা।

মুরলী—কিসের দেরি নাই ?

মেরিয়া—বুকের খবর নিবার মানুষ আসতে আর দেরি নাই।

মুরলী আবার চোখ পাকিয়ে তাকায়—মিছা কথা।

মেরিয়া হাসে—মিছা কথা নয়, জোহানা। শুন নাই, স্কুলের ছোট দিদি মিস মুরমুর কথা ?

মুরলী—কি কথা ?

মেরিয়া—এক মাসও হয় নাই, মিস মুরমু'র গালে একটা নতুন তিল হলো ; আর দুমকা থেকে চিঠিও এসে গেল, বিয়া হবে।

শাড়ির আঁচলটাকে গায়ে জড়িয়ে, মেরিয়ার একটা হাত নরম করে ধরে নিয়ে, মুখ টিপে হাসে আর কথা বলে মুরলী—তুমি বলছো, এটা তিল। আমি বলবো এটা আমার আশার তিলক। আমার মন যাকে সব সময় কাছে পেতে চায়, সে এখনও দূরে সরে রয়েছে। জানি না কতদূরে। কিন্তু বিশ্বাস করি মেরিয়া, আমার স্বপ্ন একদিন তাকে···।

—হেই জোহানা, থাম জোহানা। ছটফটিয়ে হেসে ওঠে মেরিয়া। সত্যিই যে একটা অদ্ভুত বিস্ময়, শান্ত ভাবে সহ্য করতে পারবে কেন মেরিয়া ? মুরলীর হাতটাকে টেনে গলায় জড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মেরিয়া—বুঝেছি জোহানা, তুমি এইরকমটি মিঠা কথা শিখে নিবে বলে তোমার নতুন মিতানীদের সাথে এত ভাব সেধেছিলে। তাই বটে কিনা ?

মুরলী হাসে—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কোন দোষ হয়েছে কি ?

মেরিয়া—না, দোষ নয়। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি শিখে নিলে, জোহানা ? ভাল হরবোলা তুমি।

আর, মাত্র কয়েকটা মাস পরে, যখন পলুস হালদারের ঘরের নিভৃতে সাইকেলটার গায়ে মরচের দাগ ঘন হয়ে উঠেছে, আর শীতের হাওয়া লেগে ঘরের চালার টালি থেকে শুকনো শেওলা ধুলো হয়ে ঝরে যেতে শুরু করেছে, তখন কনভেণ্টের একটি ঘরের নিভৃতে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বিপুল আনন্দের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে মুরলীরই গালে একটা আহ্লাদের মৃদু চড় মেরে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মেরিয়া। তাজ্জব করলে জোহানা। সিস্টার দিদির পিয়ানোটার কাছে বসে দু হাত চালিয়ে আর মনপ্রাণ যেন বিভোর করে নিয়ে মঙ্গল কোরাস বাজিয়ে চলেছে মেরিয়ার প্রাণের সখী জোহানা।

সিস্টার দিদি এসেছেন। কনভেণ্টের কিতাবঘরে বসে এখন বই পড়ছেন। এই খবর জানে মেরিয়া।

সিস্টার দিদির কাছে গিয়ে একটা প্রবল খুশির চিৎকার ছেড়ে ছটফট করতে থাকে মেরিয়া।—একবারটি তুমি আসবে কি দিদি ?

সিস্টার দিদি চমকে ওঠেন—কি খবর, মেরিয়া ? কিসের জন্য ডাকছ ?

মেরিয়া—জোহানা বহিনকে একবারটি দেখবে চল, দিদি।

সিস্টার দিদির হাত ধরে টান দেয় মেরিয়া। সিস্টার দিদিও তাঁর নীল চোখের একটা বিরক্তিকর বিস্ময় ধরে নিয়ে মেরিয়ার সঙ্গে হেঁটে এসে কনভেণ্টের সেই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ান, যে-ঘরের ভিতরে জোহানার হাতের ছোঁয়ার চমক খেয়ে খেয়ে পিয়ানোর বুকের ভিতর থেকে মঙ্গল কোরাসের মিষ্টি শব্দের উৎস উথলে উঠছে।

দরজার কাছে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন সিস্টার দিদি, আর বিপুল কৃতার্থতায় প্রসন্ন হয়ে সিস্টার দিদির চোখে একটা স্নেহাক্ত গৌরবের

হাসি জ্বলজ্বল করতে থাকে।

মুরলীর চোখ দুটো যেন একটা সুস্বপ্নের ছবির দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে আছে। তাই দেখতে পায় না যে, সিস্টার দিদির খুশি চোখ দুটো সুন্দর আশীর্বাদী দৃষ্টি নিয়ে দরজার কাছে একটু আড়াল হয়ে মুরলীর দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মুরলীর কাছে এসে দাঁড়ায় মেরিয়া; আস্তে আস্তে মুরলীর গায়ে হাত দেয়। রেশমী সুতো দিয়ে বোনা যে নেট গায়ে জড়িয়ে রয়েছে মুরলী, সেই নেটের ঝালর হয়ে ছোট ছোট লেসের ফুল দুলছে। নেটটাকে আস্তে আস্তে মুরলীর গা থেকে তুলে নিয়ে আবার ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মেরিয়া। সিস্টার দিদির চোখের কাছে নেটটাকে তুলে ধরে আর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ফিসফিস করে মেরিয়া: দেখ দিদি, এই ওড়না নিজের হাতে বানালে জোহানা।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকে মুরলীর কাছে এসে দাঁড়ান সিস্টার দিদি। বাজনা থামিয়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী।

—জোহানা বহিন! ডাকতে গিয়ে সিস্টার দিদির গলার স্বরও মায়াময় হয়ে গলে যায়।

—কি বটে দিদি? প্রশ্ন করে সিস্টার দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

সিস্টার দিদি হাসেন—আজ আমি তোমার আর একটা পরীক্ষা নিতে চাই জোহানা।

মুরলী—নেন না কেন দিদি।

সিস্টার দিদি—পবিত্র বাইবেল পড়তে শিখেছ?

মুরলীর চোখে যেন একটা তৃপ্ত অহংকারের বিদ্যুৎ চমক দিয়ে ঝলসে ওঠে—শুধু পড়তে শিখি নাই দিদি; লিখতেও শিখেছি। আর, যদি শুধাও তবে মুখে মুখে অনেক পাঠ বলে দিব।

সিস্টার দিদি—পর্বতের উপর যীশুর উপদেশ?

মুরলী—জানি দিদি।

সিস্টার দিদি—বল, শুনি।

মুরলী—যীশু বসিলেন, শিষ্যেরা তাঁহার চারিধারে উপস্থিত হইলেন। যীশু উপদেশ বলিলেন—হৃদয়ে যাহারা বিনত, তাহারা সুখী, কারণ ধর্মরাজ্য তাহাদিগের হইবেক। যাহাদিগের মধ্যে শক্ততা নাই, তাহারাই ঠিক সুখী, কারণ তাহারা পৃথিবীর প্রাপক হইবেক। যাহারা কান্দে তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহারা স্বস্তি পাইবেক। পবিত্রতা পাইতে যাহারা ক্ষুধিত ও পিপাসিত, তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহারা তুষ্ট হইবেক। যাহারা অপরকে দয়া করে, তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহাদিগকেও দয়া করা হইবেক। যাহারা মনে পবিত্র, তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইবেক।

—জোহানা! ডাক দিতে গিয়ে সিস্টার দিদির নীল চোখের কোণে দুটো

বড় বড় জলের ফোঁটা টলমল করে ওঠে। মুরলীকে কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে সিস্টার দিদিও যেন তাঁর মনের উতলা খুশির আবেগ শান্ত করতে থাকেন। তারপর বলেন—স্কুলের ছোটদিদি মিস মুরমু'র বিবাহ হবে, দুমকাতে চলে যাবে। সে আর স্কুলে পড়াতে পারবে না। আমার ইচ্ছা, তুমি ছোটদিদি হয়ে স্কুলের বাচ্চাদিগকে পড়াও।

মুরলী—আজ্ঞা করেন দিদি।

সিস্টার দিদি—হ্যাঁ, আজ্ঞা করলাম। তুমি চল্লিশ টাকা মাসোহারা পাবে; তাতে তুমি খুশি হবে কি জোহানা?

মুরলী—খুব খুশি হব দিদি। কিন্তু…।

সিস্টার দিদি—কি?

মুরলী—কিন্তু আমাকে কনভেণ্টের ঘরে ঠাঁই দিতে হবে দিদি; একা ঘরে থাকতে আর মন করে না।

সিস্টার দিদি হাসেন—বেশ তো, যতদিন না পলুস ফিরে আসে, তুমি ততদিন কনভেণ্টের ঘরে থাক।

এতদিনে মুরলীর আশার স্বপ্নটা নিজের জোরে ছুটে চলবার সৌভাগ্য পেয়ে ধন্য হয়ে গেল। প্রায় ছুটতে ছুটতে, সন্ধ্যার হারানগঞ্জের ডাঙার বাতাস গায়ে মেখে ঘরে ফিরে আসে মুরলী। হ্যাঁ, কত তাড়াতাড়ি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল আরও বারটা মাস। পলুসের সেই চকচকে সাইকেলটার সব লোহা কত তাড়াতাড়ি মরচেতে ছেয়ে গিয়েছে।

পলুস হালদারের এই ঘরের শেষ রাতটাকে একটা একটানা ঘুমের ঘোরে পার করে দিয়ে পরদিন সকালেই কনভেণ্টে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মুরলী। আর্থারবাবু একটা গো-গাড়ি ডেকে দিয়েছে। নিজের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিয়ে দরজার কপাটে শিকলও তুলে দেয় মুরলী, আর, তালাবন্ধ করেই হাঁপ ছাড়ে।

ঠিক সেই সময় ডাকপিওন এসে হাঁক দেয়—আপনার টাকা এসেছে।

মুরলীর নরম ঠোঁট দুটো শিউরে শিউরে হাসতে থাকে—টাকা নিব না।

ডাকপিওন—ফিরত যাবে কি?

মুরলী—হ্যাঁ।

আমি যীশুর ছোট মেষ! প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ!!

শিশুদের প্রার্থনা। কনভেণ্টের স্কুলের বাচ্চাদের ক্লাসে রোজকার পড়াবার পালা শেষ করবার পর এই প্রার্থনাকে গাওয়াবারও একটা পালা আছে। গাওয়াবার ভঙ্গীটা নামতা পড়বার মত। প্রার্থনার একটা লাইন প্রথমে একা গলায় গেয়ে ওঠে মুরলী; তার পরেই বাচ্চার দল একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গায়। গলাটাকে যেন গানের কলের মত একদমে পনের মিনিট ধরে কোনমতে খাটিয়ে

নিয়ে স্কুলঘর ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় মুরলী। চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরিটার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবার এই জীবনটাকেও কোনমতে সহ্য করতে হবে, যতদিন না মনটা নিজেই নতুন সাহসের সুখে বলে ফেলে, আর দেরি কর কেন জোহানা?

সেদিন বড় খুশী হলেন সিস্টার দিদি, যেদিন কনভেণ্টের লাইব্রেরিতে ঢুকে আলমারির বই ঘেঁটে ঘেঁটে একটি বই হাতে তুলে নিল মুরলী।

সিস্টার দিদি—কি বই নিলে জোহানা?

মুরলী—জেরুসালেম কাহিনী।

সিস্টার দিদি—বই ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

মুরলী—হ্যাঁ দিদি।

সিস্টার দিদি—কেন?

চমকে ওঠে মুরলী, যেন একটা আনমনা প্রাণ চমকে উঠেছে। মুরলীর নরম ঠোঁটের চটুল ও সুন্দর বুদ্ধির হাসিটা হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে বিড়বিড়িয়ে কেঁপে ওঠে।—একটা বড় বই যে…বড় যে দরকার বটে, দিদি।

সিস্টার দিদি—বড় বই? না, ভাল বই?

মুরলী—হ্যাঁ দিদি। একটা ভাল বই।

সিস্টার দিদি—ভাল করে পড়বার ইচ্ছা, তাই ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

—হ্যাঁ দিদি। আবার ঝিকমিকিয়ে হেসে ওঠে মুরলীর মুখ আর চোখ।

—বেশ, আমি একটা ভাল বই দিচ্ছি, সেটা আগে ভাল করে পড়। এই নাও, পিলগ্রিমের পরমগতি।

বইটাকে হাতে তুলে নেয় মুরলী। সিস্টার দিদি বলেন—তুমিও একজন পিলগ্রিম! মনে রেখ, অটুট বিশ্বাস রেখে আর হতাশ না হয়ে জীবনের পথে সন্ধানীর মত একের পর এক বাধা জয় করে এগিয়ে যেতে হয়।

সেই দিনই হারানগঞ্জের ডাঙার উপর যখন বিকালবেলার শেষ রোদ লাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সিস্টার দিদির লেখা এক গাদা চিঠি হাতে নিয়ে সড়কের পাশের ডাকবাক্সের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে মেরিয়া, আর, যেন একটা হোঁচট খেয়ে সড়কের উপর থমকে দাঁড়ায়। ও কে বটে হোথা শিরীষের ছায়ার কাছে হাতে একটা কিতাব নিয়ে কালা পাথরটার উপর কে বসে আছে গো? হে গড, ওকে যে রিচার্ডবাবুর ঘরণী স্টিফানা বলে মনে হয়!

মেরিয়ার ভীত বিস্ময়টা তখনই লজ্জা পেয়ে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে শিরীষের ছায়ার দিকে ছুটে গিয়ে, আর কালো পাথরটার কাছে এসেই চেঁচিয়ে ওঠে মেরিয়া—এটা কি করেছো জোহানা?

মুরলী—কি করেছি?

মেরিয়া—এমনটি সাজলে কেন?

মুরলী—কেমনটি?

মেরিয়া—ঠিক স্টিফানার রকমটি? রিচার্ডবাবু এখন তোমাকে দেখলে যে

তোমাকে ওর ঘরণী বলে মনে করে ফেলবে।

মুরলী হাসে : মনে করুক না কেন!

মেরিয়া—হাতও ধরে ফেলবে যে।

মুরলী—ধরে ফেলুক না কেন!

মেরিয়ার ঠাট্টার হাসিটা যেন একটা ভয়ানক সন্দেহের ধাক্কা লেগে এলোমেলো হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে মেরিয়া—কেমনটি কথা বলছো?

মুরলী—যেমনটি তুমি শুনলে।

মেরিয়ার মুখরতার আবেগ এইবার স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিকই বটে, জোহানা যে একেবারে স্টিফানাটি হয়ে গিয়েছে। সাদা শাড়িতে সেজেছে জোহানা; গায়ে সাদা জামা। জামার হাতের কিনারায় নীল সুতোর জাল। খোঁপাতে সাদা ফুল। গলায় একটা সোনার হার, তার সঙ্গে এক টুকরো ঝকঝকে সাদা পাথরও দুলছে। চকচকে জুতো পায়ে দিয়েছে জোহানা। পাথরটা যেন রিচার্ডবাবুর ঘরের একটা সোফা। বইটাকে কোলের উপর রেখে আর পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে পাথরটার উপর বসে আছে। জোহানার শাড়িটাও ঠিক সেই স্টিফানার শাড়িটারই মত ভাঁজে ভাঁজে ফুলে আর ফেঁপে জোহানার পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটিয়ে রয়েছে। সত্যিই যে ভুল করবে রিচার্ডবাবু! কিন্তু...।

মেরিয়ার চোখ-মুখের ভাবের মধ্যে যেন একটা বিষণ্ণ কিন্তুর ছায়া ছটফট করছে। কি-যেন একটা কথা বলতে চায় মেরিয়া। ভীরু আপত্তির মত একটা কথা, কিংবা উদ্বিগ্ন প্রশ্নের মত একটা কথা।

কিন্তু কোন কথা বলবারই আর সুযোগ পায় না মেরিয়া। রিচার্ড সরকার আসছে। প্রায় এসে পড়েছে।

রিচার্ড সরকারের সাইকেল চড়া মূর্তিটা সড়ক ধরে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মন্থর হয়ে গেল। একটা বিস্ময়বিবশ মন্থরতা। সাইকেল থেকে নেমে আর পথের উপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মুরলীর দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে রিচার্ড। হারানগঞ্জের বিকালের হাওয়া লেগে রিচার্ডের গলার রঙিন টাই যেন স্বপ্নালু বিস্ময়ের নিশানের মত ফুরফুর করে উড়তে থাকে।

আস্তে আস্তে হেঁটে, দু চোখের চাহনিতে একটা উদ্বেল কৌতূহল কোনমতে চেপে রেখে শিরীষের ছায়ার কাছে এগিয়ে আসে আর হেসে ওঠে রিচার্ড—কেমন আছেন জোহানা হালদার?

—ভাল আছি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মুরলী।

—আমি চলি জোহানা বহিন। এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে দিয়েই সড়কের পাশের সেই ডাকবাক্সের দিকে তাকায় মেরিয়া; প্রায় একটা দৌড় দিয়ে চলে যায়।

রিচার্ডও যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে। চশমাটাকে চোখের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলে—আপনাকে তো আর কোনদিন এখানে এভাবে বসে থাকতে দেখি নি।

মুরলী হাসে—দেখবেন কেমন করে ? আজই যে প্রথম এলাম।

রিচার্ড—তাই বলুন।

মুরলী—আপনি ভাল আছেন ?

রিচার্ড—হ্যাঁ, ভাল আছি। কিন্তু ।

—কি ?

—কই, আর একদিনও তো আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না যে, আপনি ভাল আছেন কি না-আছেন।

—আপনিও তো কোন খবর নিলেন না, আপনার রুগীটা বেঁচে আছে কি না-আছে।

—নেওয়া উচিত ছিল।

—আমারও উচিত ছিল, কিন্তু ।

—কি ?

—সারাদিনের কাজের মধ্যে এমন একটু সময়ও পাই না যে···।

—কাজ ? কি কাজ করেন আপনি ?

—সে আর বলবেন না। সকালে উঠেই স্কুলের মাস্টারনীগিরি ; দুপুরবেলা সিস্টার দিদির সঙ্গে লাইব্রেরিতে যত পড়াশুনা আর লেখালেখি ; বিকালবেলা মেরিয়ার ঘরে বসে যত সেলাই আর কাঁটা-কুরুশের কারিগরী। বিকেল শেষ না হতেই সিস্টার দিদির টেবিলের জন্য ফুলের তোড়া বাঁধা ; সন্ধ্যে হতেই লুসিয়া দিদির বাড়িতে গিয়ে পিয়ানো বাজাও আর গান গাও। হাঁপ ছাড়বারও সময় পাই না রিচার্ডবাবু।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার রিচার্ড সরকার, যেন হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখ। যেন এক জাদুকরীর মুখ থেকে তার জীবনের রূপকথা শুনছে রিচার্ড।

হেসে ওঠে মুরলী—আপনি কি-যেন ভাবছেন ; আমার বাজে কথাগুলি একটুও শুনতে পাচ্ছেন না।

—শুনেছি, সবই শুনেছি জোহানা হালদার। কিন্তু···কী আশ্চর্য··· আমি ···আমি আপনাকে খুবই ভুল বুঝেছিলাম।

কিছুক্ষণ আনমনার মত শিরীষের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে রিচার্ড সরকার। তারপরই প্রশ্ন করে—আপনি নিশ্চয়ই বেড়াতে বের হয়েছেন ?

মুরলী—হ্যাঁ।

রিচার্ড—তবে চলুন, আপনার আপত্তি না থাকে তো আমিও আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু এগিয়ে যাই।

মুরলী হাসে—বলুন, আপনার সঙ্গে আমার একটু বেড়াতে যেতে হবে।

রিচার্ডের গলার স্বর যেন নিবিড় আবেদনের মত হঠাৎ মৃদু হয়ে যায় : তাই বলছি জোহানা হালদার। চলুন।

মুরলীর বুকের ভিতরে সব নিশ্বাস উতলা হয়ে ওঠে। সেই নিশ্বাসের একটা রক্তাভ গর্বও ঝলক দিয়ে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে। সত্যিই যে আরও ভাল নতুন জীবনের, আরও বড় সুখের বড় সড়কে এগিয়ে যাবার ডাক শুনতে

পেয়েছে মুরলীর ভাগ্য।

সড়কের দু পাশের অনেক গাছের অনেক ছায়া পার হয়ে যাবার পর, যখন রিচার্ডের বাড়ির ফটকের সবুজ লতার বিতানটা দেখতে পাওয়া যায়, তখন মুরলী হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়—এইবার আমি ফিরে যাই রিচার্ডবাবু। আর আমাকে এগিয়ে যেতে বলবেন না।

যেন আরও একবার পরীক্ষা করে দেখতে চায় মুরলী, সত্যিই এই পথে এগিয়ে যেতে আর কোন বাধা নেই, এতদূর এগিয়ে আসাও মিথ্যে আশার ছলনা নয়।

রিচার্ডের মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়, যেন রিচার্ডের মনের একটা আশার ব্যাকুলতা হঠাৎ বাধা পেয়ে ব্যথিত হয়েছে।—একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না।

—বলুন, আমি কিছুই মনে করবো না।

—সেই সেদিনের পর থেকে আপনি আর একদিনও আমার বাড়িতে এলেন না কেন?

—যাওয়া কি উচিত হতো?

—কেন উচিত হতো না?

—আপনি তাহলে আমাকে সন্দেহ করতেন।

—কেন কিসের সন্দেহ করতাম?

—ভেবে দেখুন।

—আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

—আমি বলতে পারি।

—রিচার্ড হাসে—তবে বলুন।

মুরলীও হাসে—আপনি তাহলে সন্দেহ করতেন যে, জোহানা হালদারের মনে কোন মতলব আছে।

—ছি, ছি, কখনো না, আমি আপনার মত মানুষকে এরকম সন্দেহ করতেই পারতাম না।

—সন্দেহ না করলেই ভুল করা হতো রিচার্ডবাবু।

রিচার্ডের চশমার কাচ যেন আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে আর কিরকির করে—কি বললেন?

মাথা হেঁট করে মুরলী; চোখের পাতাও হঠাৎ ভিজে যায়—জোহানা আপনাকে ভালবাসে, আপনি কোনদিন স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করতে পারেন নি, আজও পারবেন না। কিন্তু…।

—জোহানা! রিচার্ডের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

মুরলী—আমাকে আর কোন কথা বলবেন না; এইবার আমাকে যেতে দিন।

—কোথায় যাবে তুমি?

—কনভেণ্টে।

—কনভেণ্টে কেন ?

—থাকবার ঠাঁই আর কোথাও নেই, তাই।

—পলুস হালদার কোথায় ?

—সে আছে ডালটনগঞ্জে ; মোপুর সিমেণ্টের কারখানায়। কিন্তু···।

—কি ?

—তার কোন কথা আমাকে আর জিজ্ঞেস করবেন না।

—কেন জোহানা ?

—আমার জীবনের শাস্তির কথা তুলে আমাকে কষ্ট দেবেন না রিচার্ডবাবু। বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ওঠে আর হাতের বইটা দিয়ে মুখ ঢাকা দেয় মুরলী।

—জোহানা! রিচার্ডের গলার স্বরও সমবেদনার আর্তনাদের মত ফুঁপিয়ে ওঠে।

মুরলী—এ দুর্ভাগ্য আর কতদিন সহ্য করতে পারবো জানি না। পৃথিবীতে এমন কাউকে দেখছি না যে, আমাকে ওই অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

রিচার্ড—আমি বাঁচাতে পারি। রিচার্ড সরকারের গলার স্বরে যেন একটা প্রতিজ্ঞাময় সৎসাহস গুমরে ওঠে।

মুরলী—আপনি ভেবে দেখুন।

রিচার্ড—ভেবে দেখেছি।

হেসে ফেলে মুরলী—এরই মধ্যে কখন্ ভেবে দেখলেন ?

গলা দুলিয়ে কামিজের কলারের চাপ একটু আলগা করে দিয়ে রিচার্ড এইবার জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, এরই মধ্যে ভেবে দেখেছি।

মুরলী—কি ?

রিচার্ড—তোমাকে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আর ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, জোহানা।

—কেন রিচার্ড ?

—ষ্টিফানা মারা যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত, এই তিন বছরের মধ্যে কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে এত ভাল লাগে নি।

—ষ্টিফানাকে তুমি নিশ্চয় খুব ভালবেসেছিলে ?

—খুবই ভালবেসেছিলাম।

—আজও ভালোবাসো নিশ্চয়।

—নিশ্চয়।

—তবে ?

—কি ?

—জোহানাকে পেয়ে কি ষ্টিফানার অভাব ভুলতে পারবে ?

—পারবো।

—কেন ?

-তোমাকে যে আমার সেই ষ্টিফানা বলেই মনে হয়। শুধু মুখটা আরও

সুন্দর।

—স্টিফানার উপর যে মায়া করতে পারতে, আমার মত মানুষের উপর কি সে মায়া করতে পারবে?

—আরও বেশি মায়া করতে পারবো!

—কেমন করে বুঝলে?

—আমার মন বলছে।

রিচার্ডের মুগ্ধ মুখটার দিকে তাকিয়ে মুরলীর কালো চোখের বিদ্যুৎ এইবার ঝিকঝিক করে হেসে-হেসে যেন জ্বলতে থাকে। রিচার্ডের বাড়ির ফটকটাও যে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ফটকের লতা থেকে রঙিন ফড়িং-গুলো মুরলীর খোঁপার উপর বসবার লোভে আকুল হয়ে ছুটে আসছে। মুরলীর আশার হিসাব চরম জয়ের আশ্বাস পেয়ে গিয়েছে।

রিচার্ড বলে—একটা অনুরোধ।

মুরলী—বল।

মুরলীর হাত ধরে রিচার্ড—এস।

মুরলী—কোথায়?

রিচার্ড—আমার ঘরে।

মুরলী যেন এখনই মাথাটাকে রিচার্ডের কাঁধের উপর হেলিয়ে দিতে চায়—আজ মাপ কর রিচার্ড। এত তাড়াতাড়ি করতে যে বড় ভয় করছে।

রিচার্ড—ছিঃ, কোন ভয় নেই। যে-ঘরে চিরকাল থাকবে, সে-ঘরে যেতে ভয় আবার কিসের?…এস।

—কে বটে গো? কে বটে গো? মুরলীকে চিনতে না পেরে দাইটা যেন একটা ভীরু বিস্ময়ের আবেশে কেঁপে কেঁপে চেঁচিয়ে ওঠে।

হেসে ওঠে রিচার্ড—কাছে এসে মুখ দেখে চিনে নাও, দাই। আর তাড়াতাড়ি চায়ের জল গরম কর।

রিচার্ডের ঘর, যে ঘরের দেয়ালে ছবির স্টিফানার চোখে এখনও সেই অদ্ভুত হাসি শিউরে রয়েছে। সেই ছবি, যার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সেদিন মুরলীর চোখ দুটো ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছিল। সে-কথা মনে পড়তেই মুরলীর চোখে যেন ছোট্ট একটা ঠাট্টার মিষ্টি শিহর হেসে ওঠে; স্টিফানার ছবির দিকে করুণাময়ী বিজয়িনীর মত একটা অদ্ভুত রকমের শান্ত ও প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

রিচার্ড বলে—বসো জোহানা।

সেই সোফাটার উপরেই নিশ্চয় বসে পড়তো মুরলী; কিন্তু বসতে পারল না; কারণ, রিচার্ডই বাধা দিয়ে বলে—না, ওখানে নয়।

মুরলীকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেয়ে পিয়ানোর কাছে ছোট টুলের উপর বসিয়ে দেয় রিচার্ড: তোমার হাতের বাজনা আর তোমার গলার গান।

রুমাল তুলে মুখের ঢলঢলে লাজুক হাসিটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করে মুরলী—এখনই?

রিচার্ড—হ্যাঁ, এখনই। দাইটা এখনই বুঝে ফেলুক যে, তুমি আমার ঘরের ানুষ হয়ে গিয়েছে।

—প্রিয় জেসু যদি আসিবে! পিয়ানোর ঝংকারের সঙ্গে মুরলীর গলার রও ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে।

রিচার্ডের চোখের চাহনিও যেন নীরবে ঝংকার দিয়ে চমকে ওঠে। কী াশ্চর্য, স্টিফানাও যে এই গানটাকেই রোজ একবার ।

—মরুতে মরুতে সুধানদী যদি বহিবে! তুমি পিপাসিত কেন রহিবে? হ্যাঁ, সই গানটাই গাইছে জোহানা। কিন্তু, জোহানার গলার মধুতে কত মিষ্টি হয়ে গয়েছে গানটা! গাইতে গাইতে জোহানার কালো চোখ দুটোও যেন গানের সে ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে। গান গাইবার সময় স্টিফানাকে এত সুন্দর দখাত না।

ট্রের উপর চায়ের পট আর পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে দাই, আর টেবিলের উপর রেখে দিয়েই চলে যায়।

গান থামিয়ে মুরলী বলে—এইবার আমাকে আমার ইচ্ছামত একটা কাজ করতে দাও।

—কি কাজ?

—আমি চা তৈরি করি।

—জোহানা! মুরলীর একটা হাত বুকের উপর তুলে নিয়ে কথা বলতে গয়ে রিচার্ডের গলার স্বর নিবিড় হয়ে ওঠে।—চিরকাল এমনি করে তুমি আমার সব সাধ···।

চায়ের পটে হাত দিয়ে মুরলী বলে—সে কথা কি তোমাকে বার বার বলতে হবে? আমাকে চিনেও কি চিনতে পারছো না?

—চিনেছি, তাই বলছি। আমার সব সম্মান তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। তুমি কথা দাও···।

—কি কথা?

—আমার সব মান তুমি বাঁচিয়ে রাখবে।

—নিশ্চয় রিচার্ড। তুমি যে আমারও মান।

চা খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়ায় রিচার্ড—কাছে এস জোহানা;

আবার আহ্বান। মুরলীর জীবনের পথিক স্বপ্নটা যেন রিচার্ডের এক-একটা আশ্বাস সান্ত্বনা আর প্রতিশ্রুতির পুণ্যে এইবার পরম বিশ্রামের ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। আর বলবার কিছু নেই; আর জানবার কিছু নেই। রিচার্ড রকারের এই সুখের ঘর মুরলীর জীবনের ঘর। কিন্তু এখনই কাছে ডাকছে কন রিচার্ড?

টেবিলের ফুলদানির উপর থেকে ফুলের তোড়াটা তুলে নিয়ে মুরলীর াতের কাছে এগিয়ে দেয় রিচার্ড। ফুলের তোড়াটাকে অদৃষ্টের চরম উপহারের ত বুকের উপর রেখে দু হাত দিয়ে সাপটে ধরে মুরলী। মুরলীর নরম ঠোঁট াঁপে, কালো চোখ দুটো চিকচিক করে; এই মুহূর্তে একেবারে কুণ্ঠাহীন

হয়ে মুরলী যেন রিচার্ডের ঠোঁট দুটোকে প্রতিদানে তপ্ত করে দিতে চায়।

রিচার্ড হাসে—চল, এবার তোমাকে তোমার সিস্টার দিদির কাছে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ফটক পার হয়ে সড়কের উপর ওঠবার পর আর চলতে চলতে সড়কের পাশে সেই শিরীষের কাছে ফিরে এসে যখন দেখতে পাওয়া যায়, শিরীষের ছায়ার আশে-পাশে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে, তখন আর একবার মুরলীর হাতটাকে বুকের উপর রেখে কনভেন্টের ফটকের দিকে তাকায় রিচার্ড: আজ আর বেশি এগিয়ে যাব না, জোহানা।

মুরলী হাসে—কেন, কিসের লজ্জা?

রিচার্ড হাসে—হ্যাঁ, লজ্জা পেতে হচ্ছে। কনভেন্টের ফটকের কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

—কে দাঁড়িয়ে আছে? ফটকের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতে গিয়েই গম্ভীর হয়ে যায় মুরলী। কি-যেন সন্দেহ করে মুরলীর চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

সিস্টার দিদি নয়, মেরিয়াও নয়। মনে হচ্ছে, অন্য কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের কাছে জ্যোৎস্নামাখা লাল কাঁকরের উপর একটা কালো ছায়াদেহ। মুরলীর চোখের তারা দুটো যেন স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে সেই কালো ছায়াদেহের দুরাশা আর দুঃসাহসের আহ্লাদ এখনি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়।

রিচার্ড বলে—আজ তবে আসি জোহানা। মুরলীর হাতটাকে বুকের কাছ থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেয় রিচার্ড।

—এস। রিচার্ডকে বিদায় দিয়ে হনহন করে হেঁটে কনভেন্টের ফটকের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় মুরলী।

হারানগঞ্জের আকাশের চাঁদ। কনভেন্টের পাঁচিলের পাশে ঝাউয়ের পাতা মৃদু ঝড়ের সঙ্গে শ্বাস মিশিয়ে দিয়ে সির-সির করে আর শব্দ ক'রে কাঁপে। দূরে হাসপাতালের কাছে আমের বাগিচাতে কোকিল ডাকে। ধবধবে সাদা সাজের মুরলী ফটকের লাল কাঁকরের উপর ধবধবে পাথুরে কঠোরতার মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—কে?

পলুস বলে আমি এসেছি।

মুরলী—কেন?

উত্তর না দিয়ে শুধু মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলুস। পলুসের অপলক চোখ দুটো যেন দুটো নির্মম বিস্ময়ের নির্জীব পিণ্ড। ভীরু চোখ, ক্লান্ত চাহনি। যেন অনেক দূরের আকাশের একটা ধবধবে সাদা আগুনের চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে কলঘরের মিস্ত্রীর হতভম্ব ভাগ্যটা।

এই কালো ছায়াদেহের হাড়মাংসের সবই যেন প্রাণ হারিয়ে ধুলো হয়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠে না পলুস। পলুসের সেই শক্ত চোয়াল কড়কড় করে বেজে ওঠে না। ছেলেমানুষের বিলাপের মত নাকি-সুরে একটা শব্দ করে

কেঁপে ওঠে পলুসের মুখটা—আমার ঘরের চাবিটা ?

হ্যাঁ, ঠিকই, পলুসের ঘরের চাবিটা মুরলীর কাছেই ছিল। কিন্তু একটুও মনে পড়ে না মুরলীর, কোথায় আছে চাবিটা ? খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। মুরলী বলে—চাবিটা নেই।

—ভাল। মুখ ফিরিয়ে নেয় পলুস, আর, একবারও পিছুপানে না তাকিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

বাবুরবাজারের সেই চক, যেখানে সড়কের এক পাশে নিতাই মুদীর একটা দোকান ছিল, যে দোকানে মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়া, ছাতু, গুড় আর মকাইয়ের খইয়ের মোয়া ঝুড়িভর্তি হয়ে সাজানো ছিল ; আর, বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি একটা ঝাঁপও ছিল।

সেই দোকান আজ আর নেই, যদিও সেই জায়গাটি আজও আছে ; আর, ঠিক সেই জায়গাতে নতুন একটা চায়ের দোকান পিপাসী খরিদ্দারের ভিড়ে যেমন জমাট তেমনই মুখর হয়ে রয়েছে। নিতাই মুদির এই চায়ের দোকানের নাম প্রাণতোষ রেস্টুরেণ্ট। তিন সারি বেঞ্চ, আর তিন সারি টেবিল। একটা কাচের আলমারিতে পাঁচটা বয়মের ভিতরে কেক বিস্কুট আর ডিম। আলমারির একটা তাকে ছোটবড় পাঁউরুটি থরে থরে সাজানো।

এই নিতাই মুদীর চেহারাটাও ঠিক সেই নিতাই মুদীর মত নয়। চিঁড়া-গুড়ের দোকানটা যেমন মরে গিয়ে আর প্রাণতোষ রেস্টুরেণ্ট হয়ে নতুন জন্মলাভ করেছে, নিতাই মুদীর পুরনো চেহারাটাও যেন তেমনই মরে গিয়ে আবার নতুন হয়ে জন্ম নিয়েছে। নিতাই মুদীর পরনে পায়জামা, গায়ে হাফ-হাতা কামিজ আর গলায় নকল রেশমের একটা চকচকে মাফলার। নিতাই মুদীর এক হাতের কনুয়ের কাছে পাঁচ ভরি সোনার একটা তাগা ঝকঝক করে ; আর এক হাতের কব্জিতে ছোট একটা ঘড়িও ঝিকঝিক করে।

বাবুরবাজার চকের সেই চেহারাও মরে গিয়ে নতুন হয়ে জন্ম নিয়েছে। চকের চার রাস্তার মাথা নানারকমের দোকানবাড়ির ভিড়ে ভারি হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সাইনবোর্ডও দেখা যায়। তা ছাড়া, সরকারী গ্রামোন্নতির একটা ব্লক অফিস। চকের সড়কের বুকটা পেট্রল গ্রীজ গীয়ার-অয়েল আর নানারকম লুব্রিকেণ্ট তেলের ছোপ আর ছাপে ভরে আছে। প্রাণতোষ রেস্টুরেণ্টের মেঝে-ধোওয়া জল যখন চকের সড়কের উপর গড়িয়ে পড়ে, তখন চকের সড়কের বুকটা রামধনু রঙের শত শত আলপনায় ভরে যায়।

প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর একটা না একটা সার্ভিস বাস, হয় এদিক থেকে, নয় ওদিক থেকে, যাত্রীর ভিড়ে ভরতি হয়ে চকের উপর এসে থামে আর চলে যায়। প্রাণতোষ রেস্টুরেণ্টের বেঞ্চ পিপাসী খরিদ্দারের ভিড়ে ভরে উঠতেই মস্ত বড় ক্যানেস্তারা জলে ভরতি করে উনানের উপর চাপিয়ে দেয় রেস্টুরেণ্টের

বয়। আর, নিতাই মন্দীও ব্যস্ত হয়ে এক-একটা পাঁউরুটিকে আদর করে আঁকড়ে ধরে ছুরি চালাতে থাকে।

প্রায় এক মাস হল, নিতাই মন্দীর প্রাণতোষ রেস্টুরেণ্টের চা-পাঁউরুটি আর ডিম-ভাজার বিক্রি প্রায় দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে, কারণ, বাবুরবাজারের চকে এই এক মাস ধরে সত্যিই বাবুদের ভিড় থই থই করছে। কখনও বড় বড় মোটর ট্রাক ভরতি হয়ে, কখনও বা পায়ে হেঁটে মিছিল করে বাবুদের এক-একটা দল যখন-তখন ছুটে এসে চকের উপর থমকে দাঁড়ায়। ভোট দাও, ভোট দাও। বাবুদের ছোট ছোট ভিড় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাঁক ছাড়ে। কত রকমের আর কত রঙের ঝাণ্ডা! চকের সড়কের চারদিকের দোকানের দেয়াল পা থেকে মাথা পর্যন্ত বড় বড় ছাপা হরপের কত রকমের আশা দাবী আর প্রতিজ্ঞার কথায় ছেয়ে গিয়েছে। চকের কাছে যত আম বট নিম আর তেঁতুলের গাছ ছবিতে ছবিতে ভরে গিয়েছে।

বাবুরবাজার চকের উপর দাঁড়িয়ে আজও দক্ষিণের দিকে তাকালে কপাল-বাবার ঘন-সবুজ জঙ্গলটাকে আর মধুকুপির ছোটকালু ও বড়কালুর নধর-নিটোল কালো-কালো ধড় দুটোকে দেখা যায়। কিন্তু সেদিন এসে পড়তে বোধ হয় আর বেশি বাকি নেই, যেদিন সারি সারি কারখানার ইমারত, উঁচু উঁচু চিমনি আর কালো ধোঁয়ার গাঢ় আবরণে বাবুরবাজারের দক্ষিণের আকাশটাকে আর স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাবে না। বাবুরবাজার থেকে শুরু হয়েছে নতুন নতুন কারখানার পত্তন। এই নতুন পত্তনের উল্লাস একেবারে ডরানির খাত পর্যন্ত না গড়িয়ে গিয়ে বোধ হয় থামবে না। সেন অ্যাণ্ড ওয়াল্টারের একটা নতুন উদ্যম এরই মধ্যে ডরানির বালুভরা বুকের এক পাশে বিরাট একটা পাম্প বসিয়ে দিনরাত ধকধক শব্দ করে জল টানতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ, সেন অ্যাণ্ড ওয়াল্টারের রেয়ার-আর্থ লেবরেটরি চালু হয়ে গিয়েছে। তারই কাছে একটা পাইপ ঢালাইয়ের কারখানাও প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে।

প্রাণতোষ রেস্টুরেণ্টের বেঞ্চিতে পিপাসী খরিদ্দারের ভিড় যখন হালকা হয়, তখন হাফ-হাতা কামিজের বুকপকেট থেকে একটা রুমাল বের করে পাঁচ ভরি সোনার তাগাটাকে মুছতে মুছতে কথা বলে নিতাই মন্দী—শুনছিস বেজা।

রেস্টুরেণ্টের বয় ব্রজবিহারী উত্তর দেয়—হুঁ আজ্ঞা।

নিতাই—ভোটের গরম তো আর তিন মাস পরেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—হুঁ আজ্ঞা।

—কিন্তু আমার তো কিছু হল না রে বেজা। দেখছিস তো, এক মাস হল দোকানের বিক্রির অবস্থা কিরকম দাঁড়িয়েছে।

—কিরকমটি আজ্ঞা?

—একেবারে যা-দশা। শুধু লোকসান আর লোকসান।

—লোকসান কেনে হবেক?

—আরে হঁ্যারে আজ্ঞা। প্রতিদিন পাঁচ-দশ টাকা করে লোকসান সহ্য করতে হচ্ছে।

—কিন্তুক, আমার মাসোহারা এইবার দু টাকা বেশি না করে দিলে চলবেক না।

—কেন?

—আমার খাটুনি যে ডবলেরও বেশি হয়ে গেছে।

—তা তো হবেই; ওরকম হয়েই থাকে; বিশ্বাস না হয়, বড় বড় কোম্পানিতে গিয়ে, ওই সেন অ্যান্ড ওয়াল্টারের মজুরদের জিজ্ঞেসা কর গিয়ে।

—কি জিগেস করতে বলছেন?

—চাকর মজুরের মেহনত ডবল হয়, কিন্তু সেজন্যেই মাইনে বাড়ে না। মালিকের মুনাফা না হলে মজুরের মাইনে বাড়বার নিয়ম নেই।

—কিন্তু মুনাফা হয় না কেন, আজ্ঞা?

হেসে ওঠে নিতাই মুদী—সেটা হলো কপাল। আমার কপাল আর তোর কপাল। নইলে, দেখ না কেন, ভোটের বাজারে কত বেটা কত হাজার মেরে নিচ্ছে, আর আমার দিন গেলে মাত্র দশটা টাকা···দশটা টাকা স্রেফ লোকসান হয়ে যাচ্ছে বেজা।···আরে, ওটা কে রে বেজা? সেই বাঘমারা খৃস্টানটা না?

উনানের উপর ক্যানেস্তারার জল টগবগ করে ফোটে; সেই ফুটন্ত জলের বাষ্পের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে সড়কের এক দিকে একটা নিমগাছের গোড়ার দিকে তাকিয়ে বেজা বলে—হঁ আজ্ঞা। পলুস হালদার বটে।

নিতাই—কিন্তু, বেটা এই সকালবেলাতে ওখানে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?···দেখ কাণ্ড, বেটা এদিকেই যে আসছে···বেটা মাতাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে যে···ওর পা দুটো যে টলছে রে বেজা, দেখছিস না?

—হঁ আজ্ঞা।

ভুল বোঝে নি নিতাই মুদী। সেই ভয়ানক বাঘিনটার খোঁজে এই দিকে কতবার যাওয়া-আসা করেছে পলুস হালদার। কিন্তু সে তো তিন-চার সাল আগের ব্যাপার। বাঘিনটাকে দুই গুলিতে শেষ করে দিয়ে এই লোকটা থানা রেলকোম্পানি আর জমিদারবাবুদের কাছ থেকে অনেক ইনাম পেয়েছে; তবে আবার ঠিক সেইরকম একটা বাঘিন-মারা আক্রোশ কেন শিকারীটার চোখে ছটফট করছে? কি খুঁজছে পলুস হালদার?

হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে আর চক পার হয়ে উধাও হয়ে গেল পলুস হালদার। আবার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে চকের উপর একটা গাছের ছায়ার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার, চকের পুবের সড়কটা ধরে বনবন করে সাইকেল চালিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। কিন্তু আবার, পাঁচ মিনিট পার না হতেই ফিরে এসে চকের বাস-স্টপের কাছ থেকে একটু দূরে, প্রাণতোষ রেস্টুরেণ্টের ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস হালদার।

নিতাই মুদী বিড়বিড় করে—আমার যে কেমন সন্দেহ হচ্ছে, বেজা।

—কেনে আজ্ঞা ?

—শিকারীটা ছুটোছুটি করছে কেন ? কি মনে করেছে বেটা ? এই চকের উপর দিয়ে এই সকালবেলাতে নতুন একটা বাঘিন পাস করবে ?

বেজাও সন্দিগ্ধভাবে পলুসের সেই রুক্ষ চেহারা আর মাতাল চোখের ছটফটে চাহনির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে—দুশমনের খোঁজ লিবে মনে হয়।

—দুশমন ? ওর দুশমন আবার কে ? এই বেটাই তো মধুকুপির দাশু কিষাণের দুশমন ? তুই সে খবর জানিস তো বেজা ?

—হুঁ আজ্ঞা ; দাশুর ঘরণীকে ঘরের বার করে বিহা করেছে পলুস।

—তবে···তবে আবার···।

হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে পলুসের কাছে দাঁড়িয়ে একগাল হাসি হাসে নিতাই মুদী : এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন হালদার ?

চমকে ওঠে পলুস ; নিতাই মুদীর দিকে কটমট করে তাকায়। নিতাই বলে—দোকানে এসে বসো। চা-পাঁউরুটি খাও। চাও তো ডিমভাজা, কলিজার ঘুঘনি আর···।

পলুস বলে—একটা খোঁজ দিতে পারেন ?

—কিসের খোঁজ ?

—হারানগঞ্জের সিস্টার দিদি এই পথে গেছেন কি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ঘণ্টা দুই আগে ওই দোকানের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লেকচার দিলেন, তারপর ওইদিকে চলে গেলেন···।

পলুস—জামুনগড়ার দিকে বটে কি ?

নিতাই—তাই তো মনে হয়।

পলুস জোরে একটা শ্বাস ছেড়ে যেন আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায় : তবে ঠিক আছে। এই পথেই নিশ্চয় ফিরবেন সিস্টার দিদি।

নিতাই মুদীর সন্দিগ্ধ চোখ দুটো এইবার একটা অবুঝ ভয়ের আবেশে ফ্যালফ্যাল করতে থাকে। তারপর চমকে ওঠে। হারানগঞ্জের সিস্টার দিদি আসছে। প্রায় কাছে এসে পড়েছে। সেই নীল রঙের সাইকেলের ঘণ্টি মিষ্টি শব্দ করে বাজছে। সেই নীল চোখ জ্বলজ্বল করে হাসছে।

একটা লাফ দিয়ে সড়কের ঠিক মাঝখানে এসে, আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সিস্টার দিদির পথ আটক করে পলুস হালদার। সিস্টার দিদির নীল চোখে ছোট একটা ভ্রুকুটি শিউরে ওঠে। কিন্তু সাইকেল থেকে নেমেই মিষ্টি করে হেসে ওঠেন সিস্টার দিদি—তুমি কবে ঘরে ফিরলে পলুস ?

পলুস—অনেক দিন।

সিস্টার দিদি আশ্চর্য হন—অনেক দিন ? তবে···তবে জোহানা কেন···।

পলুস হাসে—তবে জোহানা কেন আজও তোমার কনভেণ্ট বাড়িতে থাকে দিদি ? ঘরে যায় না কেন ?

সিস্টার দিদি—আমি তো সেই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

পলুসের চোখের তারা জ্বলে ওঠে—আমিই তোমাকে সেই কথা শুধাচ্ছি

তুমি জবাব দাও দিদি।

সিস্টার দিদি ভ্রূকুটি করেন—তুমি সরাব পান করেছ পলুস ?

পলুস—মাপ কর দিদি, তুমি আমার চেয়েও কত ভাল সরাবীকে মাপ করে থাক, সে আমি জানি।

—তুমি জঙ্গলের মানুষের মত কথা বলবে না পলুস।

—কিছু বলতে চাই না দিদি ; শুধু বিচার চাই।

—কিসের বিচার ?

পকেটের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করে সিস্টার দিদির হাতের কাছে এগিয়ে দেয় পলুস—এটা কি বলে ?

—কি ?

—আদালতের নোটিশটা কি বলে, একবার পড় না কেন দিদি।

সিস্টার দিদি কাগজটাকে পড়তে গিয়েই চমকে ওঠেন। পড়া শেষ করে একেবারে নীরব হয়ে পলুসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পলুস—এইবার বল, দিদি। আমাকে ছাড়তে চায়, বিয়া রদ করাতে চায়, আদালতে দরখাস্ত করেছে জোহানা। এমনটি কেন হয়, দিদি ?

উত্তর না দিয়ে আর আদালতের নোটিশটাকে পলুসের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন সিস্টার দিদি।

পলুস—তুমি বিচার কর দিদি।

সিস্টার দিদি—জোহানা শিশু নহে ; উহার এইসব ইচ্ছার বিচার আমার কাজ নহে।

—কিন্তু ঘরণীতে ঘরের বড় সাধ যাচে কেন ? সাধ বাড়ে কেন ? এমনটি হলে মানুষের ঘর বাঁচবে কিসে ? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

এরই মধ্যে ছোট একটা ভিড় এসে বাবুরবাজার চকের এই অদ্ভুত ঘটনাকে ঘিরে ফেলেছে। হারানগঞ্জের সিস্টার দিদিকে এরকম অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে পথের উপর থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনদিনও দেখা যায় নি। সিস্টার দিদির নীল চোখের জ্বলজ্বলে হাসি কোনদিন এরকম নিভু-নিভু হয়ে যায় নি। এভাবে আনমনার মত আর ভয়-পাওয়া চাহনি নিয়ে সিস্টার দিদিকে তাকিয়ে থাকতেও কোনদিন কেউ দেখেনি।

—এমনটি কেন হয় ? জবাব দাও দিদি।

সিস্টার দিদির গলার স্বর বিকল ঘণ্টির আওয়াজের মত ঘড়ঘড় করে : জবাব জানি না।

—তাই বল দিদি ! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস। সাইকেল আর বন্দুকের সঙ্গে টলমলে রুক্ষ চেহারাটাকে সেই মুহূর্তে সড়কের একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সিস্টার দিদির পথ অবাধ করে দেয়। ছোট ভিড়টাও ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। একটা অবুঝ বিস্ময়ের প্রশ্ন ভিড়ের মুখে মুখে বাজতে থাকে।—কি বটে হে ?··· পলুস হালদার সিস্টার দিদিকে ডাঁটে কেন হে ?···এ কেমন তামাসা বটে গো ? ··খাদের কলঘরের মিস্তিরীটা মস্করা করে হাসে কেন ? আর সিস্টার

দিদি এত ডরে ডরে তাকায় কেন ?

সিস্টার দিদির সাইকেল-চড়া মূর্তিটা ততক্ষণে হারানগঞ্জের সড়ক ধরে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। সিস্টার দিদির মাথায় সাদা চুলের খোঁপা রূপোর সুতোর স্তবকের মত কাঁপতে কাঁপতে আর সকালবেলার আলোতে চিকচিক করতে করতে চলে যাচ্ছে। সেই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সাইকেলের উপর লাফ দিয়ে উঠে বসে পলুস হালদার।

সিস্টার দিদির পিছু ধাওয়া করবে বুঝি মিস্তিরীটা !

না ; সোজা ভুবনপুর রোডের গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে যেন খাঁচাছাড়া চিতাবাঘের মত একটা ছুটন্ত আহ্লাদের আবেগে সাইকেল চালিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে পলুস হালদার। নিতাই মুদী ঠোঁট পাকিয়ে হাসে ঃ বড় জব্দ হয়েছে বেটা !

পর মুহূর্তেই চেঁচিয়ে ওঠে নিতাই—জল চাপা, শিগগির, এক ক্যানেস্তারা জল উনানে চাপিয়ে দে বেজা। গোবিন্দপুরের মেল বাস এসে পড়েছে।

একটা ভোটের মিছিলও এসে পড়েছে। গোবিন্দপুর স্কুলের ছেলেরা আছে, অনেকগুলি ছোকরা বাবুও আছে ; বিশ-পঁচিশটা ঝাণ্ডাও দুলছে।

ভোট দাও ! ভোট দাও ! পাঁচ মিনিট ধরে চড়া গলার হাঁক ছাড়বার পর মিছিলের বুকের ভিতর থেকে একটা হারমনিয়মের পাতলা ও মিঠা স্বরের আওয়াজ উথলে ওঠে। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে থাকে মিছিলের ছেলেরা আর বাবুরা।

দেশের মুক্তি হয়ে গেল যদি, মাটির মুক্তি চাই। শুন হে কিষাণভাই। তোমার সুখেতে সকলের সুখ, এ কথাটি জানা চাই। মাটির মানুষ কেউ হয় যদি, সে মানুষ তুমি ভাই। এ মাটি তোমার মাটি, জেনে নাও খাঁটি, মোরা তোমাদের সুখ চাই।

প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের মালিক নিতাই মুদী চুপ করে দাঁড়িয়ে আজকের বিক্রির আশা আর আনন্দটাকে কল্পনায় হিসাব করতে থাকে। মিছিলের হাঁক লেকচার আর গান কোনমতে একবার শেষ হলেই হয়। ওই মিছিলটাই তখন ব্যাকুল হয়ে প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকবে। কাঁচের আলমারির ভিতরে সাজানো পাঁউরুটির স্তূপ আর ডিমভরা বয়ম দুটোর দিকে তাকিয়ে হিসেব করে নিতাই, সব ফুরিয়ে যাবে নিশ্চয়। এত বড় মিছিল অনেক দিন পরে এসেছে।

মেল বাস থেকে যে পাঁচজন যাত্রী নেমেছে, তাদের মধ্যে চারজন এদিকেই আসছে ; কিন্তু একটা যাত্রী···আরে, ওটা কে রে বেজা ? ওটাকে যে মধুকুপির সেই দাগী দাশু বলে মনে হয়।

হ্যাঁ, সেই দাশু ঘরামি। গাড়ি থেকে নেমে এমন সুন্দর প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের দিকে না তাকিয়ে মিছিলটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু।

মিছিলটার কাছাকাছি এসে পথের একপাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু। হাতে ছোট একটা কম্বলের পোঁটলা ; গায়ে নতুন গেঞ্জি আর পরনে একটা

নতুন কোরা ধুতি। গোবিন্দপুর জেল থেকে ছাড়া-পাওয়া দাশু কিষাণের আত্মাটা যেন বাবুরবাজারের চকে নেমেই একটা সুন্দর কুহকের শোভা আর শব্দের স্বাদে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। গান গাইছে মিছিলটা ; আর শুনতে শুনতে দাশু কিষাণের চোখ দুটো চিকচিক করে উঠছে।

গান থামল। মিছিলের জমাট ভিড়টাও ভেঙে এলোমেলো হয়ে প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের দিকে ছুটে এল। যা ভেবেছিল নিতাই মুদী, তাই হল। রেস্টুরেন্টের সব রুটি, সব বিস্কুট, আর সব ডিম শেষ হয়ে গেল। মিছিলের ছেলেরা আর বাবুরা আবার ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়ায় ; হাঁক ছেড়ে রঘুনাথপুরের দিকে চলে যায়।

টাকা-পয়সা গেঁজের ভিতরে ভরে নিয়ে আর কোমরে গুঁজে আবার যখন রুমাল দিয়ে সোনার তাগা মুছতে থাকে নিতাই, তখন আবার চোখে পড়ে, কী আশ্চর্য, মধুকুপির সেই দাগী দাশু যে চকের সড়কের একপাশে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

—ওহে দাশু ! চেঁচিয়ে ডাক দেয় নিতাই।

চমকে ওঠে দাশু ; নিতাই মুদীকে চিনতে না পেরে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিতাই—তুই তো মধুকুপির দাশু ; আমাকে চিনতে তোর এত দেরি হয় কেন রে ?

এইবার চিনতে পারে দাশু ; আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে বিড়বিড় করে —এ সব কি বটে নিতাই দাদা ?

—এটা আমার দোকান।

—বড় ভাল দোকান ; কিন্তু সে-কথা শুধাচ্ছি না।

—কি শুধাচ্ছিস ?

—ওরা যে গীত গেয়ে গেল, সেটা কি বটে ?

—ভোটের গীত।

—সে তো জানি ; কিন্তু...।

—কিন্তু আবার কি ?

—কিষাণদিগের জমি হবে আর সুখ হবে, মাটির মালিক হবে কিষাণ। এমন কথা বলে কেন ওরা ? হবে কি, নিতাই দাদা ?

—হবে বইকি। তোমাদেরই তো রাজত্ব হবে দাশু। সরকার আইন করেছে, জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে তোমাদের দেবে। আর আমরা শুধু চায়ের জল গরম করে করে...।

দাশু—তুমি মজা করছো না তো, নিতাই দাদা ?

নিতাই—তুমি কি আমার ইয়ে যে, তোমার সঙ্গে রস করবো আমি ?

দাশুর চোখ দুটো জলে ভরে গিয়ে ছলছল করে ওঠে। নিতাই মুদীও চমকে ওঠে—এ কি, তোকে আমি কী এমন খারাপ কথা বললাম যে, কেঁদে ফেললি দাশু ?

—খারাপ কথা নয়। এমন ভাল কথা কভি শুনি নাই।

নিতাই মুন্দী গম্ভীর হয়ে বিড়বিড় করে—হ্যাঁ, আমিও আমার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে এমন অদ্ভুত কথা শুনি নি। সদরে গিয়ে এম-এল-এ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি; সেটেলমেণ্টের কাছারিতে গিয়ে খবর নিয়েছি। সকলেই তো ওই একই কথা বলছে। যারা জমি চষবে, তাদেরই জমি হবে; আইনও নাকি প্রায় হয়েই গিয়েছে।

হেসে ওঠে দাশুর ছলছল চোখ দুটো—ভাল সুখের খবর বটে।

ডিবে থেকে সিগারেট বের করে হেসে ওঠে নিতাই: কিন্তু সত্যি একটা মজার খবর আছে দাশু। শুনলে খুশী হবি।

—বলেন।

—শিকারীটা জব্দ হয়েছে।

—কে? পলুস হালদার?

—হ্যাঁ রে, সেই পলুস হালদার, তোর সেই দুশমনটা।

—কি হয়েছে?

—যাকে তোর কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছিল, সে আবার ওকেই ছেড়েছে।

—ঠিক কথা বল, নিতাই দাদা। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—ঠিক বলেছি, দাশু। এসব কথা মিথ্যে করে বলবো কেন? কিন্তু তুই কি…। তোর তিন বছরের মেয়াদ পুরো হয়েছে কি? না, জেল থেকে ভেগে এলি?

দাশু হাসে—না; কপালবাবার দয়াতে কিছু আগেই ছাড়া পেয়েছি।

—কেন?

—জেলের কম্বলের গুদামে আগুন লেগেছিল। আমিই সে আগুন ঠাণ্ডা করেছিলাম। তাই এক মাসের মেয়াদ মাপ হয়ে গেল।

—ইনাম পাস নি?

—পাঁচ টাকা পেয়েছি।

—তবে তো এখন পেট ভরে রুটি আর ডিম-ভাজা খেতে পারিস।

—ছিয়া ছিয়া!

ভ্রূকুটি করে নিতাই—তার মানে?

দাশু হাসে—ওসব চিজ মুখে নিতে বড় লাজ লাগে। হ্যাঁ·· চার আনার চিঁড়া-গুড় দিবেন কি?

নিতাই—না। এসব চিজ আমি রাখি না।

দাশুর দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে চকের দিকে তাকায় নিতাই মুন্দী। তখনই চেঁচিয়ে ওঠে—জল চাপা, জল চাপিয়ে দে বেজা; ঝালদার বাস এসে পড়েছে।

আর, দাশু ঘরামির পাথুরে ছাঁদের চেহারাটা যেন নেচে ওঠে। একটা লাফ দিয়ে উঠে যায় দাশু। চক পার হয়ে চলতে চলতে দূরের আকাশের দিকে

তাকায়। হ্যাঁ, ওই তো কপালবাবার জঙ্গল ; ওই তো মধুকুপির ছোটকালু আর বড়কালু। বুকের ভিতরেও যে সত্যিই মাদলের বোল বাজছে—মুরলী, মুরলী!

জমি আসবে, মুরলীও আসবে! হে কপালবাবা, কত ভাল বিচার তোমার। কলঘরের মিস্তিরীর ঘর থেকে কে জানে কেমন কান্না নিয়ে আবার ছুটে আসছে মুরলী। মুরলীর কোলেতে ছেইলাটা আছে তো কপালবাবা?

কিন্তু তার আগে যে জমি পাওয়া চাই। পাঁচ বিঘা দো-আঁশ কানালীর জমি। সরগুজা বুনে দিলে দুই মাসের মধ্যে হলদে ফুলে ছেয়ে যাবে ক্ষেত। গুলঞ্চের বেড়াতেও ফুল ধরে যাবে নাকি?

মধুকুপির দিকে অনেক দূরে এগিয়ে আসার পর যখন ডরানির জল দেখা যায়, তখন দাশুর শুকনো গলার পিপাসাটা যেন আপনিই ভিজে যায়। আট আনা খরচ করে বাবুরবাজারের ভাঁটিতে বসে হাঁড়িয়া খাওয়ার সাধ ছিল ; কিন্তু জমি আর মুরলীর মুক্তির খবর শুনে বুকের ভিতরটা আশায় মাতাল হয়ে হাঁড়িয়ার নেশা নেবার ইচ্ছাটাকেও ভুলিয়ে দিয়েছে।

লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে থাকে দাশু। গাঁয়ে পৌঁছে গিয়ে জাম কাঠের সেই জীর্ণ দরজার কপাটের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে, বড় বুড়া রতনের কাছে গিয়ে একটা বিপুল খুশির হাঁক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে দাশু—তোমরা কি শুন নাই বড় বুড়া, জমি আসবে, মুরলীও আসবে? কপালবাবার কাছে সাদা ছাগ বলি দাও।

আর কতদূর?

আর বেশি দূর নয়। বাবুরবাজারের পুলিস ফাঁড়িটা ছাড়িয়ে মধুকুপির অনেক কাছে চলে এসেছে দাশু। ফুরফুরে বাতাসের ছোঁয়া এইবার দাশুর চোখে-মুখে আর মাথার উপর যেন একটা ফুরফুরে মিষ্টি গন্ধের ছোঁয়া ছড়িয়ে দিতে থাকে। মহুয়াতে ফুল ধরেছে বুঝি।

কিন্তু দল বেঁধে ওরা কারা হনহন করে গাঁয়ের দিক থেকে এই দিকে হেঁটে আসছে? হাতে ছোট ছোট ঝুলি আর লাঠি ; মাথার উপর ছোট ছোট বোঝা, দলটা যেন কারও উপর রাগ করে ছুটে আসছে।

দলটা কাছে এগিয়ে আসতেই দলের সবার আগের মানুষের মুখটাকে চিনতে পারে দাশু, সুরেন মানঝির মুখ। কিন্তু সুরেনের গম্ভীর মুখে যেন একটা গম্ভীর আক্রোশ থমথম করছে।

—কি বটে সুরেন? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—গাঁয়ে ফিরেছিলাম, কিন্তু আবার গাঁ ছেড়ে চললাম দাশুদাদা। চেঁচিয়ে ওঠে সুরেন।

দাশু আশ্চর্য হয়ঃ কেন গাঁয়ে ফিরে এলে, আবার কেনই বা চলে যাও?

—কয়ল-খাদে ছাঁটাই হল। কত মালকাটা গাঁয়ে ফিরে গেল। আমরাও এলাম। কিন্তু…।

দাশুর প্রাণের ভিতরটা যেন হো-হো করে খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠে। কয়লা-খাদ কত সুখের ঠাঁই, কত বড় গলা করে এই সুরেনই না কথাটা বলেছিল। খাদের কয়লা আজ ওদের সুখের আশাকে কালো করে দিয়েছে। কাজ নাই। ভুখা পেট নিয়ে আবার মধুকুপির মাটিতে ফিরে আসতে হয়েছে।

দাশু হাসে ঃ কিন্তু, কি বটে সুরেন? আবার কোথায় চললে?

—সদরে যাব।

—কেন?

—দিনমজুরী করবো।

—ছিয়া সুরেন!

সুরেনের চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে ঃ ছিয়া তোমার গাঁ।

—কেন? দাশুর গলার স্বর গরগর করে।

সুরেন বলে—তোমার সাথে আমার ঝগড়া নাই দাশুদাদা; ওসব কথা ছেড়ে দাও, আর পার তো আমার একটা উপকার কর।

দাশুর গলার স্বর যেন লজ্জিত হয়ে আর হঠাৎ-মায়ার আবেশে নিবিড় হয়ে যায় ঃ বল না কেন সুরেন?

—আমি দুই দিন খাই নাই।

—কেন? কেন? দাশুর গলার স্বর ফুঁপিয়ে ওঠে।

সুরেন—সে-কথা আর শুধাও কেন? এখন পার যদি তবে আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দাও।

—পাঁচ টাকা! চমকে ওঠে দাশু। কি ভয়ানক হিসেব করে টাকা চেয়েছে সুরেন! সুরেনের দাবীটা যে দাশুর অদৃষ্টের শেষ সম্বল লুঠ করে নিতে চায়।

সুরেন বলে—একদিন আমিও তোমাকে দশ টাকা ধার করে দিয়েছিলাম দাশু দাদা, সে কথা ভুলে যাও কেন?

না, ভুলতে পারে না দাশু; এই সুরেন মাঝি সেদিন দশ টাকা ধার দিয়েছিল বলে দাশুর মুরলী সেদিন ভাত খেতে পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল, আর মুরলীর পেটের ছেইলাটা, দাশুর জীবনের মায়াময় সাধটাও হঠাৎ-মরণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

—এই নাও। কোমরের ধুতির গোঁজের ভিতর থেকে পাঁচটা টাকা বের করে সুরেনের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় দাশু। আশ্চর্য হয়ে দাশুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সুরেন। তারপর চলতে থাকে।

মাঝিদের দলটা হনহন করে হেঁটে গাঁ-ছাড়া আক্রোশের মত দূরে চলে যায়। দাশুও একটা করুণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মধুকুপির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

ডরানির বালুভরা বুকের উপর বড় দহটা এইবার বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাজ্জব বটে! দহের কিনারায় বক বসে নেই কেন? দহের

জল চিকচিক করে না কেন? ওই তো ডরানির সেই দহ, যার জলে মৌরলা আর কুরচিবাটা মাছের ঝাঁক ছটফট ক'রে খেলা করত। ক্ষেতের কাজ সেরে ঘরে ফিরে যাবার সময় ওই দহের জল গামছা-ছাঁকা করে কতবার মৌরলা আর তিতপুঁটি তুলেছে দাশু। সেই দহের জল দেখা যায় না। অন্ধের চোখের কোটরের মত শুকনো হয়ে পড়ে আছে ডরানির বড় দহ। তবে কি গত শাওনেও আকাশটা শুধু মরা মেঘে ছেয়েছে আর খরাতে পুড়েছে? ডরানির বুকে ভাদুয়া ঢল নামে নাই কি?

ডরানির ছুটকো স্রোতের উপর লোহা-বাঁধানো সেই পুলটা। কত রোগা হয়ে গিয়েছে স্রোতটা। এ কি? কপালবাবার জঙ্গলটার এমন দশা কেন? জঙ্গলের চেহারা থেকে সব সবুজ যেন মর-মর হয়ে ঝরে পড়েছে; জঙ্গলের ছায়াও আর ঠিক সেই রকমটি কালো-কালো নয়। মনে হয়, আরও আধ ক্রোশ দূরে সরে গিয়েছে কপালবাবার জঙ্গল।

আর, ওই তো মধুকুপি। মানঝিপাড়ার ঘরগুলি দেখা যায়। জাহিরথানের কাছে রিঠাগাছের যে ভিড়টা ছিল, সেটাও দেখা যায়। কিন্তু কেমন যেন মর-মর চেহারা। জাহিরথানের কাছে গাঁয়ের মুখিয়া রতনের গরু-ঘরের যে একচালাটি ছিল, সেটা নেই কেন? সেখানে শুধু তিনটে খুঁটো দাঁড়িয়ে আছে কেন? রতনের গরু দুটো কি মরে গিয়েছে?

বাবু দুখন সিংহের বাড়ির চালার টিন রোদ লেগে ঝকমক করে; আর ঈশান মোক্তারের কুঠি ও ভাণ্ডারের গা টাটকা চুনকামের আনন্দে ধবধব করে। ওরা ভাল আছে, বেশ সুখে আছে মনে হয়। কিন্তু কিষাণ মনিষদের ঘরগুলি শুকনো জঞ্জালের মত দেখায় কেন? ঘরে কি মানুষ থাকে না? চালার খড় যেন খাবলা দিয়ে কেউ তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। মাটির দেয়ালে ঘা হয়ে ধুলো ঝরছে। কিষাণের ঘরের মাগ আর বেটিগুলা কি সব পালিয়ে গিয়ে খাদের ময়লাকামিন হয়ে গিয়েছে? মাটির দেয়ালে কাদা গোবর নিকায় না কেন ওরা?

মধুকুপির ধানক্ষেত। চোখ পড়তেই ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দাশুর চোখ। ধানক্ষেতের শুকনো খটখটে মাটির উপর যে আগাছা হলদে হয়ে মরে পড়ে আছে, সে আগাছা সত্যিই আগাছা নয়। রোপাই-করা ধানের দেড় হাত ফুরতি যেন একটা সর্বনাশের বিষের জ্বালায় মরে গিয়ে আর একেবারে খড় হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মরাধানের এই খড়ে কোন স্বাদ নেই বুঝি, তা না হলে গরুতে এখনো এগুলোকে সাবাড় করে নি কেন?

চলতে চলতে পুবের ডাঙার ঢালুটা শেষ দিকে মাটির উপর একটা সবুজ শোভার দিকে চোখ পড়তেই দাশু কিষাণের চোখের চাহনি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ওই ভিজা জমিটা যে বড় ভাল দো-আঁশ কানালি বটে। ঈশান মোক্তারের কুঠি ওই জমিতে প্রতি বছর পঞ্চাশ মনিষের মেহনত লাগিয়ে যে আউশ আর আমন তোলে, তাতেই যে ভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক ধানে ধানে ভরে যায়।

না, মরে নি মধুকুপির মাটি। মধুকুপির মাটির প্রাণের জোর নিজের

চোখে একবার দেখে নিয়ে মনের দুঃসহ সন্দেহটাকে মিথ্যে করে দেবার জন্য পুবের ভাঙ্গার ঢালুর দিকে ছুটে যায় দাশু। কিন্তু ক্ষেতের কাছে এসে একটা আলের উপর দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। এইবার চোখে পড়েছে দাশুর; এই সবুজ ধানক্ষেতও একটা জঞ্জালের শ্মশান। ধানের কাঁচা শিস তুঁষ হয়ে গিয়েছে। মাজরা লেদা আর শুঁয়া—পোকা পোকা পোকা—ধানের দুশমনের ক্ষুধা মধুকুপির ক্ষেতের আনন্দ লুটপাট করে খেয়েছে। ধানের পাতায় ঘা; শিরকাঠি এরই মধ্যে কুটো হয়ে গিয়েছে। হে কপালবাবা, গাঁয়ের মাটিকে এমন সাজা দাও কেন? কিষাণেরা বাঁচবে কেমন করে? ছেইলা কোলে নিয়ে মুরলী যদি গাঁয়ে ফিরে এসে গাঁয়ের মাটির এমন দশাটি দেখে, তবে সে যে আবার ডরাবে আর চলে যাবে গো কপালবাবা!

ফিরে গিয়ে আবার সড়ক ধরে চলতে থাকে দাশু। দাশুর ভয়-পাওয়া চোখ দুটো এইবার আস্তে আস্তে করুণ হয়ে ছলছল করতে থাকে। বুকের ভিতরে একটা অভিমান গুনগুন করে কাঁদছে, যেন মধুকুপির মরামাটির কান্না শুনতে পেয়েছে দাশু। মধুকুপির মাটির জন্য এই দুনিয়ার কারও মনে কোন মায়া নেই। আকাশের হাতিয়া তারাও বোধহয় মধুকুপির মাটিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। তা না হলে, এত ভাল মাটি একটু জল পায় না কেন? আর··· মনে করতে পারে দাশু, এই তো কিছুক্ষণ আগে বাবুরবাজারের ফাঁড়ি পার হয়ে এইদিকে আসতে আসতে মাঝপথের একজায়গায় দাঁড়িয়ে মাটি-চালানী কোম্পানিটার যে কাণ্ডকারখানা নিজের চোখে দেখতে পেয়েছে। ডরানির বালুভরা বুকের উপর বিঁধ দিয়ে কোম্পানির কলটা কত জল তুলে একটা নালার ভিতরে গড়িয়ে দিচ্ছে। কারখানাটার দিকে কলকল করে কী সুন্দর জলের ঢল নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে! কে জানে, এত জল নিয়ে কার কপালে ঢালবে ওরা? শুধু মধুকুপির মাটি জল বিনা পিয়াসের জ্বালায় জ্বলে আর মরে।

বাঁশঝাড়ের কটকট শব্দময় দোলানির ছায়া পার হয়ে একটা ঘরের কাছে জীর্ণ জামকাঠের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায় দাশু। বুকের ভিতরে অভিমানের গুঞ্জনটা এইবার তীব্র একটা আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে।—আঃ, এ তোমার কেমন দয়া বটে কপালবাবা!

দরজার একটা কপাট কাত হয়ে ঝুলে রয়েছে। দরজার দু পাশের দেয়ালে শিয়ালের উৎপাতের চিহ্ন। দাশুর জীবনের একটা স্বপ্নালু আদরের ছবিকে একলা পেয়ে কেউ যেন আঁচড়ে কামড়ে আর তছনছ করে চলে গিয়েছে। দেয়ালের দু জায়গায় দুটো বড় গর্ত। হায় রে কিষাণের ঘর! ঘরের এমন দশা দেখলে যে আবার ঘিন্না করে চলে যাবে মুরলী।

আস্তে আস্তে হাত তুলে দরজার একটা কপাট ঠেলে দিয়ে ঘরের ভিতরের শূন্যতার দিকে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে তাকিয়ে থাকে দাশু। তারপর ফুঁপিয়ে ওঠে। না, তুই আয় মুরলী। ছেইলাটাকে কোলে নিয়ে এখনই চলে আয় না কেন? এ ঘরের এমন দশা আর ঢের দিন থাকবে না। জমি যদি হবে, তবে সবই যে হবে। ঘরটাকে নতুন মাটি দিয়ে ভাল করে নিতে কতদিন লাগে?

ঘরের ভিতরে ঢুকে চোখ মোছে দাশু। এইবার দেখতে পায়, মেঝের উপর মাটি কামড়ে পড়ে আছে মরচে-পড়া টাঙ্গিটা। দাশুর সারা জীবনের মেহনতের সঙ্গী সেই চকচকে টাঙ্গিটাও যেন এই তিন বছরের অবহেলার দুঃখে মর-মর হয়ে গিয়েছে।

টাঙ্গিটাকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে দাওয়ার উপর বসে দাশু। একটা নুড়ি তুলে নিয়ে এসে টাঙ্গিটাকে ঘষে ঘষে মরচে ছাড়াতে থাকে। দাশুর কপালের রগ ফুলে ফুলে নাচতে থাকে। যেন হঠাৎ আবার এক দুরন্ত আশার প্রেরণা পেয়ে দাশু কিষাণের প্রাণ আবার একটা জেদ ধরতে শুরু করে দিয়েছে। জমি যখন পাওয়া যাবে, তখন আর এত ডর কিসের? নুড়ি দিয়ে ঘষে ঘষে যেন কঠোর একটা অদৃষ্টের মরচে ছাড়াতে থাকে দাশু।

এখন শুধু একটা কাজ চাই। টাঙ্গিটাকে কোলের উপর শুইয়ে রেখে সড়কের নিমের ছায়াটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু। ঈশান মোক্তারের মনিষ হয়ে খাটতে ইচ্ছা করে না; বড় গুমস্তা, সেই জল্লাদটা, দুখনবাবু যার নাম, সে কি দাশু কিষাণকে মধুকুপির কোন ক্ষেতের মাটি আর ছুঁতে দিবে? কভি না। সুরেন মানঝির মত রাগ করে গাঁ ছেড়ে সদরপানে দিনমজুরী খাটতে যাওয়াও চলে না। চলে যেয়ে লাভ নেই। না, কিষাণ মানুষ কুলি হবে কেন? খাদের কাজেও ঠোকর আছে। ছাঁটাইয়ের মার খেয়ে আবার ভুখা কুকুরের মত গাঁয়ের পানে ফিরে আসতে হয়।

কিন্তু কাজ কই? দাশু কিষাণের পাথুরে বুকের সব আশা আর দুঃসাহস আবার ভীরু হয়ে দুরদুর করে কাঁপতে থাকে। এত ভাল মধুকুপির মাটিতে কাজ নেই কেন গো কপালবাবা? গোবিন্দপুর জেলখানার এতটুকু ক্ষেত আর বাগিচা যদি এত দিতে পারে, তবে···।

কি ভেবে ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় দাশু। কাজ আছে নিশ্চয়। তা না হলে বড় বুড়া রতন আর সনাতন লাইয়া বেঁচে আছে ও গাঁয়েতেই আছে কেমন করে?

কিন্তু ওরা আছে কি? গাঁয়ের মুখিয়া রতনও কি সুরেন মানঝির মত গাঁয়ের মাটিকে ঘিন্না করে চলে গিয়েছে?

গাঁয়ের কিষাণগুলো সত্যিই আছে কি নাই? ভয়ানক সন্দেহের ধুলো যেন দাশুর ফ্যালফ্যালে চোখের উপর ছিটকে পড়ছে। সত্যিই তো, এখন পর্যন্ত এই পথ দিয়ে গাঁয়ের একটা মানুষকেও যেতে দেখা গেল না। মহুয়াতে নতুন ফুল ধরেছে, এখন তো আখড়াতে মাদলের বোল আর ঝুমুরের গান বেজে ওঠবার সময়। কিন্তু কই, মাদলের শব্দ দূরে থাকুক, গাঁয়ের কোন দিক থেকে মানুষের হাঁকডাকের একটা ছোট শব্দও শোনা যায় না।

এ কেমন রহস্য! এ আবার তোমার কোন্ রাগের খেলা গো কপালবাবা? জাতপঞ্চ কি আর নাই? গরুচরানী জগমোতি কালিমণি আর বুধনিও কি নাই? গত করমে কি ওরা খোঁপাতে ফুল ঠাসে নাই, হলুদে ছোপানো শাড়ি পরে নাই, আর মহুয়ার নেশাতে মাতোয়ালা হয়ে সারা রাত নাচে নাই?

দাওয়া থেকে নেমে দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে দাশু। আর, রতনের ঘরের কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে—কোথায় গেলে গো কাকা ?

কোন সাড়া নেই। রতনের ঘরের দরজায় হুড়কো টানা রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে দাশুর চোখের আতঙ্ক ছলছল করতে থাকে। বুড়োর যে ছোট ছোট দুটো নাতিও ছিল ; ওরা ঘরে নাই কেন ?

একটু দূরে ভেরেণ্ডার বেড়া দিয়ে ঘেরা যে ঘরের দরজার কাছে একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে, সেটা হল সনাতন লাইয়ার ঘর। চেঁচিয়ে ডাক দেয় দাশু—সনাতন হে !

ছাগলটার পিঠের কাছে সাদা চুলের জঞ্জালে ছাওয়া একটা মাথা ঠকঠক করে নড়ে ওঠে। সনাতনের মা বটে কি ?

হ্যাঁ, তাই ; দাশু কাছে এসে দাঁড়াতেই সনাতনের মা বলে—ওরা ঘরে নাই গো।

—কেন ?

—উয়ারা খাটতে গেলছে।

—কোথায় গেল ?

—হোই জামুনগড়ার ডাঙা পানে।

—গাঁয়ের সব মানুষ গেছে কি ?

—হ্যাঁ গো ; সে-কথা আর শুধাও কেনে ? আমার দাদুয়াটাও গেল।

—সে কি গো দাদী ! সনাতনের ছেইলাটাও যায় কেন ? ওটা তো একটা বাচ্চা বটে গো।

—হ্যাঁ গো, সাত বছর বয়স হলো উয়ার।

সনাতনের সাত বছর বয়সের বাচ্চা ছেলেটাও জামুনগড়ার ডাঙাতে খাটতে চলে গিয়েছে। এ কি অদ্ভুত কথা বলছে দাদী বুড়ী ? গাঁয়ের সব বুড়ো জোয়ান আর বাচ্চা গিয়ে কাজের উৎসবে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, তবে বুড়ীর গলার স্বরে ক্ষীণ হাহাকারের মত একটা আওয়াজ মিছা ঠক্‌ঠক্‌ করে কেন ?

দাশু বলে—গাঁয়ের বেটিগুলাও গেছে কি ?

—হ্যাঁ গো। সনাতনের মা'র মাথাটা কেঁপে কেঁপে আবার সাদা চুলের জঞ্জাল কাঁপাতে থাকে—সব সব ; বউ বিটি বহিন, সব গেলছে।

এক মুঠা ভেজা ছোলা মুখের ভিতর ফেলে দিয়ে সনাতনের মা বলে—সাঁঝের পর উয়ারা গাঁয়ে ফিরবেক।

এ কেমন কাজ ? দাশুর বুকের ভিতর থেকে একটা খুশির চিৎকার ঠিকরে বের হতে চায়। সারা গাঁয়ের মানুষ খাটবার কাজ পেয়ে গেল ; তুমি কত দয়া জান, তোমার পাও লাগি কপালবাবা !

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না দাশু। মধুকুপির পিপুলের ছায়ার কাছে এসে পেঁছতেও দেরি হয় না। তারপর ডরানির স্রোতের লোহা বাঁধানো পুল ; তার একটু দূরে এগিয়ে যেতেই জামুনগড়ার সড়ক। সেই সড়ক ধরে ছুটে ছুটে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় দাশু ; আর, আবার একটা ভীরু বিস্ময়ে

অভিভূত হয়ে, ফ্যালফ্যালে চাহনি তুলে সামনের ডাঙাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাছেই ডাঙার উপরে টিনের একটা চালার নীচে ছোট একটা টেবিল; সেই টেবিলের উপর একটা বাক্স! টেবিলের কাছে একটা চেয়ারের উপর উবু হয়ে বসে হাসছে যে লোকটা, তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারে দাশু। বাবু দুখন সিং। মস্ত বড় একটা খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে বাবুটা, তারই সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মধুকুপির দুখনবাবু।

আর, একটু দূরে ডাঙার বুকের উপর ধুলো উড়ছে। মাটি কাটছে সবাই; বুড়ো, আধবুড়ো, জোয়ান আর আধজোয়ান। ঝুড়ি ভর্তি মাটি মাথায় তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে আর এগিয়ে যাচ্ছে যারা, তাদের ধুলোমাখা চেহারা-গুলিকেও চিনতে পারে দাশু। মধুকুপির কিষাণের ঘরের যত বউ বেটি আর বহিন। বাচ্চা ছেলেগুলিও ছোট ছোট ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কিলবিল করছে। ডাঙার উপর দিয়ে এক সারি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দড়ির লাইন এঁকেবেঁকে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে; মাটি-বহা মেয়েরা আর বাচ্চারা ঝুপঝাপ করে লাইনের পাশে মাটি ফেলছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় দাশু; টিনের একচালার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাবু দুখন সিং ভুরু পাকিয়ে হেসে ওঠে—কবে ছাড়া পেলে হে, দাশু? কোদাল নিবে নাকি হে? না, নগদ টাকায় জমি কিনে নিয়ে জোত করবে?

দাশু বিড় বিড় করে—এটা কিসের কাজ বটে?

দুখনবাবু—টেস রিলিফ বটে?

দাশুর চোখ দুটো আরও বেশি ফ্যালফ্যাল করে—সেটা কি বটে?

দুখন সিং—সরকার খয়রাতী করছে; তুমি ভিখমজুর হয়ে খাটবে, এই কাজ।

বাবু ভদ্রলোক খাতাটাকে বুকের উপর চেপে ধরে আর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা মায়াময় আক্ষেপের হাসি হাসেন—বাস্তবিক, এদিকের জংলী গাঁয়ের মানুষগুলো কী সরল!

মধুকুপি ও আশেপাশের আরও দশটা গাঁয়ের সব আউশ আর আমন অজন্মাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই দুখনবাবু বার বার সদরে দৌড়াদৌড়ি করে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে, আরও অনেক রকমের চেষ্টা করে এই টেস্ট রিলিফ মঞ্জুর করাতে পেরেছে। হাতে কাজ নেই, ঘরে এক দানা চাল নেই, এহেন দুখীদের কাজ দিয়ে বাঁচাবার জন্য সরকার জামুনগড়ার ডাঙার বুকের উপর দিয়ে এই সড়ক টানবার অর্ডার দিয়েছেন। সড়কটা জামুনগড়ার পুবের দিকে এক ক্রোশ এগিয়ে যেয়ে সীতাপুর রোডের সঙ্গে মিশে যাবে। বাবু দুখন সিং এই টেস্ট রিলিফের ঠিকা নিয়ে পে-মাস্টার হয়েছে। বাবু ভদ্রলোকটি হলেন রিলিফের ইনস্পেক্টর। বুড়ো আর জোয়ান মাটিকাটার রোজানা মজুরি আট আনা। মাটি-বহা মেয়ের মজুরি ছয় আনা। বাচ্চারা পায় চার আনা।

টেস্ট রিলিফের অফিসে এই একচালার কাছে একটা দোকানও বসে গিয়েছে। চাল, মাষকলাই, মকাই, নুন আর শুকনো মরিচ। এই দোকানের মালিক বাবু

দুখন সিং। দুখনবাবুর চাকর দাঁড়ি-পাল্লা আর বাটখারা সামনে রেখে সারাদিন ঝিমোয় আর বিড়ি টানে। সন্ধ্যা হবার কিছু আগে মাটি-কাটা আর মাটি-বহা মানুষের দল যখন এসে ভিড় করে দুখনবাবুর কাছ থেকে মজুরি নিতে থাকে, তখন ব্যস্ত হয়ে ওঠে দুখনবাবুর দোকানের চাকর। নগদ নগদ পয়সা দিয়ে চাল মকাই আর নুন মরিচ কিনে, আর পুঁটলি করে বেঁধে নিয়ে যখন সবাই চলে যায়, তখন চাকরটার মত দোকানটাও আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

তারপর হিসেব হয়। পে-মাস্টার দুখন সিং হিসেব করে রিলিফের ইনস্পেক্টরের বখরা মিটিয়ে দেয়। হাজিরাখাতার একগাদা ভুয়া নামের তালিকায় সই দেবার আগে অন্তত বিশটা টাকা হাতে না নিয়ে ছাড়েন না ইনস্পেক্টর। আবার, হাজির মজুরদের রোজানা রেট মাথাপ্রতি দু আনা বাড়িয়ে খাতায় লিখে নিয়ে যখন আবার হিসেব করে ফেলে দুখনবাবু, তখন সই দেবার আগে আবার বিশটা টাকা পে-মাস্টার দুখনবাবুর হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নেন ইনস্পেক্টর। এই ইনস্পেক্টর সাধাসিধা সরল গেঁয়ো মানুষদের খুব পছন্দ করেন। কয়লা-খাদে কাজ করে বড় চালাক হয়ে গিয়েছে; সেই সুরেন মানঝির মত সন্দেহের মানুষ যেন এখানে আর না আসে। কী ভয়ানক হাঙ্গামা করে আর মজুরির হিসাব নিয়ে উৎপাত করে শেষে ভালয় ভালয় বিদায় নিয়েছে লোকটা। আট আনা হাতে নিয়ে দশ আনার প্রাপ্তিস্বীকার করে না, টিপ সই দিতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, এই কিষাণ বেচারা বোধহয় সে-রকম ধূর্ত মানুষ নয়।

দাশুর দিকে তাকিয়ে ইনস্পেক্টর বলেন—কোদাল চাও তো বল।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। বাবু দুখন সিংয়ের কথাগুলি, আর এই বাবু ভদ্রলোকের মুখের হাসি যেন একটা নির্দয় ঠাট্টার মাতলামি। মধুকুপির কিষাণকে ভিখমজুর হয়ে আট আনা রোজানায় মাটি কাটতে বলছে কি-ভয়ানক একটা বাচাল অপমান।

—কি হে সরদার? কাজ নিতে এত ভাবনা কিসের? আবার হাঁক পাড়েন ইনস্পেক্টর।

তবু বোবার মত শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। ভিখমজুরের কাজ; কাজটা যেন কয়লার ধুলোর চেয়েও কালো ময়লার ধুলোতে ঢাকা আরও ভয়ানক একটা কাজ। কিন্তু··দাশুর বধির আত্মা যেন হঠাৎ চমকে ওঠে; কোমরের কাছে ধুতির শূন্য গোঁজায় হাত দিয়ে কাঁপতে থাকে; সেই পাঁচটা টাকাও নেই। সারাদিনের না-খাওয়া পেটটাও কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। এক বেলার মজুরি যদি চার আনা হয়, তবে তো এক সের মকাইয়ের দানা হয়। হায় কপালবাবা!

—দেন তবে একটা কোদাল। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

বাবু দুখন সিংয়ের ভুরু দুটো কুঁকড়ে যায়; চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দুখন-বাবু। আর, কোদালটা হাতে নিয়ে মাটি-কাটা লাইনের দিকে দৌড়তে থাকে দাশু।

কাকে যেন খুঁজতে থাকে দাশু। দাশুর চোখে-মুখে ভয়ানক একটা অভিমানের জ্বালা। ছোট ছোট এক-একটা ধুলোমাখা ভিড়ের কাছে এসে

একবার থমকে দাঁড়ায়, তারপরেই দৌড়তে থাকে দাশু। সব ভিখমজুর! দুখনবাবুর জাতপণ্ড যে এত যত্ন করে জাত ভাগ করেছিল, কোথায় সেই ভাগ? জাতিয়া খাদিয়া আর কুঁকড়াশি, সবই যে এক ধুলোয় ঢাকা পড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

লাইনের একেবারে শেষ মুখে, যেখানে রোদের জ্বালায় পিঠ পুড়িয়ে একটা মাটির টিলার গায়ে ঝুপঝাপ কোদালের কোপ মারছে একটা জীর্ণশীর্ণ বুড়ো শরীর, তারই কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—গাঁয়ের মুখিয়া হয়ে তুমি এমন পাপ কর কেন গো, কাকা?

চমকে ওঠে বড় বুড়া রতন। কোদাল থামিয়ে আর হাঁপাতে হাঁপাতে দাশুর মুখের দিকে করুণভাবে তাকায়।

দাশু বলে—তুমি ভিখমজুর হও কেন? তোমার কি একটুকও মানে লাগে না কাকা?

বড় বুড়া রতন ধুঁকতে ধুঁকতে বলে—মানে লাগে হে, কিন্তু পেট মানে না।

দাশুর মাথাটা কেঁপে ওঠে; তার পরেই একেবারে হেঁট হয়ে ঝুলে পড়ে। বড় বুড়ার কথাগুলি যেন একটা ভয়ানক কঠোর কোদালের কোপের মত দাশুর গাঁওয়ার অহংকারের উপর আছড়ে পড়েছে। সেই অহংকার একটা ভয়াল যন্ত্রণায় কেঁপেও উঠছে। পেট মানে না; ঠিক কথা। তাই না কিষাণের প্রাণ বুড়া খরগোশটার মত মরা ঘাসের শিকড় খুঁড়ে খাওয়ার জন্য গর্ত ছেড়ে আর মরণ-বিঁধেরও তাড়া সহ্য করে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তা না হলে দাশু কিষাণ আজ দুখনবাবুর মত মানুষের মুখের ওই ঠাট্টার ভাষা আর হাসি সহ্য করে কোদাল হাতে তুলে নেয় কেন, আর ভিখমজুর হয়ে মাটি কাটতে রাজী হয়ে যায় কেন? হায় কপালবাবা, কিষাণের গতরে হাত-পা ও মাথার সাথে একটা পেট আবার দিলে কেন? পেট যদি দিলে তবে আবার ভুখ দিলে কেন?

দাশুর হেঁট মাথাটা রোদের তাপে তপ্ত হয়ে যখন আবার কেঁপে ওঠে, তখন চোখে পড়ে দাশুর, মাটির টিলার ওদিক থেকে এক জোড়া ধুলোমাখা ভুরুর নিচে এক জোড়া শুকনো চোখের দৃষ্টি দাশুরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

—সনাতন! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। কত রোগা হয়ে গিয়েছে সনাতন! সনাতনের গলাটা যেন শুকনো মাংসের দড়ি দিয়ে জড়ানো একটা হাড়। ছোট্ট এক ফালি কাপড়কে লেংটির মত প'রে আর কোদাল হাতে নিয়ে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে সনাতন; সনাতনের হাসিটা যেন ধুঁকছে। হায় কপালবাবা জাতের লাইয়াও লেংটি পরে আর ভিখমজুর হয়? করমের দিনে সনাতনের ওই শরীরটা যে মাদল বুকে নিয়ে বনময়ূরের মত দুলে দুলে আখড়ার মাতাল ঝুমুরের আনন্দকে আরও মাতাল করে দুলিয়ে দিত।

সনাতন হাসে—হঁ্যা দাশু, পেট মানে না, তা না হলে তুমিই বা এখানে আস কেন?

ঝুপ ঝুপ ঝুপ! জামুনগড়ার ডাঙায় বুকের উপর দড়ির লাইনের পাশে ভিখমজুরদের কোদাল আছড়ে পড়ছে আর উঠছে। উড়ন্ত ধুলোরও একটা

লাইন এঁকেবেঁকে অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে বাতাসে ভাসছে। কোদাল চালিয়ে মাটি কাটছে রতন আর সনাতন; রতনের বুড়ো পিঠের চাম রোদের তাপে পুড়ছে, জোয়ান সনাতনের গলার শুকনো মাংসের দড়িতে মাটির ধুলো ঘামে ভিজে গিয়ে কাদা হয়ে যাচ্ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। দাশুর চোখ দুটো যেন ভয় পেয়ে একেবারে সাড়াহীন আর বোধহীন মূর্খতার দুটো ঢেলা হয়ে গিয়েছে।

—ও কে বটে? দাশুর চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটু বোধ ফিরে পেয়ে চমকে ওঠে। মাটির টিলার আর-এক পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কার চোখ? এই চোখ দুটোকেও দুটো নির্বোধ বেদনার চোখ বলে মনে হয়।

—জটা রাখাল বটে কি হে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

জটা জবাব দেয়—জটা রাখালের প্রেত বটে!

তাই তো মনে হয়। বাবু দুখন সিংয়ের দয়ার জল খেয়ে খেয়ে কত মোটা হয়ে গিয়েছিল জটা রাখালের চেহারা। সেই চেহারা মরা-শালের চেহারার মত শুকনো খটখটে হয়ে গিয়েছে। দুখনবাবুর মতলবের সাথী হয়ে নতুন জাতপঞ্চ করেছিল, জাতিয়া হয়েছিল; আর বনচণ্ডীর ভক্ত হয়ে বামন মেনেছিল যে জটা রাখাল, তার আবার এমন দশাটি হয় কেন? এই জটা রাখালই তো সেই নতুন পঞ্চের মানুষ, যে পঞ্চ একটা বড়াইয়ের নিয়ম করেছিল, ভাত-ভাইয়ারীতে খাদিয়া আর কুঁকুড়াশিদের সাথে এক ঠাঁই বসবে না জাতিয়ারা। ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খেটে বড় সুখে থাকবে ওরা, সে আশা আজ ভিখমজুর হয়ে যায় কেন? দাশুর ঠোঁট দুটো কঠোর ঠাট্টার হাসি হাসতে গিয়ে কুঁকড়ে যায়।

—কথা বল না কেন জটা? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

জটা বলে—কোন কথা নাই দাশু।

দাশু হাসে—তুমিও সিংহ হয়েছিলে কি?

জটা—হ্যাঁ।

দাশু—পৈতা নিয়েছিলে কি?

জটা—হ্যাঁ।

দাশু—বনচণ্ডীকে তুষেছিলে কি?

জটা—হ্যাঁ।

দাশু—তবে?

জটা—তবে আর কি বটে?

দাশু—শুধাই, তোমার কি হলো?

জটা—সবই হলো। আত্মার গতি হলো, অনেক পুণ্য হলো জনম নিতে আর হবে না।

যেন একটা দুঃসহ আক্রোশের গর্জন চেপে বিড় বিড় করে আর ঝুপ ঝাপ করে কোদাল চালিয়ে মাটি কাটতে থাকে জটা রাখাল। দাশুর ঠোঁটের উপর কুঁকড়ে-ওঠা ঠাট্টার হাসিটা ব্যথা পেয়ে ছিঁড়ে যায়। চোখ দুটো ছলছল করে

ওঠে। চোখে পড়েছে দাশুর, জটা রাখালের সেই মোটাসোটা পেটের চেহারাটা কি-ভয়ানক চুপসে গিয়ে কতটুকু হয়ে গিয়েছে!

দাশু বলে—আমার কথা শুনে কি দুখ পেলে জটা?

জটা—না।

দাশু—ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ না খেটে তুমি এখানে খাট কেন?

জটা—ওরা এখন আর জমিতে মনিষ খাটাবে না।

দাশু—কেন?

জটা—খরার ভয়ে। ছিটাই করলেও বীজ কলাবে না; ওদের লোকসান হবে। ভাদুয়া জল যদি বর্ষায় তবে আমাদিগে আবার কাজ দিবে; তার আগে দিবে না।

চোখ তুলে জ্বলন্ত আকাশটার দিকে তাকাতে গিয়ে দাশুর চোখও যেন জ্বলতে থাকে! ডরানির বুকটাকেও শুকনো খটখটে করে দিয়েছে এই দয়াহীন আকাশটা।

হেসে ওঠে জটা রাখাল। হাসির শব্দটা আর্তনাদের মত।

দাশু বলে—কি বটে জটা? হাস কেন?

জটা বলে—ওরা এখন কি বলে জান?

দাশু—কি বলে?

জটা—ওরা এখন বলে, নাও না, কত জমি নিতে চাও। নিজের বীজ আর নিজের হাল নিয়ে ভাগজোত কর।

বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দাশু। জটা বলে—কিছু বুঝলে কি দাশু?

দাশু—না।

জটা—ওরা বড় ভাল হিসাব জানে। খরাতে যখন মাটি মরে, তখন ভাগজোত নিতে সাধে; আর যখন শাওনের জলে মাটিতে রস লাগে, তখন বলে এক সের চাল রোজানা নিয়ে মনিষ খাট। ওরা…ওরা ঠগ বটে, প্রেত বটে, কিষাণের সুখের দুশমন বটে।

বলতে বলতে একটা দুরন্ত আক্রোশের স্বর দাঁতে দাঁতে পিষে দিতে দিতে চেঁচিয়ে ওঠে জটা: এমন গাঁয়ের মাটিতে থুক ফেলে আমিও সুরেন মানঝির মত চলে যাব। জটার চোপসানো পেটটা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

বড় বুড়া রতনের গলার স্বর শোনা যায়।—থাম জটা। চুপচাপ কাজ কর। …তুমিও কাজ কর না কেন দাশু? এখনও শুধু কুদালি হাতে নিয়ে খাড়া আছ কেন? আধা মজুরির নিবারও কি ইচ্ছা নাই?

তাই তো! এখনও শুধু কোদাল ছুঁয়ে মধুকপির গাঁওয়ার অভিমানের যত জ্বালা আর জ্বালাতনের কথা বলে বলে আর শুনে শুনে ছটফট করছে দাশু। কিন্তু এগিয়ে আসছে একটা বাবু; ওর হাতে আলকাতরার দাগ আঁকা ছোট একটা বাঁশ। মাপের বাঁশ বটে কি? হ্যাঁ, কাটা মাটির মাপ নিতে আসছে মাপবাবু। দশ হাত চৌকা হবে আর এক হাত গভীর হবে কাটা মাটির গড্ঢা,

তবে তো আধা মজুরি মিলবে।

চেঁচিয়ে ওঠে মাপবাবু—কী রে, কোন্ রসের কথা বটে রে! কাজ করিস না কেন?

ঝুপ ঝুপ ঝুপ! দাশুর কোদালও মাটির উপর আছড়ে পড়ে শব্দ করতে থাকে।

জীর্ণ জামকাঠের দরজার ঝুলে-পড়া কপাটটা আবার সোজা করে তুলে চৌকাঠের খুঁটোর সঙ্গে চোপের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বসিয়ে দিয়েছে দাশু। দরজার দু পাশের দেয়ালে যেখানে শিয়ালের আঁচড়ের উৎপাতে মাটি ঝরে পড়ে গিয়ে বড় বড় দুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আবার নতুন কাদা ভরে দিয়েছে!

একটা একটা দিন পার হতে হতে দুটো মাস পার হয়ে গেল। জামুনগড়ার ডাঙাতে দুই বেলার মাটিকাটা মেহনতের জীবন, যেন শুধু পুড়ে পুড়ে বেঁচে থাকার জীবন। সন্ধ্যা হলে মধুকুপির দিকে ফিরে যাবার সময় যখন কপালবাবার জঙ্গলের দিক থেকে পচা পাতার গন্ধ নিয়ে এক-একটা হাওয়া শনশন করে ছুটে আসে, শুধু তখন যেন শরীরের, সেই সঙ্গে মনের ভিতরেও সারাদিনের প্রদাহটা একটু জুড়িয়ে যায়।

টেস্ট রিলিফের অফিসে একচালার পাশে দুখনবাবুর সেই দোকান থেকে যেদিন শুধু এক সের বা দেড় সের ভেজা ছোলা কিনে আর গামছায় বেঁধে নিয়ে ঘরে ফেরে দাশু, সেদিন ঘরের ভিতরে আর উনান জ্বালতে হয় না। কিন্তু যেদিন সাধ করে চাল কিনে নিয়ে আসে, সেদিন উনান জ্বালতে হয়।

কিন্তু এই সাধ, এই ভাত রাঁধাই যে একটা জ্বালা। হাঁড়ি হাতে নিয়ে সোজা হেঁটে একেবারে ডরানির বুকের উপর অন্ধকারে ঢাকা বালিয়াড়ির কাছে এগিয়ে যেতে হয়। ভেজা বালু খুঁজতে গিয়ে আরও অনেকক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক হাঁটতে হয়। তারপর ব্যাঙের লাফালাফির শব্দ শুনে ছোট একটা দহের কাছে এগিয়ে যেয়ে হাঁড়িতে জল ভরতে হয়। তারপর আবার ঘরে ফিরে এসে, উনানে শুকনো পাতার আগুন জেবলে·· হায় কপালবাবা! উনানে শুকনো পাতার আগুন দাউ দাউ করে কাঁপে। দাশুর ঘরের ভিতরে যেন ভয়ানক একটা শূন্যতা দাউ দাউ করে কাঁপছে। দাশুর পাথুরে ছাঁদের কঠিন শরীর সব মেহনত সহ্য করতে পারে; কিন্তু সহ্য করতে পারে না শুধু এই উনান-জ্বালা আর ভাত রাঁধা মেহনত। হাঁড়িতে চাল ছাড়তে গিয়ে দাশুর হাতটাই যেন ফুঁপিয়ে কেঁপে ওঠে। এমন ভাতে পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না। এমন ভাতে কোন স্বাদ নেই। মুরলীর হাতে এই হাঁড়িতে চাল ছাড়া হত, তাই না সে ভাতে এত স্বাদ হত।

কাঁসার একটা থালি। থালিটাকে ধুতে হয়। কিন্তু হাত দুটো যে আবার

ফঁপিয়ে কেঁপে ওঠে। এটা যে সেই থালিটা বটে গো কপালবাবা, যে থালিতে কত ভাত ঢেলেছে মুরলী আর দাশু কিষাণের মুখের দিকে তাকিয়ে কত হাসি হেসেছে। মুরলী, তুই আয়! এসে আবার একটুক দুখ কর না কেন? তারপর জমি যখন হবে, তখন ।

খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর যখন দাশু কিষাণের ভিখমজুরি-খাটা শরীরটা ঘুমের ভারে অলস হয়ে পড়ে থাকে, তখনও দাশুর বুকের ভিতরটা যেন বিড়বিড় করে—মুরলী, তুই আয়।

যেদিন চার আনার ভাজা ছোলার সঙ্গে চার আনার হাঁড়িয়ার নেশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে দাশু সেদিন মাঝরাতের প্রহর শেষ না হতেই দাশুর নিঝুম বুকের একটা স্বপ্ন যেন চিৎকার করে ওঠে—ছেইলাটাকে একবার নিয়ে আয় না কেন মুরলী!

রাতশেষের ঘুম যেন একটা সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ হয়ে যায়। নতুন মাটির ঘর হল, পাঁচ বিঘা জমি হল। ক্ষেত ঘিরে গুলঞ্চের বেড়াতে ফুল ধরল। ক্ষেতের ধানের শিসের উপর তিতলি ফড়িং উড়ে বেড়ায়। চল মুরলী, একবারটি আখড়াতে যাই।

জিত হয়েছে দাশুর। কিষাণের প্রতিজ্ঞা জয়ী হয়েছে। জমির সুখে মজবুত হয়ে কিষাণের হাত এইবার একটা লুঠেরা ডাকাতের হাত কড়কড় করে ভেঙে দিয়েছে আর মুরলীকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বুকে চেপে ধরেছে। তারপর বুকের কাছে মাদলটা, কাঁধের উপর ছেইলাটা, পাশে পাশে মুরলী।

না, ধিতাং ধিতাং নয়, ঘড়াং ঘড়াং; দাশুর স্বপ্নের ঘোর পিষে দিয়ে ভয়ানক কর্কশ একটা শব্দ বেজে বেজে চলে গেল। জীর্ণ জামকাঠের দরজাটা কাঁপছে। চালার বাতা থেকে ঝুরঝুর করে ঘুণের ধুলো ঝরে পড়ছে।

ঘুম-ভাঙা চোখ দু হাতে চেপে আর ধড়ফড় করে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর উঠে বসে দাশু। শুনতে পায় দাশু; সড়কের উপর দিয়ে ঘড়াং ঘড়াং শব্দ করে যেন একটা অতিকায় লোহার জানোয়ার প্রচণ্ড হাড়গোড় বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে।

ঠিকই সন্দেহ করেছে দাশু। ঘরের বাইরে এসে আর ব্যস্তভাবে হেঁটে একেবারে সড়কের কাছে এসে দেখতে থাকে দাশু; কিন্তু দেখে কিছু বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয়, ঘড়াং ঘড়াং করে কলকব্জা দিয়ে গড়া একটা রহস্য হামা দিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।

—এটা কি বটে গো? চেঁচিয়ে হাঁক দেয় দাশু।

—এটা ট্রাকটর বটে গো। লাঙ্গলগাড়ি বটে।

যে লোকটা উত্তর দেয়, তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দাশুর বুকটা ভয়ানক এক বিস্ময়ের বেদনায় জ্বলে ওঠে। উত্তর দিয়েছে যে, সে হল সনাতন। গাঁয়ের লাইয়া সনাতন! মধুকুপির বেটি-বহিনের বিয়াতে আর পুজা-পরবে ও উৎসবের আরম্ভে মাটির উপর জল ছিটিয়ে মাঙ্গলিক কাজ করবে যে, জীবনের এতটা কাল এই কাজ করে এসেছে যে, সেই সনাতন।

ট্রাকটরেরের উপর চাকা ধরে বসে আছে যে গম্ভীর একটা লোক, তারই পিছনে চাকরের মত ভঙ্গী নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে সনাতন। খাকি কামিজ আর খাকি প্যান্ট পরেছে সনাতন। সনাতনের মাথায় কালিঝুলি মাখা এক টুকরো কাপড় ফেটির মত জড়ানো। এখন বুঝতে পারে দাশু, কেন এই দশ দিনের মধ্যে জামুনগড়ার ডাঙায় সনাতনকে মাটি কাটতে দেখতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু···।

—কিন্তু তুমি এটার সাথে কেন সনাতন ? দাশুর গলার স্বর গরগর করে।

সনাতন হাসে—আমি খালাসী বটি দাশু। ত্রিশ টাকা মাসোহারা, তা ছাড়া খোরাকিও দিবে।

—তুমি চললে কোন্ নরকে ? আবার চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

সনাতন বলে—রামগড়ে চললাম। এটা রামগড়ের সরকারী খামারের লাঙ্গলগাড়ি বটে।

ঘড়াং ঘড়াং, ঘড়াং ঘড়াং, মধুকুপির সড়কের বুকে কর্কশ উল্লাসে ঠোকর দিতে দিতে লাঙ্গল-গাড়ির দাঁতাল চাকা গড়িয়ে যেতে থাকে। সে শব্দ শুনতে শুনতে দাশুর কানে তালা ধরে যায়। দাশুর প্রাণটাও যেন বধির হয়ে আর নিঝুম হয়ে যায়। সড়কের ধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

ঢিপ ঢিপ শব্দ করে বেজে চলেছে দাশুর হৃৎপিন্ডটা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আর এই ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনতে শুনতে দাশুর প্রাণের জোরও যেন ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ছে। চোখ দুটো ভিজে আঠা-আঠা হয়ে গিয়েছে। মধুকুপির ভোরের আকাশটাকে ভাল করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। শরীরের যত হাড়ের গাঁটে অদ্ভুত একটা ব্যথা সুড় সুড় করছে। জ্বর হয়েছে বোধ হয়। তা না হলে মাথার ভিতরে এত তাত কেন ? ঘাড়টা কাঁপে কেন ? জিভে জল নেই মনে হয় কেন ? গলার ভিতরে একগাদা তেতো কফ আটকে আছে কেন ? তোমার পাও লাগি কপালবাবা, দাশু কিষাণের এই পাথরপানা শক্ত গতরে রোগ-বালাই দিও না। হাঁপাতে থাকে দাশু।

হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে। নিঃশ্বাসের বাতাস গরম হয়ে জ্বলছে। জ্বলুক, সেজন্য কোন চিন্তা নেই। এক হাঁড়ি জলে দশটা বহেড়া সিদ্ধ করে নিয়ে সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে একটা ঘুম দিলেই জ্বর ছেড়ে যাবে। কিন্তু, এখনই যে জামুনগড়ার ডাঙায় মাটি কাটতে যেতে হবে।

—চললাম দাশু। কর্কশ স্বরের একটা আচম্‌কা আওয়াজ ; যেন পটকার শব্দের মত একটা আছাড় খাওয়া আক্ষেপের শব্দ। আনমনা দাশুর কান দুটো আবার চমকে ওঠে। আর, একটা কাক নিমগাছের ডালে বসে গলা ফোলানো স্বরে ক ক করে ডাকে।

দাশুর একেবারে কাছে এসে ডাক দিয়েছে জটা রাখাল। জটা রাখালের এক হাতে একটা পুঁটলি, আর, এক হাতে লাঠি। জটা রাখালের চেপসানো পেটটা শক্ত করে একটা ছেঁড়া গামছা দিয়ে বাঁধা।

—কি বটে জটা ? তুমি আবার কোথায় চললে ? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে

দাশু।

জটা বলে—জানি না দাশু।

দাশু—জান না, তবে গাঁ ছেড়ে যাও কেন?

জটা—গাঁয়ে থাকলে মরণ হবে গো দাদা।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—কেন মরণ হবে? তুমি কি শুন নাই যে কিষাণদিগে জমি দিবে সরকার?

হেসে ওঠে জটা—শুনেছি, আমাদিগের মরণ হবার পর দিবে।…আচ্ছা… কপালবাবা তোমাকে সুখে রাখেন, আমি এখন চলি।

হন হন করে হেঁটে চলে গেল জটা রাখাল। আর, দাশুর বুকের ভিতরে একটা হাহাকার যেন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কী ভয়ানক অবিশ্বাসের হাসি হেসে দাশুর আশার লোভটাকে নিষ্ঠুর ঠাট্টায় আহত করে চলে গেল জটা। যে আশায় আশ্বস্ত হয়ে এই দু মাস ধরে ভিখমজুরির দুঃখ আর অপমান সহ্য করেছে দাশু, সে আশা কি একটা মিছা লোভের মিছা পিয়াস? ওটা কি শুধু ভোটের বাবুদের একটা গীতের কথা বটে? কিষাণে তবে জমি পাবে না?

দাশুর বুকের ভিতরে আহত আশার জ্বালা ছটফট করতে থাকে। তবে কি মুরলী আসবে না? তবে কি মুরলী ফিরে এসেও আবার কেঁদে চলে যাবে? হাত বাড়িয়ে মুরলীর কোল থেকে ছেইলাকে নিতে গেলে মুরলী কি তবে দাশুর সেই লোলুপ হাতটাকে একটা ঘৃণার ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেবে? না গো মধুকুপির কিষাণ, যে ছেইলাকে বাঁচাবার জোর নাই তোমার, সে ছেইলাকে কোলে নিবার হক নাই তোমার।

আহত আশার জ্বালার সঙ্গে যেন দাশু কিষাণের টাঙ্গি আর মাদলও জ্বলছে। গুলঞ্চের ফুলগুলি জ্বলছে। জ্বলছে ধানের শিস। জ্বলছে ঝুমুরের গীত আর নাচ। হাঁড়ির মহুয়াজলের মাতাল রসের স্বাদও জ্বলছে। আপন মাগ, আপন ছেইলা, আপন ঘর, আপন গাঁ—সব জ্বলছে।

শুকনো ও নেড়া যত ফাটা-মাটির ক্ষেত মাড়িয়ে আহত জানোয়ারের মত ছটফটিয়ে দৌড়তে থাকে দাশু; বড় বুড়া রতনের ঘরের দরজার কাছে এসে বুক-ফাটা চিৎকার ছাড়ে।—তুমিও কি বিশ্বাস কর না কাকা? কিসাণে কি জমি পাবে না?

গাঁয়ের মুখিয়া রতনের জিরজিরে চেহারার মত রতনের যে মাটির ঘরটা বুড়িয়ে জিরজিরে হয়ে গিয়েছে, তারই সামনের আঙিনার একদিকে রিঠাগাছের ভিড়ের কাছে অনেক মানুষের ভিড়। উবু হয়ে বসে আছে অনেকগুলি শুকনো, ক্লান্ত ও উদাস আশা। তার মধ্যে রতনের জিরজিরে চেহারাটাও কুঁকড়ে পাকিয়ে আর ছোট্ট একটা ভীরু শিশুর মত বোবা হয়ে বসে আছে।

জাতপঞ্চের সভা নয়; জরীপের একটা বাবু এসেছে। তাই ছুটে এসেছে মধুকুপির যত বুড়ো আধবুড়ো আর জোয়ান ভিখমজুর। কি বলে জরীপের বাবুটা?

ভিড়টা যেন আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি হাঁপাচ্ছে তারাই,

যারা টেস্ট রিলিফের মাটি-কাটা মেহনতের কোদাল ফেলে রেখে দিয়ে দু দিনের জন্য রামগড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। ত্রিশ টাকা মাসোহারা পাওয়া যাবে, আর উর্দি প'রে ও কপালে তোয়ালের ফেট্টি বেঁধে লাঙলগাড়িতে খালাসী খাটবার কাজ মিলবে; চল হে চল। মস্ত বড় একটা আশার আহ্লাদে যেন মাতাল হয়ে ওরা গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সরকারী অফিসের হাসি ঠাট্টা ও তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছে। কাজ নাই, একটার বেশি খালাসীর দরকার নাই। বড় ভাল কপাল করেছিল সনাতন, শুধু ওরই কাজ হল।

কিন্তু ওরা যে বললে, সবুর কর না কেন, কিষাণদিগে জমি দিবে সরকার। তাই কি জরীপের বাবুটা এসে গেল হে? চল হে চল; খবর পাওয়া মাত্র সবাই ছুটে এসেছে।

নতুন করে জমির শুমারী শুরু হয়েছে। চারদিকের দশটার মৌজার যত জমির দাগ আর খতিয়ানের মাপ নম্বর ও চৌহদ্দির হিসাবে ভরা নথিপত্রের একটা বোঝা গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আর দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বসে আছে জরীপের বাবু।

বাবুটার চেহারাও কেমনতর একটা উদাস চেহারা। বাবুটা বোধ হয় মধুকুপির মনিষ-জীবনের এই শুকনো ক্লান্ত ও উদাস চেহারা দেখে খুব হতাশ হয়ে গিয়েছে।

হতাশ হবারই কথা। বাবুটা বলেছে, দাও, দুটা শসা আর এক ঢেলা গুড়, আর পোয়াটাক সরু চিঁড়া দাও; জলখাবার পর্ব তোমাদেরই গাঁয়ে সেরে নিই; বেলাও যে অনেক হলো! কিন্তু বাবুটার এই সামান্য তুষ্টির রসদও যোগাতে পারে নি গাঁয়ের মুখিয়া রতন।

রোদের তাতে রিঠাগাছের ছায়াও গরম হয়ে গিয়েছে। জরীপের বাবুটার গলা ঘামে ভিজে গিয়েছে। গায়ের জামাটা খুলে নিয়ে আর ভাঁজ করে কোলের উপর রেখে দিয়ে সামনের ভিড়ের মুখগুলির দিকে শুধু চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে জরীপের বাবু।

মনিষগুলির চোখের চাহনি অদ্ভুত। একটা চোখ জ্বলে, একটা চোখ মিটমিট করে। যেন এক চোখে আশা ও আর এক চোখে হতাশা। ধুকপুকে নিঃশ্বাসের শব্দেও যেন দু রকমের সুর। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস একসঙ্গে কাঁপে হাঁফায় আর হাঁসফাঁস করে।

চেঁচিয়ে ওঠে জরীপের বাবু—আর আমি এখানে সময় নষ্ট করতে চাই না। যদি থাকে তো তাড়াতাড়ি দেখাও।

বড় বুড়া রতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়: কি দেখতে চাও বাবু?

—পরচা, কবুলিয়ত, পাট্টা, চিঠা কিংবা হুকুমনামা।

রতন—না গো বাবু। ওসব কিছু নাই।

—কারও কি কিছু নাই? একটু-আধটু মোকররী, লাখরাজ, ঘাটোয়ারী, নয়াবাদী, দিগোয়ারী, কিংবা মেয়াদী জমা?

রতন—না, কিছু নাই।

—সবাই কি লেংটা ? কোন হতচ্ছাড়ার কি দুই বিঘা চাকরাণও নাই ?

হঠাৎ রিঠাগাছের ছায়ার আড়াল থেকে যেন একটা গম্ভীর আক্রোশের ভাষা গর গর করতে করতে ছুটে আসে—ছিল গো বাবু।

উবু হয়ে বসে থাকা ভিড়ের ছায়া ডিঙিয়ে দাশুর রুক্ষ মূর্তিটা তিনটে লাফ দিয়ে জরীপের বাবুর চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কে তুমি ? কে তুমি ? ভয় পেয়ে চমকে ওঠে জরীপের বাবু। গামছা-বাঁধা নথিপত্রের বোঝাটা বুকের উপর সাপটে ধরে কাঁপতে থাকে।

—তুমি কে বট ? জরীপের বাবুটার সেই আতঙ্কিত চেহারার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে দাশু। বাবুটার ঘামে ভেজা মুখটা দুখী মানুষের মুখ বলে মনে হয়; মাথার চুল বেশ সাদা হয়ে গিয়েছে। গলার চামও শুকিয়ে ঢিলে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো সেই···ইটখোলার ঠিকাদার সেই রায়বাবুর সরকারবাবুটা বটে কি ?

দাশুর চোখ দুটোও অপলক হয়ে থরথর করতে থাকে। চিনতে পেরেছে দাশু। লোকটার ঘাড়ের কাছে যেখানে দাশু কিষাণের সেই ভয়ানক রাগী টাঙ্গির কোপ পড়ে রক্ত ঝরিয়েছিল, সেখানে শুকনো মাংসের একটা ঢেলা উঁচু হয়ে রয়েছে। পুরনো ক্ষতের দাগটা বাবুটার ঘাড়ের সব চামড়াকে যেন টেনে নিয়ে কুঁচকে দিয়েছে। বোধ হয় আর ঘাড় টান করে তাকাতে পারে না বাবুটা; তাই মাথাটাকে কেমনতর একটু হেলিয়ে দিয়ে আর টেরা মানুষের মত তেরছা চাহনি তুলে দাশুর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করছে।

দাশু বলে—তুমি তো সেই সরকারবাবু।

—আমি চললাম ; আমি চললাম ; এখানে আমার আর কাজ নাই। জরীপের বাবুর সন্ত্রস্ত চেহারা ছটফট করে, আর রতনের মুখের দিকে বার বার করুণভাবে তাকায়।

—আমার কথাটা শুন, বাবু। দাশুর গলার স্বর কোমল অনুরোধের স্বরের মত মৃদু হয়ে যায়।

সরকারবাবু তবু আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে—না হে, আর কিছু শোনবার দরকার নাই। আমি জানতাম না যে, তুমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ; জানলে আমি এখানে আসতাম না।

দাশু হাসে—আমাকে এত ডর কেন বাবু ?

দাশুর মুখের সেই অদ্ভুত হাসির দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়েই একটা লাফ দিয়ে সরে যায় জরীপের বাবু। দাশুও একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেয়ে জরীপের বাবুর পথরোধ করে।

—দাশু দাশু দাশু! ও কি কর দাশু! চেঁচিয়ে ওঠে রতন ; ভয় পেয়ে হল্লা করে ওঠে এতক্ষণের শান্ত ও নীরব ভিড়টা। আর জরীপের বাবুও তার সাদা মাথা ও ঘামে ভেজা রোগা গলাটা দুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে মেরে তোমার কোন লাভ নেই ; বুড়ো বয়সে একটা চাকরি পেয়েছি···আমি শুধু চাকরি করতে এসেছি।

দশটা মৌজার যত আবাদী অনাবাদী আর পতিত মাটির দাগ ও খতিয়ানের গামছা-বাঁধা হিসাবের বোঝা বুকের উপর আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকে জরীপের বাবু—আমি কারও জমি ছিনতে আসি নি…ওরে, আমারও জমি নেই।

চমকে ওঠে দাশু। আর, সরকারবাবুও ঘাড় টান করে, মাথা তুলে আর সোজা তাকিয়ে দাশুর মুখটাকে দেখতে থাকে। মধুকুপির সেই ভয়ানক টাঙ্গিবাজ কিষাণটা কাঁদছে। চোখের উপর বাঘের থাবার মত শক্ত দুটো মুঠো চেপে চেপে অদ্ভুত একটা কান্নার জলের ফোয়ারা চাপতে চেষ্টা করছে দাশু।

দাশু বলে—তুমি আমাকে মাপ কর বাবু!

—অ্যাঁ? কি বললে? মাপ করবো আমি? আচ্ছা…মাপ করলাম।

দাশু—তুমি একটু খুশী হয়ে বস বাবু।

হেসে ফেলে জরীপের বাবু—হ্যাঁ, তুমি যখন খুশী হতে বলছো, তখন আর খুশী না হয়ে…।

বলতে বলতে আবার চারপায়ার উপর বসে পড়ে জরীপের বাবু নথিপত্রের গামছা-বাঁধা বোঝাটাকে ঝুপ করে মাটির উপর ফেলে দিয়ে একটা হাঁপও ছাড়ে। তার পরেই রিঠা গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে জরীপের বাবুর চোখ দুটো যেন বুড়ো ভিক্ষুকের চোখের মত উদাস হয়ে যায়।—সারাটা জীবন শুধু জমির নথি ঘাঁটলাম; কত ফৌজদারী করে কত রায়বাবুকে জমি পাইয়ে দিলাম; কিন্তু কই, আমার তো কিছু হলো না হে; আমার এ-জীবনে আর কিছু হবে না হে।

দাশু—কিন্তু আমাদিগের কিছু হবে কি?

—কি?

দাশু—জমি।

—অ্যাঁ?

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—কিষাণে জমি পাবে কি?

—বল বাবু, বল। চেঁচিয়ে ওঠে মধুকুপির শুকনো ক্লান্ত ও উদাস মনিষের ভিড়—রামগড়ের সরকারী চাষ অফিসের বাবুরা বলছে, ভোটের বাবুরা গীত গেয়ে গেয়ে বলছে, কিষাণে জমি পাবে। সরকার কিষাণদিগে জমি দিবে। ঠিক কথা বটে কি, বাবু?

জরীপের বাবুর চোখ দুটো ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে।

—বল বাবু, বল। আবার বেজে ওঠে একগাদা ক্লান্ত আশার আর্তনাদ।

জরীপের বাবু কপালের ঘাম মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—যারা টাকা দিয়ে জমি কিনবে…।

—না না না; যাদিগের টাকা নাই; আমাদিগের মত মনিষদিগে জমি দিবে কি সরকার?

জরীপের বাবু বিব্রত হয়ে বিড় বিড় করে—দিতে পারে। কিন্তু…।

দাশুর চোখের তারা দুটো চিকচিকিয়ে ছটফট করে—আবার কিন্তু কেন গো বাবু? দিতে যদি পারে, তবে দিয়ে দিবে বল। বল বাবু, বল।

জরীপের বাবু—হ্যাঁ দিতে পারে ; কিন্তু দিলে কিভাবে দেবে জান ?

দাশু—জানি না, তুমি বল।

—কারও নামে জমির দাগ হবে না। পরচা পাট্টা হবে না। আল বেঁধে দিয়ে আর হাল কাঁধে নিয়ে তুমি যে ডেঁটে ডেঁটে বলবে, এটা আমার জমি, সেটি হবে না।

দাশুর চিকচিকে চোখ হঠাৎ শুকিয়ে যায়—কেমনটি হবে তবে ?

—মিলতি জোত হবে।

দাশুর বুকের ভিতরটা যেন গরগর করে বেজে ওঠে—মিলতি জোত ?

—হ্যাঁ।

দাশু—সেটা কেমন জোত বটে ?

—মিলতি মেহনতের জোত। বিশ-পঁচিশ কিষাণে মিলে এক জমিতে হাল চালাবে ; ছিটাই বুনাই আর রোপাই করবে। ফসলেরও বাঁটাই হবে। যার যেমন মেহনত, তার তেমন ভাগ।

দাশু—কিন্তু আমার জমি ।

—আরে না ; তোমার জমি বলে কোন জমি থাকবে না। তোমার জমি সবার জমি ; সবার জমি তোমার জমি।

দাশু—জমিও কি কয়লা-খাদের মত মিলতি মেহনতের নরক হবে বাবু ? বলতে বলতে দাশুর চোখ থেকে যেন একটা জ্বালা ঠিকরে বের হতে থাকে।

জরীপের বাবু আশ্চর্য হয়ে তাকায়—তুমি মিছিমিছি কার ওপর এত রাগ করছো হে ?

নিজেরই কপালের উপর শক্ত হাতের মুঠো দিয়ে একটা চাপড় মেরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—এটার উপর।

বড় বুড়ো রতন বিড় বিড় করে—চুপ কর দাশু।

দাশু তবু চিৎকার করে—কেন চুপ করবো কাকা ? জরীপের বাবু কি বলছে, তুমি কি শুনছো না ?

রতন—শুনেছি, যা হবে, তাই বলছে বাবু ; তুমি মিছা রাগ কর কেন ?

দাশু—তবে বল না কেন, মিলতি জোতের মত, মাগও মিলতি মাগ হবে ; ছেইলাও তাই হবে। কে কার মাগ, কে কার ছেইলা কার কোন্ ঘর, কিছুই ঠিক থাকবে না। সব মিলতি মজার নরক হয়ে যাবে।

রতন—হবে যদি, তবে হতে দাও না কেন। তুমি মিছা চেঁচাও কেন ?

দাশু—না হবে না, হতে দিব না কাকা। দাশুর চোখের চাহনি পাগল মাতালের চাহনির মত লাল হয়ে ধকধক করে।

হেসে ওঠে জরীপের বাবু, হেসে ওঠে মনিষদের ভিড়। দাশুর কানের কাছে পৃথিবীর সব আলো-ছায়া যেন ভয়ঙ্কর ঠাট্টার হাসি ঝরিয়ে কাঁপতে থাকে। হায় হায় ; হাসে কেন এরা ?

দাশুর হৃৎপিণ্ডের স্বপ্নটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। আপন জমি নেই, গুলঞ্চের বেড়াও নেই ; তবে আর রইল কি ? হায় কপালবাবা, তবে আর

থাকে কি? তা হলে যে ডরানির স্রোতের জল শুধু জল, বড়কালু শুধু একটা পাহাড়? হরতকীর জঙ্গলের ছায়া শুধু একটা ছায়া? তা হলে বেলতলার কপালবাবাও যে শুধু একটা পাথর হয়ে যায়।

—মিলতি জোতে বড় লাভ আছে হে! জরীপের বাবুটা একটা সান্ত্বনার হাসি হাসে।

—কোন্ লাভ বটে গো বাবু? বলতে গিয়ে দাশুর লাল চোখের জ্বালা আরও জ্বালাময় হয়ে কাঁপতে থাকে।

—অনেক সুবিধা আছে। চাষ করতে সুবিধা আছে; ফলনও ভাল হয়। একা মেহনতে তুমি যত ফসল পাবে, মিলতি মেহনতে তার দুইগুণ ফসল তোমার ভাগে পড়বে।

—বড় ভাল, বড় ভাল হিসাব! দাশুর গলার স্বরটা যেন ধিক্কার দিয়ে বেজে ওঠে।

শুধু হিসাব আর হিসাব। সুখের হিসাব আর সুবিধার হিসাব! মায়ার হিসাব নয়। শুধু মাথাতে ভাল লাগলেই হবে, বুকে ভাল লাগুক বা নাই লাগুক। হায় রে কিষাণের প্রাণ!

আস্তে আস্তে অলস হয়ে মাটির উপর বসে পড়ে দাশু; আর দুই হাঁটুর উপর মাথাটাকে পেতে দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

জরীপের বাবু বলে—একটা ভাল কথা বললাম বটে; কিন্তু কবে যে এই মিলতি জোতের সুখ তোমাদের ভাগ্যে…।

বড় বুড়া রতন হাসে—আমার কোন চিন্তা নাই বাবু। সে সুখ দেখবার লেগে আমি বেঁচে থাকবো না। কিন্তু এরা…আমার জাতের এই বেচারারা তো সুখ পাবে। বলতে বলতে মনিষদের মুখগুলির দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে মধুকুপির মুখিয়া, জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতন।

মনিষেরা বলে—আঃ, তুমি কাঁদ কেন বড় বুড়া?

রতনের জিরজিরে পাঁজরগুলি যেন উতলা হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁপতে থাকে।—আমার পঞ্চ নাই, মান নাই, ভাত নাই, জোর নাই; আমার মত মুখিয়া তোমাদিগের কোন সাধে কাজ দিলে নাই।

পুরনো মধুকুপির মর-মর প্রাণটা এইবার যেন শেষ অভিমান ডুকরে দিয়ে মরে যাবে। বড় বুড়া রতনের পাঁজরগুলি কি-ভয়ানক নেচে নেচে কাঁপছে!

একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে বড় বুড়া রতনের জিরজিরে শরীরটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাশু—কাকা গো!

রতনের শুকনো ঠোঁটে একটা করুণ হাসির ছায়া সিরসির করেঃ এখনই আমি মরবো না দাশু। কিন্তু…।

দাশু—কি বটে কাকা?

রতন—তুমি একটুক হাস।

দাশু—কেন কাকা?

রতন—যা হলো, তা হলো, যা হবার তা হবে। মিছা মন দুখিয়ে

লাভ নাই।

জোরে একটা শ্বাস ছেড়ে হেসে ফেলে দাশু : হ্যাঁ গো কাকা। আর মিছা মন দুখাবার দরকার নাই।

জরীপের বাবু বলে—আমি চলি।

মুনিষদের ভিড়টাও কলরব করে ওঠে—চল হে, চল।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মুনিষদের ভিড়টা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এখনও পুরা একটা বেলা আছে। জামুনগড়ার ডাঙাতে টেস রিলিফের কাজে ভিখমজুর খাটলে আধা রোজের মজুরী হবে। চল হে, চল।

দাশু বলে—আমিও চলি, কাকা।

রিঠাগাছের ছায়ার ভিড়ও এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে আস্তে আস্তে দুলতে থাকে। এক ঝাঁক লটকন পায়রা উড়ে এসে রিঠাগাছের মাথার উপর পাখা ফরফরিয়ে হুটোপুটি করতে থাকে। পায়রার ডানা-খসা ছোট ছোট পালকগুলি দমকা হাওয়ার ঝাপটা লেগে বাতাসে ছুটতে থাকে। আর, পাথরের পাটার মত মজবুত যার বুকের পাটা, মধুকুপির সেই দাশু কিষাণ যেন এতদিনে ওই বুকের সব নিঃশ্বাসের জোর হারিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলতে থাকে।

ওরা বলছে, আপন জমি না হোক, তবু মিলতি জোতে ওদের খুব সুখ হবে। হোক, হোক, তাই যেন হয় কপালবাবা। যেন মধুকুপির বাতাসের সঙ্গে কথা বলে বলে পথ চলতে থাকে দাশু।

বাঁশঝাড়ের ধড় হাওয়ার ঝাপটা লেগে ছটফট করছে, আর যেন একটা হায়-হায় শব্দ বাতাসের বুকে আছড়ে পড়ছে। পুরনো জামকাঠের দরজার কপাটে হাত রেখে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—তবে আর মুরলী আসবে কেন? এসে কাজ কি?

ঘরের ভিতরে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর একটা হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে দাশু। আর মাথাটা নামিয়ে হাঁটুর উপর চোখ দুটোকে চেপে রেখে মিথ্যা আশার স্বপ্নটাকে ঘষে ঘষে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

আপন জমি হবে না। গুলঞ্চের বেড়া দিয়ে আপন জমির অহংকার ঘিরে দেওয়া যাবে না। হাত ধরে মুরলীকে বুকের কাছে টেনে এনে চেঁচিয়ে উঠতে পারা যাবে না, হেই দেখ মুরলী, আমার মাটির জাদু দেখ; কেমন সুন্দর জিরার ফলন হয়েছে! সোনার দানার মত জিরা।

হাঁটুটা চোখের জলে ভিজে গিয়ে চবচব করে। ফিসফিস করে যেন ঘরের শূন্যতার কাছে আবেদন করে দাশু—না, তুই আসিস না মুরলী।

ঝুপ ঝুপ ঝুপ! বাঘের থাবার মত দুটো শক্ত হাতের মুঠো দিয়ে কোদালের হাতল আঁকড়ে ধরে জামুনগড়ার ডাঙায় টেস্ট রিলিফের কাজে নতুন সড়কের জন্য মাটি কাটে দাশু। আধা সকাল আর পুরো দুপুর ও বিকাল, ভিখমজুর দাশুর জবীনটা যেন ধুলামাখা হয়ে খাটতে থাকে, যতক্ষণ না ছোটকালুর

মাথার আড়ালে সূর্য ডুবে যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য, দাশু কিষাণের এমন পাথুরে ছাঁদের বুকটাও হাঁপায়; বাঘের থাবার মত শক্ত হাতের মুঠো দুটোও ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে আলগা হয়ে যায়; আর কোদালটাও হঠাৎ উদাস হয়ে গিয়ে কোপ পাড়তে ভুল করে ফেলে।

সন্ধ্যা হলে দুখনবাবুর খাতায় টিপ সই দিয়ে মজুরী নিয়ে, আর আধ সের মকাইয়ের দানা গামছায় বেঁধে নিয়ে, ঘরে ফেরার সময় ডরানির একটা ছোট দহের জলে স্নান ক'রে ধুলোর আবরণ ধুয়ে ফেলতে গিয়ে ছ্যাঁক্ করে চমকে ওঠে শরীরটা; আঃ, ডরানির জল কত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গো!

—মুরলী তুই আসিস না! তিন হাত উঁচু মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা শূন্যতার মধ্যে খেজুর পাতার চাটাইয়ে উপর যতক্ষণ জেগে বসে থাকে দাশু, ততক্ষণ দাশুর বুকের ভিতর থেকে একটা ভাবনার ভয় বার বার উথলে ওঠে আর বিড়বিড় ক'রে বাজে।

কিন্তু মুরলী যেন দাশুর স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে ঝগড়া করে। কেন গো সরদার? এত উদাস কেন তুমি? মুরলীকে ঘরে নিতে মন করে না, এ তোমার কেমনতর মন?

—না, আর আমার সাধ নাই মুরলী।

—কেন?

—আমার জমি নাই। আমার জমি হবে না; কেউ আমাকে জমি দিবে না।

—কিন্তু ওরা যে বলছে···।

—কি?

—একটুক সবুর কর না কেন, জমি দিবে সরকার।

—না না না; দিবে না। আবার আমাকে ওসব গীতের কথা বিশ্বাস করতে বলিস না মুরলী।

—বিশ্বাস কর না কেন সরদার?

—না মুরলী; আর বিশ্বাস করতে মন করে না।

—মিলতি জোতের জমি তো পাবে।

—দূর দূর দূর! মধুকুপির দাশু কভি মিলতি জোতের চাষী হবে না।

—মিলতি জোতে কত ভাল ফলান হবে সরদার? ধান বল, সরগুজা বল আর সব্জি বল, কত ভাল হিস্যা হবে তোমার। মাগ-ছেইলা নিয়ে ভরপেট খাওয়ার সুখ যে হবে সরদার। একটুক ভেবে দেখ সরদার।

—না না না। এমনতর নতুন সুখে আমার সাধ নাই। আমার বড় ডর লাগে আর ঘিন্না করে মুরলী। মিলতি জোতের চাষী হলে আমার ঘর ধাওড়া হয়ে যাবে; আমার সব সাধের উপর মিলতির মার পড়বে। আমার মাগ আর আমার ছেইলাও মিলতির হিস্যা হয়ে যাবে।

—হয়ে যাক না কেন? নতুন সুখে মিছা এত ডর কেন তোমার?

কটমট করে জ্বলতে থাকে দাশুর স্বপ্নের চোখ। কি-ভয়ানক বেলাজ হয়ে মুরলীর কালো চোখ দুটো নতুন সুখের পিপাসায় ধন্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—না, কভি না; তোর ওই চোখ দুটাকে দেখতেও আমার ডর লাগে। তুই আসিস না; যদি আসিস, তবে শুনে নে মুরলী, মধুকুপির গাঁওয়ার কিষাণ তোর মতন অমন নতুন সুখের ক্ষেপীকে ঘরে নিবে না।

ধড়মড় করে বুকটা, চমকে ওঠে দাশু। দু হাত দিয়ে ঘুম-ভাঙা চোখ দুটোকে ঘষতে থাকে। চোখ দুটো হঠাৎ ভিজেও যায়।

সত্যিই দাশুর বুকের ভিতরে যেন একটা ভয়ের ছায়া ছমছম করে, আর হাহাকার বিড়বিড় করে। এ কেমন নতুন সুখের ঠেলা এলো গো কপালবাবা!

জরু গরু ধান, সত্যিই কি সব মিলতি আদরের সওদা হয়ে যাবে? আপন ঘর আর আপন গাঁ বলতে কি কিছু থাকবে না? মধুকুপির মাটিতে জলেতে আর ছায়াতে কি একটুকু বেশি মিঠা স্বাদ আর পাওয়া যাবে না? মরেই যাবে গাঁওয়ার মধুকুপির পুরনো প্রাণটা? মায়াতে কেউ কারও আপন হবে না, শুধু সুখেতে আপন হবে? না, তোর আর এসে কাজ নাই মুরলী। এলে তোর আবার বড় দুখ হবে। দাশু কিষাণের বুকে আর আশা নাই, জোর নাই, সাধ নাই।

মাথাটা পুড়ছে। মুখের উপরেও যেন কতগুলি ফোস্কা জ্বলছে। কেন গো, কেন গো কপালবাবা? বিড়বিড় করতে করতে আবার ঘুম ভেঙে যেতেই বুঝতে পারে দাশু, ঘরের কপাট বন্ধ না করে একেবারে দরজার কাছে মাটির উপর শুয়ে পড়েছিল। সেইভাবে সারাটা রাত পার হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, বেশ বেলা হয়েছে। আধা সকাল পার হয়ে গিয়েছে। মধুকুপির শুকনো আকাশের সূর্য এরই মধ্যে গরম রোদ ঢেলে দিয়ে মধুকুপির মাটিকে তাতাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। সেই রোদ দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকে দাশুর মাথা ও মুখের উপরেও পড়েছে।

পিপাসী কাকের দল ডরানির জল খোঁজবার জন্য অদ্ভুত লোভের ডাক ডেকে উড়ে চলেছে। উঠে দাঁড়ায় দাশু। জামুনগড়ার ডাঙাতে মাটি কেটে আধা রোজের মজুরী পাওয়ার সময় এখনও আছে। হ্যাঁ, যেতেই হবে আর খাটতেই হবে। একটা একলা রক্তমাংসের অস্তিত্ব এখনও ক্ষুধার্ত হয়, খোরাক চায়।

ঠিক আছে; ঠিক আছে; তুমি যেমনটি চাও তেমনটি হবে কপালবাবা! দাওয়া থেকে নেমে হন হন ক'রে হাঁটতে থাকে দাশু।—কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি কপালবাবা, মুরলী যেন আর না আসে। আর, বুকের ভিতরের এই শব্দটাকেও মেরে দাও। মুরলী মুরলী! ভিখমজুরের মনে মিছা আর ওই শব্দটা বাজে কেন?

টেস্ট রিলিফের অফিসের একচালার কাছে এসে কোদাল হাতে তুলে নিতেই একচালাটা যেন অদ্ভুত শব্দ ক'সে হেসে ওঠে। চমকে ওঠে আর দেখে আশ্চর্য হয় দাশু; হেসে উঠেছে বাবু দুখন সিং।

দাশু গম্ভীর হয়ে আর ছোট একটা ভ্রূকুটি করে তাকায়—হাস কেন দুখনবাবু?

দুখনবাবু—হারানগঞ্জের কোন খবর রাখ কি দাশু?

দাশু—হারানগঞ্জের খবরে আমার কোন্ দরকারটি বটে ?

দুখনবাবু—না, দরকার নাই বটে ; কিন্তু…তবু…একটুক জানতে শুনতে ইচ্ছা হয় না কি ?

দাশু—কি জানতে আর শুনতে ইচ্ছা হবে বল ?

দুখনবাবু—তোমার ঘরণী যে ছিল, সিঁদুর মাটি করে দিয়ে তোমার ঘর ছাড়লে মহেশ রাখালের যে বেটি…।

কোদালের হাতল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর দু চোখের চাহনিতে একটা ভয়াতুর বিস্ময় কাঁপিয়ে দুখনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। দুখনবাবু বলে—মহেশ রাখালের খিরিস্তানী বেটির সাথে কার বিয়া হবে জান ?

দাশু—বিয়া হয়েছিল, সে বিয়া রদ হয়েছে ; শিকারীটার ঘর ছেড়েছে মহেশ রাখালের বেটি।

দুখনবাবু—কিন্তু আবার বিয়া হবে। আজই হবে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু। দুখনবাবু আবার হেসে ফেলে—বড় তাজ্জব বটে দাশু। হারানগঞ্জের ডাক্তার রিচার্ডবাবুর সাথে আজ মহেশ রাখালের খিরিস্তানী বেটির বিয়া হবে।

—রিচার্ডবাবু! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। যেন দাশু কিষাণের প্রাণটা অতল বিস্ময়ের একটা দহের জলের মধ্যে পড়ে আর একটা চুবানি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। রিচার্ডবাবু, সেই সাহেবপানা মানুষটি ; কত মান, কত টাকা, কত সুন্দর একটি ফুলবাড়িতে থাকে, সেই মানুষ! নতুন সাধের আর নতুন সুখের মানুষ ; তারই বুকের উপর মাথা রেখে আজ মুরলী সুখী হয়ে যাবে, দাশু কিষাণের সেই মুরলী ?

দাশুর ফ্যালফ্যালে চোখের চাহনি শিউরে ওঠে, বুকের ভিতরে কলিজাটা নাই বোধ হয়। তা না হলে বুকটা এত ফাঁকা আর ফাঁপা লাগে কেন ?

আস্তে আস্তে অদ্ভুত একটা হাসি দাশুর ঠোঁট দুটোকে কুঁকড়ে দিয়ে কাঁপতে থাকে। জোরে একটা শ্বাস ছাড়ে দাশু ; তারপরেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—বড় ভাল হলো দুখনবাবু ; বড় ভাল খবর শুনালে তুমি।

আর বলতে হবে না, মুরলী তুই আসিস না! দাশুর বুকটা এতদিনের একটা মিথ্যা জল্পনার ভার থেকে ছাড়া পেয়ে একেবারে খালি হয়ে গেল। কত ভাল হিসাব জানে মুরলী ; কত বড় সুখের ঘরে চলে গেল মুরলী। বাঃ মুরলী, তুই জাদু জানিস।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে আর হেঁটমাথা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। তারপর কোদালের হাতলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর কাঁধে তুলে নেয়।

রিচার্ড সরকার আর জোহানা সরকার! দুজনে একটা একটা মস্ত বড় ফুলের তোড়া বুকের উপর জড়িয়ে ধরে, আর প্রায় কাঁধে কাঁধে ছোঁয়াছুঁয়ি

করে যখন গির্জাঘরের ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আলোকিত পুলপিটের দিকে পুলকিত হাসির ছটা ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে, তখন বিয়ের শেষ অনুষ্ঠানও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গির্জার ঘরভরা ভিড়ের গলায় একটা গম্ভীর প্রার্থনার কোরাস গম গম করতে থাকে। সিস্টারদিদি তার আগেই তাঁর গম্ভীর ব্লেসিং গম্ভীর গলায় পাঠ করেছেন।

গির্জাবাড়ির ফটকের সামনে চারটে মোটরগাড়ি। এর মধ্যে দুটি গাড়িতে রিচার্ডের রাঁচির বন্ধুর দল এসেছে। ডাক্তার বন্ধু, উকীল বন্ধু আর ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু। আর দুটি গাড়ি হলো রিচার্ডের দুই বউদির গাড়ি। মিসেস বিশ্বাস এসেছেন দুমকা থেকে; আর মিসেস রাজা এসেছেন আদ্রা থেকে।

গির্জাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে রিচার্ড সরকার আর জোহানা সরকার যখন হাত ধরাধরি করে দুটি সুখী জীবনের উৎফুল্ল মিলনের ছবির মত ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন চার মোটরগাড়ির চার জোড়া হেডলাইটও উল্লাসের ঝলক তুলে জ্বলে ওঠে।

চলতে শুরু করে চারটে গাড়ি। হারানগঞ্জের শুভ সন্ধ্যায় উৎসব যেন অজস্র হাসি আর কলরবের সম্ভার নিয়ে গির্জাবাড়ির ফটক থেকে প্রায় একসঙ্গে একটা ছুটন্ত আমোদের মত উধাও হয়ে যায়। প্রথম গাড়িতে রিচার্ড ও মুরলী। দ্বিতীয় গাড়িতে রিচার্ডের দুই বউদি ও আরো দুজন, যে দুজনকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে মুরলী; লুসিয়াদিদি আর মেরিয়া। আজ রাতে মুরলীকে নতুন জীবনের বাড়িতে হাজার লজ্জার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে চলে আসতে পারবে না লুসিয়াদিদি আর মেরিয়া। আজ রাতটা ওখানে থাকতেই হবে।

দুই বউদিও হেসে হেসে বলেছেন, চল মেরিয়া, চল লুসিয়া, শুভরাত্রির মজা যদি তোমরা না দেখবে তো দেখবে কে? আমরা তো গুরুজন।

চার মোটরগাড়ি এসে রিচার্ড সরকারের বাড়ির ফটকের কাছে থামে। বুড়ি দাইটা বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এসে রিচার্ড আর মুরলীর মুখের দিকে তাকায় ও চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে। রিচার্ড সরকারের বাড়ির বাগানে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে, আর লতার তোরণের ভিতরেও রঙিন আলো জ্বলে; লাল-নীল আর বেগুনি রঙের আলো।

রাঁচির বন্ধুর দল হঠাৎ একটা খুশির আবেগে হাততালি দিয়ে আর হুল্লোড় করে হাসতে থাকে। কারণ, গাড়ি থেকে নামবার সময় মুরলীর কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে রিচার্ড; আর মুরলীও মাথাটাকে একেবারে রিচার্ডের বুকের উপর এলিয়ে দিয়েছে।

দুই বউদি, মিসেস বিশ্বাস ও মিসেস রাজা যেন একটা বিস্ময়ের হাসি চাপতে গিয়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন। আর লুসিয়াদিদি ও মেরিয়া একটু লজ্জা পেয়ে হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

রাঁচির বন্ধুর দল আজ রাতেই চলে যাবে। রিচার্ডের বাড়ির সামনে ছোট লনের উপর চেয়ার-টেবিল পেতে যে ভোজের আসর করা হয়েছিল, সেই ভোজের

সুস্বাদু আমোদও কাঁটা-চামচের আর চেঁঝুরের শব্দে ও কাঁচের গেলাসের ঝন-ঝনানিতে মেতে ওঠে।

শুভরাত্রি জানিয়ে বন্ধুরা যখন বিদায় নেয়, তখন মুরলীর কালো চোখ থেকে অদ্ভুত এক জ্বলজ্বলে হাসি ঝলক দিয়ে উথলে উঠতে থাকে। যেন একটা বিস্ময়বিবশ সৌভাগ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী। বন্ধুরা উপহার দিয়ে চলে গিয়েছে; টেবিলটা ভরে গিয়ে উপহারের সম্ভার উপচে পড়ছে।

রিচার্ড সরকারের বাড়ির যে-ঘরের ভিতরে চিনেমাটির প্রকাণ্ড দুটো ফুলদানিতে হলদে গোলাপের দুটো তোড়া থেকে মিষ্টি গন্ধ ভুর ভুর করে উড়ছে, সেই ঘরে মেহগনির একটা পালঙ্কের উপর এক হাত পুরু গদি; সেই গদির উপর পাতা যে নরম বিছানা, তার উপর আবার ফিনফিনে সিল্কের একটি রঙিন চাদর। মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে জলচুড়ির মত কুঁচকে গিয়ে সিল্কের চাদরটা কাঁপছে।

হারানগঞ্জের রাত নীরব হয়ে গেলেও আর রিচার্ডের বাড়ির ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও এই ঘরের ভিতর মিষ্টি মিষ্টি কথার কলরব বাজতে থাকে। মিসেস বিশ্বাস ও মিসেস রাজা, রিচার্ড সরকারের যে দুই বউদি সকাল হতেই চলে যাবেন, তাঁরা হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় একসঙ্গে হেসে ওঠেন—রাত যে একটা হতে চললো।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় দুই বউদি। লুসিয়াদিদি আর মেরিয়াও ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। মিসেস বিশ্বাস বলেন—চল মেরিয়া, আমরা আর এখানে থেকে বেচারাদের শত্রুতা করি কেন?

মিসেস রাজা বলেন—চল লুসিয়া, রাত একটা বাজতে চললো, এখন শুভরাত্রি না হলে আর কখন হবে?

রিচার্ডের উৎফুল্ল মুখের সিগারেটও ফুরফুরে ধোঁয়া ছড়াতে থাকে। মুরলী কিন্তু মাথা হেঁট করে নরম ঠোঁটের একটা লাজুক উত্তাপের শিহর লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

দেয়ালের ঘড়িটা যখন টুং করে রাত একটার সঙ্কেত শিউরে দিয়ে বেজে ওঠে, তখন মুরলীর বুকের ভিতরে একটা বিপুল আশার পিপাসাও শিউরে ওঠে। দেখতে পায় মুরলী, ঘরের দরজা বন্ধ করছে রিচার্ড। মুরলীর বুকের ভিতরে যেন একটা ঝর্ণার শব্দ কলকল করে বাজে; খোঁপাটা কেঁপে ওঠে, মুখটা লালচে হয়ে থমথম করে আর গায়ের জামা সায়া ও শাড়ির আঁটসাঁট বাঁধনগুলিও যেন হাঁসফাঁস করে।

গলার টাই খুলে আয়নার হুকের উপর রেখে দিয়ে আবার সিগারেট ধরাচ্ছে যে মানুষটা, তারই মুখের দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে কাঁপতে থাকে। মুরলীর স্বামী রিচার্ড সরকার। রাঁচির বন্ধুরাও কতবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুরলীকে মিসেস সরকার বলে ডেকেছে।

রিচার্ড সরকারের এই ঘর মুরলীর জীবনের ঘর। মুরলীর ভাগ্যটা এতদিনে যত দীনতা হীনতার ছোঁয়া আর বাঘডাকা রাত্রির ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এক ফুল-

বাড়ির শুভরাত্রির কোলে পেঁাছে গিয়েছে।

মুরলীর কাছে এগিয়ে আসে রিচার্ড। আস্তে আস্তে ডাকে—জোহানা।

মুরলী—কি ?

কোন কথা না বলে মুরলীর সাজানো রাঙানো সুন্দর চেহারাটাকে দুহাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় রিচার্ড। কী প্রচণ্ড আগ্রহের স্পর্শ। মুরলীর বুকটাও অদ্ভুত এক অনুভবের সুখে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। রিচার্ডের প্রাণের সব লোভ যে এখনই উছলে উঠে মুরলীর শরীরের সব লজ্জা ভিজিয়ে ভাসিয়ে একটা দুরন্ত উৎসব শুরু করে দেবে।

মুরলীর কপালের উপর রিচার্ডের নিঃশ্বাসের বাতাস ঝরে পড়ছে। এই বাতাসে যেন হলদে গোলাপের চেয়েও নিবিড় গন্ধের পরাগ আছে। চোখ বন্ধ করে, সারা শরীর আর প্রাণটাকেও চরম ইচ্ছার নেশায় বিভোর করে দিয়ে, রিচার্ডের বুকের ছোঁয়ার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। মনের ভিতর গুণ গুণ করে একটা আশার গান। হে গড, কত দয়া তোমার! আমার স্বামী আমার এই রিচার্ডকে যে মরদানির দেবতা বলে মনে হয়।

রিচার্ড আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে ডাকে—জোহানা।

মুরলী—কি ?

রিচার্ড—তুমি কি জান যে···।

মুরলী—কি ?

রিচার্ডের গলার স্বর হঠাৎ একটু বিচলিত হয়ে কাঁপতে থাকে—আমার দুই বউদি আর তোমার ওই লুসিয়াদিদি ও মেরিয়া, ওরা এখন কি করছে জান ?

মুরলী—না।

রিচার্ড—এই ঘরের ভিতরে উঁকি দেবার জন্য জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে ওঠে মুরলী। আর সত্যিই দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়, দুটো জানালা একেবারে খোলা হয়ে রিচার্ড ও মুরলীর জীবনের এই শুভরাত্রির ছবিটাকে বাইরের চোখে ধরা পড়িয়ে দেবার জন্য ধূর্ত মতলবের মত চুপ করে রয়েছে।

মুরলী বলে—জানালা দুটো বন্ধ করে দাও।

রিচার্ড বলে—না জোহানা।

মুরলী—তবে আলো নিভিয়ে দাও।

রিচার্ড—না জোহানা।

রিচার্ডের গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে ছটফট করে ওঠে মুরলীর লজ্জিত শরীরটা।—তবে ?

রিচার্ড—ওরা জানতে চায় জোহানা, একেবারে চোখে দেখে নিয়ে বুঝতে চায় যে, আমি সত্যিই তোমার স্বামী হতে পেরেছি।

আশ্চর্য হয় মুরলী—কি বলছো, ঠিক বুঝতে পারছি না।

রিচার্ড—আমার দুই বউদির মনে একটা সন্দেহ আছে! তাছাড়া, আমার

মনে হয়, তোমার লুসিয়াদিদি আর মেরিয়ার মনেও একটা সন্দেহ আছে যে···।

মুরলী—কি সন্দেহ ?

রিচার্ড—ওদের ধারণা, কোন মেয়ের স্বামী হবার মত শরীর আমার নেই।

মুরলী ভ্রূকুটি করে—ছিঃ, ওদের সন্দেহ নরকে যাক ; তুমি ওদের সন্দেহের পরোয়া করবে কেন ?

রিচার্ড—ওদের সন্দেহ ভেঙে দিতে চাই জোহানা, সেজন্যে তোমাকে যদি একটু···।

মুরলীর চোখ দুটো যেন রিচার্ডের সুন্দর পৌরুষের এই ভয়ানক অপবাদের উপর একটা আক্রোশ নিয়ে জ্বলতে থাকে। মুরলীর রঙিন নরম ঠোঁট যেন রাগ করে আর ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকে। ধবধবে সাদা দাঁতের কামড় বসিয়ে দিয়ে ঠোঁটটাকে শক্ত করে চেপে ধরে মুরলী। আর রিচার্ডের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজেরই কোমরে জড়িয়ে দিয়ে ফিস ফিস করে মুরলী—। হ্যাঁ রিচার্ড ; একটু কেন, আমি একেবারে বেহায়া হয়ে যেতেও রাজি আছি।·· এস।

রিচার্ড—জোহানা।

মুরলী—যারা দেখবে, তারাই যদি লজ্জা না পায়, তবে আমাদের কোন লজ্জা ?

রিচার্ড আবার ডাকে—একটা কথা শোন জোহানা।

মুরলী—কি বল ?

রিচার্ড—ওদের সন্দেহ মিথ্যে নয়।

—কি ? চেঁচিয়ে উঠেই মুখটাকে রিচার্ডের বুকের উপর আছড়ে দিয়ে যেন বোবা হয়ে যায় মুরলী। রিচার্ডের বুকের হাড়ে যেন জটিল একটা গিঁট আছে। সেই গিঁটে ঠোকর লেগে মুরলীর কপালটা জ্বলতে থাকে।

মুরলীর মাথায় হাত বুলিয়ে নিবিড় আদরের সুরে আর অবাধ হাসি হেসে আবার ডাক দেয় রিচার্ড—জোহানা।

মুখ তোলে মুরলী ; মুরলীর চোখ থেকে যেন মরা আগুনের ছাই ঠিকরে পড়ছে।—রিচার্ড !

—কি ?

—তুমি কি-ভয়ানক ফাঁকির পিশাচ।

—আস্তে কথা বল।

—কেন ?

—ওরা শুনে ফেলবে ; ওরা জানালার আড়ালে কান পেতে আছে।

—ওরা কেন সন্দেহ করে যে, তোমার শরীরে দোষ আছে ?

—মারা যাবার আগে এই সন্দেহ রটিয়ে দিয়ে গিয়েছে স্টিফানা।

—কি বললে ?

—তোমার লুসিয়াদিদির কাছে, তোমার মেরিয়ার কাছে, আর আমার দুই বউদির কাছে বোকা স্টিফানা রাগ করে যেসব কথা বলত···।

—কিসব কথা ?

—বোকা স্টিফানা কত বার বেফাঁস বলে ফেলেছে, আমার স্বামী থেকেও স্বামী নেই, আমার ছেলে হবে না, তবে আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? স্টিফানা শেষ পর্যন্ত…।

—কি?

—বউদিরা আর তোমার লুসিয়াদিদি ও মেরিয়া, ওরা সন্দেহ করে যে, স্টিফানা ইচ্ছে করে মরেছে।

—তার মানে?

—আত্মহত্যা করেছে।

—ওদের সন্দেহ কি মিথ্যা? স্পষ্ট করে বল রিচার্ড।

—মিথ্যে নয় জোহানা। বোকা স্টিফানা শেষে রাগ করে একেবারে পাগল হয়ে গিয়ে বিষ খেয়েছিল।

মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দ এইবার যেন সাপের রাগের শব্দের মত হিস হিস করে ওঠে।—জোহানাও আত্মহত্যা করবে। তোমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জোহানা।

রিচার্ড হাসে—ছিঃ জোহানা; তুমি তো স্টিফানার মত বোকা নও, পাগল নও।

জোহানা—কিন্তু আমি কি মেয়েমানুষ নই?

রিচার্ড হাসে—তুমি চমৎকার বুদ্ধিমতী মেয়েমানুষ। তা না হলে মধুকুপি নামে একটা জংলি গাঁয়ের ঘর থেকে বের হয়ে…।

—চুপ কর। ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী।

রিচার্ড হাসে—আমি জানি, তুমি খুব খুশি হবে, যদি এই বাড়িটা আমি তোমার নামে লিখে দিই।

চমকে ওঠে মুরলী। রিচার্ড বলে—তাছাড়া কিছু নগদ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে তোমারই হাতে দিয়ে দিতে চাই।

মুরলী—কত টাকা?

রিচার্ড হাসে—ধর, অন্তত দশ হাজার টাকা।

মুরলী হাসে—তাতে তোমার লাভ?

রিচার্ড—আমার লাভ এই যে, তাহলে তুমি স্টিফানার মত কাণ্ড করবে না। তুমি আমার মান রাখবে।

মুরলী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—তোমার মান যদি তুমিই রাখতে না জান, তবে আমি কি করে রাখব বল?

রিচার্ড হাসে—সে কথাই তোমার কানে কানে বলতে চাই। শুধু আমার মানের কথা নয়, তোমারও মানের কথা।

জোহানা—বল।

জোহানার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে রিচার্ড। শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে কাঁপতে থাকে মুরলী। রিচার্ডের নিঃশ্বাসের বাতাস যেন একটা শিশু সরীসৃপের স্পর্শের মত মুরলীর প্রাণের উপর সিরসির

করছে।

রিচার্ডের কাছ থেকে সরে গিয়ে আর বিছানার উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে চোখের উপর রুমাল চেপে রাখে মুরলী। কী অদ্ভুত অভিনয় করতে বলছে রিচার্ড! মুরলীকে কী চমৎকার ফাঁকির জাদুকরী বলে মনে করেছে রিচার্ড। একটা ঘোর মিথ্যার কালো ছবিকে খাঁটি সত্যের রঙিন ছবির মত ফুটিয়ে তুলে রিচার্ড সরকারের মান রাখতে হবে। দুই বউদি, আর লুসিয়াদিদি ও মেরিয়ার সন্দেহ আজ মিথ্যে হয়ে যাবে। আজ নিজের চোখে দেখতে পেয়ে ওরা বুঝতে পারবে যে, রিচার্ড সরকার সত্যিই পুরুষের মত পুরুষ, পাগল স্টিফানা মিছিমিছি একটা অপবাদ রটিয়ে শেষে নিজেরই আক্ষেপের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছিল।

মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় রিচার্ড—কি জোহানা?

রিচার্ডের এই ডাক অনুরোধের ডাক নয়; রিচার্ডের গলার স্বর অনুতাপের স্বর নয়। রিচার্ডের চোখের চাহনি অপরাধীর চাহনিও নয়। একটা মূর্তিমান শান্তকঠোর বুদ্ধির ডাক দাবি আর চাহনি।

শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্নের মত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর ধরা গলায় বিড় বিড় করে মুরলী।—লোকে না হয় জানল যে, তুমি বড় ভাল স্বামী; আর আমি বড় সুখী স্ত্রী, কিন্তু তাতে আমাদের কোন্ সুখ হবে?

—চুপ, বাজে কথা বলো না; নয়তো খুব আস্তে কথা বল। আস্তে আস্তে অদ্ভুতভাবে হেসে, যেন একটা রুষ্ট ধমকের স্বর চেপে দিয়ে কথা বলে রিচার্ড।

—কিন্তু ··· । আস্তে কথা বলতে গিয়ে মুরলীর কালো চোখের চাহনি ভীরু হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

রিচার্ড—আর কোন কিন্তু নেই। লোকে যা জানল, তাই তো আসল কথা। ভিতরে আমরা যা-ই হই না কেন, তাতে কি আসে যায়? লোককে জানানো চাই যে, আমরা খাঁটি সুখের স্বামী-স্ত্রী। ব্যস্, তাহলেই হয়ে গেল।

রিচার্ড সরকারের স্ত্রী জোহানা সরকার; এই নাম আর এই পরিচয়ের গৌরব থেকে পালিয়ে যাবার আর উপায় নেই। কিন্তু উপায় থাকলেও পালিয়ে গিয়ে লাভ কি? না, এই ভাল, খুব ভাল।

খোঁপা খুলে বিনুনিটা দুলিয়ে দিয়ে মুরলীও দুলে ওঠে। রিচার্ডও কাছে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরতেই মুরলীর ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গিয়ে হেসে ওঠে।

রিচার্ড—হাসবে না জোহানা; এ সময় হাসতে নেই। ওরা তাহলে ভুল বুঝবে!

হ্যাঁ, রিচার্ড সরকারের পৌরুষের অপবাদ মিথ্যে করে দেবার জন্য মুরলীকে এখন চোখের চাহনিতে নিবিড় অনুভবের আবেশ ফুটিয়ে তুলতে হবে। মুরলীর নরম ঠোঁট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁপবে। রিচার্ডের গলাটাকে দুহাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দুরন্ত তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়তে হবে।

একটুও ভুল হয় না মুরলীর। রিচার্ড সরকারের বৃথা পৌরুষের সেই

আলিঙ্গন আর মিছা উন্দামতা বরণ করে মুরলীর রক্তমাংসের সব পিপাসা যেন ধন্য হয়ে যেতে থাকে। রিচার্ডের কপালের উপর যখন এই কপট উৎসবের শ্রান্তি বড় বড় ঘামের ফোঁটা হয়ে হীরার কুচির মত জ্বলতে থাকে, তখন মুরলীও হাঁপ ছেড়ে, রিচার্ডের মাথা আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে, আর গলার স্বর কলকলিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।—আঃ, তুমি পুরুষ বটে রিচার্ড। তুমি আমার ভাগ্য বটে রিচার্ড।

সেই মুহূর্তে জানালার কাছ থেকে বাইরের বারান্দার অন্ধকারে যেন কতগুলি খুশির হাসি পলাতক নূপুরের শব্দের মত ছুটোছুটি করে পালিয়ে যায়। তার মধ্যে একটা শব্দকে চিনে ফেলতেও পারে মুরলী, ওটা নিশ্চয় মেরিয়ার হাসির শব্দ।

হারানগঞ্জের ডাঙার অন্ধকারে সাঁতার দিয়ে একটা পশ্চিমা হাওয়া হু-হু করে ছুটে এসে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে চীনেমাটির ফুলদানির ফুল কাঁপাতে থাকে। হে গড! আবার পেঁছা হাওয়া ছুটে আসে কেন? হাওয়ার সাথে ডরানির স্রোতের শব্দটাও ভাসে কেন?

জানালার কাছে এগিয়ে এসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করে মুরলী। কিন্তু চমকে ওঠে; আবার মেরিয়ার সেই খুশির হাসির শব্দ চকিত ঝংকারের মত বারান্দার কিনারা দিয়ে যেন ছুটে চলে গেল।

ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসেই মেরিয়ার হাত ধরে ফেলে মুরলী।—কি বটে মেরিয়া?

মেরিয়া হাসে—খুব বটে! আর কথা বল কেন?

কথা শেষ করেই মুরলীব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুরলীর কোমরে জোরে একটা চিমটি কাটে মেরিয়া।

—উঃ চমকে ওঠে, আর হেসে ফেলে মুরলী।

মেরিয়া—উঃ কর কেন?

মুরলী কলকল করে হেসে ওঠে—কোমরে ব্যথা; সত্যিই খুব ব্যথা। কিন্তু বেশ মজার ব্যথা বটে, মেরিয়া।

দাশুর মুখটাকে ওভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করে কেন দুখনবাবু?

কোদাল নেবার জন্য টেস্ট রিলিফের অফিস ঘরের একচালার কাছে দাশু এসে দাঁড়াতেই দুখনবাবুর চোখ দুটো কুঁচকে যায়। দাশুও যেন ভীরুর মত চমকে ওঠে আর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কোদাল হাতে তুলে নিয়েই একটা দৌড় দিয়ে মাটিকাটা লাইনের দিকে চলে যায়।

মাটিকাটা ভিখমজুরদের দলের সঙ্গে নয়; একেবারে একলা হয়ে একটা টিলার পাশে কিংবা গড়্হার ভিতরে নেমে মাটি কাটে দাশু। মাটি কাটতে কাটতে হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়। দম টেনে নিয়ে নিজেরই বুকটার দিকে

তাকায়। কোদাল ছেড়ে দিয়ে হাতের মুঠো দুটোকে চোখের সামনে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। হাতের মুঠোর উপর ফুঁ দেয়।

হাঁটু দুটোও অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। ভয়ানক একটা রহস্য যেন দাশু কিষাণের রক্তমাংসের ভিতরে কিলবিল করছে। বিড় বিড় করে দাশুর ধুলোমাখা ঠোঁট দুটো।—দাশু কিষাণের লেগে তোমার মনে আবার কোন্ দয়া ডাক দিলে গো কপালবাবা?

ধুলোর উপর শরীরটাকে লুটিয়ে দিয়ে বসে পড়ে দাশু। সত্যিই, যেন জঙ্গলের পাপিয়ার মত বিকট খুশির আবেগে ধূলিস্নান করে শরীর জুড়োতে চায় দাশু। মুঠো মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে হাতে পায়ে ও হাঁটুর উপর, এমন কি মুখের উপরেও ছড়িয়ে দিতে থাকে।

সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত শরীরটাকে এইরকম ধুলোমাখা করে যেন একটা প্রচণ্ড ছদ্মবেশ ধরে, নিজেরই চোখের সন্দেহময় চাহনির কাছ থেকে নিজের চেহারাটাকে লুকিয়ে রেখে রোজই কাজ করে যায় দাশু।

জামুনগড়ার শুকনো খট্‌খটে আকাশে যেদিন ভাঙা-ভাঙা কালো মেঘের টুকরো ভেসে চলে গেল, সেদিন সন্ধ্যা হবার আগেই কোদাল থামিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। আজ তো রোদের তেমন তেজ নেই, মেঘের ছায়াও ডাঙার উপর দিয়ে বার বার গড়িয়ে গিয়েছে, তবে পিঠের আর বুকের উপর অদ্ভুত একটা জ্বালা চনচন করে কেন?

কী আশ্চর্য, এই জ্বালার সঙ্গে গা-ঢাকা দিয়ে দুঃসহ একটা পিপাসাও ছটফট করছে। দাশুর গতরের হাড়মাস যেন আর একলা হয়ে থাকা এই শূন্যতা সহ্য করতে চায় না। বুকটা মত্ত হয়ে একটা কোমলতার স্বাদ জড়িয়ে ধরতে চায়। মাটিকাটা লাইন থেকে হঠাৎ ছুটে চলে এসে, কোদাল জমা দিয়ে, শুধু আধা রোজের মজুরী নিয়ে ঘরে ফিরে যায় দাশু।

দাশুর ঘর; তিন হাত উঁচু মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা অন্ধকার। দাশুর পাথুরে গতরটা যেন জ্বালাহরণ ছোঁয়ার লোভে লোভী হয়ে মেজের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে।

আঃ, কত ঠাণ্ডা এই ঘরের মাটি! দাশুর পিঠের আর বুকের জ্বালাটাকে একটা কনকনে ঠাণ্ডা আদরের ছোঁয়া বার বার জড়িয়ে ধরেছে। এই ঘরের মাটি এত ঠাণ্ডা হয়ে গেল কবে?

মাটিকাটা মেহনতের শরীরটার ক্লান্তিও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলেও দাশুর বুকের ভিতরে একটা ভীরু ভাবনা দুরদুর করে। দাশুর হাতের শক্ত মুঠো ভেঙে দিয়ে কে যেন কোদাল কেড়ে নিতে চাইছে। থাম দাশু থাম, আর তোমার মেহনতে কাজ নাই।—না না; এমন কথা বলো না, আমার হাতের কোদাল ছিনে নিও না, হে। আমি যে···।

ঘরের দরজার কাছে কে যেন খকখক করে কাশছে। চমকে ওঠে, চোখ মেলে দরজার দিকে তাকায় দাশু।

—কে বটে হে! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—তুমি কি কবরের ভূত বটে হে? মাটিতে মুখ থুয়ে একা-একা কথা বল কেন? আগন্তুক লোকটা কড়া মেজাজের আওয়াজ তুলে ঘরের ভিতরে উঁকি দেয়।

উঠে বসে দাশু। লোকটার দিকে ভাল করে তাকাতে গিয়ে আরও আশ্চর্য হয়ে যায়। লোকটার গায়ে কালো রঙের মোটা কাপড়ের জামা। জামার পকেট দুটো কাগজপত্রের ভারে ভারি হয়ে ঝুলছে। লোকটার কানে একটা পেনসিল গোঁজা।

পকেটের ভিতর থেকে একটা রসিদ-বই বের ক'রে লোকটা বলে—তোমার তিন বছরের চৌকিদারী খাজনা বাকি পড়েছে সরদার।

দাশুর স্তব্ধ চেহারার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে আর দু'বার কেশে নিয়ে লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে!—দাও হে, তাড়াতাড়ি কর।

দাশু—কি দিব?

—খাজনার টাকা।

—টাকা নাই।

—তবে যে নুটিস হবে হে সরদার?

—হবে তো হবে।

—তোমার ঘরের চিজ-মাল যে তবে নীলামে চড়বে।

হেসে ফেলে দাশু—তাতে ডর নাই।

ভ্রূকুটি করে লোকটা।—ডর নাই কেন? ঘরে চিজ-মাল নাই বুঝি?

দাশু—একটা টাঙ্গি আছে।

লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে।—তাতে বোর্ডের কাছারি ডরবে না। তোমার ঘর ভেঙে, ছাপরের বাঁশ খাপরা আর খুঁটা টেনে নিয়ে···আর তোমার এ শালার পচা কাঠের দরজার চৌকাঠ আর কপাট খুলে নিয়ে··· ।

কাশতে থাকে লোকটা। কাশছে একটা প্রচণ্ড বিদ্রূপ। দাশুর চোখের ফ্যালফেলে চাহনি থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু করে।

লোকটা বলে—সব নীলাম হয়ে যাবে হে সরদার। ঘরের মজা আর নিতে হবে না।

—বড় ভাল কথা বলেছ গো বাবু। বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। চোয়াল দুটো চড়চড় করে বেজে ওঠে। দাশুর মুখটাও অদ্ভুত রকমের কুৎসিত হয়ে হেসে ফেলে।

লোকটা আশ্চর্য হয়।—তুমি রাগ করে হাসছ মনে হয়?

দাশু—না, একটুকও রাগি নাই।

—নিশ্চয় রেগেছ।···সে ত হল···কিন্তু···আমি বলি।

—বল।

—জল খেতে আমাকে একটা টাকা দিয়ে দাও, ব্যস্, তবে আর তোমার কোন ভাবনা নাই। আমি বন্দোবস্ত করে দিব, নুটিস হবে না। আরও এক সাল খাজনা না শুধে···।

—না। এক পয়সা দিব না। লোকটার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায় দাশু।

লোকটা দু'পা পিছনে সরে গিয়ে পাল্টা ভ্রূকুটি করে।—আমাকে ডাঁটলে তুমি ?

দাশু—তুমি যাও।

রসিদ বই পকেটে পুরে নিয়ে লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে যাওয়ালে তুমিও যে যাবে।

দাশু—যাব।

—ঘরছাড়া বেইদা হতে হবে যে !

বেইদা হতে হবে ? বাঃ, টিহা টিহা টিহা ! কিন্তু না, সত্যিই মধুকুপির বিকালের আলোতে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে কোন পাপিয়া ডেকে ওঠে নি। দাশু কিষাণের বুকের ভিতরে একটা অদ্ভুত অনুভবের শব্দ বেজে উঠেছে।

দেখতে পায় না দাশু, লোকটা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, আর, কখন্ চলে গেল। দাশুর চোখ দুটো অপলক হয়ে সামনের সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকালের হাওয়া লেগে নিমগাছের পাতা দুলছে। দুলছে বাঁশঝাড়ের ছায়াটা।

দাশুর বুকের ভিতরেও একটা মিষ্টি বাতাস দুলছে। সেই বাতাসে ফিসফিস করে কথা বলছে একটা মুক্তির সুখ। সব গেল, সব গেল। আর কোন বাধা নেই। মুরলী আর আসবে না, জমিও হবে না ! এইবার ঘরও গেল। এইবার একটা অঘরা বেদে হয়ে যেতে হবে। তবে তুই এখন আয় না কেন সকালী !

সকালী সকালী ! দাশুর বুকের ভিতরে যেন সকালীর উপোষী ইচ্ছার একটা ছবি হেসে-কেঁদে ছটফট করছে—তুমি কি আমাকে ভুলেই গেছ গো সরদার ? নয়তো এতদিনের মধ্যে আমার কথা একবারও মনে পড়ে নাই কেন ? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে আমার মোয়া মুখে নিবে, সে সাধও কি নাশ হয়ে গিয়েছে ?

না ভুলি নাই, ভুলবো কেন ? কিন্তু আসবে কি সকালী ? বড়কালুর মাথা ঘেঁষে সূর্য ডুবতে শুরু করছে। ঘরের দাওয়ার উপর চুপ করে বসে, যেন একটা আশার পাপিয়ার মিষ্টি ডাকের শব্দ শুনতে থাকে দাশু। বুকের ভিতরে একটা পুরনো অনুভবের স্বাদ মত্ত হয়ে উথলে উঠছে। শরীরের সব হাড়মাস কী ভয়ানক ক্ষুধাতুর হয়ে ছটফট করছে।

সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। ঘরের ভিতরে ঢুকে, একবার উনানটার দিকে, আর, একবার মাটির সরার ভিতরে রাখা পাঁচ মুঠো মকাইয়ের দানার দিকে তাকায় দাশু। তারপর চুপ করে বসে থাকে।

কিন্তু দরজার কপাটের উপর ঠকঠক করে দুটো কঠোর শব্দের ঠোকর যেন আছড়ে পড়লো। চমকে ওঠে দাশু। একটা শব্দ যেন প্রচণ্ড এক আহ্লাদের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতের শব্দ। আর একটা হলো, ছোট লাঠির আঘাতের শব্দ। দুটো ভিন্ন ভিন্ন গলার দু'রকম স্বরের হাঁকও শোনা যায়।

—দাশু দাগী ঘরে আছ ? ঘড়ঘড়ে গলার স্বর।

—বাইরে এসো হে দাশু। মিনমিনে গলার স্বর।

জামকাঠের নড়বড়ে দরজার কপাট খুলে দিয়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। রাতের পাখি ডাকছে, আকাশে অনেক তারাও ফুটেছে। গাঁয়ের আঁধার কুয়াশার সঙ্গে জড়াজড়ি শুরু করেছে। তবু বেশ ভাল করে দেখতে পায় দাশু, ছায়াময় একটা টাট্টু ঘোড়ার চেহারা দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে দাশুর ঘরের একটা খুঁটিকে কামড়ে দিয়ে ধরে লেজ নাড়ছে। আর, দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজী ও রামাই দিগোয়ার।

চৌধুরীর পা টলছে। তবু রামাই-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘড়বড়ে গলার স্বর যেন একটা তরল গর্জন বমি করে চৌধুরী কই, কই রে গাধার নাতি, বোতলটা কই রে ?

—এই যে হুজুর! রামাই দিগোয়ারও ব্যস্ত ভাবে টলতে টলতে চৌধুরীর হাতের কাছে একটা বোতল এগিয়ে দেয়।

চৌধুরী—এঃ, তুই শালা নেশার কুম্ভীর বটে রে রামাই। কিছু আর রাখিস নাই মনে হয়।

রামাই—না হুজুর, বাপ কসম হুজুর, আমি শুধু বোতলের গলাটুকু নিয়েছি।

চৌধুরী ঘড়ঘড় করে হেসে আকুল হয়ে ওঠে।—মিছা বাপ বেচারার নামে কসম করিস কেন রামাই ? কসম যদি করিস তবে ···।

রামাই—বলেন হুজুর।

চৌধুরী—তোর ঘরওয়ালীর যৈবনের নামে কসম কর না কেন ?

মিনমিনে গলার স্বর কাঁপিয়ে হাসতে থাকে রামাই—ঘরওয়ালীর যৈবনের কসম হুজুর, আমি বোতলের শুধু গলাটুকু নিয়েছি।

চৌধুরী খুশি হয়ে হাসে—বেশ; তোকে আর তবে গাধাকে নাতি বলবো না রামাই; তুই হলি রয়ল টাইগরের নাতি।

রামাই হাসে—এইবার দাশুকে কথাটা বলে দিয়ে···।

চৌধুরী—হ্যাঁ, এই দাশু দাগী, তুই আমাকে আজও এক পয়সা পরবী দিস নাই; থানাতে হাজিরাও দিস নাই। কিন্তু···সে জন্য ভাবিস না, কোন ডর নাই।

বোতলের সরাব হাঁ-করা মুখের ভিতরে ঢালতে থাকে চৌধুরী। বগবগ শব্দ করে সরাবের ধারা ঝড়ে পড়ে। একটা ঢেঁকুর তুলে নিয়ে চৌধুরী বলে—হ্যাঁ··· তোকে আর টেস রিলিফে খাটতে হবে না দাশু। আমি তোর ভাল রোজগারের কাজ বন্দোবস্ত করে দিব। বল, রাজি আছিস ?

দাশু—ভাল রোজগারের কাজ ?

চৌধুরী—হ্যাঁ, গোবিন্দপুরের পাঁচু দাগীকে বলেছি। ওর পার্টিতে তোকে ভর্তি করে নিবে পাঁচু।

চমকে ওঠে দাশু।—সেটা কেমন কাজ বটে ?

চৌধুরী হাসে—বাবুরবাজারের চকে রাতের বেলা যে মালের গাড়িগুলো থাকে, সেগুলোর উপর একটুক এথি-ওথি করতে হবে। একটা বস্তা চিনি সরাতে পারলেই তো দশটা টাকার হিস্যা হয়ে গেল। ভাবিস কেন?

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে যায় আর মরা গাছের ধড়ের মত নিথর হয়ে যায় দাশু। চৌধুরী বলে—হ্যাঁ···কিন্তু···মাগিটাকে আমার চাই।

—কা'কে চাই? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

চৌধুরী—খবরদার, অমন করে চেঁচাবে না। আস্তে কথা বল।···হ্যাঁ, বেদেনী মাগিটাকে তুমি যখন রাখতে চাও, তখন রাখ। কিন্তু, আমি এসে ওকে মাঝে মাঝে গোবিন্দপুরে নিয়ে যাব। না হয় তো, মাঝে মাঝে একটা-দুটো রাত তোমার এখানেই থেকে···।

রামাই বলে—এ কথা আবার দাশুকে শুধান কেন হুজুর? এতে দাশুর কি কোন অসাধ আছে? হ্যাঁ কিনা দাশু?

একটা পাপিয়ার আর্তনাদ যেন দাশুর বুকের ভিতরে মাথা খুঁড়ে ছটফট করছে। কাঁদতে থাকে দাশু। জবাব দেয় না দাশু।

রামাইয়ের গলার স্বরে আবার মিনমিনে হাসির শব্দ উছলে ওঠে—আমরা সব খবর রাখি দাশু। বেদেনী সকালী তোমাকে বড় পিয়ার করে। অর্জুন সিং বলে, গোকুল সামন্ত বলে, তোমাকে মোয়া খাওয়াবার আশা নিয়ে মাগিটা গোবিন্দপুরের জেল ফটকের কাছে গিয়ে বসে থাকে।

চৌধুরী হাসে—এখন আর জেল ফটকের কাছে যায় না মাগি। সে খবর জেনেছে মাগি, দাশু ছাড়া পেয়েছে।

রামাই—কিন্তু ভাল চালাক বটে মাগিটা। পাঁচ গাঁ ঠুঁড়েও ওর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

চৌধুরী—কিন্তু, কতদিন ছিপে থাকবে মাগি? নাগরের কাছে না এসে পারবে কেন?

রামাই—হ্যাঁ, সেই কথা দাশুকে বুঝিয়ে দেন হুজুর। যখনই মাগি আসবে, তখনই যেন ফাঁড়িতে আমার কাছে খবর দিতে ভুলে না যায় দাশু।

চৌধুরীর হাতের বন্দুকটা দুলে ওঠে। ইস্, আর ভুল করলে শালা যে মরবে। তা হলে আমিও আবার ওকে তিন বছরের মেয়াদে জেলের ভাত খেতে রওনা করিয়ে দিব!

টাট্টু ঘোড়াটা মাড়ির মাংস উঁচিয়ে আর বড় বড় দাঁত দিয়ে চালার খুঁটো শক্ত করে কামড়ে ধরে বিচিত্র এক খুশির আবেগে চাট্ ছুঁড়তে থাকে। চৌধুরী বলে —হ্যাঁ, তবে এই কথা, একেবারে পাকা কথা হয়ে গেল দাশু।

টলতে টলতে এগিয়ে যেয়ে টাট্টুর কাছে এসে, টাট্টুর পিঠের জিনের উপর একটা চাপড় মেরে রেকাবে পা দেয় চৌধুরী। একটা লাফ দিয়ে টলমলে চেহারাটাকে টাট্টুর পিঠের উপর চড়িয়ে দিয়ে হাঁক দেয়—চল রামাই।

টাট্টুর গলার লাগাম-দড়ি হাতে তুলে নিয়ে রামাই দিগোয়ার দু পা এগিয়ে যায়।—চলেন হুজুর।

দাশুর কানের দু পাশ দিয়ে ঠাণ্ডা ঘামের ধারা ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু মুখ টিপে যেন একটা চাপা উল্লাসের হাসি হাসতে থাকে দাশু। কোন ডর নাই সকালী; তোর বেদে হয়ে তোর সাথে যদি চলে যাব, গোবিন্দপুর থানার পিশাচটা তবে আর আমাদের পাত্তা পাবে কেন? সকালী তুই আয়।

—ও কি? ও কি? তোমার মুখে এসব কেমন দাগের চক্কর বটে দাশু? বলতে বলতে একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে দাশুর সামনে আর দাশুর মুখের দিকে তীব্র একটা সন্দেহের আঙুল তুলে তাকিয়ে থাকে দুখনবাবু।

—কি বটে দুখনবাবু? ভয়ানক শূন্য ও উদাস এক জোড়া চোখের চাহনি তুলে দুখনবাবুর সন্দিগ্ধ চোখের চাহনির সামনে ভীরু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

চেঁচিয়ে ওঠে দুখনবাবু—গরলের দাগ বটে কি?

—না না, দুখনবাবু। এত মিছা কথা বল কেন দুখনবাবু? তোমার চোখে গরল আছে বুঝি। বলতে বলতে একটা লাফ দিয়ে সরে যায় দাশু, আর কোদাল কাঁধে নিয়ে ছুটতে ছুটতে মাটি-কাটা একটা গড়হার ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। মধুকুপির সবচেয়ে বড় দেমাকী তেজী আর মজবুত কিষাণের পাথুরে গতরটা যেন প্রচণ্ড এক অপরাধের লজ্জায় মাটি-কাটা গড়হার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আর ধুলোমাখা হয়ে লুকিয়ে থাকতে চায়।

দুখনবাবু চিৎকার করে ছুটে আসে—খবরদার দাশু, তুমি আর এখানে মজুর খাটতে আসবে না; খবরদার, খবরদার, এখনই কোদাল জমা দিয়ে চলে যাও।

দুখনবাবুর মুখের দিকে এক জোড়া হতভম্ব চোখের চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু। যেন এক পরম ভবিতব্যের বাণী শুনছে দাশু কিষাণের আত্মাটা। দুখনবাবু বলে—এবার ছুটি নাও দাশু।

দাশু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—হ্যাঁ, ছুটি নিব।

দুখনবাবু—ঘরে যাও দাশু।

দাশু—হ্যাঁ ঘরে যাব।

দুখনবাবু—তোমার আর কোন কাজে দরকার নাই।

দাশু—দরকার নাই, ঠিক কথা।

কোদালটাকে দুখনবাবুর শক্ত ছায়াটার কাছে ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায় দাশু।

ওই যে কপালবাবার সেই জঙ্গল, আর ওই সেই বেলগাছ। হনহন করে হাঁটতে থাকে দাশু।

হাতের সেই কোদালটাকে যেমন রাগ করে দুখনবাবুর চোখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দাশু, তেমনই রাগ করে শরীরটাকে কপালবাবার আসনের

সামনে শুকনো পাতার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে পড়ে থাকে। কপালের রগ দগ দগ করে। পাঁজরের হাড়গুলি ফুলে ফুলে কাঁপে। বেলপাতা চিবানো সবুজ লালারসের ধারা দু কষ বেয়ে ঝরে পড়ে। বল কপালবাবা, দাশু কিষাণের গতরে কোন্ গরলের কীট ঠাঁই নিলে? সেই গরল বটে কি? কোন কাজে দাশু কিষাণের কি আর দরকার নাই? ছুটি নিতে হবে কি?

মাটিতে কপাল ঘষে ছটফট করে দাশু।—না না না। মিছা কথা বলেছে দুখনবাবু। দেখ না কেন গো কপালবাবা, এগুলা কি গরলের দাগ? ভেরেণ্ডার পাতা দিয়ে সেঁক দিলে কি দাগগুলা মুছে যাবে না?

কপালবাবার আসনের কাছ থেকে মাটি ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ায় দাশু, তখন জঙ্গলের হাওয়া উতলা হয়ে উঠেছে, আর বিকালের রোদও পাখির ডাকের সঙ্গে হুটোপুটি করে গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে।

ধুলোয় ভরা হাত-পা আর বুকটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে দাশু। ছলছলে চোখ দুটোও যেন আঠায় ভরে গিয়েছে। জোরে জোরে চোখ দুটোকে ঘষে নিতেই দেখতে পায় দাশু, হ্যাঁ, এখনও বেলা বেশ আছে। সড়ক ধরে এখনও অনেক লোক জামুনগড়ার ডাঙার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু ওপথের দিকে আর এগিয়ে যেতে চায় না দাশু। লোকের চোখের সন্দেহ থেকে আড়াল হয়ে এই চেহারাটাকে যদি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে সামনের মরা ক্ষেতের মাটি পার হয়ে ওই পলাশবনের ভিতর দিয়ে ডরানির খাতের পাশে পাশে হেঁটে একেবারে লোহার পুলের কাছে পোঁছে যাওয়া যায়। তারপর সড়কটাকে কিছুক্ষণের জন্য ফাঁকা পাওয়া যাবে আর একটা ছুট দিয়ে ঘরে পোঁছে যেতেই বা কতক্ষণ লাগবে?

পলাশবনের মাথার উপর তিতিরের ঝাঁক উড়ছে। মরাক্ষেতের শেষ আল পার হয়ে পলাশবনের ভিতরে ঢুকতেই ভেরেণ্ডার একটা ঝোপ দেখতে পায় দাশু। পটপট করে ভেরেণ্ডার পাতা ছিঁড়ে আর গামছায় বেঁধে নিয়ে আবার চলতে থাকে।

টিহা টিহা টিহা! সত্যিই একটা পাপিয়া ডেকে উঠেছে। দাশুও যেন একটা হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়। এই তো এখানে! এখনও আছে! এটা যে সেই পাথরটা। পাথরের পাশে ওটা যে সেই এক-হাঁটু জলের দহটা!

হাঁড়িয়ার পান্সে গন্ধে বিবশ হয়ে একটা মাতাল পিপাসার বাতাসও বুঝি থমকে রয়েছে! দাশুর বুকের উপর একটা আদুড় কোমলতার পিছল স্পর্শ লুটিয়ে পড়ছে। সকালীর লাল চোখ দুটো যেন দুটো লাল ফুলের রক্তের অভিমান, আর ঠোঁট দুটো মাতোয়ালা পিপাসার দুটো কুঁড়ি। দাশু কিষাণের বুকের কাছে সাধের মরণ খুঁজছে সকালী।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও দাশুর প্রাণের ভিতরটা যেন মাতাল হয়ে দুলতে থাকে। ঠিক আছে; সব ঠিক আছে। দুখনবাবুর সন্দেহ মিথ্যা, দাশু কিষাণের ভয়গুলি মিথ্যা। দাশু কিষাণের গতরে গরল ঢুকে নাই। তা না

লে সকালীর ছোঁয়া নেবার জন্য প্রাণের ভিতর এত বড় পিয়াসের জোর উথলে ওঠে কেন? তুই আয় সকালী। তুই কবে আসবি সকালী?

দহের জলে সকালীর গায়ের গন্ধ আজও লুকিয়ে আছে বুঝি! দাশুর চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে জলের দিকে তাকায়। কিন্তু চমকে ওঠে, চোখ বন্ধ করে, মাথার ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি দুই হাতে মুঠো করে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু। জলের ভিতর থেকে যেন একটা লাসের মুখের ছবি ভেসে উঠেছে। ভুরু দুটো শীর্ণ হয়ে ঝুলে পড়েছে; নাকের ডগাটা ফাটা। কানের দোলকের মাংস ফুলে উঠেছে। মুখের উপর চাকা চাকা লালচে দাগ। আর চোখের পাতাগুলিও ঝরে পড়ে গিয়েছে।

চোখ মেলে তাকায় দাশু। হাতের মুঠা দুটোকে চোখের সামনে এনে দেখতে থাকে। হ্যাঁ, ভাঙা চুলের গুঁড়োতে হাতের মুঠো ছেয়ে গিয়েছে; আঙুলের নখগুলিও কেঁচো মাটির ছোট ছোট টুকরোর মত কুঁকড়ে পাকিয়ে আর শুকিয়ে রয়েছে। আর, সারা গা জুড়ে যেন আঁশ ধরেছে; ফাটা ফাটা চামের চাকা চকচক করছে।

জলের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দাশু। সারা শরীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর করুণ আর্তনাদের মত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—বাঃ, কপালবাবা। খুব দয়া, খুব দয়া; দাশু কিষাণের উপর তোমার দয়ার শেষ নাই।

এত ঠাণ্ডা যে ডরানির জল, সে ডরানির জল দাশু কিষাণের শরীরে আর ঠাণ্ডা ছোঁয়ার স্নেহ ছুঁইয়ে দিতে পারছে না। একটুও ঠাণ্ডা লাগে না এত ঠাণ্ডা জল! দাশু কিষাণের এই জ্যান্ত শরীরের হাড়মাস নির্বোধ হয়ে গিয়েছে।

জল থেকে উঠে একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর চুপ করে বসে থাকে দাশু। হ্যাঁ, পাপিয়াটা ডাকে; কিন্তু দাশুর কানে মিঠা শব্দের স্বাদ নেবার সেই জোর আর নেই। মনে হয় পাপিয়া নয়, একটা রাগী পাখির চিৎকার পলাশবনের বাতাসে ছুটোছুটি করছে। পলাশবনের বাতাসই বা কেমন? এত সুন্দর ফুরফুরে বাতাসের ছোঁয়া দাশুর আদুড় শরীরের উপর এসে লুটিয়ে পড়ছে; কিন্তু দাশুর শরীরে কোন স্নিগ্ধ অনুভবের সুখ ফুরফুর করে না।

একটা কাঠবিড়ালী; কখন এসে দাশু কিষাণের ছড়ানো পায়ের উপর এসে বসেছে, দেখতে পায় নি দাশু। কিন্তু দেখতে পেয়েই হো হো করে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। না, আর ভাবতে হবে না। কাঠবিড়ালীটা এত বড় একটা লেজের রোঁয়া বুলিয়ে দাশুর পায়ের উপর যে সুখের ছোঁয়া ঢেলে দিচ্ছে, সে সুখের স্বাদ পায় না দাশুর শক্ত শক্ত পা দুটো; পায়ের পাতা দুটোও বেঁকতে শুরু করেছে; আর হাঁটুতে কেমনতর একটা ব্যথা।

তবে আর কেন? ভেরেণ্ডার পাতাগুলি গামছার পুঁটলি থেকে খুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে এইবার ডুকরে ওঠে দাশু। না, তুই আসিস না সকালী।

বিকালের আলো যখন একেবারে মরে যায়, আর পলাশবনে ছায়াগুলি অন্ধকারে কালো হয়ে উঠতে থাকে, তখন উঠে দাঁড়ায় দাশু। ফিসফিস করে

হেসে যেন এক পরম অন্তিমের সঙ্গে কথা বলে।—আর মিছা কেন উঠা-বসা করাও কপালবাবা? আর যে উঠবার কোন দরকার নাই; আর যে কোথাও বসবারও দরকার নাই।

কানারানীও যে আজ আর নাই। থাকলে, আজ এই পলাশবনের জঙ্গলের আঁধারে কানারানীর চোখের সেই আগুন দেখতে পেলে কত খুশি হয়ে যেত দাশু। কানারানীর চোখের সামনে এই রোগের ধড়টাকে ফেলে দিয়ে হেসে উঠতো দাশু—নে কানারানী, আমাকে ছুটি করে দে। দাশু কিষাণের এই ঘেয়ো গতরটাকে খেয়ে নিয়ে তুই সুখ কর।

আকাশে তারা দেখা যায় না কেন? তবে কি কালা বাদলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে? ঝড়ো হাওয়ার গোঁ গোঁ শব্দ শুনে তাই মনে হয়। কে জানে ঝড়টা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছে?

পলাশবনের ভিতর থেকে, ডরানির খাতের পাশে পাশে হেঁটে যখন খোলা ডাঙার বুকের উপর পেঁছে যায় দাশু, তখন আকাশের রূপ দেখে আর আশ্চর্য হয়ে আরও একবার থমকে দাঁড়ায়। বিজলি হানছে আকাশটা, আর বড়কালুর পাথর যেন চমক দিয়ে ঝলসে উঠছে। শিলা ঝরবে কি? মেঘ গলবে কি? আর, পুরা তিন ঘণ্টা ধরে জল বর্ষাবে কি মধুকুপির আকাশ?

—কানারানী নাই, কিন্তু ডরানি তো আছে। আবার বিড়বিড় করে দাশু।

ঝড়ের শব্দের সঙ্গে অনেক দূরে ডরানির বুকের একটা শব্দও গোঁ গোঁ করে উঠলো। দাশুর দুই পাটি সাদা দাঁতের হাসি যেন চমক দিয়ে ধবধব করে।—ছুটি নিব, ছুটি নিব দাশু।

ডরানির পুলের কাছে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। কিন্তু আকাশ-ছাওয়া কালা বাদল ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে থাকে; আর তারার ঝাঁকও চিকচিকিয়ে ফুটে ওঠে। ঝড়ো হাওয়াটাও আর গোঁ গোঁ করে না, বিজলীর চমকানিও নেই। মধুকুপির শুকনো মাটির উপর এক ফোঁটাও জল ঝরে পড়লো না।

—ডরানি তুই পাগল হবি কবে? আবার যেন পিপাসিতের মত ছটফট করে আর ফিসফিস করে একটা পরম লোভের সঙ্গে কথা বলে দাশু। তারপর চলতে থাকে।

পুরনো জামকাঠের দরজার একটা নড়বড়ে কপাট ঝড়ের চোট লেগে একবারে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। চালার বাতা একদিকে নেমে গিয়েছে। একটা খুঁটোর মাথা ফেটে গিয়েছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই উনানের মুখে শুকনো পাতা গুঁজে দিয়ে আগুন ধরায় দাশু। সরা থেকে চারমুঠো মকাই-এর দানা আর গোটা দশেক ডুমুর হাঁড়িতে ফেলে দিয়ে তারপর জল ঢালতে গিয়ে প্রচণ্ড একটা লজ্জার আঘাতে স্তব্ধ হয়ে যায় দাশু কিষাণের হাত দুটো। হেসে ফেলে দাশু। আর মিছা কেন রাঁধা করাও কপালবাবা? এই চার মুঠা মকাই-ডুমুরের জাউ খাবে কে? তোমার দয়ার গরল গলিয়ে দিল যে গতর, সে গতরে খোরাক ঢেলে আর লাভ কি?

হাঁড়িটাকে হাতের এক ঠেলা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে দাশু;—না, আর নয়, এইবার তুমি ছুটি নাও দাশু।

উনানের আগুনটা যেন একটা ধুনির আগুন, আর দাশু কিষাণ একটা ছাইমাখা উদাসী সাধু। উনানের শুকনো পাতার আগুন থেকে গরম ছাই উড়ে এসে দাশুর চোখে-মুখে ও মাথায় ছিটকে পড়ে। তবুও নড়ে না দাশু।

হঠাৎ একটা কাক ডেকে উঠতেই চমকে ওঠে দাশু। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায়। না, ভোর হয় নি; নিমগাছের কাক বোধহয় বাসার কাছে একটা হিংসুটে পেঁচার মুখ দেখতে পেয়ে সেই মাঝরাতে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার মধুকুপির সেই তারাছড়ানো আকাশের চারদিকে তৃষ্ণার্তের মত চোখ ঘুরিয়ে তাকাতে থাকে দাশু। ভোর তো হবে, কিন্তু কালা বাদল আবার দেখা দিবে কি? ভাদুয়া মেঘ গলবে কি? আর, ডরানির জল পাগল হয়ে হুড়পা বান বহাবে কি?

দাশুর মনের আশাটা হিসাব করে করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। হবে হবে; আজ না হয় কাল, কাল না হয় এক হপ্তা পরে, একদিন না একদিন পাগল হবে ডরানির জল। হুড়পা বানের ঢল আছাড় দিয়ে দিয়ে বড় বড় পাথরের চাঙড় গুঁড়া করে দেবে। বড় বড় শালের ধড় কুটোর মত ভেসে উধাও হয়ে যাবে। তার সাথে তুমিও ভেসে যাবে, তুমি বড় ভাল ছুটি নিতে পারবে দাশু। চিন্তা কর কেন?

কখন্ ভোর হয়েছে বুঝতে পারে নি দাশু। উনানের কাছে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর সেই ছাইছড়ানো উদাসী সাধুর মত চোখ-মুখ আর মাথা নিয়ে নিঝুম হয়ে তখনো বসে থাকে দাশু, যখন ভোরের কাক ডাক দিয়ে উড়তে শুরু করে দিয়েছে, আর বড়কালুর মাথায় রোদ ছড়িয়ে পড়েছে।

বেশ চনচনে হয়ে সকালবেলার রোদ যখন মধুকুপির সব ডাঙায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন একটা জিপ গাড়ি ছুটে এসে ঠিক দাশু ঘরামির ঘরের সামনে সড়কের উপর নিমগাছের ছায়ার কাছে দাঁড়ায় আর জোরে হর্ন বাজাতে থাকে। কিন্তু জিপ গাড়ির এই হর্নের শব্দও বোধহয় শুনতে পায় নি, পৃথিবীর সব শব্দের সঙ্গে যেন আড়ি করে আর বধির হয়ে ঘরের ভিতরে বসে আছে দাশু।

—ঘরে আছ কি হে দাশু? একেবারে দাওয়ার উপর উঠে আর নড়বড়ে কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে যখন চেঁচিয়ে ওঠে নিতাই মুদী, তখন চমকে ওঠে দাশু।—কে বটে?

—আমি নিতাই।

—তুমি আবার এখানে আস কেন নিতাইদাদা?

—দরকার আছে রে ভাই।

—কার কাছে ?

—তোমার কাছে।

—বল।

—তোমার ভোট চাই।

ঘরের ভিতরের আবছায়ার মধ্যে সুস্থির হয়ে বসে আর নিতাই মুদীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে দাশু।

নিতাই মুদী বিরক্ত হয়ে বলে—হাস কেন দাশু ? ভোট দিবে, তাতে আবার হাসি কিসের ?

দাশু—কাকে ভোট দিব নিতাইদাদা ? তোমাকে কি ?

—আরে না। যাকে ভোট দেবে, সে মানুষ যে-সে মানুষ নয়। কিষাণদের দুঃখের কথা ভেবে দিন-রাত কাঁদে যে, এমন একটি খাঁটি মানুষ।

—সে কে বটে ?

—হারানগঞ্জের ডাক্তার রিচার্ড সরকার।...ব্যস্, তুমি আর বোকার মত হাসাহাসি করবে না। এই নাও, একটা টাকা রাখ; ভোটের দিন সকালবেলা পেটভরে চিঁড়া-গুড় খেয়ে নিয়ে বাবুরবাজারে গিয়ে রিচার্ডবাবুর বাক্সে ভোটটা দিয়ে এস।

—না। টাকা নিব না।

—কেন ?

—আমি ভোট দিব না।

—তবে মর। রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে নিতাই মুদী।

—ঠিক কথা; বড় ভাল কথা বলে দিলে নিতাইদাদা।

বলতে বলতে হেসে ফেলে দাশু। দাশুর সেই অদ্ভুত হাসির শব্দ শুনে ও ঘরের আবছায়ার ভিতরে লুকানো দাশুর মুখের হাসির সেই অদ্ভুত চেহারাটাকেও দেখতে পেয়ে হঠাৎ যেন ভয় পায় আর চমকে ওঠে নিতাই মুদী। তারপরেই দাওয়া থেকে নেমে হনহন করে হেঁটে জিপ গাড়িটার দিকে চলে যায়।

আবার কিছুক্ষণের নিঝুম ভাবনার আবেশ। তবু দাশুর সেই উদাসী মুখের উপর একটা কৌতুকের হাসি থমথম করতে থাকে। আর মিছা কেন দাশু কিষাণের ঘরের কাছে দরকারের হাঁক হাঁকে ওরা ? ওরা বোঝে না কেন, দাশু কিষাণ আর নাই।

—দাশু একবার ঘরের বাইরে এসো হে। আবার একটা ডাক। দুখনবাবুর গলার স্বর চিনতে পারে দাশু। দুখনবাবু বেশ জোরে চেঁচিয়ে আর সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে।

ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেয়ে উত্তর দেয় দাশু।—কি বটে দুখনবাবু ?

দুখনবাবু—তোমার ভোট চাই দাশু।

দাশু হেসে হেসে হাত নেড়ে ইসারায় জানায়—না।

দুখনবাবু ভ্রূকুটি করে তাকায়।—লালবাবুর লেগে ভোট চাই; না কর কেন?

দাশু—না।

দুখনবাবু—তোমার যে দুই টাকা দশ আনা চৌকিদারী খাজনা বাকি পড়েছে, সে খবর জান কি?

দাশু—জানি!

দুখনবাবু—চৌকিদারীর লোক যে আদায় হাসিল করতে তোমার ঘরের কপাট খুলতে আসবে, সেটা জান কি?

দাশু—আসুক না কেন।

দুখনবাবু—আমি বলি; দুই টাকা দশ আনা নাও, চৌকিদারী খাজনা শোধ করে দাও, আর খুশি হয়ে ভোটটি লালবাবুকে দিয়ে দাও।

দাশু—না দুখনবাবু।

দুখনবাবু—কেন? লালবাবুর মত মানুষকে ভোট দিবে না কেন?

দাশু—না।

দুখনবাবু—রাজা রামচন্দ্রের মত মানুষটাকে তুমি ভোট দিবে না?

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—না।

দুখনবাবু—তুমি মর।

দাশু—আঃ, তুমি আজ বড় ভাল দয়ার কথাটি বলে ফেলেছ দুখনকাকা।

চমকে ওঠে দুখনবাবু; সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে দুই চোখ কটমট করে দাশুর সেই কুৎসিত ফাটা ফাটা মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই যেন ভয়ে শিউরে উঠে আর জোরে জোরে হেঁটে চলে যায়।

দুখনবাবু চলে যেতেই ঘরের ভিতরে ঢুকে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর শান্তভাবে বসে, আর, যেন বুকের ভিতরের একটা অদ্ভুত হাসির সঙ্গে মনে মনে খেলা করতে থাকে দাশু। কিন্তু আবার কে যেন আসছে মনে হয়। সড়কের আর-এক দিক থেকে হন্তদন্ত খুশির ছায়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে দাশুরই ঘরের দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসছে একটা লোক। গায়ে চাদর জড়িয়ে আর রোগা রোগা ধুলোমাখা পা ফেলে ফেলে লোকটা আসছে। অনেক দূর থেকে আসছে বলে মনে হয়।

—সরদার। দাওয়ার উপর উঠে আর ঘরের ভিতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় লোকটা।

—কে বটে? উত্তর দেয় দাশু।

—আমি কালু।

—কে?

—ভাল করে দেখে নাও সরদার। দেখ, চিনতে পার কিনা?

আশ্চর্য হয় দাশু। তোমাকে গোবিন্দপুর থানার হাজতে দেখেছি কি?

কালু—হ্যাঁ, সরদার।

দাশু—কিন্তু তুমি মিছা আমার কাছে এসে…।

কালু হাসে—মিছা আসি নাই সরদার।

দাশু—তবে বল।

কালু—উস্তাদ বেচারার ফাঁসি হয়েছে।

—কে? কে? কার ফাঁসি হয়েছে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কালু—হাজারিবাগ জেলে উস্তাদ গুপী লোহারের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

—ভঁইসাল ভাই! ডুকরে ওঠে দাশুর বুকের পাঁজর। কালু দাগীও করুণভাবে হাসে—হ্যাঁ সরদার, তোমার ভঁইসাল ভাই আর নাই। কিন্তু···।

—কি?

চাদরের আড়াল থেকে ছোট একটি থলি বের করে কালু দাগী বলে—এতে পাঁচশত টাকা আছে সরদার।

—কিসের টাকা?

—তোমার হিস্যা। উস্তাদ বেচারা তোমার কথা ভুলে নাই। কয়েদ হবার আগে ওর একটা ভক্তের হাতে টাকাটা দিয়ে বলে গেল, যেন তোমার হিস্যার টাকাটা তোমাকে পেঁছাই দেয়।

—ভক্তটা কে বটে?

—আমি বটি গো। তিন সাল কয়েদ খেটে ছাড়া পেলাম, তবে না তোমার ঠাঁই আসবার মওকা হলো।···হ্যাঁ···এখন···।

—কি?

কালু দাগীর চোখ দুটো চিকচিক করে।—এখন মনের সাধে জমি কর, নতুন ঘর কর আর মাগ ছেইলা নিয়ে সুখ কর সরদার। তোমার ভঁইসাল ভাই যেমনটি বলে গেছে, তেমনটি কর।···ও কি? তুমি কাঁদ কেন সরদার?

দাশু—আমি টাকা নিব না কালু।

কালু—কেন সরদার?

দাশু—আর দরকার নাই।

—তুমি কি তবে···। বলতে বলতে আর কি-যেন সন্দেহ করতে করতে দাশুর মুখটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে কালু। সত্যিই কি ঘর ছেড়ে সাধু হয়ে চলে যাবে বেচারা সরদার? ধুনির ছাই গায়ে মেখে জপতপ করে নাকি সরদারটা? তা না হলে ওর মুখটা এমন উদাসপারা দেখায় কেন?

কালু দাগীর বিস্ময়ের প্রশ্নটাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে দাশু।—আমি ছুটি নিব কালু।

—অ্যাঁ? দাশুর মুখটাকে আরও ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতে গিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে কালু—তোমার এ কেমন দশা হলো সরদার!

দাশু—কপালবাবার দয়া বটে।

কালু—তবে বল সরদার, আমি কি করি?

দাশু—তুমি চলে যাও। কপালবাবা তোমাকে সুখে রাখবেন।

কালু—টাকাটা?

দাশু—যাকে দিবার মন করে তাকে দিয়ে দাও।

কালু—এ টাকা ফিরে নিয়ে যেতে বড় ডর লাগছে সরদার।

দাশু হাসে—না, কোন ডর নাই কালু।

টাকার থলিটা কোমরে গুঁজে আর চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কালু দাগী, তারপর যেন ভয় পেয়ে উসখুস করতে থাকে।

কালু দাগীর মূর্তিটা দাওয়া থেকে নেমে আবার সড়ক ধরে উধাও হয়ে যাবার পর দাশুর চোখের চাহনিটা চিকচিক করে হাসতে থাকে। আর দুখ করবার কিছু নাই। আর রাগ করবার কিছু নাই। ছুটি নেবার আগে যেন বুক ভরে হাসবার আর খুশি হবার একটা পরব দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আর কত দেরি হবে? ডরানি তুই পাগল হবি কবে? দাশুর মনের ভিতরে শেষ লোভের আশাটা আবার গুনগুন করে উঠতেই দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর অদ্ভুত একটা মিষ্টি হাসির শব্দ খিলখিল করে বেজে ওঠে।—সরদার!

খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর বসে দরজার দিকে একটা করুণ চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু।

সকালী এসেছে। কী সুন্দর ঢলঢল করছে সকালীর মুখটা।

কে জানে কোন্ নদীর ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুয়েছে সকালী? লাল চোখ নয়, কটকটে ছটফটে দুরন্ত চাহনিও নয়। সকালীর চোখের সাদা দুটো বড় বেশি সাদা হয়ে ধবধব করে; আর চোখের তারা দুটো কুচকুচে কালো হয়ে চিকচিক করে। যেন শেষ রাতের ঘুমের ঘোরে নতুন আশার স্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠেছে সকালী। আর, স্নান করে একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে নিয়ে ভোরের হাওয়ার সঙ্গে তর্‌তর্ করে হেঁটে মধুকুপির দাশু কিষাণের এই ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

সকালীর খোঁপাটাও আর সেই রুক্ষ চুলের কুণ্ডলী নয়। তেলমাখানো চুলের খোঁপাটাও স্নিগ্ধ হয়ে চিকচিক করে। খোঁপাতে দুটো আধফোটা সাদা ফুলের কুঁড়ি। পরিষ্কার ধবধবে সাদা একটা কালোপেড়ে শাড়ি পরেছে সকালী। এই স্নিগ্ধ চেহারার একটা লাজুক আবেশ সকালীর কোমরটাকে যেন অলস করে দিয়েছে, তাই শাড়ির আঁচলটাকে কোমরের চারদিকে শক্ত করে জড়িয়ে নিয়েছে। নতুন গামছা দিয়ে পোঁটলা করে বাঁধা ছোট্ট একটা উপহারের ভার আদর করে হাতে ধরে রেখেছে। দেখেই বুঝতে পারে দাশু, মকাই-এর খই-এর মোয়া হাতে নিয়ে সকালীর জীবনের আশা আজ দাশুর জীবনের এক দুরন্ত অঙ্গীকারের কাছে জবাব চাইতে এসেছে। দাশুর চোখ দুটো আরও করুণ হয়ে থরথর করে কাঁপে।

দরজার কাছে এগিয়ে এসে, দরজার পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে, যেন স্নিগ্ধ শরীরের সব অনুভবের আবেশ হেলিয়ে দিয়ে, ঘরের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা দাশুর আবছায়াময় মূর্তির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে সকালী—রাগ কর নাই তো সরদার?

দাশু—কার উপর রাগ করবো সকালী?

সকালী মাথা হেঁট করে।—আমার উপর।

দাশু—কেন ?

সকালী—আসতে দেরি হলো বলে ?

দাশু—না সকালী, একটুকও রাগ করি নাই।

সকালী—থানার মুন্সীটার জুলুমের ডরে আসতে পারি নাই সরদার।

দাশু—আজও না এলে ভাল হতো।

চমকে ওঠে সকালী—কেন ?

দাশু—তুমি এই তল্লাটে আর থেকো না সকালী ; দূরে চলে যাও।

সকালী—কেন ?

দাশু—থানার মুন্সীটা তোমার দুশমন বটে।

সকালী আবার মাথা হেঁট করে হাসে।—সে কথা আর বল কেন সরদার ? বাবা বড়পাহাড়ী জানে, দানোটার মতলব এই দুটা বছর আমার পিছু নিয়ে আমাকে কী মরণজ্বালা দিলে ! এই তল্লাট ছেড়ে রামগড়ে চলে যেতে হয়েছিল সরদার।

দাশু—ভাল করেছিলে, আবার চলে যাও।

সকালীর স্নিগ্ধ চোখের কালো তারা দুটো হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে ছটফট করে ওঠে।—আমাকে যাও যাও কর কেন সরদার ?

দাশু—আমাকে মাপ কর, আমি বেদে হতে পারব না।

সকালীর স্নিগ্ধ চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করে। জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে সকালী। তারপর সেই ছলছলে চোখ দুটোকেই অদ্ভুতভাবে হাসিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে—না সরদার, তোমার বেদে হয়ে কাজ নাই। আমিও তোমাকে ঘরছাড়া বেদে করে নিয়ে যেতে আসি নাই।

—কি বললে ? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

সকালী—কিষাণ মানুষ কিষাণ হয়ে থাকবে, কিষাণ হয়ে বাঁচবে, বেদে হবে কেন ?

—সকালী ! দাশুর গলার স্বর একটা বিস্ময়ের বেদনা সহ্য করতে না পেরে ভুকরে ওঠে।

সকালী—ঘর কর সরদার। ঘরণী কর।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে।—বেদেনী সকালী আবার এমন কথা বলে কেন ?

আঁচল তুলে চোখ মুছে নিয়ে যেন অতৃপ্ত জীবনের একটা দুরন্ত ক্লান্তি মুছে ফেলতে চেষ্টা করে আর ফিসফিস করে সকালী—না সরদার, বেদেনী হতে আর সাধ নাই।

দাশু—মরদের ঘর করবার সাধ হয়েছে কি ?

সকালী—হ্যাঁ সরদার। তোমারই ঘর করবে সকালী।

—চুপ সকালী, চুপ। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

সকালী—মিছা চুপ করতে বলো না সরদার। সকালীকে তোমার ঘরে রাখ সরদার।

বলতে বলতে সকালীর এতক্ষণের শান্ত চেহারাটা দুর্বার এক আশার আবেগে

টলমল করে ওঠে। ঘরের দরজার উপর যেন এখনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে সকালীর শরীরটা।

খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে একেবারে দরজার কাছে এসে, শক্ত করে একটা কপাট আঁকড়ে ধরে, আর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। দাশুর চোখ-মুখ আর হাত-পায়ের উপর সকালবেলার আলোর আভাও যেন একটা দুরন্ত কৌতুকের ঝলকের মত ছড়িয়ে পড়ে।

দাশুর মুখের দিকে তাকায় সকালী। সেই মুহূর্তে দু পা পিছিয়ে যায় আর চেঁচিয়ে ওঠে—এ কি! তোমার যে কুট হয়েছে সরদার!

তীব্র, তীক্ষ্ণ ও করুণ একটা হাহাকার; সকালীর আর্তরব শিউরে শিউরে বাজতে থাকে। ডরানির জলের কাছে ভোরবেলার সারসী মানঝি ছোঁড়াদের তীরের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে যে-রকমের যন্ত্রণার রব ছাড়ে, ঠিক সেইরকমের একটা যন্ত্রণার রব। চোখের উপর আঁচল চাপা দেয়, আবার আঁচল সরিয়ে নিয়ে দাশুর মুখের দিকে তাকায় সকালী। চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সকালী।—তুমি আবার আমাকে ঠকালে সরদার! ছিয়া ছিয়া ছিয়া!

দাশু—আমাকে মাপ কর।

সকালী—না, কভি না।

চোখের উপর আবার আঁচল চাপা দেয় সকালী। দরজার পাশে মাটির দেয়ালের উপর কপাল ঠেকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বোবার মত শুধু চুপ করে একঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। সকালীর অভিমানের আক্রোশও আস্তে আস্তে ক্লান্ত হতে থাকে। সকালীর বুকের ভিতর থেকে একটা অসহায় বিলাপের গুঞ্জন বের হয়ে গুন্‌গুন্‌ করে।—ছিয়া ছিয়া! আমি কার লেগে এত সাধ করে নতুন গামছায় বাঁধা করে মোয়া নিয়ে এলাম?

আরও কিছুক্ষণ তেমনই মাটির দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে আর গুন্‌গুন্‌ করে কাঁদবার পর জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে সকালী। আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মোছে আর একেবারে শান্ত হয়ে যায়। দরজার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মোয়ার পোঁটলাটা রেখে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় সকালী। সড়কের দিকে তাকায়।

দাশু বলে—তোমার সাধের চিজ এখানে আর রাখ কেন? নিয়ে যাও।

দাশুর মুখের দিকে না তাকিয়ে, আর গলার স্বর একটু রূঢ় করে নিয়ে যেন ধিক্কার দেয় সকালী—ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ে কোন্‌ লাভ?

দাশু—রেখে গেলেই বা তোমার কোন্‌ লাভ?

সকালী—তুমি দয়া করে খাবে, এই লাভ।

দাশু—না।

মুখ ফিরিয়ে দাশুর মুখের দিকে কটমট করে তাকায় সকালী।—সকালীর ছোঁয়া মিঠাই খেতে আজও ঘিন্না লাগে বুঝি?

দাশু—একটুকও ঘিন্না করে না সকালী। কিন্তু, তুমি এই চিজ নিয়ে যাও।

ঝামটা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সকালী—নিয়ে গিয়ে কি হবে? কাউয়াতে

খাবে কি ?

দাশু হাসে—না ডরানির জলে ফেলে দিলে কাউয়াতে খাবে কেন ?

ডরানির জলে ? ভ্রূকুটি করে কুটে কিষাণের এই বিচিত্র হাসির রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে সকালী। দাশুর হাসিটা যেন একটা ভয়ানক কৌতুকের সঙ্কেত। তা না হলে হাসে কেন দাশু ?

—ডরানির জলে ফেলে দিব কেন ? দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে সকালীর চোখ দুটো যেন একটা নতুন সন্দেহের বেদনায় কাঁপতে থাকে।

দাশু হাসে—ডরানির জল বড় ঠাণ্ডা বটে, আর দাশু কিষাণের গতরে বড় জ্বালা বটে।

—সরদার। ফুঁপিয়ে ওঠে সকালী।

—তুমি মিছা কাঁদ কেন ? ফিসফিস করে দাশু।

মিছা কান্না ? দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর শান্ত হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে সকালী। মধুকুপির যে কিষাণের বুকের ছোঁয়া এত ভাল লেগেছিল, সেই কিষাণের জীবনটাকেও কুষ্ঠরোগের একটা লাস মনে করে পালিয়ে যাচ্ছে সকালী ?

—আমি যাব না সরদার! অদ্ভুত এক জেদের মূর্তি ধরে চেঁচিয়ে ওঠে সকালী।

দাশু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—কি ? কেন যাবে না ?

সকালী—আমি তোমার ঘরে ঠাঁই নিব।

দাশু—ক্ষেপীর মত কথা বল কেন সকালী ? কুটিয়া মানুষের ঘরে থাকতে তোমার যে…।

সকালী—আমার একটুকও দুখ হবে না সরদার।

দাশু—কিন্তু আমার এই ঘর যে ঘর নয়। এই ঘর নিলাম হয়ে যাবে।

সকালী—যাক না কেন ? ভিন গাঁয়ের ভিন ঘরে থাকবো।

দাশু—আমার এই গতরে যে খাটাখাটিও আর চলবে না।

সকালী—আমার গতর কি নাই ? আমি খাটবো। আমি তোমার ভাত দিব। চাও তো, আমি তোমাকে…।

দাশু—কি ?

সকালীর চোখে অদ্ভুত এক ইচ্ছার জেদ জ্বলজ্বল করতে থাকে।—চাও তো আমি তোমাকে ছেইলা দিব। তোমার কুটিয়া গতরকে একটুকও ঘিন্না করবে না সকালী।

চমকে ওঠে দাশু; দাশুর শরীরের জ্বালার উপর যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়েছে। নিঃশ্বাসের বাতাসে সান্ত্বনা, আর রক্তের ভিতরে শান্তি। হিসাব জানে না, একটুকও হিসাব জানে না সকালী; শুধু মায়া করতে চায়, আর কিছু চায় না, এমন মানুষও দুনিয়াতে আছে। হে কপালবাবা, ছুটি নিতে যে ইচ্ছা করে না।

—সকালী! আস্তে আস্তে ডাকে দাশু।

—চিন্তা কর কেন সরদার? যেন বুকের সব নিঃশ্বাসের আবেগ ঢেলে দিয়ে নিবিড় স্বরে দাশুর জীবনটাকে আশ্বাস দেয় সকালী।—বাবা বড়পাহাড়ী দয়া করেন, তোমার রোগ সেরে যাবে সরদার।

হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়, কোন চিন্তা করতে আর ইচ্ছা হয় না। সকালী জল ঢেলে দিয়ে ধুয়ে মুছে দিলে গরল চলে যাবে। আবার টাঙি কুদালি হাতে নিতে পারা যাবে। আবার ক্ষেতজোত হবে, নিশ্চয় হবে। ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙবে দাশু, ছিটাই বুনাই করবে সকালী। পাঁচ বিঘা মাটির ক্ষেত আর গুলঞ্চের বেড়া, হে কপালবাবা! আকাশে ভাদুয়া মেঘ গলছে, ঝিরঝির ঝরানি শুরু হয়ে গিয়েছে। চল সকালী চল। কাঁধের উপর ছেইলাটা, বুকের উপর মাদলটা, পাশে পাশে সকালী।

—খাও সরদার। ডাক শুনে চমকে ওঠে দাশু। হ্যাঁ দাশুর জীবনের দরজার কাছে এসেই গিয়েছে আর বসে পড়েছে সকালী। নতুন গামছার পোঁটলা খুলে মকাই-এর খই-এর মোয়া বের করেছে।

দরজার চৌকাঠের কাছে মেজের মাটির উপর বসে পড়ে দাশু, আর মকাই-এর খই-এর মোয়ার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়।

কেঁপে ওঠে হাতটা। তার পরেই কেঁপে ওঠে দাশু কিষাণের সেই অদ্ভুত চোখ, যে চোখ থেকে পাতা ঝরে গিয়েছে আর ময়ূরের চোখের মত সাদা দাগের চক্কর চোখের কোলে ফুটে উঠেছে। কি-যেন দেখতে পেয়েছে দাশু।

দাওয়ার সামনে যে ছোট নিমগাছটা, তারই ধড়ের আড়াল থেকে একটা বন্দুকের নল আস্তে আস্তে উঁকি দিয়ে কাঁপছে। দুরন্ত শিকারলোভীর মত সকালীর পিঠটার দিকে তাক করে নিয়ে একেবারে সুস্থির হয়ে গেল বন্দুকের নলটা।

—খবরদার, পলুস হালদার! হুংকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে দাশু। দরজার বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সকালীকে আড়াল ক'রে, বুক চেতিয়ে আর দুই হাত তুলে দাঁড়ায় দাশু। চমকে ওঠে সকালী, উঠে দাঁড়ায়, আর দাশুর পিঠের পিছনে নরম ছায়ার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তুমি সরে যাও সরদার। নিমগাছের আড়াল থেকে যেন হোঁচট-খাওয়া মানুষের মত একটা যন্ত্রণাক্ত চেহারা নিয়ে, চিৎকার করে আর লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে আসে পলুস হালদার।

—কভি না। গর্জন করে ওঠে দাশু।

—শুধু একটা টোটা আছে সরদার। আমার কথা শুন; তুমি সরে যাও।

—বেশ তো; আমারও একটা বুক আছে। যদি সাধ হয়, তবে আমার বুকের উপর টোটা খালাস করে নাও।

—তুমি সরে যাও সরদার। দাশুর পিঠের পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে সকালী, আর চোখ দুটো ধিকিধিকি করে জ্বলতেও থাকে।—খিরিস্তানের বন্দুকের জোর কত, আমাকে বুঝে নিতে দাও সরদার।

—না, কভি না। দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে সকালীকে আড়াল করে রাখে দাশু। —মারতে হলে আমাকে মেরে চলে যাক্ শিকারীটা।

দাঁতে দাঁত ঘষে চেঁচিয়ে ওঠে সকালী—তোমাকে মারবে এই শিকারীটা? ইঃ, আমি যে তবে ওর টুঁটি ছিঁড়ে লেহু পিয়ে নিব।

পলুস হালদারের গায়ে শুধু একটা ময়লা গেঞ্জি, পরনে একটা কালিঝুলি মাখা নীল রঙের পেন্টালুন। মাথাটা উসকো-খুসকো; যেন অনেকক্ষণ ধরে দু হাতে মাথার চুলের ঝুঁটি টানাটানি করেছে পলুস।

বন্দুকটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে, আর এক হাতে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে জোরে একটা শ্বাস ছাড়ে পলুস। তারপর একেবারে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দাশুর আর সকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হেসে ফেলে পলুস। কিছুক্ষণ আনমনার মত মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই বন্দুকের নলটাকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে, নলের মুখটাকে নিজের বুকের উপর শক্ত করে চেপে ধরে।

এক লাফ দিয়ে নিমগাছের দিকে এগিয়ে যেয়ে পলুসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাশু; বন্দুকটাকে যেন থাবা মেরে আঁকড়ে ধরে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পলুসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়!

পলুসের গম্ভীর করুণ হতাশ আর ব্যথিত মুখটা আবার অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—তুমি বাধা দাও কেন সরদার? একটা টোটা আছে, খালাস করতে দাও।

—না, কভি না। তুমি কার উপর রাগ করে নিজেকে নাশ করতে চাও হালদার?

পলুস—একটু আগে শুধালে বলতাম, ওর উপর রাগ করে। শুকনো চোখের ভুরু টান করে সকালীকে দেখিয়ে দেয় পলুস।

দাশুর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়।

পলুস—কিন্তু না, সকালীর উপর আর রাগ নাই। যার উপর রাগ হয়, তাকেই নাশ করতে চাই সরদার; তুমি বাধা দিও না।

দাশুর হাত থেকে বন্দুকটা কাড়তে চেষ্টা করে পলুস। হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—না, কভি না। ছিনাছিনি করো না; আমার কুটিয়া হাতে জোর নাই হালদার। তুমি থাম হালদার।

ছিনাছিনি থামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস; তারপর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ভয়ানক এক অভিমানের হাসি হাসতে থাকে।—তোমার কুটিয়া হাতে বড় জবর জোর আছে সরদার। তুমি কী ভয়ানক ছিনে নিতে পার!

দাশু—কি বললে?

কোন উত্তর না দিয়ে আবার মাটির দিকে আনমনার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পলুস। টপ্ টপ্ করে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা পলুসের চোখ থেকে ঝড়ে পড়ে।

দাশু আশ্চর্য হয়—এ কি হালদার?

চাপা গলায় ফুঁপিয়ে ওঠে পলুস হালদার।—সকালী!

চমকে ওঠে দাশু। পলুসের সজল চোখের চাহনিটা যেন দাশু কিষাণের এই কুণ্ঠগ্রস্ত জীবনের এক নতুন অহংকারের কাছে নিঃসহায় এক প্রার্থীর আবেদন। কি-যেন বলতে চায় পলুস, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারছে না, আর মাথাটা বার বার হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে সকালীর দিকে একবার তাকায় দাশু। দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর দরজার কাছে চুপ করে বসে আছে সকালী। ঢলঢল করছে সকালীর সুন্দর মুখটা। তেলচিকণ খোঁপাতে সাদা ফুলের আধফোটা কুঁড়ি দুটোও সুস্থির হয়ে রয়েছে। সকালীর নাম করে পলুস হালদারের বুকের ভিতর থেকে যে অভিমান উথলে উঠেছে, তার শব্দ শুনতে পায় নি সকালী। দাশু কিষাণের ঘরের দরজার মাটি আঁকড়ে একেবারে শান্ত কঠোর ও নির্বিকার একটা মূর্তি ধরে বসে আছে।

পলুস হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে দাশু। বুকটা একবার ধড়ফড় করে ওঠে। তার পরেই দাশু কিষাণের সেই রোগের দেহটা যেন লোহার মূর্তির মত কঠিন হয়ে যায়। ফিসফিস করে দাশু।—সকালীকে ঘরে নিয়ে যেতে চাও, হালদার?

পলুস—হ্যাঁ সরদার। কিন্তু যাবে কি সকালী?

হেসে ফেলে দাশু।—নিশ্চয় যাবে।

আস্তে আস্তে হেঁটে, ঘরের দাওয়ার উপর উঠে, দরজার কাছে এসে, আর, চুপ করে সকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

সকালী বলে—কি বটে সরদার? খিরিস্তানটা যায় না কেন?

দাশু হাসে—যাবে, যাবে, কিন্তু একা যাবে না।

সকালী ভ্রূকুটি করে।—কি?

দাশু—তোমাকে নিয়ে যাবে।

সকালী—মিছা কথা।

দাশু—মিছা কথা নয়।

সকালী—কিন্তু আমি যাব কেন?

দাশু—যাওয়া ভাল।

সকালীর চোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—এমন কথা বলতে তোমার লাজ লাগে না? তুমি কোন্ সাধে এমন কথা বল?

দাশু—তোমার ভাল হবে, সেই সাধে বলি।

—তুমি ঠগ বট সরদার। তুমি পাথর বট সরদার। তোমার মনেও এত গরল ছিল! হায় বাবা বড়পাহাড়ী! মাথা হেঁট করে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে থাকে সকালী।

দাশু বলে—পলুস হালদার কাঁদছে।

চমকে ওঠে সকালী।—অ্যাঁ? কেন কাঁদলে? কার লেগে কাঁদলে?

দাশু—তোমার লেগে।

আবার মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে থাকে সকালী।

দাশু—যাও সকালী।

সকালী—তুমি যেতে বল ?

দাশু—হ্যাঁ।

সকালী—একটুক ভেবে নিয়ে বল।

দাশু—খুব ভেবে নিয়ে, খুশি হয়ে বলছি।

দাশুর মুখের দিকে অপলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে সকালী—তুমি কেন খুশি হও সরদার ?

দাশু—তোমাকে ভাবতে যে আমার বড় মায়া লাগে। তুমি যে…।

সকালী—ব্যস্, আর বলতে হবে না সরদার। বুঝলাম!

তেলচিকণ চুলের খোঁপাটাকে খুলে নিয়ে শক্ত করে আবার জড়িয়ে বাঁধে সকালী। শাড়ির আঁচলটাকে টানাটানি করে গুছিয়ে নিয়ে মাথার উপর টেনে দিয়ে, চুপ করে দুই হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে বসে থাকে।

দাশু হেসে হেসে আর চেঁচিয়ে ডাক দেয়—হালদার!

মুখ তুলে তাকায় পলুস—কি বটে ?

দাশু—ওখানে দিনকানা ভুতের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এখানে এসো, হালদারিনকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে যাও। তা না হলে যাবে কেন বেচারা ?

এগিয়ে আসে পলুস। সকালীর হাত ধরে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সকালী।

দূরের আকাশের এক কোণে কালা বাদল ঘনিয়েছে মনে হয়। ডাঙার উপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের একটা আঁধিও দৌড়ে চলে গেল। দাশুর চোখ দুটো পিপাসীর চোখের মত দূরের আকাশের সেই মেঘে ভরাট চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই ব্যস্ত হয়ে হাঁক দিতে থাকে দাশু।—না, আর দেরি করবে না, হালদার। সিধা ভুবনপুরের সড়ক ধরে চলে যাও। যদি জিরাতে হয় তবে নিরসাচটিতে একটা ঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে খাওয়াদাওয়া করে নিও। তারপর মোটর বাস ধরে…হ্যাঁ, এখন কোথায় যাবে হালদার ?

পলুস বলে—কাতরাসগড় যাব সরদার। রেল কোম্পানীর কারখানায় কাজ পেয়েছি।

দাশু—ভাল ভাল, খুব ভাল বটে হালদার। কপালবাবা তোমাদিগে সুখে রাখেন।

পলুসের পাশে পাশে হেঁটে সড়কের উপরে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায় সকালী। তারপর চলতে থাকে। ঘরের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আর নিথর হয়ে তাকিয়ে থাকে দাশু।

দূরের আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দেয়; আর দাশুর চোখে সেই ঝিলিকের ছবি ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে

বিপুল এক স্বস্তিময় আরামের শ্বাস ছাড়ে দাশু। আঃ, কপালবাবার দয়াতেও কত মজা! কোথা থেকে চলে এল বেচারা পলুস হালদার; সকালীকে হাত ধরে আর মায়া করে নিয়ে চলে গেল। ভাল হলো, বড় ভাল হলো।

ছুটি নেবার জন্য তৈরি হয়েও ভুল করে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য লোভ করেছিল দাশু। বেচারী সকালীর বোকা মনটাকে মিছা অভিমানে ভুলিয়ে দিয়ে সকালীর বুকের একটা ভয়ানক মায়ার জেদ ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। সকালীর অসহায় ভাগ্যটাকে চুরি করতে চেয়েছিল দাশু। এই কুটিয়া গতরের ছায়া আর ছোঁয়া দিয়ে সকালীর খোঁপার সাদা ফুলের কুঁড়ির সব সাধ কালো করে দিতে চেয়েছিল। ছিয়া ছিয়া। মধুকুপির দাশু কিষাণেরও মনে এমন ভুল হয়?

—মন ভুল করেছিল বটে, কিন্তু কপালটা ভুল করে নাই দাশু! দাওয়ার উপর নিজেরই ছায়াটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলে দাশু আর চোখের চাহনিও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বেঁচে গিয়েছে সকালী; সুখের ঘরে চলে গিয়েছে। দাশুর মুক্তির পথে আর কোন বাধা নেই। কোন লোভের কাঁটা নেই; কোন মায়ার বেড়া নেই।

ক্যা ক্যা ক্যারর্—একটা রাম শালিকের আতঙ্কের কর্কশ স্বর। হিংসুটে বিড়ালের চেহারা চোখে পড়লে ঠিক এইরকম আতঙ্কের কর্কশ রব ছাড়ে শালিকগুলি। দেখতে পায় দাশু, নিমের ডালে বসে শালিকটা দাশুরই দিকে তাকিয়ে এই অদ্ভুত আতঙ্কের কর্কশ বিলাপ ছাড়ছে আর কাঁপছে।

—আমাকে এত ডর কেন রে? হেসে ফেলে দাশু। শালিকটার আতঙ্কের রব আরও কর্কশ হয়ে বেজে ওঠে। সত্যিই ভয় পেয়েছে শালিকটা। শালিকটা যেন দাশুর এই স্তব্ধ অস্তিত্বটাকে সহ্য করতে পারছে না। দাশুকে মধুকুপির সেই দুরন্ত মাটিকাটা অহংকারের কিষাণ বলে চিনতেও পারছে না।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আর তেমনি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে দাশু। চোখে পড়ে, একটু দূরে দেড় বিঘা চাকরানের বুকটা যেখানে প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে, পুরনো ইঁটখোলার যত ঝামা আর ঝুনোর হাড়গোড় নিয়ে হাঁ করে পড়ে আছে, সেখানে শিয়ালকাঁটার ঝোপের ভিতর থেকে সত্যিই একটা শিয়ালের মুখ উঁকি দিয়ে দাশুর দিকে তাকিয়ে আছে।

—তুই আবার কি ভাবছিস রে? বিড়বিড় করে দাশু।

শিয়ালটার মুখটা যেন একটা অভিযোগের মুখ। যে মানুষের জীবনে আর কোন কাজ নেই, সাধ নেই, আশা নেই, সে মানুষ এখনও এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? কিংবা, দাশু কিষাণের এই ঘেয়ো চেহারাটাকে জীবন্ত মানুষের চেহারা নয় বলে সন্দেহ করছে শিয়ালটা?

একটা ভীমরুল। ভীমরুলটা যেন একটা রাগের গুঞ্জন তুলে দাশুর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। উড়ে উড়ে ঘুরছে আর বার বার তেড়ে আসছে ভীমরুলটা।

—তুই আবার রাগিস কেন? কি শুধাতে চাস? বিড়বিড় করতে করতে দু পা এগিয়ে যেয়ে দাওয়ার একটা খুঁটো ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

—যাও যাও, মিছা আর হেথা দাঁড়িয়ে থাক কেন দাশু ?

—হ্যাঁ, যেতে তো হবে ; কিন্তু দাশুকে তোমাদিগের এত ঘিন্না কেন ? কি পাপ করেছে দাশু কিষাণ ?

—বুঝে দেখ।

—কি আর বুঝতে বল হে ? শুধু নতুন হতে পারি নাই, এই পাপ করেছি। আর কোন পাপ করি নাই।

চালার বাতার একটা কাঠের গায়ে হঠাৎ ঠোকর লেগে ভীমরুলের ধড়টা ঝুপ করে মাটির উপর পড়ে, ছটফট করে, তারপরেই উড়ে উধাও হয়ে যায়।

ঘরের ভিতরে ঢুকে গামছাটাকে হাতে নিয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়ায় দাশু। কালা বাদলের ঘোর তখনও দূরের আকাশের এক কোণে কালো হয়ে আছে। গামছাটাকে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নড়বড়ে জামকাঠের একটা কপাটকে যেন খিমছে ধরে দাশু। না, আর তোকে ঠেলা দিব না ; এই ঘর আর বন্ধ করতে হবে না। তোকে খোলা রেখে দিয়ে চলে যাব। চৌকিদারীর পিয়াদা আর আদালতের বাবু এসে যদি নিলাম হেঁকে তোকে ছোঁয় তো ছুঁবে। তুলে নিয়ে যায় তো নিয়ে যাবে। আমি আর তোকে ছুঁতে আসবো না।

ছটফট করে দাওয়া থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে নীচের ঘেসো মাটির উপর দাঁড়ায় দাশু। কিন্তু বুকের ভিতরে ভয়ানক একটা শূন্যতা ছটফটিয়ে ওঠে। বড় বিস্বাদ হয়ে গেল মুক্তির আনন্দ !

—হায় রে ঘর ! হায়রে মধুকুপির মাটি !

—ছিয়া দাশু, মিছা আবার মনটাকে দুখাও কেন ?

—কেন দুখাবে না বল ? আমি কারও সুখ নাশ করি নাই ; আমি কোন কসুর করি নাই ; তবে আমার গতরে গরল ঢুকে কেন ? আমার কুট হয় কেন ?

—আঃ, আবার কেন ভুল কথা বল দাশু ?

—না, আমি আজ জবাব নিয়ে যেতে চাই।

—জবাব কেউ দিবে না হে। কপালবাবাও দিবে না।

—তবে বল না কেন, কপালবাবার দয়াতে বিচার নাই।

—ছিয়া ছিয়া, এমন কথা বলতে নাই। কপালবাবার দয়াতে বড় ভাল বিচার আছে দাশু।

—আমার সব সুখ নাশ হলো, এটাকে ভাল বিচার বল ?

—তবে তুমি বল, কেমন বিচার ?

—বড় মজার বিচার বটে।

—তবে তাই বটে।

—তাই বল না কেন ? ঘেসো মাটির দিকে তাকিয়ে একটা অবুঝ বিস্ময়ের জ্বালা চোখে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। ছুটি নেবার উল্লাসটা মনমরা হয়ে বুকের ভিতর কাতরাতে শুরু করেছে। এক মুঠো অবহেলার ধূলির মত ঝড়ের বাতাসে উড়ে গিয়ে ডরানির জলে পড়ে যাওয়া, বাস্, তারপর দাশু কিষাণের কোন চিহ্ন থাকবে না। বাঃ, কী মজাদার সাজা !

না, ভাল লাগে না। চোখের সামনের এইসব আলো-ছায়া দেখতে একটুও ভাল লাগে না। দাশুর জন্য মায়া করে একটা পাখিও ডাকে না, একটা পাতাও কাঁপে না। দাশুর কথা ভেবে কোথাও কারও চোখ ভিজে না। বাঃ, কী সাজা-দার মজা!

বুকের ভিতরে কলিজাটা যেন ফোঁপাতে শুরু করেছে। নিজেরই এই ফুটিয়া শরীরটাকে আদর করে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে করে। ত্রিশ বছর বয়সের কঠোর ধড়টা যেন এইটুকু একটা শিশুর নরম শরীর হয়ে যেতে চায়।

বিষুয়া পরবের সময় গোবিন্দপুর থেকে মেলা দেখে গাঁয়ে ফিরতে গিয়ে পথ চলতে চলতে বাপের কাছছাড়া হয়ে পিছিয়ে পড়েছে দাশু। বাপকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদেও উঠেছে। পথের ভিড়ের মানুষগুলি শুধাচ্ছে, তোমার কোন্ গাঁয়ে ঘর, কার ছেইলা তুমি?

—কুথাকে গেলি রে বাপ। চেঁচিয়ে ডাক দিতে দিতে ছুটে আসছে দাশুর বাপ।—এই তো আমি, কাঁদিস কেনে বাপ, কোন ডর নাই বাপ। বলতে বলতে ছোট্ট ছাগলের বাচ্চার মত দাশুর সেই ছোট্ট নরম শরীরটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে পথ হাঁটতে থাকে দাশুর বাপ। দাশুর ধুলোমাখা পা দুটো বাপের কাঁধের দু পাশ থেকে ঝুলে বাপের বুকের উপর দুলতে থাকে। দাশুর সেই ধুলোমাখা পায়ে কত আদর করে হাত বোলাতে থাকে দাশুর বাপ।

দাশুর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা মায়ার স্বর ডুকরে ওঠে।—তুই কোথায় আছিস রে বাপ?

কী আশ্চর্য, আজ দাশুর বুকটা যে ঠিক ওর বাপের গলার স্বর নিয়ে নিজের ছেলেটাকে ডেকে ফেলেছে। হ্যাঁ, বড় মিঠা ডাক, বড় মিঠা বাতাস। বড়কালুর বহেড়ার জঙ্গলের মাথা নড়ছে, ঝড়ের শব্দ শোনা যায়। কী মিঠা আওয়াজ! হাঁ, ওটা যে আমারই ছেইলা বটে। ডাগরটি হবে, জোয়ান হবে, বিয়া করবে, আমার পুতবহুর যেন চাঁদপারা মুখটি হয় কপালবাবা।

কি যেন ভাবে আর হঠাৎ থর থর করে কেঁপে ওঠে দাশু।—ছেইলাটা আছে তো?

আছে, নিশ্চয় আছে। মুরলীর কোলের আদরের কাছে আছে। ছেইলার লেগে যে মুরলীর মনে বড় মায়া ছিল। ছেইলাকে বাঁচিয়ে রাখবে বলেই না কিষাণের ঘরের দুখকে ঘিন্না করে পালিয়ে গেল মুরলী?

ছেইলাটাকে একবার দেখতে হবে। চল দাশু চল; আর দেরি কর কেন? হোই দেখ, আকাশে কালা বাদল জোর করেছে! জোর বৃষ্টি হবে। ডরানিতে হুড়পা বান ডাকবে।

ঢের দূর নয় হারানগঞ্জ। দৌড়ে দৌড়ে চললে চার ঘণ্টার মধ্যে পেঁছে যাওয়া যায়।

দৌড় দিয়ে সড়কের উপরে উঠতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় দাশু।—হেই দাশু; থাম হে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে রামাই দিগোয়ার।

কাছে এগিয়ে এসেই চমকে ওঠে রামাই—হেই দেখ, দাগীটার কুট হলো কবে?

সড়কের সেই দূরের বাঁকের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু, যেখানে ডরানির লোহার পুলটা দেখা যায়, যেখান থেকে সড়কটা সোজা একটানা বাবুরবাজার চলে গিয়েছে। বাবুরবাজার থেকে সড়ক ধরে সোজা হাঁটা দিলে হারানগঞ্জ পেঁৗছে যেতেই বা কত সময় লাগবে? বড় জোর দেড় ঘণ্টা।

রামাই হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে দাশুর ঘরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে।—সকালীর খবর বল দাশু। ঘরে আছে কি নাই?

দাশু—নাই।

রামাই—ঢের চালাকি চলবে না দাশু। আমি দেখেছি, চৌধুরীজী দেখেছে সকালী আজ সোহাগের খানকিটির মত সেজে নিয়ে ইদিক পানে এসেছে তোমার কাছে আসে নাই কি?

—হঁ্যা, এসেছিল।

—তবে? গেল কোথায়?

—ওর মরদের ঘরে চলে গেল।

—বেইমানী মাগির মরদটা আবার কে বটে?

—পলুস হালদার।

—অ্যাঁ? খিরিস্তান শিকারীটা?

—হঁ্যা।

—কিন্তু, তুমি মাগিকে যেতে দিলে কেন? কি কথা ছিল মনে নাই?

—মনে ছিল।

—তবে?

দাশু হাসে—মনে ছিল, তাই না ওকে মরদের ঘরে যাওয়া করিয়ে দিলাম।

রামাই-এর চোয়াল দুটো রাগ করে চড়চড় করে বেজে ওঠে।—তুই কি আমার মাগের বড় ভাই বটিস রে দাগী? আমার সাথে রস করে কথা বলছিস …তুই শালা সকালীকে কেন যেতে দিলি, বল্?

দাশু—তোমার সাথে কথা বলতে আমার আর সাধ নাই রামাই, তুমি যাও।

—চৌধুরীজীর মত মানুষের সাথে দাগা দিয়ে তুই কি পার পাবি রে দাগী! চেঁচিয়ে ওঠে রামাই।

উত্তর দেয় না দাশু।

রামাই আবার চেঁচিয়ে ওঠে—তোকে এখনি বুঝিয়ে দিব রে ঠগ। চ এখনই আমার সাথে চল।

দাশু মাথা নাড়ে।—না।

রামাই—চৌধুরীজীর কাছে গিয়ে জবাব দিবে চল, কেন তুমি সকালীকে চলে যেতে দিলে?

দাশু বলে—জবাব তো তোমাকে বলেই দিয়েছি। তুমি যাও।

রামাই—আবার পাঁচ বছর কয়েদ খাটতে সাধ হয়েছে কি?

দাশু হাসে—না।

রামাই—কিন্তু খাটতে হবে। চৌধুরীজীকে এখনই খবর দিব। ফাঁড়িতে আমারই ঘরে বসে আছে চৌধুরীজী। এখনই ঘোড়া ছুট করিয়ে যমের পারা এসে তোকে গেরেপ্তার করবে। ভেবে দেখ দাশু, ভাল কথা বলি, আমার সাথে চল।

দাশু—না।

রামাই—পালাবি ভেবেছিস?

উত্তর দেয় না দাশু।

—কোন্ শালার বাপ তোকে পালাতে দিবে? বলতে বলতে দৌড় দেয় রামাই দিগোয়ার।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। নীল রঙের উর্দিপরা একটা ক্ষেপা জানোয়ারের মত রামাই দিগোয়ার সড়ক ধরে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে ছুটে চলেছে। এখনই খবর পাবে চৌধুরী; এখনই টাট্টুঘোড়ার সওয়ার হয়ে তড়বড় করে ছুটে আসবে একটা প্রতিহিংসার অপদেবতা। চৌধুরীর হাতের পিতল-বাঁধানো লাঠি, পিঠে ঝোলানো বন্দুক, ঝোলার ভিতরের হাতকড়া আর দড়ি; দাশুর মুক্তি পাওয়া ভাগ্যটাকে আবার মাঝপথ থেকে বাঁধাছাঁদা করে হাজত-ঘরের দিকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার জন্য একটা বিভীষিকার দূত ছুটে আসবে। ছেইলার মুখ দেখবার যে সাধ, আর ডরানির জলের ঢলে কুটিয়া গতর উৎসর্গ করে দেবার যে সাধ দাশুর বুকের ভিতরে উতলা হয়ে উঠেছে, সে সাধ বিফল করে দেবার জন্য একটা অভিশাপ হন্তদন্ত হয়ে তেড়ে আসবে।

—না, আর ধরা দিব না। দাশুর বুকের ভিতরেও একটা প্রতিজ্ঞা যেন চিৎকার করে ওঠে।

কিন্তু বাবুরবাজার হয়ে, গোবিন্দপুর সড়ক ধরে হারানগঞ্জের দিকে ছুটে চলে যেতে পারা যাবে না। ওই পথে চৌধুরীর ক্ষেপা আক্রোশ টাট্টুঘোড়া ছুটিয়ে এসে পলাতক দাশুকে আটক ক'রে ধরতে পারে।

খানাপিনার সেই জঙ্গল, যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোন ডহর নেই। মুলি বাঁশ, খেজুর, শাল আর কাঁটাকরঞ্জা; সেই সঙ্গে ফণীমনসা ও আলকুশীর ঝোপে ভরাট হয়ে আছে খানাপিনার যে জঙ্গল, সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কেউটের ছোবল আর গো-বাঘা হুঁড়ারের কামড় এড়িয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারা যায়, তবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে একেবারে গোবিন্দপুর সড়কে পেঁছে যাওয়া যাবে। তারপর হারানগঞ্জ, যে হারানগঞ্জের ডাক্তার রিচার্ডবাবুর বাড়ির বাগানে দাশুর ছেইলার হাত ধরে হেসে হেসে ঘুরে বেড়ায় মুরলী।

দূরের সড়কের পাশে বাবলার সারির মাথার উপরে ধুলো উড়ছে। মনে হয় দাশুর, একটা ছুটন্ত টাট্টুঘোড়ার তড়বড়ে খুরের শব্দ ডরানির লোহার পুলের গায়ের উপর আছড়ে পড়ছে। পুলিশের চৌধুরীই ছুটে আসছে বুঝি!

লাফ দিয়ে সরে যায় দাশু। সড়ক থেকে নেমে, পাকুড়তলায় ছায়া ধরে ছুটতে ছুটতে, নেড়া কাঁকুরে ডাঙাটাও এক দৌড়ে পার হয়ে গিয়ে খানাপিনার জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে দাশু। আলকুশির ঝোপ ঠেলে, উই-এর ঢিবি মাড়িয়ে, আর মুলি বাঁশের ধড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকে।

এগিয়ে যায়, আর মাথার উপরে আকাশটার দিকে মাঝে মাঝে তাকায়। হ্যাঁ, ঝিলিক হানছে পুবের আকাশকোণের মেঘ ; দিক ভুল হবার ভয় নেই।

হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝড় যখন দাশুর হাঁপধরা বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে, তখন বুঝতে পারে, সোজা তাকিয়ে দেখতেও পায় দাশু, খানাপিনার জঙ্গলের শেষ খেজুরের ভিড় পার হয়ে একটা খোলা ডাঙার কাছে চলে এসেছে। গোবিন্দপুরের সড়ক দেখা যায়। সড়ক ধরে ছুটে চলেছে ঝালদা যাবার মোটর-বাস।

গামছা দিয়ে মাথা আর মুখের খানিকটা ঢেকে নিয়ে, সড়কের দিকে একজোড়া সন্দেহের চোখ আর সতর্ক চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু। টাট্টুঘোড়ার সওয়ার হয়ে ছুটোছুটি করছে না তো কোন অভিশাপ ?

না, কোন ছুটন্ত টাট্টুঘোড়ার শব্দ তড়বড় করে বাজে না। এখন এই সড়কে উঠে সোজা পুব দিকে হাঁটা দিলে হারানগঞ্জের পথ পাওয়া যাবে, গির্জাবাড়ির চুড়াটাও দেখা যাবে।

ডাঙাটাও এক দৌড়ে পার হয়ে সড়কে উঠেই হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় দাশু। অনেক মানুষের একটা ভিড় একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ভিড়ের সঙ্গে পুলিশের লালপাগড়িও দেখা যায়।

লাঠি কাঁধে নিয়ে তিনজন পুলিশ ভিড়ের আগে আগে আসছে। দুটো গো-গাড়ির চাকার কঁকানির পিছু পিছু ভিড়ের সোরগোলও ছটফট করতে করতে এগিয়ে আসছে। সড়কের কিনারায় একটা গাছের গা ঘেঁষে প্রায় গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। বুকটা থর থর করে। এত পুলিশ যখন, তখন চৌধুরীও কি নাই ?

ও কি ? কার নাম করে চেঁচিয়ে উঠছে আর কথা বলছে ভিড়ের মানুষগুলি ?

চমকে ওঠে দাশু। ভিড়টা যেন একটা বিস্ময়ের মিছিলের মত ছটফট করে দাশুর ভীরু চোখের চাহনির একেবারে কাছে এসে পড়ে।

—চৌধুরী মরলে। চৌধুরীকে কাটলে। টাঙ্গি দিয়ে দুটা কোপ দিল রামাই-এর মাগ মঙ্গলী ; বাস্ ! চৌধুরীর ধড় আর মুড়া দুই ঠাঁই হয়ে গেল।

এ কি কথা বলে ওরা ? গামছাটাকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে সড়কের কিনারা থেকে সরে এসে ভিড়ের কাছে দাঁড়ায় দাশু। ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। ভিড়ের সোরগোলের ভাষা শুনতে থাকে।

—হঁ হে, মঙ্গলীর ইজ্জত নাশ করতে চেয়েছিল মাতোয়াল চৌধুরীটা। এমন পিশাচকে কাটবে নাই কেনে মঙ্গলী ?

—চুপ কর, চুপ কর ! হাঁক ছাড়ে একটা পুলিশ।

—ঢের দিনের পাপের বিচার এক দিনেই হয় হে। সাদা চুলে ভরা মাথা দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো যে বুড়োটা, তার কাছে এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে দাশু—কি ব্যাপার বটে, কাকা ?

বুড়ো বলে—রামাই দিগোয়ার চৌধুরীটাকে ঘরে বসা করাই ভিন গাঁয়ে দাগীর খবর করতে গিয়েছিল। চৌধুরীটা রামাই-এর মাগের হাত চেপে ধরলেক ; তখন রামাই-এর মাগ টাঙ্গি লিয়ে এইসে…। হোই দেখ না কেনে, কেমন ডাঁট করে বসে আছে মঙ্গলী।

আগে আগে চলেছে যে গো-গাড়িটা, তারই ভিতরে গদির উপর চুপ করে শক্ত হয়ে বসে আছে রামাই-এর মাগ মঙ্গলী। মঙ্গলীর কোমরে দড়ি। একটা পুলিশ সেই দড়ির টানা হাতে ধরে নিয়ে গো-গাড়ির পিছু পিছু হেঁটে চলেছে। মঙ্গলীর মাথার চুল ক্ষেপীর মাথার চুলের মত ছন্নছাড়া ও এলোমেলো হয়ে মুখের চারদিকে লুটিয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে দেখা যায়, নিথর হয়ে রয়েছে মঙ্গলীর এক জোড়া শান্ত চোখ।

—রামাই দিগোয়ার ঘরে ফিরে এইসে চৌধুরীর মুড়াটার দিকে একবার নজর করে লিয়ে সেই যে ভাগলেক আর উয়ার পাত্তা নাই। হোই দেখ না কেনে…। বুড়া মাহাতো হাত তুলে পরের গো-গাড়িটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে মুখ টিপে হেসে ফেলে।

গো-গাড়ির ভিতরে চৌধুরীর লাস খড় দিয়ে ঢাকা। শুধু পায়ের পাতা দুটো বের হয়ে আছে। চৌধুরীর লাসের ঠিক বুকটার উপর রক্তাক্ত কম্বলে জড়ানো একটা বস্তু পড়ে আছে। কম্বলের পোঁটলাটা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়েও আছে। সেই ফাঁক দিয়ে চৌধুরীর নাকটা আর কর্কশ গোঁপের একটা গোছা উঁকি দিয়ে রয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে নেয় দাশু। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিড়টা তেমনই বিস্ময়ের মিছিলের মত বিচিত্র হাঁকডাক আর চিৎকারে মুখর হয়ে গোবিন্দপুর থানার দিকে যাবার জন্য সোজা সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

আর কতদূর ? আর বেশিদূর নয়। এখান থেকে আস্তে আস্তে হাঁটা দিলে হারানগঞ্জে পেঁছে যেতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে যেতে পারা যাবে। হ্যাঁ, পাঁচ বছরের জন্য আবার কয়েদ হবার বিভীষিকা দাশুর ভাগ্যের পিছনে আর ধাওয়া করে ছুটে আসছে না। আস্তে আস্তে হাঁটা দিলেও চলবে।

ভিড়ের সোরগোল আর শোনা যায় না। জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে দাশু। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতে গিয়েই দেখতে পায়, হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির চূড়ার উপর দিয়ে বড় সুন্দর বিজলীর চমক ছটফটিয়ে উঠলো।

চলতে থাকে দাশু।

নীরব সড়কের এক কিনারা ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে

দাশু। হারানগঞ্জের গির্জার সেই শান্ত ও সুন্দর চেহারাটাও দাশুর ব্যাকুল চোখের ঘেয়ো চাহনির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। আর ঢের দূরে নয় হারানগঞ্জ।

জেলা বোর্ডের রাস্তাটা এসে গোবিন্দপুর রোডের গা ছুঁয়েছে যেখানে, সেখানে এসে পেঁছিতেই একবার থমকে দাঁড়ায় দাশু। একটা বুড়ো বট ছিল এখানে সেটা আর নেই। নতুন একটা ইমারত দেখা যায়। ইমারতের গায়ে নানা রঙের ছবির বাহার, মাথার উপরে একটা চোঙা; চোঙার মুখ থেকে কলের গানের ঝমঝমে আওয়াজ উথলে পড়ছে।

যেন ঝমঝমে হল্লার একটা নতুন জগৎ। কত মানুষ এসে ভিড় করেছে। হাসছে, কথা বলছে, হাঁকডাক করছে, ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করছে। পয়সা দিয়ে মজা কিনবার বাজার বটে কি? তাই তো মনে হয়। কলের ছবির হাসা-কাঁদা দেখবার আর শুনবার জন্য কত মানুষ ভিড় করেছে।

পথ চলতে থাকে দাশু। কিন্তু পথটা আর নির্জন হয় না, নীরবও হয় না। দেখতে পায় দাশু, ছোট ছোট হল্লার উৎসব দাশুর আগুপিছু হেঁটে হেঁটে চলেছে। ছোট ছোট ভিড় কথা বলছে, হাসছে, হাঁকডাক করছে আর চলছে। এরা যায় কোথায়? কালীথানের মেলা কি শুরু হয়ে গেল?

দাশুর পিছন থেকে একটা লোক রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি আমাদিগে এমন দয়াটি না করলেই ভাল করতে হে সরদার?

মুখ ফিরিয়ে তাকায় দাশু। লোকটা বলে—এই রোগের শরীর নিয়ে তুমি আবার সভার ভিড়ে যাও কেন?

—কিসের সভা?

—ভোটের সভা।

—কোথায়?

—পাহাড়তলীতে।

দাশু হাসে—রাগ করবে না বাপ, আমি তোমাদিগের সভার ভিড়ে যাব না।

নতুন রেল লাইনের পাশে পাশে গড়িয়ে এসে একটা নতুন সড়ক যেখানে গোবিন্দপুর রোড ছুঁয়েছে, সেখানে এসে আবার থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কটা ঝালদার দিক থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কিন্তু এত শব্দ করে কেন, আর এত ধুলো উড়ায় কেন নতুন সড়কটা? কত রকমের শব্দ হু হু করে, গোঁ-গোঁ করে, হা-হা করে ছুটে আসছে।

ছুটে এল আর চলে গেল বড়-বড় মোটরগাড়ির মিছিল। মিলিটারির কামানগাড়ি, একটা দুটো নয়, দশটা বিশটা নয়, অনেক অনেক। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আর তাক করে গলা উঁচিয়ে রয়েছে কামানগুলি।

ধুলোর ঝাপটা সহ্য করবার জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু, আর শুনতেও পায়, পথের লোকগুলি হাততালি দিয়ে হল্লা করে উঠেছে,—এরা কাশ্মীরে গিয়েছিল হে। এক সাল হলো এরা লাইনে ছিল; এইবার জিরাবার

ছুটি মিলেছে, তাই রাঁচির পল্টনবারিকে ফিরে চলেছে।

হাঁটতে থাকে দাশু। কিন্তু সড়কের শব্দের উৎসব যেন ফুরাতে চায় না। বড় বড় মোটর লরিতে বোঝাই হয়ে লোহা-লক্কড়ের এক এক একটা ছোট ছোট পাহাড় ছুটে চলে গেল। পথের লোক বলে—ভুবনপুরের নতুন সীসাগালাই কারখানার মাল গেল হে।

চলতে থাকে দাশু। সড়কেরই পাশের মাঠে এক জায়গায় অনেক তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর বাইরে ছোট ছোট বাক্সের উপর বসে বাবুরা পেয়ালা হাতে নিয়ে চা খাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। পথের ভিড় বলাবলি করে—এরা ধানবাদের খাদের ইস্কুল থেকে এসেছে হে। তামার পাথরের খোঁজ নিতে এসেছে ভুবনপুর হতে শুরু করে মধুকুপি, সব মাটি এরা জরিপ করবে।

এগিয়ে যায় দাশু।

না, আর এই সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে হবে না। এইবার সামনের মোড়ের কাছে পেঁছে ডাইনের সড়ক ধরতে হবে। হারানগঞ্জ এসে গিয়েছে। গির্জাটা কত কাছে এসে পড়েছে।

এই তো হারানগঞ্জের কবরথান। আর ঢের দূর নয় রিচার্ড ডাক্তারের ফুলবাড়ি। পথের পাশের ঐ লাল রঙের বাড়িটার ফটকের কাছে যে ছোট রাস্তাটা বাঁয়ে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তায় আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলেই ···।

কিন্তু ফটকের কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় দাশু। বাঁয়ের সেই ছোট রাস্তা ধরে আবার একটা মিছিল হাঁক দিতে দিতে ঝাণ্ডা দুলিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু মিছিলটার জন্য নয়। মিছিলটা কোন বাধা নয়, বিস্ময়ও নয়। মিছিলটার দিকে আর তাকায়ও না দাশু। ফটকের কাছে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিস্ময়ের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দাশু।

রোদ নেই, মেঘে ছাওয়া আকাশ। তবু, ছোট্ট একটা রঙিন ছাতা মাথার উপর মেলে দিয়ে যেন ঝলমলে হাসির এক শ্যামলী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলা দিনের ময়লা আভা ছাতার রঙিন কাপড় চুঁয়ে আর রঙিন আভাটি হয়ে রূপসীর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

মিছিলটার দিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে রূপসী। নরম-নরম ঠোঁট দুটোকে যেন গরব করে ফুলিয়ে ফুলিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছে। শাড়ির আঁচল ফুরফুর করে উড়ছে। গলার সোনার হার দুলছে। সোনার হারের পাথরে আর কালো চোখের তারা দুটোতে একই রকমের হাসি ঝিকমিক করে জ্বলছে।

শ্যামলী রূপসীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরতার এক শুভ্রা মূর্তি। তার ধবধবে সাদা চুলের খোঁপা এই মেঘলা দিনের ময়লা আভাতেও চিকচিক করে। লাল মুখে কী সুন্দর হাসি! নীল চোখে কী সুন্দর আলো! বাঁশ আর শালপাতা দিয়ে তৈরি একটা দেহাতী ছপি-ছাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো বয়সের এক মেম।

ওরা দুজনে হেসে হেসে মিছিল দেখছে। আর, দাশু ওদেরই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিছিলটা ডাক্তার রিচার্ড সরকারকে ভোট দেবার জন্য হাঁক দিয়ে আবেদন করছে। আর, ওরা দুজনে যেন প্রাণের খুশিতে বিভোর হয়ে মিছিলের হাঁকের শব্দ শুনছে।

চলে গেল মিছিলটা। চলন্ত মিছিলের দিকে এক হাত তুলে রুমাল দোলাতে দোলাতে হেসে ওঠে মুরলী, আর-এক হাতে রঙিন ছাতা কাত করে মুখের উপর রঙিন আভা ধরে রাখে। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—চল দিদি।

—চল জোহানা। বলতে বলতে এক পা এগিয়ে যেয়েই চমকে ওঠেন সিস্টারদিদি।—মার্সি! মার্সি!

—কি বটে দিদি? চমকে ওঠে মুরলী।

—লেপার বটে। মানুষটার কুষ্ঠ হয়েছে! সিস্টারদিদির চোখ দুটো মায়াময় বেদনায় করুণ হয়ে দাশুর কুটিয়া গতরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুরলীও তাকায়। সেই মুহূর্তে রঙিন ছাতা দিয়ে মুখটা আড়াল করে দু পা পিছিয়ে সরে যায় মুরলী। রঙিন ছাতা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

দাশুর কাছে এগিয়ে আসেন সিস্টারদিদি।—কোন চিন্তা নাই। কোন ডর নাই। তোমার রোগ আরাম হয়ে যেতে পারে।

—তুমি কি সিস্টারদিদি? সিস্টারদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দাশুর চোখের ঘেয়ো চাহনি যেন মুগ্ধ হয়ে ছলছল করতে থাকে।

সিস্টারদিদির নীল চোখ দুটো একটু আশ্চর্য হয়ে কেঁপে ওঠে।—কেন, তুমি কি আমাকে আগে কখনো দেখ নাই?

—না।

—আশ্চর্যের কথা! যা-ই হোক, তুমি বিশ্বাস কর, তোমার রোগ সেরে যাবে।

যেন সান্ত্বনার দেবী কথা বলছেন। কী মিঠা কথা, কী মিঠা চাহনি! দাশুর কুটিয়া শরীরের উপর যেন আরামের ওষুধ ঝরে পড়ছে। সিস্টারদিদির হাত দুটো যেন মায়া করবার জন্য ছটফট করছে; দাশুর গায়ে এখনই বুঝি হাত বুলিয়ে দেবে সিস্টারদিদি।

সিস্টারদিদি—আমার আসাইলামে তোমাকে ভর্তি করে নিব। তুমি খাওয়া পাবে, কাপড় পাবে, বিছানা পাবে, ওষুধ পাবে, আর আমার সেবা পাবে।

হাত তুলে চোখ দুটো মুছতে চেষ্টা করে দাশু।—এত দয়া কেন দিদি?

সিস্টারদিদি—ভুল কথা বল কেন ম্যান? আমার দয়া নয়। তোমার আমার পরম পিতা যিনি, তাঁর দয়া।

—বড় ভাল কথা বটে, দিদি। মাথা হেঁট করে সিস্টারদিদির পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

এখন দেখলে তো দাশু? বুঝে দেখ, সিস্টারদিদিকে কত ভুল বুঝেছিলে। সিস্টারদিদির দয়ার রকমটি দেখ। সিস্টারদিদির মনে কোন হিসাব নাই। শুধু মায়ার লেগে মায়া করে সিস্টারদিদি।

এমন শান্তির ঠাঁই পেলে কে না জিরাবে বল? ছিয়া ছিয়া, মিছা রাগ করে মরণ চাও কেন, বল? হ্যাঁ দাশু, এত ভাল জিরাবার ঠাঁই আর কোথাও পাবে

না। রাজি হয়ে যাও দাশু।

মুখ তুলে সিস্টারদিদির মুখের দিকে আবার তাকায় দাশু।

সিস্টারদিদি—বিশ্বাস করে একবার প্রেয়ার সাধলেই তোমার সব দুখের অবসান হয়ে যাবে। প্রেয়ারের চেয়ে মহৎ ওষুধ নাই।

চমকে ওঠে দাশু।—কিসের প্রেয়ার দিদি?

সিস্টারদিদি।—প্রেয়ার, প্রার্থনা। আসাইলামে রোজ দুইবার প্রার্থনা হয়। যারা ঈশাই মানে আর প্রার্থনা করে, তাদের উপর পরমপিতা বিশেষ দয়া করেন।

দাশু—আমাকে কি তুমি ঈশাই মানতে বলছো, দিদি।

সিস্টারদিদি—হ্যাঁ, তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি।

দাশুর চোখের তারা দুটো জ্বলে জ্বলে হাসতে থাকে—না দিদি।

—কি বললে? দুই চোখের চাহনি টান করে কথা বলেন সিস্টারদিদি।

—আমাকে খিরিস্তান হতে বলো না।

—কিন্তু খিরিস্তান না হলে আমি তোমাকে আসাইলামে ঠাঁই দিব কেমন করে?

—দিবে না তো দিও না।

—বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু আমি তোমার সেবা ছেড়ে দিতে চাই না। সপ্তাহে এঝটিবার যদি আসাইলামের হাসপাতালের বাহির দরজায় এসে দাঁড়াও, তবে ওষুধ পাবে। তাতে যদি বাঁচ তো বাঁচবে।

—না।

—কি? ভ্রূকুটি করেন সিস্টারদিদি।

—তোমার ওষুধ নিতে আমার সাধ নাই।

সিস্টারদিদির নীল চোখের চাহনি কাঁপতে থাকে।—তা হলে এই রোগের গরলে তোমার দেহ যে গলে যাবে।

—যাক না কেন?

—রোগে ডর নাই?

—না।

—কেন?

—এই রোগ রোগ নয়।

—তবে কি?

—কপালবাবার খেলা।

—কার খেলা? সিস্টারদিদির চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে।

দাশু শান্তভাবে হাসে—কপালবাবার খেলা বটে গো, দিদি।

সিস্টারদিদি—কে সে?

কপালের মাঝখানে হাতের একটা ভোঁতা আঙুল চেপে ধরে হাসতে থাকে দাশু—এই!

—যাও! চেঁচিয়ে ওঠেন আর মুখ ফিরিয়ে নেন সিস্টারদিদি।

দাশু—যাব দিদি, যাব। তোমার হারানগঞ্জে ঠাঁই নিতে আমি আসি নাই।

সিস্টারদিদি—ভিখ মাগতে এসেছ বোধহয় ?

দাশু—না।

সিস্টারদিদি—তবে কেন এসেছ ?

দাশু—আমার ছেইলাকে দেখতে এসেছি।

—তোমার ছেলে ? ওয়েল্... তোমাকে পাগল বলে মনে হয়।

—পাগল মনে কর যদি, তবে কর। কিন্তু আমার ছেইলা এখানে আছে।

—কোথায় আছে ?

—ওই যে, ওর কাছে আছে।

—কার কাছে ? দাশুর হাতের ইঙ্গিতটার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন সিস্টারদিদি। পাগলটা হাত তুলে জোহানাকে দেখিয়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসছে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, জোহানার রঙিন ছাতাটা থরথর করে কাঁপছে। ছাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছে কেন জোহানা ?

—জোহানা ? লোকটা এমন মিথ্যা কথা বলে কেন ? চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে সিস্টারদিদির গলার স্বর ভীরু হয়ে ফিসফিস করে।

ছাতার আড়ালে তেমনি মুখ লুকিয়ে রেখে যেন রঙিন রাগের নাগিনীর মত হিসহিস করে ওঠে মুরলী—মিথ্যা কথা নয় ; ভুলে যাও কেন, দিদি ?

সিস্টারদিদি—এই কি তোমার সেই...।

মুরলী—হ্যাঁ।

দাশুর গলার স্বর একেবারে নরম হয়ে গিয়ে যেন আবেদন করে—ওকে বল দিদি, এখনি আমার ছেইলাকে নিয়ে এসে আমার নজরের কাছে একবার রাখুক।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সিস্টারদিদি শান্ত স্বরে বলেন—তোমার ছেলে এখন ঈশ্বরের ছেলে হয়ে গিয়েছে, তাকে দেখে তোমার লাভ কি ?

—কি বললে দিদি ? আমার ছেইলা কি তবে আর নাই ?

—আছে আছে ; অনাথবাড়ির দয়াতে মায়াতে আর আদরে সে ছেলে খুব ভাল আছে।

—অনাথবাড়িতে ? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—হ্যাঁ। মৃদু স্বরে উত্তর দেন সিস্টারদিদি।

হেসে ফেলে দাশু।—তোমার বহিনকে তুমি এটা কেমন সুখ দিলে দিদি ?

—কি বললে ?

—পেটের ছেইলাকে কোলে নিতে পারলে না যে, সে মানুষ কেমন সুখের মানুষ বটে ?

সিস্টারদিদি—বাস্, তুমি এখন যাও।

—আমার ছেইলাকে দেখাও, তবে যাব।

সিস্টারদিদি—ওই দেখ।

লাল রঙের যে বাড়িটার ফটকের কাছে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সিস্টারদিদি, সেই বাড়িটার বারান্দার দিকে হাত তুলে দাশুকে কি-যেন দেখতে

বলেন।

—কি দেখতে বলছো দিদি? আশ্চর্য হয়ে বাড়ির বারান্দার দিকে তাকায় দাশু। দেখতে থাকে দাশু, ভাল করে হাঁটতে পারে না আর হামা দেয়, এমন বয়সেরও ছেলেমেয়ে বারান্দার সেই লিখা-পড়ার ঠাঁই-এর কাছে কিলবিল করছে। একটা বুড়ি মানুষ বারান্দার এক কোণে বসে, মাথার সাদা চুলের ঝুঁটি মেলে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে ঢুলছে।

বারান্দার উপর একদল ছোট ছোট ছেলে আর মেয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। একটি ডাগর মেয়ে খড়ি হাতে নিয়ে একটা কালো তক্তার উপর কি-যেন দাগছে আর বলছে, সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর করে চেঁচিয়ে উঠছে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের দল।

কালো তক্তার উপর খড়ি দিয়ে আঁক দেগে হাঁক দিল ডাগর মেয়েটি।—নয়ের পিঠে নয় এল এল।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের দল সুর করে চেঁচিয়ে ওঠে—নিরানব্বই বল বল।

ডাগর মেয়েটি বেণী দুলিয়ে কালো তক্তার উপর আবার খড়ির দাগ দেগে দুলতে থাকে: দশের পিঠে শূন্য এল।

ছেলেমেয়ের দল ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে—এক শত বল বল।

—শতকিয়া খতম বল। খড়ি ফেলে দিয়ে হাত তুলে হাঁক দেয় ডাগর মেয়েটি।

শতকিয়া খতম! শতকিয়া খতম! কলকল করে আর লাফিয়ে বারান্দা থেকে নেমে বাগিচার চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে ছেলেমেয়ের দল। গায়ে সাদা কাপড়ের হাতকাটা জামা, আর পরনে কালো কাপড়ের জাঙ্গিয়া, অনাথবাড়ির আদরে পোষা এক দল খুশির খরগোশ ছুটোছুটি করছে।

—এইবার যাও। দাশুর হতভম্ব চোখের দিকে তাকিয়ে আবার হাঁক দেন সিস্টারদিদি।

দাশু—কেন যাব? আমার ছেইলা কই?

সিস্টারদিদি—ওদেরই মধ্যে আছে। যাকে খুশি তাকে তোমার ছেলে বলে ভেবে নাও, আর খুশি হয়ে চলে যাও।

—না, সে হয় না।

—কেন? ওদের দেখতে কি ভাল লাগে না?

—খুব ভাল লাগে। বেঁচে থাকুক ওরা। কিন্তু…।

—আবার কিন্তু কিসের? তোমাকে বড় জেদী মানুষ বলে মনে হয়। বিরক্ত হয়ে ধমক দেন সিস্টারদিদি।

দাশু—ধমক দিও না দিদি। আমার হাড়মাসে জন্ম নিলে যে, তাকে আমি একবার দেখে নিয়ে চলে যেতে চাই। তুমি মানা করবার কে?

সিস্টারদিদির কানের কাছে ফিসফিস করে কি-যেন বলে মুরলী। আর সিস্টারদিদিও অনাথবাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে ডাক দেন—আনিয়া বহিন।

বারান্দার কোণ থেকে জনের মা আনিয়া বুড়ির ঢুলে পড়া মাথাটা হঠাৎ

চমকে ওঠে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে জনের মা আনিয়া বুড়ি।—কি বটে? কি আজ্ঞা হয় দিদি?

সিস্টারদিদি—জোহানার যে ছেলে অনাথবাড়িতে আছে, সেই ছেলেকে…।

আনিয়া বুড়ি মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক উল্লাসের জ্বালায় যেন নাচতে থাকে—হঁ হঁ দিদি, বড়টি হয়েছে সেই ছেইলা। জোহানা বহিন কি ছেইলার মুখ দেখবে, দিদি?

মুখ ফিরিয়ে নেয় মুরলী। সিস্টারদিদি গম্ভীর হয়ে বলেন—সেই ছেলেকে একবার নিয়ে এস।

নাচতে নাচতে চলে যায় জনের মা আনিয়া বুড়ি। অনাথবাড়ির বাগিচায় খরগোশের পালের মত হুটোপুটি করছে যারা, তাদেরই ভিতর থেকে একটা ছোট্ট মানুষকে খপ্ করে ধরে আর কোলে তুলে নিয়ে আবার নাচের ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে ফটকের কাছে ছুটে এসে বিড় বিড় করে—গড বাবা দয়া করেন।

কিন্তু হঠাৎ ভয় পেয়ে আর রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে আনিয়া বুড়ি।—হায় গড, কুটিয়াটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন গো?

গায়ের কাপড়ের আঁচল দিয়ে ছেলেটাকে ঢেকে এক লাফ দিয়ে সরে গিয়ে পথের পাশের একটা কচি কদম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে আনিয়া বুড়ি।

এক-পা দু-পা করে কচি কদমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। সিস্টার-দিদি চেঁচিয়ে ওঠেন—সাবধান, তোমার এই রোগের দেহ নিয়ে তুমি লিট্ল বাবার কাছে যাবে না।

দাশু—না, খুব কাছে যাব না দিদি। আমি একটুক দূরে দাঁড়িয়ে দেখবো। কিন্তু, ছেইলার মুখ ঢাকা দেয় কেন বুড়িটা?

সিস্টারদিদির ইসারা পেয়ে আনিয়া বুড়ি ছেলেটার মাথা থেকে আঁচলের ঢাকা সরিয়ে দেয়। বছর আড়াই বয়স, মোটা-সোটা ফোলা-ফোলা গাল, মাথাটা কোঁকড়া চুলে ঠাসা, ছেলেটা আনিয়ার কোল থেকে নেমে যাবার জন্য ছটফট করে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

—বাপার কেমন সুন্দর দাঁত হয়েছে গো! মাথা ঝেঁকে হিহি করে হাসতে থাকে দাশু।—কিন্তু বাপাকে সুখে রাখবে কি কপালবাবা? দুই চোখ চিক-চিকিয়ে আর ঠোঁট কাঁপিয়ে বিড়বিড় করে দাশু।

সিস্টারদিদি—বাস্, নো মোর, তুমি সর, তুমি যাও।

দাশু হাসে।—বাপা বড় ভাল চুমা দিতে জানে মনে হয়।

আনিয়া বুড়ি ভয় পেয়ে ভ্রূকুটি করে।—জানে তো, কিন্তু তাতে তোমার কি? তুমি সর না কেন?

দাশু—বাপা একবার চুমা দিক না কেন?

—হেই! গর্জন করে ওঠে আনিয়া বুড়ি।

দাশু হাসে।—আমাকে নয় গো। এই গাছটাকে চুমা দিক বাপা।

আনিয়া বুড়ি ভ্রূকুটি করে।—তামাসা বটে কি? কি ভেবেছ তুমি?

দাশু—তামাসা নয় বুড়ি মা। দেখতে সাধ হয়, বাপা কেমনটি চুমা দিতে শিখলে।

আনিয়া বুড়ির কাঁকাল কাঁপিয়ে দিয়ে ছেলেটা আবার ছটফটিয়ে ওঠে। যেন একটা দুরন্ত আহ্লাদের খেলার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে ছেলেটা। মাথা হেলিয়ে কচি কদমের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। কচি কদমের গায়ে ছেলেটার মুখের লালা লেগে ছোট্ট একটা ভেজা-ভেজা ছাপ ফুটে উঠেছে। সেই ছাপের দিকে তাকিয়ে পিপাসিতের মত ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—তুমি এখন সর বুড়ি মা, জলদি সরে যাও।

আনিয়া বুড়ি সরে যায়। ছেলেটাকে কোলের উপর শক্ত করে চেপে ধরে একটা দৌড় দেয়। অনাথবাড়ির একটা ঘরের কাছে এসে ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে আর হাঁপাতে থাকে আনিয়া বুড়ি।

আর, কচি কদমটার গায়ের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে দাশু। দু হাতে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে, ছেলেটার লালায় ভেজা ছাপের উপর মুখটাকে চেপে ধরে আর চোখ বন্ধ করে কাঁপতে থাকে।

সিস্টারদিদির চোখ দুটোও চমকে চমকে কাঁপে। লোকটা কেঁপে কেঁপে কাঁদছে? না, হাসছে? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

কী ভয়ানক কালো হয়ে গিয়েছে হারানগঞ্জ! আকাশ জুড়ে কালো মেঘ নিরেট হয়ে গিয়েছে। জোর হাওয়া ছুটতে শুরু করেছে। আকাশের সব দিকে লিকলিকে বিদ্যুতের সাপ ঝিলিক দিয়ে খেলছে। ডাঙার ওপারে অনেক দূরে, শালবনের উতলা চেহারার পিছনে ডরানির স্রোতটাও গোমরাতে শুরু করে দিয়েছে।

—চল জোহানা, চল। দিশেহারা পলাতক মানুষের মত হঠাৎ ভয় পেয়ে আর ব্যস্ত হয়ে ডাক দেন সিস্টারদিদি।

—চল দিদি, চল। মুরলীর গম্ভীর মুখটা যেন একটা আতঙ্কের রব ছেড়ে কাঁপতে থাকে।

আকাশ-জোড়া কালা বাদলের দিকে তাকিয়ে আর একেবারে নীরব হয়ে ওঠে দাশু। ঝুরঝুর করে বৃষ্টি ঝরে পড়ে।

অনাথবাড়ির ছেলেমেয়ের দল বাগিচা থেকে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। ফটক পার হয়ে অনাথবাড়ির বারান্দার দিকে ছুটে চলে যান সিস্টারদিদি। শন্ শন্ করে একটা ক্ষেপা হাওয়ার ঝাপ্টা এসে মুরলীর রঙিন ছাতার উপর আছড়ে পড়ে। কিন্তু এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ ধমকে দাঁড়ায় মুরলী।

যার মুখটা না দেখবার জন্য এতক্ষণ ধরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিল মুরলী, সেই লোকটা মুরলীরই পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল। একটা কথাও বলল না, মুরলীর চোখের এত কাছে এসেও একবার থমকে দাঁড়াল না। কিন্তু মুরলীর মুখটার দিকেও কি একবার তাকায় নি? তাকায় নি বোধহয়। তা না হলে এত সহজে একেবারে উদাসী সাধুর মত চুপ করে চলে

যায় কেমন করে ?

কতদূর গিয়েছে ? মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ পিছন দিকে তাকায় মুরলী। আর, তাকাতে গিয়েই ডাক দিয়ে ফেলে—শুনছো।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় দাশু। ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির ধারা যেন একটা-ঝাপসা পর্দা। মুরলীর মুখটাকে স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু আবার শুনতে পায় দাশু, যেন ঝালদার মহেশ রাখালের বেটির গলার স্বর ব্যাকুল হয়ে ডাকছে—শুনছো!

হ্যাঁ, মুরলীই ডাকছে। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে মুরলী। ঝড়ের হাওয়ার মধ্যে কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, সেই পুরনো গলার স্বর উতলা করে দিয়ে ডাকছে। কিন্তু ডাকে কেন মুরলী ? এটা আবার তোমার দয়ার কোন্ মজা বটেক পালবাবা ? মুরলী কি দাশু কিষাণকে ওর রংদার ছাতার তলে ঠাঁই নিতে ডাকছে ?

—একটা কথা বলতে চাই ; শুনে যাও। ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে যেন গলার স্বরের একটা মিঠা মায়া মিশিয়ে দিয়ে, যেন দাশুর অভিমান ভাঙবার জন্য আবার ডাক দিয়েছে মুরলী।

—কি কথা ? বলতে গিয়ে দাশুর পা দুটো টলমল করে ওঠে।

মুরলী—ভাল কথা বলতে চাই, কাছে এসে শুন।

ভাল কথা! দাশু কিষাণের প্রাণের অন্তিমটাকে কাছে ডেকে নিয়ে ভাল কথা বলতে চায় নতুন সুখের রূপসী মুরলী ? কিন্তু মুরলীর মুখে ভালকথা শুনতে পেলে দাশুর জীবনে আবার যে জিরোবার সাধ হেসে উঠবে।

তা খারাপ কিসের দাশু ? মুরলী যদি মায়া করে বলে, তুমি যেও না, তবে যেয়ে কাজ কি ? মুরলীর কাছে আর ঠাঁই হবে না। নাই হোক, মুরলীর ভাল কথার মায়ার কাছে এসে ঠাঁই নাও না কেন, বেঁচে থাক না কেন ? বুঝতে পার না কেন, মুরলী তোমাকে আজও ভুলে নাই ?

আস্তে আস্তে হেঁটে মুরলীর কাছে এসে দাঁড়ায় দাশু।—কি ভাল কথা বলতে চাও ?

মুরলী—তোমার ভালর লেগে বলছি।

দাশু—বল।

রঙিন ছাতার হাতলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে মুরলী—তোমার মরণ ভাল।

—হ্যাঁ, বড় ভাল কথা বটে। হেসে ফেলে দাশু।

যেমন বড় বড় শিলা, তেমনই জলের মোটা মোটা ধারা ; আর, তেমনি শনশনে ঝড়ের বাতাস। হারানগঞ্জের ডাঙার উপর যেন আকাশভাঙা একটা ভয়ানক আক্রোশ লুটিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ডাঙার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—ও কিসের আওয়াজ ? ডরানির জলের আওয়াজ বটে কি ?

মুরলী বলে—হ্যাঁ।

সড়ক ছেড়ে দিয়ে একটা দৌড় দিয়ে ডাঙার উপর নেমে পড়ে দাশু। তার পরেই, না; আর স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখা যায় না। একটা ছুটন্ত তৃষ্ণা যেন থর-

বৃষ্টির ধারার ভিতর দিয়ে গলে গলে ক্ষয় হতে হতে ডরানির ক্ষেপা জলের দিকে ছুটে চলে গেল।

আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেয়ে অনাথবাড়ির বারান্দার উপর উঠে সিস্টার-দিদির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী।

ঝাপসা হয়ে গিয়েছে হারানগঞ্জ। গির্জার চূড়া আর দেখতে পাওয়া যায় না। অনাথবাড়ির বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে জলবাতাসের ক্ষেপা শব্দ আর বাজের শব্দ শুনতে শুনতে বধির হয়ে গিয়েছে কান, তা না হলে শুনতে পেতেন সিস্টারদিদি, মুরলীও শুনতে পেত, তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনবার কাতর-স্বরে চেঁচিয়ে হাঁক দিয়েছে জনের মা আনিয়া বুড়ি—তোমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে বস না কেন জোহানা বহিন।

এই বধিরতা ভাঙে তখন, যখন জনের মা আনিয়া বুড়ির গলার স্বর দুজনের একেবারে কাছে এসে হেসে ওঠে।—গড বাবা দয়া করেন। ভাবি নাই, এত জলদি এমন পাগলা বাদল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ঝড় থেমেছে, বৃষ্টিও নেই। কী আশ্চর্য, হারানগঞ্জের ভেজা ডাঙার উপর মরা বিকালের শেষ রোদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আর, আকাশের উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে ঝলমলে একটা রামধনু ফুটে উঠেছে।

ডাঙার শেষে শালবনের আড়ালে ডরানির ক্ষেপা জলের গুঁড়ো উপরে ভেসে উঠে শালবনের মাথার উপরে সাদা ধোঁয়ার মত থমকে রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলেন সিস্টারদিদি—লোকটা তোমাকে কি কোন কথা বলে গেল, জোহানা ?

ঝলমলে রামধনুটার দিকে অপলক গম্ভীর চোখের চাহনি তুলে ধরে মুরলীও আস্তে আস্তে বলে—না দিদি, আমি ওকে একটা ভাল কথা বলে দিলাম।

সিস্টারদিদি—ভাল কথা ?

মুরলী—হ্যাঁ।

সিস্টারদিদি—কি কথা ?

মুরলী—বলে দিলাম, তোমার মরণ ভাল।

চমকে ওঠেন সিস্টারদিদি—তাই কি লোকটা ক্ষেপার মত ছুটে চলে গেল ?

মুরলী—হ্যাঁ।

সিস্টারদিদি—কোথায় গেল ?

মুখ ফিরিয়ে, সিস্টারদিদির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে আর নরম ঠোঁট দুটোকে কুঁকড়ে দিয়ে কথা বলে মুরলী—সে কথা মিছা আর শুধাও কেন দিদি ?

—জোহানা ! সিস্টারদিদির গলার স্বর শিউরে ওঠে।

মুরলী—হ্যাঁ দিদি, লোকটা মরণ নিতে ডরানির ক্ষেপা জলের কাছে ছুটে চলে গেল। ও আর এখন তোমার দুনিয়াতে নাই।

ওঃ, ওঃ, ওঃ ! ভয়ানক ভীরু একটা আর্তনাদের শিহর চাপতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে কথা বলেন সিস্টারদিদি।—তুমি ভয়ানক ভুল কথা বলেছ জোহানা।

—সিস্টারদিদি! চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর কালো চোখ দুটো হঠা সাদা হয়ে যায়।

সিস্টারদিদির চোখে ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—আমাকে আবার কি বলতে চাও?

মুরলী—বলতে চাই, তুমি তো ওকে আগেই মেরে রেখেছিলে, আমি শুধু ওর লাস গুম করে দিলাম।

—কি বললে, জোহানা? সিস্টারদিদির সাদা চুলের খোঁপা কাঁপতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—তুমি ওকে তোমার সাধের আসাইলামে ঠাঁই দিতে পারলে না কেন?

সিস্টারদিদি—জানি না।

মুরলী—খুব জান, জবাব দাও দিদি।

সিস্টারদিদি—না।

মুরলী—না বললে চলবে না, দিদি। আমি আজ তোমার জবাব ন নিয়ে।

ডিং ডাং! ডিং ডাং! গির্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ শ হয়ে যায় মুরলী। সিস্টারদিদির কাছ থেকে জবাব নেবার আর উপায় ন। সিস্টারদিদির মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে ধরেছেন, আর মনে মনে প্রেয়ার সাধতে শুরু করেছেন।

আজ আর ভবে গির্জা যাবেন না সিস্টারদিদি। রঙিন ছাতাটা হাতে বারান্দা থেকে নেমে আর দুলে দুলে হাটতে হাটতে সড়কের উপরে উঠেই দাঁড়ায় মুরলী। মুরলীর দুই চোখ যেন কাচের তৈরী দুটো চমৎকার চে চিকচিক করে হাসতে থাকে। বোধহয় দেখতে পেয়েছে মুরলী, রিচার্ড সরকা জন্য ভোট হাঁকতে হাঁকতে সেই মিছিলটা আবার এদিকেই ফিরে আসছে।

—